ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

ওঁ ধর্ম্মাধিপতয়ে নমঃ

গৌর-চন্দ্রিকা।

সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তমগোচরং।
শিবং সচ্চিদানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোস্ম্যহং॥

যিনি নিখিল বেদান্ত-সিদ্ধান্তের গোচরীভূত; ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, শিবস্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দময় সদ্গুরুকে নমস্কার করিয়া আমরা নূতন উদ্যমে ৭ম বৎসরের "আর্য্য-দর্পণ" পরিচালনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। দেব! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার সেই দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে কার্য্যে ব্রতী হইলাম, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা কেবল একমাত্র তুমিই জান। কৃতকার্য্য হইতে পারি বা না পারি তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু যেন কর্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ হইয়া আমিত্বের সম্প্রসারণের পরিবর্ত্তে তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে ঊর্ণনাভের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া না পড়ি; যেন সর্ব্বাবস্থায়—সর্ব্বরকমে সর্ব্বকর্ম্মফল তোমার অতুল রাতুলপদে সমর্পণ করিতে পারি।

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কালচক্র আবর্ত্তনে বাঙ্গালা ১৩২০ সালটী অতীতের কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল; কেবল তাহার স্মৃতি জগত বহন করিবে। একবৎসরের মধ্যে লীলাময় ভগবান্ তাঁহার লীলা-রঙ্গমঞ্চে কত প্রকারের লীলাভিনয় করিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? —কোথাও সুন্দর শ্যামল শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা বর্ষার প্রবল বারিপাতে নিমজ্জিত, আবার কোথাও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে ভস্মীভূত; কোথাও ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত জীবগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে অশান্তি-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত, কোথাও শান্তি ও আনন্দের মন্দাকিনী কুলকুল নাদে প্রবাহিতা। কোথাও মরুভূমি সুদৃশ্য রমণীয় নগরীতে পরিণত,

আবার কোথাও সুরম্য রাজপ্রাসাদ ভীম-দর্শন শ্মশানে পর্য্যবসিত; কোথাও হাসি, কোথাও কান্না, এইরূপ লীলা বৈষম্যের অভিনয়ে গত বর্ষের কাল-যবনিকা পতন হইল। পুরাতন চলিয়া গেল, নূতন আসিল। যাঁহারা পুরাতনের ভক্ত তাঁহারা অতীতের স্মৃতি লইয়া ধ্যানে বসুন, আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা লইয়া সাদরে নূতনকে বরণ করিলাম।

পুরাতন বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শীতের জড়তা ও অবসাদ দূর হইয়াছে, নূতন বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের সুবাতাস বহিতেছে। এক্ষণে আমাদিগকে অগ্রসর হইয়া জগত সমক্ষে আর্য্যগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেদিন নিশ্চয়ই পাইব, যে দিন হিন্দুর আচার, হিন্দুর ব্যবহার, হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম জগতের নিকট আদর্শ স্বরূপ হইবে।

একণে আমাদের কর্ত্তব্য—লক্ষ্য নির্ণয় করতঃ গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া। জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা এবং তাহার পরিপুষ্টিই জাতীয় জীবনরক্ষক। আমরা ধর্ম্মকে প্রকৃত লক্ষ্য না করিয়া পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতেছি; সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া আর কর্ত্তব্যে অবহেলা করা উচিত নহে। যাহাতে এই ধর্ম্মরক্ষা হয় তাহার চেষ্টা করা আপামর সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার ধন আছে তিনি ধনে, যাহার জ্ঞান আছে তিনি জ্ঞানে, এইরূপ আসুন আমরা সংঘশক্তিতে দেশের সেবাকার্য্যে অগ্রসর হই। আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পরমুখাপেক্ষী হইলেও কেহ সাহায্য করিবে না; আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের পদে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; সুতরাং যাহার যাহা আছে তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাই জাতীয়-জীবনের শোণিতবিন্দুতুল্য হইবে। আমরা যদি অন্তরের সহিত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হই, ভগবান নিশ্চয়ই মঙ্গল-হস্ত প্রসার করিয়া সাহায্য করিবেন। আমরা অতীব ক্ষুদ্র হইয়া এইরূপ সেবাব্রত লইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা যে কাঠবিড়ালীর সেতু-বন্ধনে সাহায্য করার ন্যায় আমরা সকলেই (যতই ক্ষুদ্র হই না কেন) সাধারণের হিত-কল্পে কিছু না কিছু করিতে পারি। আসুন আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া অন্ততঃ একবার আমাদিগের স্ব স্ব শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখি। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ।"

পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর সেই সেই গুণে অবস্থানই তাহাদিগের জাতীয়ত্বরক্ষা ও অভ্যুদয়ের হেতু-ভূত। আমরা এই বিশাল হিন্দুজাতি সেইরূপ ধর্ম্ম লইয়া জন্মিয়াছি, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া আমরা কখনই বাঁচিতে পারিব না। অন্যান্য জাতি যেমন বহির্জ্জগতের বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, হিন্দু তেমনি অধ্যাত্ম জগতের—ধর্ম্মের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। এই ধর্ম্মপ্রাণতাই হিন্দুর স্বভাবগত এবং জাতীয় ভিত্তি। সুতরাং ভিত্তি দৃঢ় রাখিয়া যদি আমরা অন্যান্য জাতির অন্যান্য গুণের অনুসরণ করি, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না; বরং উপকারই হইবে। কিন্তু যদি আমরা ধর্ম্ম-

ত্যাগ করিয়া অন্য অন্য জাতির অন্যান্য গুণানুসরণে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের বিশেষত্ব নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে এবং জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। তাই নববর্ষের প্রারম্ভে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে স্বধর্ম্মের গৌরব উপলব্ধি করিয়া তাহার জন্য অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছি। এই সনাতন ধর্ম্মের অন্তঃস্থল প্রাণে প্রাণে বুঝিবার চেষ্টা করুন, আমাদের আর্য্যঋষিগণ যুগান্তব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহাদের বংশধরগণের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বার্থপর ছিলেন না, বা শাস্ত্রাদিপ্রণয়ন পূর্ব্বক অমৃত-বাণী ঘোষণা করিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষাকল্পেও প্রয়াসী ছিলেন না। তাঁহারা ঐ সকল অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থরাজী কেবল মাত্র লোকহিতার্থেই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য জ্ঞানালোক সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেনঃ—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—

আমাদের কেবল আলস্য ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করিলেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারিব ও তাঁহাদিগের প্রতিভায় অধিকতর মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইব।

মঙ্গলময় শ্রীগুরুর কৃপায় "আর্য্য-দর্পণ" এক্ষণে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। আর্য্য-ঋষিগণের সনাতন ও শাশ্বত পন্থা অবলম্বন করতঃ তাঁহাদিগের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগের যুগযুগান্তব্যাপী সাধনার ফল সনাতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জগতের সেবা করিতে আমাদের এই পত্রিকা (ক্ষুদ্র হইলেও) গত ৬ বর্ষব্যাপী আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করে নাই। আমাদের "আর্য্য দর্পণ" পত্রিকা আর্য্যগৌরব রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। শাস্ত্রাদির কূটস্থানের ব্যাখ্যা, সাধনমার্গের গুহ্যতথ্যসকল সাধারণের গোচরীভূত করণ, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম যোগত্রয়ের বিশদালোচনা ইত্যাদি সাধক-ভক্ত-সুধী-মণ্ডলের বিশিষ্ট মহানুভবগণের লেখনিনিঃসৃত হইয়া প্রবন্ধাকারে প্রতিমাসে আর্য্য-দর্পণে স্থান পাইয়া থাকে। উন্নত ও মৌলিক প্রবন্ধরাজিতে যাহাতে আর্য্য-দর্পণের কলেবর পরিপুষ্টি লাভ করে তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকিব। আশা করি ধার্ম্মিক এবং জ্ঞানী মাত্রেই পত্রিকা-পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও ধর্ম্মপিপাসু সুধী-গণের অনুরোধে এবার আমরা আর্য্য-দর্পণকে বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। আমাদের নানারূপ অসুবিধা ও ক্ষতি সত্ত্বেও এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম, আমরা ভগবৎকৃপায়, নানারূপ অভাব অনাটন সহ্য করিয়া এবং সুদূর আসামের নিভৃত স্থানে থাকিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যভার লইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি।

উপসংহার কালে আমাদের নিবেদন এই যে, বিশাল হিন্দুজাতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহাতে বহু বিষয়ের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ

বাহির হইয়া আর্য্যজাতির মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। কি বিষয় সম্পদে, কি চিত্র-সৌন্দর্য্যে, কি ভাষার পারিপাট্যে তাহাদের স্থান সাহিত্য জগতের অতি উচ্চে; আমাদের আর্য্য-দর্পণের তেমন স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই নাই। আর্য্য-দর্পণের পরিচালকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত নহেন—তাহাদের সাহিত্যের আলোচনা করিবার আদৌ সুযোগ নাই। তাঁহারা কৌপিন-মাত্রৈকসম্বল নগণ্য ভিখারী; সুতরাং আমাদিগের গৌরব করার কিছুই নাই। সাহিত্য হিসাবে আমরা "আর্য্য-দর্পণ" প্রচার করি না, ধর্ম্মের সেবাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব এই পত্রিকায় ভাষার ব্যভিচার দেখিলে, কেহ মর্ম্মাহত হইবেন না। অনন্ত ভাব-বৈচিত্র্যময় সংসারে কেহ বাসন্তী-পূর্ণিমার পক্ষপাতী, কেহবা অমাবস্যার ঘোরান্ধকার ভালবাসেন, তাই একশ্রেণীর হিন্দুর নিকট "আর্য্য-দর্পণ" ধর্ম্মপিপাসুর সুশীতল পানীয় রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহারা আর্য্য-দর্পণের ন্যায় নগণ্য পত্রিকারও সমাজে প্রয়োজন আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের জন্যই আমাদের আর্য্য-দর্পণ প্রচার। আর এককথা, এই পত্রিকার আয় জগদ্গুরু শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের আসাম-প্রদেশস্থ "সারস্বত-মঠের" অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের" দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার্থে সম্পূর্ণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং দরিদ্র নারায়ণ সেবাও "আর্য্য-দর্পণ" প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং গ্রাহকবর্গের প্রদত্ত অর্থদ্বারা এই সেবা রূপ মহাব্রতই সম্পন্ন হইবে। দেশের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ বর্ত্তমান সময়ে সেবাধর্ম্মের আবশ্যকতা বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং অনেকেই এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে যত্নবান হইয়াছেন। "আর্য্য-দর্পণ" ক্ষুদ্র হইলেও এই মহৎ কার্য্য যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা জন্যই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্থায়ীত্ব ও উন্নতিবিধান স্বধর্ম্মানুরাগী সুধিগণের যত্ন ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। গ্রাহকগণের বিশেষ অনুরোধে ও আগ্রহে আমরা "আর্য্য-দর্পণের" কলেবর এই বর্ত্তমানবর্ষ হইতে ১ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিলাম, তথাপি ইহার বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে মূল বৃদ্ধি করা হইল না। এক্ষণে সহৃদয় গ্রাহকগণ এবং দেশের ধর্ম্মপ্রাণ মহাশয় ব্যক্তিগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে তাহারা যেন এই দরিদ্র পত্রিকার স্থায়ীত্ব ও উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন এবং যাহাতে ইহা বহুল প্রচারিত হইয়া সনাতনধর্ম্ম প্রচার এবং দরিদ্র-নারায়ণ-গণের সেবায় সহায়তা করিতে পারে তৎবিষয়ে যত্নবান হন।

শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন।

—:0:—

মায়ের-আশীর্বাদ ভিক্ষা।

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাগো যাঁহার রচিত,
সেই তুমি আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত।

ক্ষুদ্র নই হীন নই, আমরা সন্তান,
অবিনাশী আত্মাদেহে করি অবস্থান।

কর্ম্মদোষে তবু মোরা হয়েছি অনাথ,
ভুলে গেছি আমাদের পিতা বিশ্বনাথ ।
যদ্যপিও তুমি মাগো রাজ রাজেশ্বরী,
ভাগ্যদোষে তবু মোরা পথের ভিখারী ।
মাতৃহারা ছেলে মত কাঁদিয়া বেড়াই ।
এ জগতে আমাদের যেন কেহ নাই ।
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হয়ে বিস্মরণ,
হীনকাজে দীন ভাবে যাপিছি জীবন ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
আজ যে মা সে বিশ্বাস কার আর নাই ।
হিংসা দ্বেষে জলে মরি একে অন্য সুখে,
স্বার্থ তরে ছুরী মারি ভাইয়ে ভাই এর বুকে ।
তুমি মাগো অন্নপূর্ণা আর তোর ছেলে,
অন্নাভাবে নিত্য যায় কালের কবলে ।
তুমি মা অভয়া, মোরা ভয়ে সদা মরি,
অভাবে স্বভাব নষ্ট হীন কাজ করি ।
সন্তানের দুর্দ্দশার আর কিবা বাকী,
কেমনে মা ধৈর্য্য ধর এ সকল দেখি ।
আমরা অজ্ঞান আজো জানি না স্বরূপ,
তাই ঘটে পরমাদ প্রত্যহ এরূপ ।
ক্ষুদ্র নই, হীন নই, আমরা সন্তান,
দয়াময়ি ! দয়া করে দেগো দিব্যজ্ঞান ।
প্রেমময়ি ! আমাদেরে কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচে যা'ক জীবনের ভ্রান্তি ও বিষাদ ।
সংযমী, বিনয়ী হই, হই সত্যবাদী
সরলতা, দয়া, প্রেমে, পূর্ণ কর হৃদি ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
সর্ব্বভূতে মা তোমাকে দেখ্‌তে মোরা চাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
সবে মিলে মন খুলে মা বলিতে চাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে থাকিবারে চাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
হিংসা দ্বেষ স্বার্থ যেন মোরা ভুলে যাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
অনাসক্ত ভাবে ভোগ করিবারে চাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
তপে জপে যোগে দিন যাপিবারে চাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
আপন স্বরূপ যেন ভুলে নাহি যাই ।
আমরা তোমার ছেলে বিশ্ববাসী ভাই,
বিশ্ব-হিতে মন প্রাণ সঁপিবারে চাই ।
ক্ষুদ্র নই, হীন নই, আমরা সন্তান,
দয়াময়ি ! দয়া করে দেও দিব্যজ্ঞান,
নব বলে কর বলী দেও মা প্রসাদ,
যাচি মাগো প্রেমময়ী তব আশীর্ব্বাদ ।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু ।

———:0:———

বাসন্তী বা দুর্গাতত্ত্ব ।

নূতন বৎসরে প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিয়াছেন;—পুনর্জ্জীবিতা প্রকৃতি বসন্তের নব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন । বাসন্তী গৃহোপবনে নব-মালিকার কুসুম সৌন্দর্য্য বিকসিত অগণ্য প্রফুল্ল ফুলরাজি শ্বেত শোভায় বন আলোকিত করিয়া প্রভাতের বিমল বিভার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে । মাঝে মাঝে গোলাপ-রূপবতী সেই সৌন্দর্য্যের

রমণীয়তা ও বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। সেই কুঞ্জে মধুপানে, সুবাসিত গোলাপ বাগানে, প্রস্ফুটিত মল্লিকাবনে মধুগন্ধে বিভোর হইয়া মধুকর-নিকর উল্লাসে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে। পিকরাজ শ্যামলতরুকুঞ্জে—কুহু ঝঙ্কারে নন্দদুলালী রূপ লুকাইয়া গন্ধ-বাঙ্গীতে বাঙ্গালী যুবকেও পরাজিত করিতেছে। আর একালের সকলের সেরা দক্ষিণ সমীরণ সন্তর্পণে—অতিধীরে ফুলফুলদলে-দলে প্রবাহিত হইয়া মধুরতা সঞ্চারিত করিতেছে। চারিদিকে কেবল সৌন্দর্য্য আর শোভা—কান্তি আর লাবণ্য—রূপ আর রমণীয়তা।

এই বাসন্তী সৌন্দর্য্যময় বঙ্গধামে সেদিন—৯০শে চৈত্র শুক্রবার অপরূপরূপ-যৌবনা বাসন্তীপ্রকৃতির প্রাণস্বরূপা বাসন্তীপূজা হইয়া গিয়াছে। বাসন্তী-উৎসবে সমগ্র বঙ্গের সমগ্র হিন্দু একপ্রাণে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কতশত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে,—সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া একটী আনন্দের তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেকেই জানে না যে, বাসন্তী বা দুর্গা দেবী কি?—আমরা কাহার আরাধনা কেন করিতেছি। সুতরাং দুর্গা কি; তাঁহার দশভুজা কেন, তিনি অসুর-বিনাশে যুদ্ধ-নিমগ্না কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা শক্তি,—সেই সমষ্টি শক্তিই দশভুজা দুর্গা। সগুণ ব্রহ্মের সাকার রূপ বা ভগবতীতনুই দুর্গামূর্ত্তি। এই বিশ্বরূপিনী মহামায়া নিত্যা। এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্না হইয়াছে। তাঁহার সৃজিত বিশ্বে পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তির সংগ্রাম অনিবার্য্য; এই সংগ্রামে কখনও দেবতা জয়ী, কখনও অসুর জয়ী। যখন দেবতা পরাভূত হয়েন, তখন অসুর জয়ী হয়,—জগৎ পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ শক্তিতে ভাসিয়া পড়ে। দেবগণ হীন-শক্তি হইয়া পড়েন,—তখন পুণ্যশক্তি রক্ষার জন্য এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে কথিত আছে যে, "পুরাকালে দৈত্যাধিপতি মহিষাসুরের সঙ্গে একশত বৎসর পর্য্যন্ত দেবতাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাবীর্য্যবান্ অসুরগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্র দেবগণের সহিত পরাভূত হইলে, মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। তাহাতে পরাভূত দেবগণ ব্রহ্মাকে সহায় করিয়া, তাঁহার সহিত হরি-হর সন্নিধানে গমন করেন। মহিষাসুর কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা এবং সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম ও অন্যান্য দেবতা সকলের অধিকার বিচ্যুতির কথা দেবগণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে, শিব ও বিষ্ণু ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহাদের বদনমণ্ডল ভ্রুকুটি-ভঙ্গি দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাজ্যোতিঃ নির্গত হইল। সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দেহ হইতে মহত্তেজোরাশি বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া একত্রিত হইল। তখন দেবগণ দেখিতে পাইলেন, ঐ তেজপুঞ্জ নিজশিখা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় হইয়া উঠিল।

তদনন্তর, সেই সুরগণের শরীর-বিনির্গত একত্রীভূত অনুপম তেজোরাশি নারী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। আর সেই দ্যুতি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। শিবের তেজ হইতে সেই স্ত্রীর মুখমণ্ডল প্রকটিত হইল। আর যমের তেজে কেশ ও বিষ্ণুর তেজে বাহুদ্বয়

প্রকাশ পাইল। চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ঊরুদ্বয় এবং ধরণীর তেজ দ্বারা নিতম্ব বিনির্ম্মিত হইল। ব্রহ্মার তেজ হইতে পাদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পদাঙ্গুলিসকল, বসুগণের তেজে হস্তাঙ্গুলিসকল ও কুবেরের তেজে নাসিকা বিকশিত হইল। আর দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজ হইতে দশন সমূহ এবং অনলের তেজে ত্রিনয়ন উৎপন্ন হইল। সন্ধ্যার তেজে ভ্রূ-যুগল, বায়ুর তেজ হইতে কর্ণদ্বয় এবং অন্যান্য দেবতাবৃন্দের তেজ হইতে দেবীর অপরাপর অবয়ব সমুদয় সমুদ্ভব হইয়াছিল।

পিনাকধারী শিব নিজ শূল হইতে অন্য শূল এবং বিষ্ণু স্বীয় চক্র হইতে অন্য চক্র সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। সমুদ্র শঙ্খ এবং অগ্নি শক্তি দান করিলেন। পবনদেব ধনু ও বাণপূর্ণ তূণীর প্রদান করিলেন। দেবাধিপতি ইন্দ্র ঐরাবত হইতে ঘণ্টা ও নিজ বজ্র হইতে অন্য বজ্র দেবীকে সম্প্রদান করেন। যম কালদণ্ড, বরুণ পাশ অস্ত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রদান করেন। দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকূপে আপন কিরণ দিলেন, এবং কাল খড়্গ ও নির্ম্মলচর্ম্ম। বর্ম্ম দান করিলেন। ক্ষীরোদ সাগর বিমল হার, অবিনশ্বর অম্বর, দিব্য মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুভূষণ, কেয়ূর, নির্ম্মল নূপুর, উৎকৃষ্ট কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক সকল প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা অতি নির্ম্মল কুঠার, অন্যান্য নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সকল এবং অভেদ্য কবচ দান করিলেন। জলনিধি শিরোদেশে ও গলদেশে অমল কমল মালা এবং সুশোভন পঙ্কজ-হার অর্পণ করিলেন। হিমালয় বাহনের জন্য সিংহ ও অশেষ ধনরত্ন এবং ধনাধিপতি কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। সর্ব্বনাগেশ্বর অনন্তদেব মহামণি-বিভূষিত নাগহার দান করিলেন। তখন অন্যান্য দেবগণও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও নানা প্রকার অলঙ্কার দান দ্বারা দেবীকে সম্মানিতা করিলে, তিনি মুহুর্মুহুঃ উচ্চনাদে অট্ট অট্ট হাস্য আরম্ভ করিলেন। এই মহাভীষণনাদিনী দেবী হইতে অসুরগণ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে মনে করিয়া মহোল্লাসে দেবগণ ভক্তি-অবনত কায়মনে দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।*

অনন্তর দেবী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—"দেবগণ! নিশ্চিন্তে স্ব স্ব স্থানে গমন কর, এই আমি মহিষাসুরকে সংহার করিতে চলিলাম। বৎসগণ! তোমাদিগকে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে,—যখন অসুরদল পরাক্রান্ত হইয়া তোমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে, আমি আবির্ভূতা হইয়া দানব সংহার করতঃ তোমাদিগকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিব"

দেবীর উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইল; এই দেবী কি,—আশা করি সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সমস্ত দেব-শক্তির সমষ্টি শক্তি।

---

*এই ভাবে দেবীর প্রকৃত স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—"এই ত্রিলোকে সদসৎ যে কিছু বস্তু, সমস্তই এই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র। ভক্ত পাঠক! চণ্ডীতে সমস্ত স্তবটা দেখিয়া লইবেন। প্রঃ লেঃ।

শক্তি যখন ব্যষ্টি ভাবে অবস্থিত তখন দেব-শক্তি—আর সমষ্টি অবস্থাগত যখন, তখনই মহাশক্তি দুর্গাদেবী। দেবী সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালোপযোগী তত্ত্বালোচনা করা যাউক।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগৎকে স্থূলভাবে দেখেন; সেইজন্য তাঁহাদিগের দৃষ্টি স্থূল জগতেই সীমাবদ্ধ। জগতের যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম স্তর আছে, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। তাঁহাদের মতে পদার্থের ঘন (Solid) তরল (Liquid) এবং বাষ্পীয় (Gaseous) এই তিনটি অবস্থা আছে। যেমন জলের তিন অবস্থা,—বাষ্প, জল এবং বরফ। কেহ কেহ কায়ক্লেশে আজি কালি পদার্থের আকাশীয় (Etheric) অবস্থাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ইহার উপরে আর উঠিতে প্রস্তুত নহেন, বা সক্ষম নহেন। আর্য্য-শাস্ত্রের ঋষিগণ বলেন,—এই স্থূল জগতের ভূর্লোকের পর পর সাতটী স্তর আছে। এই স্তর কয়টীর সূক্ষ্মতম নাম,—আদি, অনুপাদক, আকাশ, বায়ু তেজ, অপ্ ও পৃথিবী। এক এক স্তরের ভূত এক একটী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। এই এক একটী তত্ত্ব গ্রহণ করিবার উপযোগী আমাদের এক একটী স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই তত্ত্বের সংযোগে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে যে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তাহাদের নাম যথাক্রমে—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। আদি ও অনুপাদক তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয় সাধারণ মানবে নাই। এক এক তত্ত্বের উপাদানভূত পরমাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা "তন্মাত্র।" পার্থিব পরমাণুর নাম গন্ধ-তন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর নাম রস-তন্মাত্র, তৈজস পরমাণুর নাম রূপ-তন্মাত্র, বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শ-তন্মাত্র এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্দ-তন্মাত্র। এপর্য্যন্ত গেল স্থূলজগতের ভূর্লোকের কথা। এই ভূর্লোকের পর পর আরও ছয়টী লোক আছে। তাহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম। এই সপ্তলোকের নাম যথাক্রমে—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। এই সপ্তলোকের প্রত্যেকই ভৌতিক-উপাদানে গঠিত;—পরস্পরে কেবল স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য। ভূর্লোকের ন্যায় অপর ছয় লোকেরও এইরূপ সাতটী করিয়া স্তর আছে। ভূর্লোকের যাহা সূক্ষ্মতম স্তর—আদিতত্ত্ব, তাহাই পাশ্চাত্য—বৈজ্ঞানিকের Protyle (প্রোটাইল)। অর্থাৎ—ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব সেই জগতের পরম-পরমাণু (Ultimate atom) সেই লোকের অদ্বিতীয় মহাভূত। সেই মূলতত্ত্বের সংহননেই নিম্নের অপরাপর ছয় স্তরের উপাদান গঠিত হয়। ভূর্লোকের যে আদিতত্ত্ব, তাহাই বিচিত্ররূপ সংহত হইয়া যথাক্রমে অনুপাদকতত্ত্ব, আকাশ-তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, অপতত্ত্ব ও পৃথিবীতত্ত্ব উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু প্রোটাইল ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব ভুবর্লোকের স্থূলতম স্তর হইতে স্থূল। ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের তুলনায় ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব পরমপরমাণু নহে; কিন্তু ভুবর্লোকের আদিতত্ত্বের পরমাণুপুঞ্জ। সংহনন-জনিত। ভুবর্লোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল,—স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। এইরূপ পরস্পর বিশ্লেষণ করিয়া সত্যলোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই আর্য্যঋষির কথিত মূল প্রকৃতি। এই সর্ব্ব সূক্ষ্মতম একমেবা-

দ্বিতীয় মহাসূক্ষ্মভূত পর পর স্তরে স্তরে সংহত ও পরিণত হইয়া সর্ব্ব নিম্নস্তরে ভূর্লোকে আদিতম প্রোটাইলের রূপ ধারণ করে। অতএব প্রকৃতি প্রোটাইল জাতীয় হইলেও এক পদার্থ নহে।

এই মূল প্রকৃতির অন্য নাম মায়া। যথাঃ—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। যাহা এ-পীঠে মায়া, তাহাই ও-পীঠে প্রকৃতি। অর্থাৎ—যাহা পরাক্-দৃষ্টিতে (Objective point of view হইতে) প্রকৃতি, তাহাই প্রত্যক্-দৃষ্টিতে (Subjective point of view হইতে) মায়া। এই মায়া সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
গীতা।

এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী। গুণ শব্দে, ইংরাজি-দর্শিত এখন (Quality) বা (attribute) বুঝে; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সেরূপ গুণ নহে। মূল প্রকৃতি এই তিনটী পরস্পর বিরোধী প্রবণতার (Tendency) রঙ্গভূমি। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম, অদ্বিতীয়, নির্দ্দেশরূপে সম, মহ মূলভূতে (সত্যলোকের absolutely homogeneous matter তে) এই তিনটী পরস্পর বিরোধী প্রবণতার নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংঘর্ষ চিরস্থায়ী। যখন কালবশে এই বিরোধী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (equilibrium) সংঘটিত হয়, তখন তাহার নামকরণ করা হয়, প্রকৃতি। সে প্রলয়ের অবস্থা—অব্যক্ত অবস্থা। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, যখন প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির অভিমুখী হয়, তখন তাহার নাম প্রধান। সৃষ্টির মুখে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া সত্য প্রভৃতি সপ্তলোকে অনুলোম-ক্রমে ব্যক্ত হয়। আর প্রলয়-কালে এই সপ্তলোক বিলোমক্রমে স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অব্যক্ত হইতে হইতে অবশেষে অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিতে উপশান্ত হয়।

এই প্রকৃতি আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী। ইনিই কালী, দুর্গা, প্রভৃতি নাম-রূপে আর্য্যঋষির হৃদয়ে ধ্যানাকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই প্রকৃতিদেবী বা দুর্গাশক্তি সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা গোপরাজ নন্দকে বলিয়াছেন;—

"দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী। আমরা ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেবদেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তুষ্টি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, শান্তি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি ও লজ্জা-স্বরূপিনী। উনিই গোলকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, চন্দ্রে শোভাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণশক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি,—সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের বিদ্যা-

রূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আবার ভক্তগণের মধ্যেই উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লক্ষ্মীরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যারূপিনী, সাধুগণের সুবুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী-স্ত্রীতে পতিভক্তিরূপা,—সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় দুর্গাশক্তি সর্ব্ব শক্তিস্বরূপা।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্ব শক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিরূপিনী—তাহাই দুর্গা। এই মহামায়া দুর্গা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ভবের হাটে খেলা করিতেছেন। সেই পরমা বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী ভগবতীকে প্রসন্না করিতে পারিলে, জীব সংসার-মোহ হইতে বিমুক্ত হয়েন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দেবশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্য্যঋষি যখন বুঝিলেন, কোন মহা শক্তির কণাশক্তিতে জগৎ এত যে হময়ী— এ শক্তি কোথায় আছে? কে সে? আমাদের মা;—মা! মা! কোথায় তুমি? ঋষি ধ্যানে বসিলেন। সাধকের হৃদয়ের দশদিক আলো করিয়া দশভূজা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল,—সে ধ্যানের প্রতিমা দুর্গামূর্ত্তি। আজি আর্য্যসমাজ প্রতি বৎসরের প্রকৃতির বাসন্তী-সজ্জা মধ্যে সেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন।

অতএব বাসন্তী দুর্গাপূজা আর কিছুই নহে, তাহা মহাশক্তির আরাধনা মাত্র যে বিশ্ব-শক্তি জগৎব্যাপিনী, তাহাই মহা-শক্তি;—তাহাই সমষ্টি শক্তি। সেই শক্তিরই উন্নত বিকাশ চেতনা, চেতনার উন্নত বিকাশ জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি। আবার বুদ্ধিজীবী প্রাণী-সমাজের বল,—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য ও বীর্য্য। সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্য সবলিত মহাশক্তি পাপ ও যথেচ্ছা-চারিতার পতনশীল স্বরূপ মহিষাসুরকে পদতলে রাখিয়াছেন। এই মহাভাবের ধ্যানজ প্রতিমা বাসন্তী উৎসবে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। মহাশক্তি দশদিক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিত্যন্ত সাধন করিতেছেন, তাই মহাশক্তি দশভুজা। ভীষণ বলবিক্রম-শালী ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃসিংহ তাঁহার বাহন। অবিদ্যাজাত অজ্ঞানাসুরকে পাশে আবদ্ধ করিয়া, তাহার বক্ষস্থলে ভীষণ বিবেক-শূল বিদ্ধ করিয়া, কেশে ধরিয়া রাখিয়াছেন। দক্ষিণে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা জ্ঞানগুরু গণপতি; তৎপরে ধর্ম্মৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবী। বামে বিপুল বলবিক্রমশালী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়; তৎপরে বাক্‌বাদিনী বাণী সর্ব্বদেবতা—সবাশ্রয় তাঁহার পশ্চাতে, ... বিচিত্রিত, চমৎকার পবিত্র-... সহিত কি মহান্ সত্ত্ব ... সত্তা-প্রতিমায় বিকশিত।

সাধারণ মানব-হৃদয়ে পরমাত্মা কোন শক্তি রূপেই প্রবর্ত্তিত হন। সাধারণ মানব-হৃদয় আর কোনরূপে পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারে না। আর্য্যঋষি তাই তাঁহাকে মহাশক্তি রূপে প্রদর্শন করিলেন;——সমুদয় ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহাকে দেখিলেন ও দেখাইলেন। সত্ত্ব, রজ, ও তমো গুণে পরিপূর্ণ হইয়া পরমাত্মা শক্তিরূপে প্রকটিত। এই শক্তিরূপী পর-

মায়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লীলায় লিপ্ত রহিয়াছেন। জগতের মহামায়ার অভ্যন্তরে তিনি আপনার লীলা সম্পাদন করিতেছেন। ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বল, বীর্য্য প্রভৃতি তাঁহার বিভূতি। এই মহাশক্তির ধ্যানে ব্যাপৃত হইয়া আর্য্য ঋষি সকলকে নিজ নিজ হৃদয়ে তাহার বিভূতির সহিত দেখিতে পরামর্শ দিলেন। দর্শকেই যে শক্তি বিস্তৃত, সেই মহাশক্তি দশভুজায় দেখা দিলেন। সেই দশভুজার পার্শ্বে ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান, সিদ্ধি ও বীর্য্য; লক্ষ্মী—সরস্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়। এই মহাশক্তিকে আর্য্যঋষি ধ্যানে দেখিয়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন ও সর্ব্বসাধারণকে করাইলেন। তাহাই বাসন্তী পূজা নামে ভারতের হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পাঠক! শক্তিতত্ত্ব ও তাঁহার পূজার রহস্য বুঝিলে কি? এরূপ শক্তি পূজার প্রতিষ্ঠা না হইলে কোন সমাজ উঠিতে পারে না, কোন জাতির উন্নতি সাধন হইতে পারেনা। আইস, আমরা একমনে—একতানে ভারত-বাসী সকল হিন্দু প্রকৃত শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া আর একবার জগতে ভারতের জয় ঘোষণা করি। আইস, আমাদিগের হৃতশক্তি ও দৃঢ়া ভক্তি পাইবার জন্য সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা, পরব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী, মহাবুদ্ধিপ্রদায়িনী, কুলকুঠারঘাতিনী, মুক্তি-দায়িনী মহাশক্তীশ্বরী দুর্গাদেবীর শমনলাঞ্ছিত, সুরাসুরবাঞ্ছিত-অতুল-রাতুল চরণোদ্দেশে প্রণাম করি।

দুর্গাদেবী জগন্মাতা জগদানন্দদায়িনী।
মহিষাসুর সংহর্ত্রী প্রণমামি নিরন্তরং॥
ওঁ শান্তি ওঁ।

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

—:০:—

কৌপীন-পঞ্চক।

(১)

বেদান্ত বাক্যে যাঁর পরম সন্তোষ।
ত্রিকালজ্ঞ অন্নে যাঁর সদা পরিতোষ।
অশোক-অন্তরে সদা বিচরণকারী।
ভাগ্যবান সুনিশ্চিত সে কৌপীনধারী॥

(২)

বৃক্ষতল একমাত্র যাঁহার আশ্রয়।
শুধু ভোজ্য আহরণে নহে হস্তদ্বয়।
কন্থা সম ঐশ্বর্য্যেও যেবা কুৎসাকারী,
ভাগ্যবান্ সুনিশ্চিত সে কৌপীনধারী॥

(৩)

আত্মানন্দে যেই জন পরিতুষ্ট রয়।
শান্তভাবে স্থিত যাঁর ইন্দ্রিয় নিচয়।
অহর্নিশ যেই জন ব্রহ্মসুখচারী
ভাগ্যবান সুনিশ্চিত সে কৌপীনধারী॥

(৪)

দেহ-আদি ভাব যেবা নাহি রাখে স্থির।
স্ব-আত্মায় পরমাত্মা দেখে যেবা ধীর।
আদি অন্ত মধ্যভাগ অবিচারকারী।
ভাগ্যবান সুনিশ্চিত সে কৌপীনধারী॥

(৫)

পূত ব্রহ্মাক্ষর সদা যেবা উচ্চারয়ে ।
"অহং ব্রহ্ম" ইতি যেবা নিয়ত চিন্তয়ে ।
ভিক্ষাজীবি হয়ে যিনি পর্য্যটনকারী ॥
ভাগ্যবান সুনিশ্চিত সে কৌপীনধারী ॥

স্বরূপানন্দ ।

—:0:—

যোগপ্রক্রিয়ায় রোগারোগ্য ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ।)

ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে, তৎসমস্তই বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এক চৈতন্যের সাহায্যে এই জড় দেহে বায়ুই জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ কেবল যন্ত্রমাত্র; বায়ু ঐ যন্ত্রটী চালনা করিবার উপকরণ। মানব দেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশে অনাহতনামক একটী রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে বায়ুবীজ (যং) নিহিত আছে। ঐ বায়ুবীজ বা বায়ুযন্ত্র প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্যভেদে দশনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান, এই পঞ্চ বায়ুই প্রধান। এই প্রধান পঞ্চ বায়ুর মধ্যে হৃদ্দেশে প্রাণবায়ু, অপান বায়ু গুহ্যদেশে, সমান বায়ু নাভিমণ্ডলে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। বায়ুর বৃত্তিভেদে বিবিধ নাম সংকল্পিত হইলেও এক প্রাণবায়ুই মূল ও প্রধান।

শরীরে যে পর্য্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহ জীবিত থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সংঘটন হয়। প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত গমনাগমন করে, আর যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্য্যন্ত অপানবায়ু অধোভাগে গমন গমন করিয়া থাকে। যখন নাসারন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের উর্দ্ধভাগ স্ফীত করিতে থাকে, সেই সময়ে অপানবায়ু যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিয়া থাকে। অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে, এবং প্রাণ অপানবায়ুকে আকর্ষণ করে; এইরূপ নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয় দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই দুই বায়ুই পূরককালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয়; এবং রেচনকালে দুই বায়ু দুইদিকে গমন করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীন হইলেও পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে, প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়াও অপান বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে; এই দুই বায়ুর বিসংবাদে অর্থাৎ—নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীত ভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। আর যখন

ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রন্থি ভেদপূর্ব্বক একত্রে মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা দেহত্যাগ করে, পৃথিবীর ভাষায় জীবের মৃত্যু হয়। গমনকালের ঐ ভাবকে নাভিশ্বাস বলে। বায়ুর এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া বায়ু জয় করিতে পারিলে ইচ্ছামত শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং শরীর সুস্থ, নীরোগ ও কান্তি-পুষ্টিবিশিষ্ট করা যায়।

দেহ-নগরের মধ্যে বায়ু রাজা স্বরূপ। প্রাণবায়ু নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু গ্রহণের নাম নিশ্বাস এবং বায়ু পরিত্যাগের নাম প্রশ্বাস। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য হইয়া থাকে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আবার দুই নাসিকায় এক সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কখন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, কচিৎ কখন এক আধ মুহূর্ত্ত দুই নাসিকায় সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসাপুটের শ্বাসকে ইড়ার বহন, দক্ষিণ নাসিকার পিঙ্গলার বহন এবং উভয় নাসাপুটে সমানভাবে বহিলে তাহাকে সুষুম্নার বহন বলে। এক নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া অন্য নাসিকা দ্বারা শ্বাস রেচন কালে বুঝিতে পারা যায় যে, এক নাসিকা হইতে সরল ভাবে শ্বাস প্রবাহ চলিতেছে, অন্য নাসাপুট যেন বন্ধ; তাহা হইতে অন্য নাসার ন্যায় সরলভাবে নিঃশ্বাস বাহির হইতেছে না। যে নাসিকা দ্বারা যখন সরল ভাবে শ্বাস বাহির হইবে; তখন সেই নাসিকার শ্বাস বহিতেছে বুঝিতে হইবে। কোন্ নাসিকার নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পাঠকগণ এইরূপে অবগত হইবেন। ক্রমশঃ অভ্যাসবশে অতি সহজেই ইড়া, পিঙ্গলা বা সুষুম্না বহন নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

এইরূপে যখন ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ— বাম নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে বুঝিতে পারিবেন, তখন স্থির কর্ম্ম সকল করা কর্ত্তব্য। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে শুভকার্য্য সকল ও যোগাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যখন পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে তখন কঠিন ও ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ফল লাভ হইবে। আর উভয় নাসিকায় নিশ্বাস বহন কালে কোন প্রকার শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না; করিলে তৎসমস্ত নিষ্ফল হইবে। সে সময়ে যোগাভ্যাস ও ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা ভগবানকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ— তত্ত্বজ্ঞানানুসারে * তিথি-নক্ষত্রানুযায়ী যথাযথ নিয়মে ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিলে, কোন কার্য্যে আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপ দিবা রাত্র মধ্যে বারো বার বাম ও বারো বার দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন্ দিন কোন্ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে, তাহারও নির্দ্দিষ্ট

* নিশ্বাস বহন কালে ক্ষিত্যাদি তত্ত্ব পর পর কিরূপে উদিত হয়, পরে তাহা বর্ণিত হইবে।

নিয়ম আছে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া বাম নাসায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া দক্ষিন নাসায় প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়।* অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই নয় দিন প্রাতঃকালে—সূর্য্যোদয় সময়ে প্রথমে বাম নাসিকায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই ছয় দিনের প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ড থাকিবে; পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে। আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, ও অমাবস্যা,—এই নয় দিনের প্রাতঃকালে—সূর্য্যোদয় সময়ে প্রথমে দক্ষিণ নাসায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই ছয়দিন দিনমণির উদয় সময়ে প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ডান্তরে অন্য নাসায় উদয় হইবে। এইরূপে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাই মনুষ্যজীবনে শ্বাসবহনের স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং প্রতিপদ তিথিতে যদি নিশ্বাস বায়ু নির্দ্দিষ্ট মতের বিপরীত ভাবে উদয় হয়, তবে অমঙ্গল ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। যথাঃ—

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রভাতে মিত্রান্তরকালে সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে যদি দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা মধ্যে গরম জনিত কোন পীড়া হইবে; আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাসিকায় নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, সেইদিন হইতে অমাবস্যার মধ্যে শ্লেষ্মাঘটিত বা ঠাণ্ডাজনিত কোন পীড়া হইবে সন্দেহ নাই। দুইপক্ষ ঐরূপ বিপরীত ভাবে নিশ্বাসবায়ু উদয় হইলে আত্মীয় স্বজন কাহারও গুরুতর পীড়া কিম্বা মৃত্যু, অথবা কোন প্রকার বিপদ হইবে। তিনপক্ষ উপর্য্যুপরি ঐরূপ হইলে নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

প্রতিকার। শুক্ল কিম্বা কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ দিন প্রভাতে যদি ঐরূপ বিপরীত নিশ্বাস বুঝিতে পারেন, তবে সেই নাসিকা কয়েক দিন বন্ধ রাখিলে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণ পুরাতন পরিষ্কার তুলা পুটলির মত করিয়া পরিষ্কৃত সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া মুখ সেলাই করিয়া দিবেন। ঐ পুটলি দ্বারা নাসছিদ্রমুখ এরূপে বন্ধ করিয়া দিবেন, যেন সেই নাসিকা দ্বারা কিছুমাত্র নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য না হইতে পারে। যাঁহাদের কোনরূপ শিরঃরোগ আছে কিংবা মস্তিষ্ক দুর্ব্বল তাঁহারা তুলাদ্বারা নাসাছিদ্র রোধ না করিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের পুটলি দ্বারা নাসিকা বন্ধ করিবেন। যে কোন কারণে যতক্ষণ বা যতদিন নাসিকা বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন হইবে, ততক্ষণ বা ততদিন অধিক শ্রমজনক কার্য্য, দ্রুতগমন, চীৎকার শব্দ বা দৌড়াদৌড়ি

* বামে চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
প্রতিপত্তো দিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে॥
পবনবিজয়স্বরোদয়।

প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে কয়েক দিন দিবারাত্র নিয়ত (স্নানাহারের সময় ব্যতীত) বন্ধ রাখিলে ঐ তিথির মধ্যে একেবারেই কোন রোগভোগ করিতে হইবে না। যদি অসাবধানতা বশতঃ নিশ্বাসের ব্যতিক্রমে কোন পীড়া জন্মে, তবে যে পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষে দক্ষিণ এবং কৃষ্ণপক্ষে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন না হয়, এরূপ করিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইবে। গুরুতর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অতি সামান্য ভাবে হইবে, আর অল্প দিন মধ্যে আরোগ্য হইবে। এইরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে শরীর সুস্থ থাকে, দীর্ঘজীবী হওয়া যায়; ফলে সাংসারিক, বৈষয়িক সকল কার্য্যে সুফল লাভ করতঃ সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

স্বরশাস্ত্রের সঙ্কেত। অন্নাদি যখন যাহা আহার করিবেন, তাহা দক্ষিন নাসিকার শ্বাসবহন কালে করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে অতি সহজে জীর্ণ হয়, কখন অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে না। যাঁহারা এই রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারাও প্রত্যহ এই নিয়মে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইবে এবং ক্রমে রোগও আরাম হইবে। আহারান্তেও যাহাতে কিছুক্ষণ দক্ষিন নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার জন্য আহারান্তে কিছুক্ষণ বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিবেন। স্বরজ্ঞ সন্ন্যাসীগণ একটী দোঁহা বলিয়া থাকেন :—

"যো দাহিনে পানি পিয়ে, ভোজন বাঁয়ে খায়।
দশ বারহি দিন যো করে, রোগ শরীরহি আয়॥"

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি দক্ষিন নাসার শ্বাসবহন সময়ে জলপান করে এবং বাম নাসিকার শ্বাস বহন কালে ভোজন করে, এইরূপ দশ বার দিন করিলে শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রত্যহ বাম নাসিকার শ্বাসবহন সময় জলপান করিবেন, এবং দক্ষিন নাসার শ্বাস-বহন সময় অন্ন, জলখাবারাদি খাইবেন। আর ইড়ার বহন কালে প্রস্রাব করিবেন এবং পিঙ্গলার বহন কালে মলত্যাগ করিবেন। ভোজনের সঙ্গে জলপান কিম্বা মলত্যাগ কালে প্রস্রাব দক্ষিণা নাসার শ্বাস বহন কালে করিলে কোন ক্ষতি হইবেনা। প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ, নিরোগী ও দীর্ঘজীবী হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু কোন পীড়া হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকে না।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকার শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্তদ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। সেই দিন কোন হানি, বিপদ, এমন কি একটী কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার কালে যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিতেছে, সে দিকের পদ অগ্রে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে শুভফল লাভ হইয়া থাকে। কোন স্থানে যাত্রা করিবার কালে যে দিকের নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই চরণ অগ্রে বাড়াইয়া গমন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। কাহাকেও প্রীত রাখিতে ইচ্ছা হইলে, যে নাসায় শ্বাস বহিতেছে, সেই দিকে তাহাকে রাখিয়া কথা-বার্ত্তা বলিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হইবে। মোকদ্দমাদি কার্য্যের জন্য গমন করিতে হইলে,

যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, তাহার বিপরীত চরণ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবেন। পরে বিচারালয়ে গিয়া যে নাসিকায় শ্বাস বহিবে বিচারপতিকে সেই দিকে রাখিয়া এবং বিপরীত দিকে বিবাদীকে রাখিয়া এজাহার দিলে বা কথাবার্ত্তা বলিলে, নিশ্চয় মোকদ্দমায় জয়লাভ হইবে। গৃহে অগ্নি লাগিলে বায়ুর গতির বিপরীত দিকে অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্বাস গ্রহণ করে (স্বাভাবিক শ্বা। যখন টানিয়া লওয়া যায়) নাসিকাদ্বারা জলপান করিলে অগ্নি আর বাড়িবেনা এবং তখনি উহা শীতল হইবে। কোন শত্রুর সহিত মিলনের ইচ্ছা থাকিলে, একটী পাত্রে একটু জল লইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় সূর্য্যমুখী হইয়া মনে মনে শত্রুর নাম ও মিলনের ইচ্ছা করতঃ নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে নাসারন্ধ্র দ্বারা ঐ জলপান করিবেন। প্রত্যহ একবার করিয়া ইহা করিলে কিছু দিন মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে শত্রুর মন হইতে বৈরীভাব দূর হইবে। শ্বাস গ্রহণ সময়ে কাহাকেও কিছু দান করিলে দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস বহন কালে পুরুষ এবং বাম নাসায় নিশ্বাস বহন কালে স্ত্রীলোক দাম্পত্য-সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, দম্পতি পরস্পর অনুরক্ত থাকিবে এবং দাম্পত্য-প্রেম পরিবর্দ্ধিত হইবে। ঋতুস্নাতা নারী পৃথিবী কিম্বা জলতত্ত্বের উদয় কালে ঐরূপ নিয়মে পতি-সহবাস করিলে বন্ধ্যাও পুত্রবতী হইয়া থাকেন।

বায়ুরোগী লোক এবং যাহাদের খিট খিটে স্বভাব ও রুক্ষ মেজাজ, তাহারা সমস্ত দিন দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ রাখিবে। এইরূপ কিছু দিন ধরিয়া দিনে দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ রাখিলে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কোন কারণে রাগ উপস্থিত হইলে দক্ষিন নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত করিবেন। প্রত্যহ দিনে বাম নাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত রাখিতে পারিলে শরীরের আলস্য ও জড়তা দূর হয়, শরীর সুস্থ থাকে এবং কোন রোগ পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকেনা।

যখন ইঁপানী বা শ্বাস প্রবল হইবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস বহিতেছে; সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া অন্য নাসিকায় নিশ্বাস গতি প্রবর্ত্তিত করিবেন; তাহা হইলে দশ পনের মিনিটে টান কমিয়া যাইবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে একমাস মধ্যে পীড়াশান্তি হইবে। দিবসের মধ্যে যত অধিক সময় ঐ ক্রিয়া করিবেন, তত শীঘ্র ঐ রোগ আরোগ্য হইবে।

প্রাণবায়ুর স্বভাবিক বহির্গতি দ্বাদশ অঙ্গুলী; নিশ্বাস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত আর প্রাণবায়ুর বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি যে যে কার্য্যে প্রাণবায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, সেই কার্য্য যত অল্প করিবেন, ততই সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। প্রাণ শব্দে বায়ু আর আয়াম অর্থ নিরোধ, প্রাণায়ামের কুম্ভককালে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়,—শ্বাস প্রবাহ হয় না, এই হেতু যিনি নিয়মিত রূপে প্রাণায়াম করেন, তিনি রোগশূন্য ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। যখন যে নাড়ীতে শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই

নাড়ী রোধকরতঃ অন্য নাড়ীতে নিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যিনি পুনঃ পুনঃ প্রাণবায়ুর রোধ ও মোচন করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। আধিব্যাধি জরাদি তাঁহাকে আক্রমন করিতে পারে না।

কার্য্যভেদে ও অন্যান্য নানা কারণে এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন বোধে উপরে অনেকগুলি ক্রিয়া লিখিত হইল। সুতরাং স্বেচ্ছানুসারে শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তনের উপায় জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রিয়া অতি সহজ,—সামান্য চেষ্টায় শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। স্থিরভাবে বসিয়া যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত নাসিকা বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, যে নাসিকায় শ্বাস চলিতেছে সেই নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন; পরে সেই নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া বিপরীত নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া ঐরূপ করিলে অতি অল্প সময়ে শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাসিকায় প্রবাহিত করা যায়। ঐরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া যে নাসাপুটে শ্বাস বহিতেছে, কেবল সেই পার্শ্বে কিছু সময় শয়ন করিয়া থাকিলেও শ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। যিনি স্বেচ্ছানুসারে এইরূপে বায়ুরোধ ও রেচন করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে পবনকে জয় করিতে পারিবেন।

বন্ধত্রয় সাধন। যত্ন সহকারে বাম চরণের গুলফ দ্বারা গুহ্য প্রদেশ ও উপস্থের মধ্যবর্ত্তী যোনিমণ্ডল নিপীড়িত করতঃ দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করিয়া হস্ততলদ্বয় দ্বারা তাহার অঙ্গুলিসকলের অগ্রদেশ ধারণ করিবেন। কেহ কেহ অঙ্গুলির অগ্রদেশের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরিতেও উপদেশ দিয়া থাকেন। অনন্তর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করতঃ চিবুক হৃদয়োপরি রাখিতে হইবে। পরে ভ্রূর মধ্যস্থলে দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে দোমভর বায়ু টানিয়া যথাসাধ্য কুম্ভক করিয়া রাখিবেন। অনন্তর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া পুনরায় বায়ু আকর্ষণ করিবেন। পরে যথাসাধ্য কুম্ভক করতঃ পুনরায় রেচন করিবেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে হইবে। এই ক্রিয়া সাধন সময়ে প্রথমতঃ বামাঙ্গে যেরূপ করা হইবে, পশ্চাৎ সংযত মনে দক্ষিনাঙ্গেও সেই প্রকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ দক্ষিন চরণ প্রসারিত করিয়া যতক্ষণ বায়ুসাধন করিবেন, বাম চরণ প্রসারিত করিয়াও ততক্ষণ বায়ুসাধন করিতে হইবে। তদনন্তর সেই প্রসারিত চরণ উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চন দ্বারা অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া এবং প্রাণ বায়ুকে নিম্নগামী করিয়া নাভিমণ্ডলে সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত ও কুম্ভকদ্বারা রুদ্ধ করিবেন। পরে খা[illegible] মুদ্রাবলম্বন পূর্ব্বক ক্রোড়ে উত্তান হস্ত[illegible] স্থাপন করিয়া অল্প পরিমাণে উপস্থের উপরে চাপিয়া রাখিবেন! যেন অপান বায়ু পুনরায় অধোগমন করিতে না পারে। ঐ সময়ে

পার্শ্বদ্বয়ে যে হস্তদ্বয়ের মধ্যদেশ আছে, তদ্বারা পার্শ্বদ্বয় অল্পে অল্পে, ক্রমে সন্তাড়িত করিবেন, অর্থাৎ—উদর ... হস্তমধ্য দ্বারা অল্পে অল্পে চাপ ... থাকিবেন, ইহারই নাম বজ্রত্রয়সাধন।

যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ং কালে ও নিশাকালে, এই চারি সময়ে এই বজ্রযোগ সাধন করিবেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ নীরোগ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা দেহের পুষ্টি ও অস্থি পঞ্জর দৃঢ়বদ্ধ হয়। নিয়মিত অভ্যাসে শারীরিক নিখিল রোগশান্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি, শরীরে সুনির্ম্মল কান্তি, দীর্ঘজীবী ও বার্দ্ধক্যাপনয়ন হয়। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা নাড়ীর চালন, বিন্দুধারণ, সর্ব্বপ্রকার সুখ, অভিপ্রেত সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

—:0:—

সাধক-সঙ্গীত।

(১)

পাবাজ মিশ্র—একতালা।

কেশব হৃষীকেশ কৃষ্ণ কেশী-মথন কারী।
মুরছিত জনে দেখাও মূরতি মুরলীধর মুরারী—
তুমি হে আদি বীজ অনন্ত,
তুমি হে শ্যাম সাম মন্ত্র,
তুমি হে জগত সৃজন যন্ত্র, যম যন্ত্রনাহারী;—
আছ কৈলাসে গিরিশ নামে, গিরিজামুখ শোভে হে বামে,
গোলক ধামে ক্ষীরোদ কুমারী নারী—
গোকুলে তপ্ত হেম বরণা প্রেমপরিখা প্যারী—
সরযু তীরে তুমি হে রাম
নবীন দূর্ব্বা উজল শ্যাম,
জনক রাজ তনয়া অঙ্গ—সঙ্গ পীযূষপারী॥
তুমি হে ভকত ভীতিহরণ, দয়াময় হরি দীন-শরণ,
মাধব মধুসূদন বলি-বামন বনোয়ারী।—
তুমি হে শান্তি সুখ বিধাতা,
রাস চির বিরাম দাতা,—

বিশ্বপাতা অখিল-ভয়-সংহারী—
যশোদানন্দন জয় জনার্দ্দন গোবর্দ্ধনধারী;—
তুমি হে অপার সমুদ্র বারি
ক্ষুদ্র জীবন মীন আমারি
ত্রাহি বৃন্দাবন-বিহারী ভব বিপদবারী।
মেঘ মাধুরী জড়িত গগন, তারকা-মাল, জড়িত তপন,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ বিভূতি তোমারি—
অতীত রাগ শ্রুতি পবিত্র,
তুমি হে নাথ! নিয়ুক্তি মুক্ত,
নিত্য সত্য নিগম তত্ত্ব-চারী—
নিরবলম্ব প্রভু নিরঞ্জন, নিরয় জয়দিবারী;—
তুমি হে চিন্তামণি চিদ্ঘন
কদাচিৎ ঘন নিন্দি বরণ,
সচ্চিদানন্দরূপে গোবিন্দ হৃদয় আত্মহারী।

——:0:——

সাধনা ও সিদ্ধি।

বীরভূম জেলায় তারাপুর গ্রাম—এখানে উত্তরবাহিনী দ্বারকা নদীর তীরে বিখ্যাত তারপীঠ মহাপীঠ নহে, ইহা একটী সিদ্ধপীঠ। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া তারাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, তাই তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "বশিষ্ঠারাধিতা তারা" বলিয়া থাকে। এখানে তারাদেবী, চন্দ্রচূড় ভৈরব, জীবিত-কুণ্ড প্রভৃতি তীর্থযাত্রীর দর্শনীয় বিষয়। ইতিপূর্ব্বে বশিষ্ঠের সিদ্ধপীঠে "বামাক্ষেপা নামে শিবতুল্য একজন কৌল সাধু অধিষ্ঠিত ছিলেন, কয়েক বৎসর হইল তিনি স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্যে তারাপীঠ সাধারণের নিকট অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তারাদেবীর নিত্য পূজাও বিশেষ পূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সময় হইতে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং পূজার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহার বংশধরগণ বহন করিতেছেন। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, শনি ও মঙ্গলবারে দেবীর বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দুর্গাপূজার সময় ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ

রূহ কয়েকদিন রীতিমত পূজা হইয়া থাকে। এইরূপ দীপান্বিতায়, জগদ্ধাত্রী পূজায় এবং রটন্তী ও বাসন্তী দেবীর অর্চ্চনার সময়ে তারা-দেবীর পূজাও যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহানবমীতে মহিষবলি এবং অন্যান্য বিশেষ পূজায় ছাগবলির ব্যবস্থা আছে। বারুণীযোগে দ্বারকানদীতে স্নান করিবার জন্য এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। রথযাত্রার সময়, জন্মাষ্টমীর উৎসবে ও দোললীলায় যে উৎসব হয়, তাহাতে শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ সমভাবে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ একস্থানে শাক্তগণের যাবতীয় পর্ব্বের পূজা ও বৈষ্ণবগণের মহোৎসব এরূপ আর বর্ত্তমানকালে কোথাও দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক তারাপীঠ একমাত্র শাক্তগণেরই সাধনা স্থল। শক্তি-সাধকগণ এই পীঠে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস এখানে জপ করিলে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। যথাঃ—

তারাপুরমিদং পীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।
লক্ষ ত্রয় জপাদ্দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভবেৎ॥

এখানে তিনলক্ষ বার জপ করিলে দেবী সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। বামাক্ষেপা একজন প্রচণ্ড জাপক ছিলেন। জপে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মায়ের কৃপায় বঞ্চিত থাকে না। যে কৃপা সাধু বামাচরণ পাইয়া ছিলেন। দেখিতে তিনি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা ভীম ভৈরব ভাব মাখান থাকিত। পরন্তু তাঁহার মুখখানির দিকে তাকাইলে মনে হইত যেন কোমলতার আধার, স্নেহের ও সারল্যের ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে,—যেন একটী পাঁচ বছরের ছেলের মুখ প্রৌঢ়ের দেহের উপর বসান রহিয়াছে। তিনি মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা কহিতেন না, অন্য প্রসঙ্গ তিনি জানিতেন না, মায়ের মন্দির ছাড়া অন্যত্র বাস করিতেন না তাই মায়ের কৃপা করামলকবৎ তিনি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সে কৃপার প্রভাবও অপূর্ব্ব ছিল। এই প্রবন্ধে তাহাই কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

একদা বামাক্ষেপা স্ব-আসনে উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে বালকের ন্যায় মায়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন—এমন সময় সহসা তাঁহার ভাবভঙ্গ হইল। পশ্চিমলগ্ন সূর্য্যের বিপরীত দিক হইতে দীর্ঘ ছায়া আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন আগন্তুক অপরিচিত যুবক। শুভ্র গৌরবর্ণ সুকুমার তরুণ ব্রাহ্মণ, লুণ্ঠিত কেশজাল মধ্যে অনিন্দসুন্দর বালকোচিত সারল্যময় মুখ ও তাহারই মধ্যে দুইটী তীক্ষ্ণ চক্ষু। মুখে একটী পরিপূর্ণ ভক্তির আনন্দ ও উত্তেজনার সুন্দর দীপ্তি প্রকাশ পাইতে ছিল। যুবক আসিয়া বামাচরণের চরণে পতিত হইলেন।

আশীর্ব্বাদান্তে বামাচরণ তাঁহাকে সস্নেহে উঠাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আমার কাছে কেন আসিয়াছ বৎস? তুমি কি চাও?" সাধুর সস্নেহ ব্যবহারে যুবক কাঁদিয়া ফেলিলেন, বহুক্ষণ পরে প্রাণের আবেগ সংযত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কিছুদিন পূর্ব্বে জগৎ-মহত্ত জানিয়াছি অর্থ অজ্ঞাত ব্যাকুল

হইয়াছিলাম, সেই সময়ে স্বপ্নে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপর আর কোন উপায় করিতে না পারায় জীবনে সত্যলাভ করিতে পারিলাম না ভাবিয়া হতাশ হই। তদনন্তর মোহময় জীবন ধারণ বৃথা বিবেচনা করিয়া অনাহারে আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াছিলাম। তদবস্থায় স্বপ্নযোগে আদেশ হইল "তারাপীঠে আসিয়া আপনার শরণ লইলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" তাই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি—আপনি আমার গুরু, আমায় রক্ষা করুন, জগৎ-রহস্য জানাইয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন—আমায় নব জীবনদান করুন, নতুবা আপনার চরণে প্রাণত্যাগ করিব। সত্য-লাভ ব্যতীত এ জীবন বিড়ম্বনা মাত্র—গুরুদেব! শরণাগতকে চরণে স্থান দিন"।

আগন্তুক আবেগভরে আপন জীবনের কথা ও মন্ত্র প্রাপ্তির বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিয়া মন্ত্রটী বামাচরণকে জানাইলেন। বামাচরণ হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন, "কে রে-তুই ভাগ্যবান, তোর প্রতি মায়ের এত কৃপা। তুই যে তারামন্ত্র পাইয়াছিস্। আমি তোকে নিশ্চয় সাহায্য করিব। এই মন্ত্রের গুণে তোর সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।"

যুবক বিনীতভাবে বলিলেন, "গুরুদেব! মন্ত্রে বা দেবতায় আমার বিশ্বাস নাই। অলৌকিক শক্তি লাভ বা অসামান্য মূর্ত্তি দর্শন করিতে আমার আদৌ কৌতুহল নাই। আমি কে, কোন স্থান হইতে এখানে এসেছি পরে কোথায় যাব, আমি নিত্য না—দুদিনের জলবুদ্বুদ্ মুক্তি কি, ভগবান কে? তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি; আমি নিত্য হইলে আমার নিত্য আপনার কেহ আছেন কি না, এই সকল তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দিন।"

হাসিমাখা মুখে বামাচরণ বলিলেন, "বুঝাইয়া কেন, আমি তোমায় তাহা দেখাইয়া দিব; কিন্তু তুমি কি চাও আমাকে বুঝাইতে পার নাই।"

যুবক নতজানু হইয়া বামাচরণের পদস্পর্শ করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে স্বচ্ছ এক আলোক অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় প্রতিফলিত হইল। গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "জ্ঞান চাই।"

বামাচরণ যুবকের মুখের প্রতি কারুণ্য-পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বৎস! নিজের সমস্ত অন্তরে অন্তরে কি কাহারও মৃদু পদক্ষেপ অনুভব কর না? সমস্ত জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে কি কাহারও অস্ফুট ধ্বনি শুন নাই—কাহারও আকর্ষণ অনুভব কর নাই? বৎস! যে দিন ঐ স্পর্শকারীর চরণ দর্শন করিবে, ঐ ধ্বনির শুভ্র নিঃশ্বাস অর্থময় হইবে—সেই দিন কি তোমার জ্ঞান-লাভ সম্পূর্ণ হইবে না?"

আগন্তুক আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন "তাঁহার কি দর্শন পাওয়া যায়?" বামাচরণ বলিলেন, "গুরুমন্ত্রে তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি অন্তর হইতে বাহিরে আসেন। তখন তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ও আস্বাদন করা যায়। তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই জীবের সর্ব্ব-কামনা পূর্ণ হয় অর্থাৎ অপূর্ণ জীব পূর্ণতা লাভ করে।"

হতাশভাবে যুবক বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও স্বধর্ম্মরক্ষার্থ কোন

শিক্ষা পাই নাই, আচার-নিয়ম প্রতিপালন করি নাই, শাস্ত্রাধ্যয়ন কিম্বা কখন জপ পূজা করি নাই। শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে ত হাতে বিশ্বাসও নাই। দেবদেবী বা পূজা অর্চনায় এ যাবৎ অবজ্ঞাই করিয়া আসিয়াছি, ভক্তি-লাভার্থ কোন অনুশীলন করি নাই। আমি মন্ত্র দ্বারা কিরূপে বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিব,—আর ভক্তিহীন আমি—কিরূপে তাঁহাকে ডাকিয়া বাহিরে আনিব? এমন কি অন্তের দ্বারাও ইহা সম্ভবপর বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

সস্নেহে করুণামাখা স্বরে বামাচরণ বলিলেন, "আমি তোমার স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। আর তোমার ভক্তির অভাব নাই। সন্তানলাভ বা তদর্থে মনগত পুরুষের দর্শন জন্ত তোমার প্রাণে যে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, তাহারই নাম ভক্তি। তুমি মায়ের কৃপালাভের অধিকারী। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি যাহা আদেশ করিব, বিনাবিচারে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাও, অচিরে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া যুবক বলিলেন, "অ্যাঁ—আমি তাঁহার দর্শন পাইব, তিনি কিরূপ মূর্ত্তিতে আমায় দর্শন দিবেন?"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বামাচরণ আপন মনে গান ধরিলেন,—

মা যে আমার বিশ্বরূপা—
রূপ বর্জ্জিতা অরূপা।

তাঁহার মুখপানে চাহিয়া যুবক বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ গান করিয়া বামাচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মায়ের মূর্ত্তির কি সীমা আছে, এই অনন্ত বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি। যে যে রূপে যে নামে ডাকে, তিনি সেইরূপে—তাহার মনোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া কৃতার্থ করেন। তোমার স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য মায়ের রূপ ও ধ্যান আমি বলিয়া দিব।"

সাধুর অহেতুক কৃপালাভ করিয়া আগন্তুক ধন্ত হইলেন। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কে গুরুদেব?"

গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এবার তারস্বরে বামাচরণ বলিলেন, মায়ের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের উপায় নির্দ্দেশ ব্যতীত আর তোমার একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিব না, মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি কে তাঁহার নিকটেই জানিয়া লইও। আজি হইতে আমার আদেশের অনুগামী হইলে কি না জানিতে চাই।"

আগন্তুক আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বামাচরণের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। শ্রীগুরুর এরূপ অহেতুক কৃপা না হইলে নিরপেক্ষ শাস্ত্রকারগণ বলি-বেন কেন—

"পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ।"

যথাকালে শিষ্যকে বামাচরণ বীরাচার-মতে অভিষেক করাইয়া যথারীতি জপে নিযুক্ত করিলেন। নৈত্যজপ, নৈমিত্তিক জপ, পুরশ্চ-রণাদি সম্পন্ন করাইয়া শিষ্যকে বীর সাধনার অধিকারী করিয়া লইলেন। পরে সাধনার

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সময় ও সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।*

দ্বারকানদীর তীরে দুই মাইল ব্যাপী ভীমদর্শন মহাশ্মশান। কেবল মানবাস্থি-চূর্ণ ও চিতাঙ্গারে শ্মশানভূমি পূর্ণ। চতুর্দ্দিকের বহুদূর হইতে মৃতদেহ সৎকারার্থ এই শ্মশানে আনয়ন করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহই দুই একটা মৃতদেহ এখানে দাহ হইয়া থাকে। এ শ্মশান দেখিলে ভোগী শিহরিয়া উঠে—[illegible] ব্যাকুল হইয়া তারা—তারা বলিয়া ফেলে। বৈরাগ্য-লাভেচ্ছুর বিক্ষিপ্ত চিত্ত এ দৃশ্য দেখিলে সংযত হয়। শুভক্ষণে যুবক আসিয়া এই মহাশ্মশানাধিপতি বামাচরণের শরণ লইয়াছিলেন, একবিংশতি দিন না যাইতে তাঁহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আজ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথি—শনিবার সার্দ্ধ প্রহর রাত্রি গত হইলে বামাচরণ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া সাধারণের অগোচরে শ্মশানে গমন করিলেন। শিষ্য গুরুর নির্দ্দেশমত নিজকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অদ্য দুই তিনটা শব এই শ্মশানে সংস্কৃত হইয়াছিল। বামাচরণ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট চিতার নিকটে যাইয়া শিষ্যকে যথাসনে চিতার নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর সংকল্প করাইয়া গুরু, গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকাগণের পূজা করাইলেন। পরে আত্মরক্ষা করিয়া দিয়া যথাশাস্ত্র দিকবন্ধন, সামিষান্ন বলিপ্রদান করতঃ চিতাসংস্কার ও তদুপরি পীতবস্ত্র বিস্তারপূর্ব্বক বটপত্রে পীঠমন্ত্র লিখিয়া দিলেন। অনন্তর ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর শিষ্যকে বীরাসনে উপবেশন করাইলেন। সম্মুখে সাক্ষীস্বরূপ প্রদীপ জ্বালাইয়া শিষ্যকে সময়োপযোগী উপদেশ দান করতঃ জপের সংকল্প করাইলেন। পরে শিষ্যকে স্বহৃদয়ে ইষ্ট দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক জপ করিতে আদেশ দিয়া তিনি তারামন্দিরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্য সেই জনশূন্য মহাশ্মশানে চিতার উপরে বসিয়া গুরুর উপদেশ মত জপ করিতে লাগিলেন। কি ভয়াবহ দৃশ্য—মহাশ্মশান, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, কচিত শৃগাল ও নিশাচর পক্ষীর কর্কশ শব্দ, আর দ্বারকা-নদীর মৃদু-মধুর একটানা কলকল নিনাদ। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকারে দশদিক সমাচ্ছন্ন। যুবক সেই অন্ধকারে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া একাকারে আত্মসত্তা লইয়া জপে নিমগ্ন। তিনি দু'একবার বিভীষিকা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—দুই একবার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু বামাচরণ তারামন্দির হইতে মাঝে মাঝে তারা—তারা বলিয়া পূতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন,—নাদসিক্ত বামাচরণের তারা শব্দে তারাপুরের সে মহাশ্মশান যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে শব্দে শিষ্যের বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত হইয়া যাইত। কিন্তু রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর শিষ্য আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছিলেন না; বামাচরণের

*তান্ত্রিক সাধকের সাহচর্য্য যিনি করেন নাই, হাতে হাতে তন্ত্রের সাধন-ফল যিনি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার নিকট বামাক্ষেপা ও তান্ত্রিক-সাধকের কথা প্রকাশ করিতেনাই। লেখক

ন্যায়—তারা শব্দও ক্রমশঃ মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিল। শিষ্য যেন ক্ষণকালের জন্য আপন অস্তিত্ব আর উপলব্ধি করিতে পারিলেন না,—কি এক জাগ্রত-সুষুপ্তির অতীতভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সহসা এক অলৌকিক দৃশ্যে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রতি লোমকূপ হইতে বাষ্পের ন্যায় একপ্রকার তরল জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া জগৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। আবার সেই তরল জ্যোতিঃ বাহিরে কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় আভাশালী ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রতুল্য সুশীতল উপলব্ধি হইতে লাগিল। এই পরম তেজোরাশি ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব বা মধ্যদেশে পরিচ্ছিন্ন হইল না। উহা আদি অন্ত-রহিত। এই জ্যোতিরাশির হস্তাদি অঙ্গ বিশিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক আকারও নাই।

যুবক প্রথমতঃ সেই তেজের প্রভায় প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, অনন্তর যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি সেই পরম তেজ দিব্য মনোহর রমণী মূর্ত্তিতে আভাসিত হইল। তখন তিনি সর্ব্বশৃঙ্গার-বেশধারিণী, সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী, নিখিল-জন-জননী, ভুবন-মন-মোহিনী, ব্রহ্মজ্ঞান-বিনোদিনী, স্মেরাননা, অকপট করুণাময়ী মূর্ত্তি দেবীকে সম্মুখে অবস্থিতা দেখিতে পাইয়া, প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে কণ্ঠ সংরুদ্ধ হওয়ায় কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না।

(ক্রমশঃ)

চিদানন্দ—

—:0:—

উপদেশ-সংগ্রহ।

১। ভগবল্লোক ভাবময়—সেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবগুলি মূর্ত্তিমন্ত-তাহারাই ভগবানের দাস দাসী।

২। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এককালীন লয় কখনও সম্ভবপর নয়,—সুতরাং ভগবানও একবারে নির্গুণ অবস্থা কখনও প্রাপ্ত হন না।

৩। দুগ্ধ ও তাহার সাদা বর্ণে যেমন অভেদ,—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ, প্রকৃতি-পুরুষও তেমনি অভেদাত্মক।

৪। যেমন সূর্য্য সমস্ত জগতে প্রতিভাত হইয়াও কোন এক নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন—সেইরূপ ভগবান সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিত্রিয় অবস্থায় অবস্থিত আছেন।

৫। সাধনা বলে ষট্‌চক্র ভেদ হয় কিন্তু সপ্তম চক্র ভেদ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না; ইহা তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে।

৬। যোগীর ধ্যান সাধারণতঃ দুই প্রকার এক নির্লক্ষ্য, আর এক বিশেষ লক্ষ্য। যাঁহার বিশেষ ভাব লক্ষ্য হয়, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর পাইবেন না; আর যিনি নির্লক্ষ্য

তিনি বিশেষ ভাবের কথা জানিতে পারিবেন না।

৭ দ্বিদল ভেদ হইলেই ভগবল্লোকের সংবাদ জানা যায় বটে; কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিবেন না; যেমন সমুদ্রের কিনারায় গিয়া সমুদ্রের খবর নিয়ে আসা, কিন্তু সমুদ্রে নামিলেই তাহাতে ডুবিয়া যাওয়া।

৮। ফানুষ উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে যখন সঞ্চিত গ্যাস ফুরাইয়া যায়, তখন তাহাতে আবার গ্যাস পুরিতে হয়; কিন্তু ক্রমমুক্তিতে যতই উর্দ্ধগতি হইবে ততই শক্তিসঞ্চারিত হইবে।

৯। তপঃলোক, জনলোক, মহর্লোকে যেরূপ দেহ হয়,—প্রেমিকের ভগবল্লোকেও তদ্রূপ দেহ হয়; কিন্তু জ্ঞানীর তাহা হয় না। জ্ঞানী ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়।

১০। জীবন্মুক্ত বা সাধু জানিতে পারেন না যে, তিনি জীবন্মুক্ত বা সাধু, অন্যে তাহা বিচার করিতে পারেন।

১১। উপলব্ধির সঙ্গে জ্ঞান না থাকিলে কিছুই বুঝা যায় না বা ধারণা হয় না।

১২। ভগবানের কাছে কিছুই চাহিবার নাই, তবে যদি নেহাত চাইতে হয় তবে জ্ঞান অথবা ভক্তি। তিনি ত কত জন্ম জন্মান্তর হইতেই দিতেছেন সুতরাং তাঁহাকেই যথাসর্ব্বস্ব দেওয়া উচিত।

১৩। সত্যযুগে ধর্ম্ম চারিপদ অর্থে সত্য যুগে পাপ ছিল না এরূপ বুঝিতে হইবে না; তাহার প্রমাণ মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি। সত্য যুগে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া ষোল আনাই করিতে হইত ইহা বুঝিতে হইবে। ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের পক্ষেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে, ত্রেতায় ধর্ম্মক্রিয়ার অঙ্গগুলির বার আনা, দ্বাপরে অর্দ্ধেক, এবং কলিতে এক চতুর্থাংশ সম্পাদন করিলেই ষোল আনার ফলভাগী হইবে। সুতরাং কলির জীবই সমধিক ভাগ্যবান।

১৪। আদিতে পাপ ছিল না ইহা ঠিক নয়—পাপ না থাকিলে মধুকৈটভ অত্যাচারী হইত না।

১৫। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাশাপাশি না থাকিলে "ধর্ম্মের জয়" "অধর্ম্মের ক্ষয়," লোকে বুঝিতে পারিত না।

১৬। মা যেমন ছেলেকে খুঁজিয়া পাওয়া'ন সেইরূপ ভগবান বুঝিয়া সব দিবেন; তুমি তাঁহার উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও।

১৭। কর্ম্মের পূর্ব্বে ইচ্ছা, সুতরাং যাহা কিছু হইতেছে সকলই তাঁহারি ইচ্ছা।

১৮। ভগবানের রূপ দেখিয়া কেহ সন্তুষ্ট হয় না; তিনি রূপ দেখাইয়া জীবকে আকর্ষণ করতঃ তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া অদৃশ্য হন - ইহাই শতবর্ষ বিরহ—তখন জীব কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হয়, তাহাতে তাহার ময়লা কাটে, ময়লা কাটিলেই তাহাকে পায়—ইহাই যোগীর যোগ।

১৯। আপনার ভিতর ভগবানের পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করাই স্বরূপত্ব লাভ।

২০। যোগী সমাধিস্থ থাকিতে থাকিতে যখন দ্বিদল পার হইয়া যান, তখন মহাপ্রলয়েও তাহার দেহের লয় হয় না।

২১। যতদিন ধ্যানাবস্থায় নিজের সত্তা জ্ঞান থাকিবে ততদিন বুঝিতে হইবে যে ধ্যানের উচ্চাবস্থা লাভ হয় নাই। ধ্যানের উচ্চাবস্থায় সাধকের আপন সত্তা লয় পাইবে, ক্রমশঃ একমাত্র ধ্যেয় রূপই ফুটিয়া উঠিবে; ধ্যানের আরও পরিপক্কাবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর নাম, রূপ লয় হইয়া তাঁহার তত্ত্ব বা স্বরূপ প্রকাশিত হইবে।

ক্রমশঃ।

রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

——:0:——

পাগলের দর্শন।

(৫)

এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র সগুণ ব্রহ্মের ক্রিয়াগুণের স্থূলাবস্থা গতিশক্তির লীলাখেলা। ইহা যেখানেই ঘন সেখানেই গাছ, পাথর, জীব, গ্রহ, নক্ষত্র; যেখানে সূক্ষ্ম সেখানেই আকাশ, বায়ু প্রভৃতি লঘু পদার্থের শক্তিরূপে বর্ত্তমান। পরমা প্রকৃতি বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী শক্তি। এবং এই মহাশক্তির গর্ভে অন্যান্য শক্তিগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী কর্ম্মশক্তিকে সুচারুরূপে বিকাশ করিতেছে; আর্য্যঋষিগণ এই ক্রিয়াশক্তিটীর কার্য্য প্রণালীর একটা তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শাস্ত্রে এই জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি বর্ত্তমান আছে ইহার কতক জটিল দর্শনের রূপক, কতক মহা ভাবময় অধ্যাত্মিক জগতের কথা। দর্শনশাস্ত্রেও নানামত বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মোটের উপর বিষয়গুলির গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সকল মতেরই মূলে ঐক্যভাব রহিয়াছে; কেবল ভিন্ন ভিন্ন মতে একই বিষয় নানারূপে আলোচনা করিয়া এক বিরাট বিভূতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পাগল তাঁহাদের বিরাট বিভূতির সহিত ঐক্য থাকিয়া এক অদ্ভুত নয়নারাম দৃশ্য দেখিতেছে; তাহা জগতে পঞ্চ মহাশক্তির লীলা খেলা, আর মূলে মহা চৈতন্যরূপে এক মহাসিন্ধু।

এই বিরাট বিষয়টী বুঝিতে হইলে প্রথমে জাগতীয় মূল শক্তিকেন্দ্রগুলির একটা হিসাব করিতে হয়। হিসাব করিয়া যাহা পাইলাম তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জগতে   বহির্মুখী পথ   জীবে

মহাকেন্দ্র

$\left\{(+৯)\frac{-১০}{+১০}\right\}$ (ব্যক্ত+অব্যক্ত গুণ) $= \left\{+০\frac{-১}{+১}\right\}$......পুরুষ (আত্মা)+প্রকৃতি।

কেন্দ্র প্রতিক্ষিপণী স্বভাব (ইচ্ছা)

$\left\{(+৮)\frac{-৯}{+৯}\right\}$ (centrifugal nature) $= \left\{(+১)\frac{-২}{+২}\right\}$ বুদ্ধি—(মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত)

শক্তি (অব্যক্ত)

$\left\{(+৭)\frac{-৮}{+৮}\right\}$ (Negative centre of force) $= \left\{(+২)\frac{-৩}{+৩}\right\}$......অহংকার।

গতি (ব্যক্ত শক্তি)

$\left\{(+৬)\frac{(-৭)}{+৭}\right\}$ (Positive force) $= \left\{(+৩)\frac{-৪}{+৪}\right\}$...তন্মাত্র   মন   ইন্দ্রিয়

কাঠিন্য

$\left\{(+৫)\frac{-৬}{+৬}\right\}$ (Heard ness) $= \left\{(-৪)\frac{-৫}{+৫}\right\}$............স্থূল ভূত (স্থূল দেহ)

(Extreme point of the centrfiugal and founder of the centripetal force.)

৫ (কেন্দ্রাভিমুখ)

কেন্দ্ররূপে অবস্থিত; তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া গুণ আশ্রয় করিলেন। এই গুণ অনুতে অধ্যাসিত হওয়া যায়, ইচ্ছা প্রকাশের জন্য কেন্দ্র হইতে ভূমার দিকে প্রকাশিত হইতে একটা স্পন্দন দ্বারা বৃত্তাকারে প্রকাশিত হইতে হয়। বৃত্তাকারে প্রকাশিত না হইলে ভূমা হইতে পারে না, তাই বৃত্তাকারে আবর্ত্তিত গতির প্রকাশ হয়। গতির এই আবর্ত্তন স্বভাবের কেন্দ্রটাই ইচ্ছা এবং এই স্বভাবটিই কেন্দ্রস্থানে, কেন্দ্র-প্রতিকর্ষিণী স্বভাব (Centrifugal nature)। এই স্থান হইতে স্থূল জগতের দিকে ধাবিত হইতে, ইচ্ছাক্রিয়া অব্যক্ত শক্তিরূপে পরিণত হয়। যেহেতু শক্তি ভিন্ন ইচ্ছার প্রকাশ অর্থাৎ গতির বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং সেই ব্রহ্মকেন্দ্র হইতে সৃষ্টির আদি গুণ প্রকাশের জন্য তিন অংশে ভূমার দিকে প্রধাবিত হইতে একটা স্পন্দন দ্বারা বিস্তার করিতে আবশ্যকতা বোধ জন্মে। এই আবশ্যকতা বোধই জাগতিক অব্যক্ত শক্তির কেন্দ্র। জীবের ইহাই জ্ঞানরূপী সরস্বতী অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত শক্তির কেন্দ্র। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগাবস্থা ইহার কারণ। সমষ্টি গুণ ব্যক্ত হইতে, এই কেন্দ্রে পৌছিয়াই স্থল সুল ব্যষ্টি অব্যক্ততা ও ব্যক্ততা জীবের বোধ উপযোগী হইয়া প্রকাশিত হয়। যদিও ইহাদের উৎপত্তি ইহার পূর্ব্ব স্তর হইতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা যোগী ভিন্ন কোন বৈজ্ঞানিক জড়ভাবে ধরিতে সমর্থ হয়েন না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Herbert Spenecr ইহার সঙ্গে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন নাই; এবং বর্ত্তমান যুগে পণ্ডিতগণ এই কেন্দ্রেই শূন্যকে স্থাপন করিয়া পদার্থের বিচার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বরফের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া বুঝেন, তাপশূন্য কেন্দ্র হইতে আরও সূক্ষ্ম হইয়া -১২ ডিগ্রিতে পৌছিয়া শূন্য হইয়া গেল। পাগলের জ্ঞানে তাঁহাদের এই বিচার অতি স্থূল।

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে চাহিয়া শূন্যকে স্থাপন করিতে গেলে তাহার স্থান এমন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহা হইতে সূক্ষ্ম মনুষ্য-জ্ঞানে ধারণা করিতে পারে না। সেইস্থানে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপ্রকার বিচার, সর্ব্বপ্রকার গুণ যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, মানুষ তাহার হিসাব রাখিতে পারে না। বস্তুতঃ হিন্দু-দার্শনিকদের যাহা শূন্য, তাহা পুরুষ প্রকৃতির যৌগিক মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র। তাই গণিতশাস্ত্রে শূন্য একযোগে পিতামাতা। শূন্য হইতে গণিত যেমন যোগ ও বিয়োগ উভয় পথে বিয়োগ একক (—১), যোগ একক (+১) প্রভৃতি সংখ্যার সৃষ্টি করিয়া ক্রমে পূরণ ও ভাগের সাহায্যে অনন্তরূপে অনন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও পুরুষ-প্রকৃতি যোগে মহাশূন্যরূপ ভূমাগুণ হইতে শক্তি উৎপন্ন হইয়া বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী গতি প্রকাশ করতঃ, উভয় ভাবের বিচিত্র আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া, বিচিত্র বিভূতি প্রকাশ করে। জীব অহরহঃ এই বিচিত্র বিভূতিতে মোহিত হইয়া, প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বীয় বাসনার তৃপ্তির অন্বেষণে ঘুরিতেছে, কিন্তু একটী বারও বিভূতির হিসাব করিয়া দেখে না।

জগতে জীবিত পিতামাতার সংযোগে যেমন সন্তান, এবং উভয়ের জীবিত থাকা

অবস্থাটী যেমন সন্তানের পিতামাতা হওয়ার কেন্দ্র, গণিতেও সেইরূপ যোগ বিয়োগ উভয়ের কেন্দ্র শূন্যের বর্ত্তমানতার দরুণ অনন্ত রাশিরূপে অনন্ত সন্তান। শূন্য যখন এককের দক্ষিণে বসিয়া যৌগিক ক্রিয়ার ফলে দশকের সৃষ্টি করেন এবং দশকের গতি অনন্তাভিমুখে প্রধাবিত করিয়া অনন্তরাশি উৎপাদন করেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল বংশবিস্তার। কিন্তু বিয়োগ তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে, ইহাদিগকে লয়ের পথে লইয়া যায়। সে ধীরে ধীরে বংশধরদিগকে গ্রাস করিয়া অবশেষে শূন্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। বিয়োগ সমস্ত বংশধরদিগকে গ্রাস করিয়া এমন প্রলোভিত হইয়া পড়ে যে শূন্যকে গ্রাস করিতে একটুকুও আশঙ্কা মনে করে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই শূন্যকে গ্রাস করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার অস্তিত্ব আর থাকে না। তিনি শূন্য গ্রাসের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, নিজেই শূন্যে মিশিয়া শূন্য হইয়া যান।

শূন্যের প্রকাশ হইতেই যোগ, এবং সেই প্রকাশের কেন্দ্রাভিমুখী অন্তর্মুখী পথে শূন্যে প্রত্যাবর্ত্তনই বিয়োগ। শূন্য প্রকাশিত হইতে ব্যক্ততা গুণকে আশ্রয় করে; কিন্তু ব্যক্ত, অব্যক্তকে প্রকাশ না করিয়া, স্বীয় অস্তিত্বের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া বিয়োগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। গণিতশাস্ত্রে যোগ ও বিয়োগ, পূরণ ও ভাগের সাহায্যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকে, ততক্ষণই সংখ্যাগুলির স্থিতি। যুদ্ধে উভয়েই বিনষ্ট হইলে, তাহাদের আত্মা, মহাশূন্যে আসিয়া অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করে। আধ্যাত্মিক জগতেও ব্যক্ত শক্তি ও অব্যক্ত শক্তি, উভয়ে যতক্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবে ততক্ষণই জগতের স্থিতি। জীব এই আবর্ত্তে পতিত হইয়া জন্মান্তর ভোগ করে। কিন্তু সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে তিনি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার খণ্ড আবর্ত্তের বহির্ম্মুখী গতিকে বিয়োগ করিতে পারিলেই পরমাত্মরূপ মহাশূন্যে আসিয়া বিশ্রাম করিতে সমর্থ হইব, তখন বহির্ম্মুখী গতির সাকার মূর্ত্তি কামনাকে বিয়োগ করিয়া নিষ্কামে আসিয়া পৌছেন। নিষ্কাম হইলেই ভূমা এবং ভূমা হইলেই ব্রহ্ম লাভ হয়।*

শূন্য এইরূপে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের বিকাশের দিকে শক্তি প্রদান করিয়া প্রথমে (−১) এবং (+১) এই অবস্থা দ্বয়কে প্রকাশ করেন। এই অবস্থা দ্বয়কে প্রকাশ করিতে তাহার একটা স্পন্দনের দরকার হয়, শূন্যের এই আবশ্যকতাই কেন্দ্র প্রতিকর্ষিণী স্বভাব (centrifugal nature)। জীবের ইহাই স্থূল ইচ্ছার কেন্দ্র। উভয় সংখ্যায় এই কেন্দ্রে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়া, আরও স্থূলের দিকে গতি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়; তাই দুইয়ের সৃষ্টি। কিন্তু দুই তিনের স্থান পর্য্যন্ত না পৌঁছিতে পারিলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন না বলিয়া তিনের সৃষ্টি করিতে বাধ্য। দুই স্থানীয় কেন্দ্র প্রতিকর্ষিণী স্বভাব শক্তিতে পারগত না হইলে, বিস্তৃতি লাভে সমর্থ হয় না; তাই স্বভাবটী অব্যক্ত শক্তিতে

---

* উল্লিখিত মহাশূন্য যদিও পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে, তথাপি শূন্য পরমাত্মা নয়। এবং এই শূন্য শূন্যবাদীদের শূন্যও নয়। শূন্য কেবল পুরুষ প্রকৃতির সংযোগের ফলে মধ্যবর্ত্তী সমষ্টিকেন্দ্র।

পরিণত হইয়া তিনের প্রকাশ করে। অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইতে গতির দরকার,—যেহেতু গতি ভিন্ন শক্তি নিষ্ক্রিয়। বস্তুতঃ গতিই শক্তির ব্যক্তাবস্থা। তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে অব্যক্ত শক্তিকে ব্যক্তাবস্থায় গতিতে পরিণত করিয়া চতুর্থের স্থান অধিকার করে। চতুর্থ স্থান গতির স্থান বলিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত মহাসমরে প্রবৃত্ত। কিন্ত এই স্থানে ব্যক্ত প্রবল বলিয়া, অব্যক্তকে পরাভূত করতঃ যেমনই বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে প্রয়াস পান, অমনি গতি ঘনীভূত হইয়া কাঠিন্য রূপে পঞ্চম স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কাঠিন্যই গতির ব্যক্ততার চরম স্থূলকেন্দ্র, ইহার পর আর তাহার বহির্দ্দিকে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। তাই কাঠিন্য তাহার শত্রু অব্যক্তকে বেশী দিন পরাভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। অব্যক্ত শূন্যের সাহায্যে শক্তি সম্পন্ন বলিয়া, সর্ব্বদা ই আক্রমণে প্রবৃত্ত থাকেন। ইহার ফলেই কঠিনের কাঠিন্য ধীরে ধীরে লীন হইয়া শূন্যের দিকে প্রধাবিত হয়। ইহাই জাগতিক পরিবর্ত্তন। ঘন, স্থূল কাঠিন্যরূপী গতি এই অবস্থায় কেন্দ্রাভি-কর্ষিণী (centripetal) বলিয়া ষষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েন। গণিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র অর্থাৎ পঞ্চমের চরম স্থূল-কেন্দ্র ও ষষ্ঠের প্রথম কেন্দ্র যেমন এক দর্শকের মধ্যবর্ত্তী স্থূলকেন্দ্র, জগতেও সেইরূপ কাঠিন্য ও তাহার অন্তর্দ্ধান উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রই বিকাশের চরম স্থান। পঞ্চম যেমন ষষ্ঠে পরিণত হইয়া দশমস্থান লাভ করিবার জন্য, শূন্য ও এককে মিলিত করিয়া, নূতন সৃষ্টি করিতে সেই এক ও শূন্যের দিকে প্রধাবিত হয়; জগতেও সেইরূপ এক অবস্থায় কাঠিন্য লীন করিয়া অন্য নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় অন্য ধ্বংসের সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতির সূক্ষ্ম যৌগিক অবস্থার দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু ধ্বংস কার্য্য শূন্যে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়েন না বলিয়া, বিকাশের স্তরে স্তরে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে কেন্দ্রে আসিয়া পৌছেন। কাঠিন্যের কারণ ব্যক্তশক্তি অর্থাৎ গতি; সুতরাং ষষ্ঠ দশক হইতে সপ্তমের সৃষ্টি করিয়া কাঠিন্যের লীন করতঃ শক্তির কেন্দ্রাভি-কর্ষিণী গতির সহিত মিলিত হয়। এইরূপে সপ্তম, গতির কারণ অব্যক্ত শক্তিতে যুক্ত হইয়া, অষ্টমের সৃষ্টি করে। অষ্টম অব্যক্ত শক্তির কেন্দ্র, কেন্দ্রপ্রতিভিকর্ষিণী স্বভাবের সহিত যুক্ত হইয়া নবম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রপ্রতিভিকর্ষিণী স্বভাবের কারণ পুরুষ-প্রকৃতি যোগে মহাকেন্দ্র; নবম এই কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া দশকে পরিণত হয়। কিন্তু দশক হইতে তাহাকে প্রথমে মহাশূন্যে লয় হইয়া সৃষ্টশক্তি রক্ষা করিবার জন্য এককের সাহায্যে যুগল রূপে প্রকাশিত হয়। অনন্তর নূতন সৃষ্টির জন্য পুনরায় বহির্ম্মুখী পথে একাদশের দিকে প্রধাবিত হয়। এইরূপে আর এক দশকের সৃষ্টি করে, এক হইতে দশকে পৌঁছিতে যে বৃত্তের প্রকাশ হয় তাহাই নিয়তি,—কৃষ্ণের হস্তে সুদর্শন চক্র,—জাগতিক ভাবে কালচক্র। এই পথেই প্রকৃতি পূর্ণরূপে প্রকাশিত থাকিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ক্রমশঃ।

কশ্চিৎ পাগলস্য।

সংবাদ ও মন্তব্য ।

মহামৃত্যুঞ্জয় মেলা । শিবরাত্রি উপলক্ষে মাণিকগঞ্জ-মহাদেবপুর মহামৃত্যুঞ্জয়-আশ্রমে দিবসত্রয়ব্যাপী পূজা, অহোরাত্র কীর্ত্তন ও মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় লীলাকীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমা । দোল-পূর্ণিমায় কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে যাচিয়া-সাধিয়া প্রেম বিলাইয়াছিলেন। যাঁর পূতপদরজে পতিতা বঙ্গভূমি পবিত্রা হইয়াছিলেন,—যিনি বঙ্গবাসীর মৃতপ্রায় প্রাণে অমৃত ঢালিয়া নবজীবনে সঞ্জীবীত করিয়া দিয়াছিলেন,—যাঁর অহেতুক কৃপায় বঙ্গবাসী আজ সকল বিষয়ে ভারতবাসীর লক্ষ্যস্থানীয়—গুরুস্থানীয় হইয়াছেন; সেইদিন আর সেই দীনের ঠাকুরকে দীন বাঙ্গালী যেদিন ভুলিবে, সেদিন বঙ্গবাসী আবার সর্ব্ব প্রকার দৈন্যে পতিত হইবে। বঙ্গদেশের একমাত্র স্মরণীয় দিন ফাল্গুণী পূর্ণিমা। ২৮শে ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার আসাম—সারস্বতমঠে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষে যথারীতি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূজা, পাঠ ও ভোগ, এবং সমস্ত দিন নামযজ্ঞ হইয়াছিল।

বার্ষিক-উৎসব । কুমিল্লা-হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৮শে ফাল্গুণ বৃহস্পতিবারে প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তন ও বিষ্ণু পূজা এবং ঐ দিন বৈকালে ও ২৯শে, ৩০শে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। ১লা চৈত্র সমস্ত দিনব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন ও মহোৎসব হইয়াছে। প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক লোক প্রসাদ লইয়াছিলেন। মানিকগঞ্জ, বোয়ালিয়া, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে কীর্ত্তনীয়া ও ভক্তগণের আগমন হইয়াছিল। স্থানীয় উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবের-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সাদর-আহ্বান । বর্ত্তমান মাসের ১৫ই মঙ্গলবার অক্ষয়া-তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তিআশ্রমের ৭ম বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চ্চনা, ১৬ই শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্ম্মালোচনা এবং ১৭ই পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীমৎ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বত মঠে—তদীয় আসনে তাঁহার পূজা, আরত্রিক, হোম, ও বেদ পাঠাদি হইবে। সমস্ত দিন ব্রহ্মনাম যজ্ঞ এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা পূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধু-সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মহাদান। ময়মনসিংহ—গৌরীপুরের স্বধর্মনিষ্ঠ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় দেশের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলজনক কার্য্যে যোগদান ও অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায়" এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ সভা" এই টাকায় বাড়ী তৈয়ারি করিবেন এবং বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের জয় হউক।—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়ে ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু বেদবিদ্যায় বাঙ্গালী অন্য দেশের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহু পশ্চাদ্‌পদ—বঙ্গদেশে বেদের পঠন-পাঠন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণসভার উদ্যোগে ও ব্রজেন্দ্রকিশোরের মহাদানে যদি বঙ্গদেশের এই মহা অভাব বিদূরিত হইয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হয়। যে ব্রাহ্মণকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে বেদপাঠ কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা করিবে, সে আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে পারি। আসাম-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী ব্রাহ্মণকুমারগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া সারস্বতমঠের "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম" হইতে সেবকগণ প্রেরণ ও অর্থ-সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়া স্থানীয় অবস্থা অবগত হইবার জন্য তত্রত্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ডেপুটী কমিশনার সাহেব বাহাদুরকে পত্র লিখা হইয়াছিল। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যে উত্তর দিয়াছেন আমাদের সেবকগণের অবগতির জন্য পত্রখানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

No 3936. M.

from W. A. Cosgrave Esq. I. C. S.
Deputy Commissioner of sylhet.

To

The Members of the Sri-
Gouranga-Anath-Niketan.
KOKILAMUKH P. O. ASSAM.

Dated, Sylhet, the 14th March 1914.

Gentlemen,

I have the honour to acknowledge with thanks your letter dated the 22nd February in which you volunteer to assist in relief work in the Sylhet District. There is no real famine in Sylhet only distress in a limited area on account of the failure of the last Aman paddy and I do not think that there is any need for your association to send a band of sevaks such a long journey to render assistance; much as I appreciate your generous offer. Government has given out substantial loans and the public are now co-operating by contributing private subscriptions.

I have the honour to be
Gentlemen,
Your obedient servant,
Sd. W. A. Cosgrave
Deputy Commissioner,
Sylhet.

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(সূচনা)।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সার বস্তুর অপরিজ্ঞান বশতঃ অপার্থিব সুখের অভ্যুদয় হয় নাই,—চিরসঞ্চিত কলুষমল পূতবারিতে ভাসে নাই,—সংসার রূপ মহা মোহান্ধকার ঘুচে নাই; তজ্জন্যই মন বিবেক-বিজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া অবিনশ্বর শান্তি লাভে বঞ্চিত হয়। অতএব জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কি? সর্ব্ব শাস্ত্রের সার কি? এই দুইটী প্রশ্ন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লইয়া গিয়া অসাধারণী প্রজ্ঞার সাহায্যে চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে:—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধক্ষজে।
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সু প্রসীদতি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)।

পরমপিতা পরমেশ্বর যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা স্বরূপ, যিনি জ্ঞানের অধীশ্বর, মনের প্রয়োজক, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, মোক্ষপ্রদ, যিনি কার্য্যকারণ বিহীন ও আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—তাপত্রয়-শূন্য, সেই ইন্দ্রিয়াতীত মনোবাণীর অতীত সচ্চিদানন্দ ভগবানে যাহা দ্বারা নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক হয়; এবং যে ভক্তিতে কোনরূপ বিকার বিড়ম্বনা নাই অথচ চিত্তপ্রসন্নতা সংসাধিত হয়, সেই ধর্ম্মই পুরুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাহাই জীবের আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক মঙ্গল স্বরূপ। উহার দ্বারাই আত্মচিন্তা বিকাশিত হইয়া ঈশ্বর-পরিজ্ঞান সাধিত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নে "নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং"।

(স্কন্দ পুরাণ)।

সনাতন বেদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্র, ইহা

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই। বেদই হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব আদিম শাস্ত্র। আবার শাস্ত্র অর্থে "অজ্ঞাত ব্যাপকত্বং শাস্ত্রত্বম্ অর্থে বেদই প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। বেদই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শ্রুতিসমন্বিত। ধর্ম্ম, সংপ্রসঙ্গ, নীতি ও সদাচার বিষয়ক যে সকল শাস্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সমস্তই বেদমূলক; তাহাদের সহিত বেদের স্বাতন্ত্র্যতা নাই। বেদের সাধারণ অর্থ জ্ঞান। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটী মন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবাদ বা জ্ঞানকাণ্ড অন্যটীকে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কর্ম্মবাদ বা কর্ম্মকাণ্ড বলে। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিমার্গে প্রথম অধিকারীর নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ বিবিধ কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডে সংসারতিমির বিনষ্ট করতঃ পরিত্রাণের পথ পরিজ্ঞাত করাইয়া দেয়,—সংসারবন্ধন চিত্তবৃত্তি-প্রবাহকে প্রক্ষীন করে, অজ্ঞান-মলিনতা অপসারিত করতঃ সত্যের আলোক দেখাইয়া দেয়;—কর্ম্মনিমিত্তক অবিদ্যাবীজ উৎপাটিত করিয়া নির্ম্মল প্রশান্ত জ্ঞানময় রাজ্যে লইয়া যায়। পক্ষান্তরে যাহা দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের অনুসন্ধান সংগৃহীত হয়, শান্তিবর্দ্ধক ইষ্টপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবর্ত্তক অনিষ্ট পরিহারের পন্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকেই বিবুধগণ বা প্রজ্ঞাবাদিগণ বেদ বলিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান আপস্তম্ভ "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো বেদ নামধেয়ম্" সূত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়কেই বেদ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

এইরূপ বৃহস্পতি বলিয়াছেন "বেদান্ বৈ সদ্য দুঃখ প্রমুচ্যতে" বেদ দ্বারা সদ্য দুঃখের শান্তি হয়।

উশনঃ বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ" সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়স্করঃ পরঃ" বেদই দ্বিজাতির মোক্ষকর।

দক্ষ বলিয়াছেন—"বেদাভ্যাসোহি বিপ্রানাং পরমং তপ উচ্যতে" ব্রাহ্মণগণের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা।

সংবর্ত্ত বলিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থ বিদ্দ্বিজ" বেদশাস্ত্রবেত্তা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণু বলিয়াছেন—"যস্তুপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ" যে ব্যক্তি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক বেদাধ্যাপন করেন তাঁহাকেই আচার্য্য বলা যায়।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"ব্রহ্মদানমেবাতিরিচ্যতে ব্রহ্মদান অর্থাৎ বেদাধ্যাপনই অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে।

পরাশর বলিয়াছেন—"যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্তোতে" যে সকল বিপ্র ষড় বেদাঙ্গবিদ্ হন, তাঁহারা ত্রিলোককে ধারণ করেন।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন—"বেদশ্চৈশ্বরাত্মত্বাত্ত মুহ্যন্তি সূরয়ঃ" বেদ ঈশ্বরাত্মক বলিয়া জ্ঞানিগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

মনু বলিয়াছেন—

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদধি দৈবিকমেবচ
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ॥

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাম্।
ইদমম্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম ॥

যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, দেবজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, পরমাত্ম-বিষয়ক বেদমন্ত্র, উপনিষদাদিতে যে সকল শ্রুতি উদিত হইয়াছে; সর্ব্বদা সে সমুদয় জপ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা জ্ঞানবান, যাহারা স্বর্গকামী, যাহারা মুক্তিকামী, সকলের পক্ষে বেদই একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ।

নন্দী পুরাণে বলিয়াছেন—
আত্মবিদ্যাচ পৌরাণী ধর্ম্মশাস্ত্রাত্মিকা বিভো।
সর্ব্বদানক্রিয়াফলৈঃ দাতাবস্তুনস্তফলভাগিনঃ ॥

এখানে আত্মবিদ্যা অর্থে শ্রুতি, পুরাণ অর্থে ভূতকালবাচী, পুরাতন বিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা বেদই বুঝাইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থে অজ্ঞাত ব্যাপকত্বং শাস্ত্রত্বম্ অর্থে বেদই প্রতিপাদ্য হইতেছে।

কণাদ বলিয়াছেন—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" বেদ ঈশ্বরবাক্য ও সিদ্ধপ্রমাণ।

জৈমিনী বলিয়াছেন—"প্রমাণান্তরা গোচরার্থ প্রতিপাদকং হি বাক্যং বেদবাক্যং" যাহাতে কোন প্রমাণান্তর নাই, তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদক বাক্যই বেদবাক্য অর্থাৎ ঈশ্বরবাক্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ" বেদ প্রসিদ্ধ ঈশ্বরবাক্য। শ্রুতি বাক্যের অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাও বেদ ঈশ্বরপ্রণীত অবগত হওয়া যায়।

উপরোক্ত পর্য্যালোচনার দ্বারা বেদের মুখ্যত্ব ও প্রাধান্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া বেদই হিন্দুজাতির সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ও উৎকৃষ্টতম শাস্ত্র প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা।

যে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত হিন্দু সন্তান-সন্ততির সামীপ্য সম্বন্ধ, পরাশান্তির সমবায়ী সমাশ্রয়, পরমপদ পরিজ্ঞানের সন্নিকর্ষ সমন্বয়, এক্ষণে সেই হিন্দুসন্তান অপেক্ষা অন্যান্য জাতিরা বেদাদি শাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চায় মনযোগী হইয়াছেন। আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশের প্রত্যেক স্থানেই ত্রিকালজ্ঞ হিন্দুঋষিদের বিষয় আলোচিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সন্তান ব্রহ্মচর্য্যের বিনিময়ে বিলাসের বেশ-ভূষা, বৈদিক কর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গোক্তি, বেদপাঠের স্থলে সরমার মনোবিলাস পাঠে দৃঢ়প্রযত্ন। ইহার উপর আজকাল চতুর্দ্দিকেই নানা নাম ও বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মবল সঙ্কুচিত, ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত এবং পরিপন্থীর পরিভাষায় পরিপ্লাবিত ও পরিহসিত।

বেদবাক্যের সম্মান সর্ব্ব প্রযত্নে সকলেরই রক্ষা করা কর্ত্তব্যের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। সেই কর্ত্তব্যপরিপালনে হিন্দু ভ্রাতাগণের দশমমণ্ডল ঋগ্বেদের বাক্যে একান্ত মনোনিবেশ করাই বর্ত্তমান দুঃসময়ের প্রকৃত শান্তি ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক। যথাঃ—

সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বং সং জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতি সমানী।
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ধর্ম্মভাবে তোমরা পরস্পর মিলিত হও, একত্রে একমনে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদের ধর্ম্মভাবে মন একমত হউক। দেবতারা একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতেছি। তোমাদের সহিত একই হোমে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমাদের ধর্ম্মের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে ও সম্পূর্ণ। রূপে একমত হইয়া ধর্ম্মবল বর্দ্ধিত কর।

(ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল।)

ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

নির্ব্বাণ—ষটক্।

(১)

নহি আমি অহংকার, চিত্ত, বুদ্ধি, মন,
না হই নাসিকা, জিহ্বা অথবা শ্রবণ,
তেজাকাশ, ভূমি নহি বায়ু বা নয়ন,
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

(২)

প্রাণসংজ্ঞা নহি আমি কিম্বা পঞ্চ বায়ু,
সপ্তধাতু নহি আমি, পাদোপস্থ পায়ু,
নহি আমি পঞ্চকোষ, পাণি বা বচন,
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

(৩)

পাপ, পুণ্য নহি আমি, কিম্বা নহি সুখ,
মন্ত্র, তীর্থ, বেদ নহি, নহি আমি দুঃখ,
যজ্ঞ, ভোজ্য, ভোক্তা নহি, অথবা ভোজন,
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

(৪)

দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, না আছে আমার,
মাৎসর্য্যভাব নাই, মদের বিকার,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নহি কদাচন,
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

(৫)

জন্ম, মৃত্যু, শঙ্কা নাই, নাই মোর পিতা,
জাতিভেদ নাই মোর নাহি মম মাতা
গুরু, শিষ্য, বন্ধু, মিত্র নাই কোনজন।
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

৬

নির্ব্বিকল্পরূপী আমি, আমি নিরাকার।
আমি সর্ব্বব্যাপী, বিভু ইন্দ্রিয় সবার।
ভীতি, মুক্তি, নাহি মোর অথবা বন্ধন,
চিদানন্দরূপী আমি শিব সনাতন॥

স্বরূপানন্দ।

প্রেমে সমাধি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণধন কাশী আসিয়াছে। কাশী আসিয়া সমস্ত স্থান খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কোথাও গুরুর সাক্ষাৎ পাইল না। বিশ্বেশ্বরের বাড়ী, অন্নপূর্ণার বাড়ী, দুর্গাবাড়ী ও অন্যান্য সাধু সমাগমের স্থানে প্রত্যহই বসিয়া থাকে; কিন্তু কোথাও তাহার গুরুদেবের চরণ দর্শন মিলিল না। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই কাতর হইল। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমির কোন স্থানে তাহার গুরু রহিয়াছেন, সে কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত তাহা হইলে খোঁজা যাইত, কিন্তু এমন অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কি প্রকারে তাহা সম্ভব হয়?

কাশীতে অবস্থান করিবার সময় তাহার একটা কথা প্রায়ই মনে হইত, শুনিয়াছি অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেহ অভুক্ত থাকে না, আমি আজ না খাইয়া থাকিব, দেখি আমার ভাগ্যে ভোজন মিলে কি না। এইরূপ মনে করিয়া কৃষ্ণধন একদিন কিছুই না খাইয়া কাশী ভরিয়া ঘুরিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হয় কৈ কিছুইতো মিলিল না। তবে কি এসব মিথ্যা গুজব? সে কাশীমাহাত্ম্যের উপর বিরক্ত হইয়া দশাশ্বমেধঘাটের দিকে চলিল। ঘাটে উপস্থিত হইয়া একটী বেদীতে উপবেশন করিল। গঙ্গা তখন কি সুন্দর ঢেউএর সঙ্গে খেলা করিতেছে! কৃষ্ণধন অনন্যমনা হইয়া গঙ্গার সেই ভুবনমোহন তরঙ্গভঙ্গি নয়নগোচর করিতে লাগিল। সূর্য্য পশ্চিমাকাশ সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অস্তগামী হইতে চলিলেন। সহস্র সহস্র যাত্রী গঙ্গার নির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। এমন সময় এক পলিতকেশা লোলদেহা বৃদ্ধা একটী পাতার ঠোঙ্গা হাতে গঙ্গায় স্নান করিতে আসিয়াছে। ঠোঙ্গার উপরে একটী আবরণ; সে কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেখ বাবা আমার এই খাবার ঠোঙ্গাটী তোমার কাছে রহিল, তুমি দেখিও, আমি এই গঙ্গায় একটী ডুব দিয়া আসিয়াই লইয়া যাইব? কৃষ্ণধন ঠোঙ্গার দিকে দৃষ্টি রাখিল। বৃদ্ধা অপরাপর সকলের সাথে মিলিয়া গঙ্গায় নামিল, ডুব দিল কিন্তু আর উঠিল না।

বহুক্ষণ কৃষ্ণধন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান মিলিল না। তাহার সঙ্গে যে সকল যাত্রী স্নান করিয়াছে, তাহাদিগকে একে একে ঐ বৃদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল বৃদ্ধাকে আমরা দেখি নাই। তখন কৃষ্ণধন নিরুপায় হইয়া ঠোঙ্গার আবরণ উন্মোচন করিল। দেখিল ঠোঙ্গায় চারিটী বর্দ্ধমানের বড় বড় সীতাভোগ রহিয়াছে। তখন কৃষ্ণধনের মনে হইল তাহার সেই সঙ্কল্পের কথা,—পরীক্ষা করিব কাশীতে মানুষ অভুক্ত থাকে কি না। সে মনে ভাবিল, মা অন্নপূর্ণাই বুঝি ছল করিয়া বৃদ্ধা সাজিয়া আমার মনের সন্দেহ মিটাইয়া গেলেন। তাহা না

হইলে, এ অসময়ে এতদূরে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ আসিবে কি করিয়া। কৃষ্ণধন পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া, নিজের ভ্রম স্মরণ করিতে করিতে বাসায় ফিরিল।

যেদিন কৃষ্ণধন দেবতার এই লীলা পরীক্ষা করে, সে দিন নবমী পূজার দিন ছিল। পরদিন দশমী। সে দিন কাশীর গঙ্গায় প্রতিমার মেলা বসিয়াছে; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সহস্র সহস্র দীপাবলীতে গঙ্গা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে মায়ের তরণী হইতে সেই অসংখ্য দীপরশ্মি চঞ্চল সলিল বক্ষে পতিত হইয়া বড়ই মনোরম দেখাইতে লাগিল। সেই উজ্জ্বল রশ্মি আবার নদীর জলে পড়িয়া শান্তি না পাইয়া ছুটিয়া মায়ের মুখের কাছে গিয়া জগতকে মায়ের প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল। কৃষ্ণধন বহুক্ষণ ধরিয়া মায়ের সে মূর্ত্তি দেখিল। দেখিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিল। রাত্রি হইলে-বাসায় আসিতেই প্রাণটা কেন যেন কাঁদিয়া উঠিল।

জীবনকুমার কৃষ্ণধনের কাশীর ঠিকানা জানিত। মধ্যে মধ্যে দুই এক খানা পত্রও দিত। হরুঠাকুরের মৃত্যু হইলে সকল শিষ্যেরাই কৃষ্ণধনের খোঁজ করিতে লাগিল। জীবনকুমারকে কৃষ্ণধনের প্রিয়বন্ধু জানিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সন্ধান লইল। জীবনকুমার কৃষ্ণধনকে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক খানা টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

আজ কৃষ্ণধনের প্রাণ সত্য সত্যই সংসার-বন্ধন হইতে চিরমুক্ত হইল। পূর্ব্বে যদিও সংসারে কোনও আসক্তি ছিল না তবুও পিতৃস্নেহের কি এক প্রাণস্পর্শী মাধুরীতে কখনও প্রাণটা সংসারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত সে মাধুরীও ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদে আজ শুষ্ক হইয়া গেল। আজ সে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত প্রাণের এক মাত্র কামনা কাম্য বস্তুর উদ্দেশে আজ নির্ব্বাধ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাস্তায় অনেক সাধুর সঙ্গেই দেখা হয়, কিন্তু সে মনের মানুষের সাক্ষাৎ মিলিল কৈ? সে যে একবার চক্ষের দেখা দিয়া কোথায় লুকাইয়াছে। আশা বলিতেছে 'এই তো আমি, 'এই তো আমি;' কিন্তু কৈ সে?

আজ কৃষ্ণধনকে এক সাধু স্বেচ্ছায় নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, কেন শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? তোমার গুরু তোমার দেশেই গয়ায় যাও; ফল্গু নদীর ওপারে, কিছু দূর গেলেই দেখিতে পাইবে একটা ছোট পাহাড়, সেই পাহাড়েই গুরুর সন্ধান মিলিবে।

কৃষ্ণধন সাধুর এই অযাচিত করুণায় বড়ই কৃতার্থ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া সে গয়া অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সাধু যে পাহাড়ের কথা বলিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে হনুমানজীর পাহাড় বলিয়া থাকে। ফল্গুনদী পার হইয়া কয়েক মাইল গেলেই পাহাড়টী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ অতি সহজেই পাহাড়ের সন্ধান লইল। পাহাড়ের পাদদেশেই সাধুর কুটীর। সাধুকে লোকে পাগল বলিয়াই জানে। নাম তাঁর শ্যামানন্দ। পাগল মাতৃভক্ত তান্ত্রিক। তান্ত্রিক সাধুর কথা হইলেই আমাদের চক্ষের কাছে কাপালিকদের ছবি ফুটিয়া ওঠে; তাই তান্ত্রিকের নাম শুনিলে আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি

কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকের ভাব, অতি সুন্দর; পাঠক, এই শ্যামানন্দকে দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

যখন কৃষ্ণধন সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হইল, তখন দেখিল এক মহাপুরুষ আশ্রম-পাদপদের গায়ে হাত বুলাইতেছেন, মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত আবার কি যেন কথা কহিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও আহ্লাদে আট খানা হইয়া সেই সকল বৃক্ষসমূহের বল্কলাবৃত্ত শরীর চুম্বন করিতেছেন; আবার কখন ও বা 'মা' 'মা' করিয়া সেই সকল বল্লরীবেষ্টিত বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। এই মহাপ্রেমিকই শ্যামানন্দ।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই লতাবিতানের অন্তরালে একটী সুন্দর মন্দির। মন্দিরে মায়ের পাষাণময়ী প্রতিমা। কৃষ্ণ প্রথমেই 'তারা মা' বলিয়া মাকে প্রণাম করিল, পরে সেই মহাপুরুষের দিকে ফিরিয়া চলিল। দেখিল, মহাপুরুষের নয়নদ্বয় হইতে যেন দুইটী প্রেমের কণা ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে, চোখে, মুখে কি একটা শান্তির চন্দনলেপ লিপ্ত করিয়া দিল। স্বপ্নের গুরুর সহিত এ মহাপুরুষের সাদৃশ্য না থাকিলেও, কৃষ্ণধন তাহার মনপ্রাণ ইঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রেমিক শ্যামানন্দ মধুর আশীর্ব্বাদে কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণধন আজ দুই দিন হইল এই আশ্রমে আসিয়াছে। সে তো সাধুর ভাব দেখিয়াই অবাক! মানুষ কি এমন হইতে পারে, সাধু নিশ্চয়ই পাগল। তবুও কেন এঁর জন্য প্রাণ কাঁদে, ভক্তিতে হৃদয় নমিত হয়? কে বলিবে ইহার ভিতরে কি গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। কৃষ্ণধনের বড় ইচ্ছা হ'ল শ্যামানন্দকে এসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে। সুযোগও মিলিল। মহাপুরুষ আশ্রমে ছিলেন না, কোথায় বেড়াইতে গিয়াছেন। যখন ফিরিলেন কৃষ্ণধন বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে সাধুর মাথায়, কাঁধে ও হাতে অনেকগুলি পাখী বসিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ প্রথমে মনে করিল হয় তো পোষা পাখী হইবে; কিন্তু সে শ্যামানন্দের কাছে যাইতেই পাখীগুলি উড়িয়া গেল। তখন তাহার ভ্রম ঘুচিল।

শ্যামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিগো, কি করিতেছিলে?

কৃষ্ণ,—কি আর করিব, আপনার কাণ্ড দেখিতেছিলাম। আপনি এই পাখীগুলি কোথায় পাইলেন?

শ্যামানন্দ,—ওরা ঐ গাছের ডালে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়াই নামিয়া আসিয়াছে।

কৃষ্ণ,—আমাকে দেখিয়া তো ওরা ভয়ে উড়িয়া গেল, আপনার কাছে আসিতে ভয় করে না কেন? কেন এমন হয়?

শ্যামানন্দ,—তুমি হয় তো প্রভুভক্ত অনেক কুকুরের কথা শুনিয়া থাকিবে; প্রভু যদি লাঠি দিয়া তাদের তাড়া করেন তারা, ভাবে প্রভু বুঝি আদর করিতেছেন; ভয়

পায় না, ভালবাসা আছে কি না! তুমি যাও দৌড়াইয়া পলাইবে। এখানেও ঠিক তাই, আমার সঙ্গে ওদের ভালবাসা আছে; তাই ভয় পায় না; ওরা জানে আমি ওদের কোনও অনিষ্ট করিব না।

কৃষ্ণ,—আমি বুঝি অনিষ্ট করিতাম? আমাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল কেন?

শ্যামানন্দ,—তোমার মনে বোধ হয় এখনও একটু হিংসা রহিয়া গিয়াছে। যাহার হিংসা দ্বেষ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার কাছেই ওরা যায়; তাহাকেই উহারা আপনার বলিয়া জানে।

কৃষ্ণ,—আচ্ছা, আপনি যে গাছের গায়ে চুমো খান, গাছকে আলিঙ্গন করেন, এ আবার কি? গাছকে চুম্বন করিতে তো কোথাও শুনি নাই; আপনার কি তাহাতে কোনও সুখ হয়?

শ্যামানন্দ,—হয় বৈ কি; খুব সুখ হয়। মানুষকে চুম্বন করিয়া যদি সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গাছকে চুম্বন করিয়া সুখ পাওয়া যাইবে না কেন? জড়ে চৈতন্যের বিকাশ হওয়াতে জড় চেতন হইয়াছে। মানুষে ও গাছে এবিষয়ে আমি কোনও পার্থক্য দেখিতে পাই না। উভয়েই ব্রহ্মের বিকাশ, তাই আমি সর্ব্বদাই অনুভব করি, ওরা চেতন, ওদেরও প্রাণ আছে। ওদের ভিতরে ভগবানের পরশ লাভ করিয়া আমি আত্মহারা হইয়া যাই; তিনি ওদের ভিতরে প্রকাশিত হইয়া আমায় আকুল করিয়া দেন, আমার প্রাণ যেন কেমন করিয়া ওঠে, আমি ছুটিয়া গিয়া আলিঙ্গন না করিয়া পারি না, চুম্বন না করিয়া পারি না।

কৃষ্ণ,—আপনি দেখিয়াছি গাছের সঙ্গে কথাও বলিতে পারেন। গাছ কি কথা বলিতে পারে?

শ্যামানন্দ,—কেন পারিবে না? যাদের প্রাণ আছে তাহারা সকলেই কথা বলিতে পারে। তুমি কথা বলিতে পার, আর ওরা পারিবে না? ওদের কথা ওরাই বোঝে, আর যাহাদের ওদের ঐ ভাষায় অধিকার আছে, তাহারাও বুঝিতে পারে। এই বলিয়াই শ্যামানন্দ গান ধরিলেন,—

সবার মাঝারে তোমার মুরতি
পাই সদা আমি দেখিতে;
সবার পরশে তোমার পরশ
আমার হৃদয় খানিতে।
সবার কথায় তোমার কাহিনী
পশে সদা মোর শ্রবণে;
তুমি মোর কাছে রয়েছ সদাই
জীবনে জনমে মরণে।

গান সমাপ্ত হইল। শ্যামানন্দ আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। সেই ভাবাবস্থায়ই আবার বলিতে লাগিলেন,—তুমি আসিয়াছ? বহুদিন পরে আবার আসিয়াছ? আমাকে গুরু করিতে আসিয়াছ? কে কার গুরু বাবা! সবাই এক জিনিষ, তবে যাঁহার উপরে বিশেষ শক্তি প্রকাশিত হয়, তিনি আদিষ্ট হন। আমার আদেশ আসিয়াছে, আজ আমি তোমায় আমার বহুদিনের সঞ্চিত ধন প্রদান করিব, এস বাবা, এস।

কৃষ্ণধন শ্যামানন্দের কৃপালাভ করিল। শ্যামানন্দ বলিলেন, তুমি বড় ভাগ্যবান, আমিও তোমাকে শিষ্য পাইয়া আজ আমাকে

ভাগ্যবান মনে করিলাম। মায়ের মন্দিরের কিছুদূরেই ঐ শ্মশান, ঐ স্থানে বসিয়া আজ হইতে অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই নামে জপ করিতে থাক। ভয় নাই বাবা, দেবী আসিলে বর চাহিও; প্রকৃত দেবী কিনা কেমনে বুঝিবে জান? মাথায় পা দিতে বলিও, ইষ্টদেবী হইলে মাথায় পা দিবেন, আর কোনও দেবী পারিবেন না। যাও বাছা, আশীর্ব্বাদ করি অচিরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। ক্রমশঃ।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

———:0:———

সাধক-সঙ্গীত।

২

ললিতভৈরব—একতালা।

হরি—কোথায় নাই রে মন, হরিময় এই ত্রিভুবন॥
অনল অনিলে, ক্ষিতি আর সলিলে, অনন্ত আকাশে রন।
দেখ রে নয়নে, চন্দ্র তপনে, হরির শরীর কিরণ
নিবিড় আঁধারে সেই রসকূপ,
আলোকের কোলে সেই কাল রূপ,
বিকট প্রান্তরে সেই নট ভূপ, অপরূপ দেয় দরশন;—
মরীচিমালায়, মরীচিকায় হায়, মুরারী খেলে সঘন,
মনোজ্ঞ তরুতে, মৃদুল মরুতে, মরুতেও তিনি ছাড়া নন॥
সরিৎ সাগর, দেখনা রে কেউ,
বুকে রয় তারা হরি রূপের ঢেউ,
নীরদ ছটায়, তড়িৎ ছটায়, হরিরূপের আবরণ;
শিখি, শুক, পিকে, চকোরে চাতকে, মধুপে মধুসূদন,
হরি গন্ধ মাখা, হরিরূপে ঢাকা, বিকচ কুসুম বন॥
দেখ রে গিরি-ধর-দেহে মূর্ত্তিমান,
গিরিধর আমার সদাই বর্ত্তমান
ললিত লতায়, শ্যামল পাতায়, শ্যামাঙ্গের কত নিদর্শন;
ময়ূর তাণ্ডবে, নধর পল্লবে শ্রীরাধাবল্লভে হয় স্মরণ।
বেণী বলব কিরে, দেখ সর্পশিরে, দর্পহারী হরির শ্রীচরণ॥

গোচারণ ভূমে খেলে বৎসগণ
মনে পড়ে তায় শ্রীবৎসলাঞ্ছন
উড়ে যায় পাখী তাতেও কমল-আঁখি, কভূ ত তাহা না রয় গোপন ;—
দূরে আর কাছে, আগে কিম্বা পাছে, আছে যে গোবিন্দ সর্ব্বক্ষণ।
দুর্গম মশানে, ভীষণ শ্মশানে, হরি বই নাই কোন জন ॥

শ্রীগুরু।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অঞ্জন শলাকা দ্বারা যেরূপ চক্ষুর হীন-দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ যিনি জ্ঞান দান করিয়া মনের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দেন সেই পরম-পদ শ্রীগুরু-চরণে বন্দনা করি।

সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন, অপ্রমত্ত, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ও মুমুক্ষু জীবের প্রতি কৃপা পরবশ ইষ্টদেবতা গুরু রূপে আবির্ভূত হইয়া দীক্ষা দ্বারা মুমুক্ষু শিষ্যের ভববন্ধন মোচনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা।

জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ ও কর্ম্ম-পাশ ছেদন করিয়া মুক্তিমার্গে আরোহণের জন্য দীক্ষার আবশ্যক। যথাঃ—

দীয়তে জ্ঞানমিত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনং।
অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥

আজকাল দেখা যায় যেমন শৈশবে অন্নারম্ভ, বাল্যে উপনয়ন এবং যৌবনে বিবাহ, তেমনি তদানুসঙ্গিক একটা কার্য্য দীক্ষা। এ দীক্ষা যে কি, কেন গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কাহারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ বা ইচ্ছা নাই। গুরু বার্ষিক লইতে আসিলেন—মন্ত্র ত না লইলে নয়—উর্দ্ধতন কয়েক পুরুষেই যখন হইা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই আমরাও মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। শিষ্যের গুরুর আবশ্যকতা ঐখানেই শেষ হইয়া গেল এবং গুরু শিষ্যে আর খোঁজ নাই। রীতিমত বার্ষিক লইয়াই গুরু তাঁর নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিলেন বলিয়া পরম সন্তুষ্ট; আর শিষ্য অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অক্ষমতাসত্ত্বে বার্ষিক প্রদান করিয়া অসন্তুষ্ট। গুরু শিষ্যকে চিনিলেন না, জানিলেন না বা দেখিলেন না, শিষ্যও তথৈবচ। আর গুরুর দরকারও শিষ্য [illegible] ঐ পর্য্যন্তই। আজকাল [illegible]লিপিাদিতেও দেখা যায় কোন কোন গোঁসাই প্রভুদের পেশা গুরু-গিরি বলিয়া লেখা হয়। পেশা চাকরী, ব্যবসা কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য—তেমনি একটা পেশা গুরুগিরি! হায়, হায়, যে গুরুর স্বরূপ—

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যিনি

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিষ্যকে দীক্ষাদান কিনা তাঁরি পেশা-ব্যবসা—ইহকালের মল-মুত্র-পুরিষ পরিপুরিত দেহ রক্ষার উপায় স্বরূপ—তাঁর অর্থলাভের পথ—পরিবার প্রতিপালনের উপায়। যে গুরুর চরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া শিষ্য ভব-সাগর পাড়ি দিবে সেই গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ কিনা ব্যবসা। এহেন গুরু কর্ণ-ধারের নৌকায় উঠিয়া শিষ্য কি ভবনদী পাড়ি দিতে পারে? যিনি নিজে ঘোর অন্ধকারে অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতেছেন—কাম-কামনার দাসত্ব করিতেছেন, যিনি সংসার দাব-দাহে-ক্লিষ্ট, কাম-কামনার তাড়নে নিষ্পে-ষিত, তিনি মুমুক্ষু শিষ্যকে উদ্ধার করিবে কেমন করিয়া? তিনি নিজে আলোকের রেখা পর্য্যন্তও দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু "সবজান্তা" সাজিয়া—"সর্ব্ব শাস্ত্র-বেত্তা হইয়াছেন" বলিয়া তাঁর অহংকারের সীমা নাই। আবার করিতেছেন কি না—নিজের সেই অধঃপতিত শক্তি লইয়া পতিতকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। তাহার ফলে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া যে দশা প্রাপ্ত হয় তাহাই হইতেছে যথা—

The blind leading the blind, both fall into a ditch.

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানা পরিষন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

তবে প্রকৃত ভবপারের কাণ্ডারী গুরু-রূপে বরণীয় কে?

তীর্ণাঃ ভীম ভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥

যিনি স্বয়ং ভয়াবহ ভবার্ণব পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজ স্বার্থের চিন্তা না করিয়া অপরকেও উদ্ধার করেন—সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

শিষ্যকেও মুক্তি অভিলাষী, ভক্তিমান, ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হইতে হইবে। তাহাকে অধিকারী হইয়া গুরু কৃপালাভের চেষ্টা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ্যা-সমিতিও ইহা মানিয়া থাকেন।

দৃষ্টিশক্তি পরিচালনার পূর্ব্বে চক্ষুদ্বয় অশ্রু-শূন্য করিতে হইবে অর্থাৎ অযথা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বদা যথাকর্ত্তব্যসাধনে তৎপর থাকিতে হইবে। যুদ্ধ করিতে আসিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়দৌর্ব্বল্য দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ
নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥
গীতা ২।৩

শ্রবণশক্তি বিকাশের পূর্ব্বে কর্ণকে সর্ব্ব-বিধ বাক্য সহনোপযোগী করিতে হইবে;-অর্থাৎ শ্রবণ বিষয়ে সংযমী হইতে হইবে। বাক্‌শক্তি বিকাশের পূর্ব্বে অন্যের প্রতি যন্ত্রণা-দায়ক বাক্য প্রয়োগের শক্তি লোপ করিতে হইবে। গুরু সন্নিধানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেপদদ্বয় হৃদয়রক্তে ধৌত করিতে হইবে অর্থাৎ

চিত্তজয় করিতে হইবে। এক কথায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিতে হইবে। নতুবা গুরু-ব্রহ্মের অযাচিত করুণাপ্রবাহ হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ না করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

গুরু ও ইষ্টে কোন প্রভেদ নাই। গুরু প্রণাম মন্ত্রে আছে যথা—

'নমোহস্তু গুরবে তস্মাদিষ্টদেব স্বরূপিনে,'

গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মলাভ যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে মুক্তি তাহার করতলগত, অষ্টসিদ্ধি তার সেবায় নিযুক্ত হয়।

গুরুভক্তি লাভ করিতে হইলে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবানের সাকার অভিব্যক্তি জ্ঞানে দেহমনপ্রাণ শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। মৃত্তিকা, কাচ, প্রস্তর কিংবা অন্ত কোন ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিকে যদি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা হয়,—ভক্তি লাভ হয়; তবে এই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা হইবেনা কেন?

শ্রীভগবান ভক্তাধীন, ভক্তিভরে ডাকিলে তিনি দয়া করেন। যে যে ভাবে তাঁহার আরাধনা করেন, তিনি সেইরূপেই ভক্তমনোমোহন রূপে দেখা দেন। তাঁর নিজের মুখের কথায় তা ব্যক্ত হইয়াছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে-
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

প্রাণ চাই, প্রাণভরে ভক্তি ক'রে ভাল চাই—"লোকে কি বল্‌বে" বল্লে হবেনা—যেহেতু আমার সুখ দুঃখে লোকের কিছুই আসিয়া যায় না। তাহারা কেবল আমাকে তাহাদের মনোমত হইতে না দেখিলেই আমার সম্বন্ধে ভাল মন্দ আলোচনা করিবে।

"ঢেঁকী ভজে যদি, এই ভবনদী,
পার হতে পার বঁধু,
লোকের কথায় কিবা আছে যায়
পিব সুখে প্রেম মধু॥"

যে মনপ্রাণ সংসার, বিষয়-বাসনা, কামকামনা সেবাপরায়ণ হইয়া অতি সামান্ত সামান্ত বস্তুতে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া শ্রীগুরুচরণারবিন্দে অর্পণ করিলে, তিনি কি আর তখন দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন? এরূপ শিষ্যকে তিনি একেবারে ভববন্ধন মোচন করিয়া দেন।

গুরুর আদেশ পালনে উৎফুল্লচিত্তে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে। সেবার ফল অনন্ত। যথাঃ—

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ॥

যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন না হইয়া কেবল গুরুর সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। গুরুসেবাপরাঙ্মুখ ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ ও ভেকধারী সন্ন্যাসী হইলেও সন্ন্যাসীপদবাচ্য নহেন।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরুপাদ সেবনাৎ।
সর্ব্ব তীর্থাবগাহনাৎ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

সর্ব্ব তীর্থের ফল একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বাহন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গুরু কৃপায় মূক বক্তা হয়, আর চলৎ-

শক্তিহীন ব্যক্তি পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর আদেশ পালনে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে বেগবতী নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন—ভক্তের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁর প্রতি পাদক্ষেপনে একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া পদ রক্ষার আধার হইয়াছিল। আবার এদিকে তাঁহার অপর শিষ্য ত্রোটকাচার্য্য বোধশক্তিহীন সম্পূর্ণ মূর্খ হইলেও গুরুকৃপায় শুধু সেবাপরায়ণ ছিলেন বলিয়া, ত্রোটক ছন্দে শ্রীগুরুগুণানু-কীর্ত্তন করিয়া তাঁর প্রতি ঘৃণাপরায়ণ গুরু-ভ্রাতাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

শুধু গুরুভক্তি দ্বারাই ভব বন্ধন মুক্তি হয়, কোন রূপ শাস্ত্রালোচনাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করা দরকার হয় না। যথা:—

জ্ঞানং বিনা মুক্তি পদং লভতে গুরু ভক্তিতঃ।

গুরুদেবের দোষগুণ বিবেচনা করিতে নাই, আমার গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ জগতে আমার গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই; এইরূপ ভাবে থাকিতে হয়। গুরুর চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁরি সংসারে তাঁরি আদিষ্ট কর্ম্মচারী রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাঁহার প্রতি প্রাণের ঐকান্তিক ভালবাসা রাখিতে হয়। কোন রূপ দোষ গুরুতে আছে এরূপ কথা শুনিলেও যখন প্রাণে কোনরূপ সংশয় না হইবে, তখন বুঝিতে হইবে প্রকৃত ভালবাসা ও ভক্তি লাভ হইয়াছে। বৈষ্ণব ভক্তের কথায় আছে,—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ ভাব প্রাণে উদিত হয় না।

প্রিয় পাঠকগণ, সংসারের অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত দেহ, বিষয়বিদগ্ধ প্রাণ লইয়া এ সংসারে সুখ কি? বিষয় যাতনায় ব্যাকুল হইয়া আকুলভাবে সেই দীনশরণের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হই, তিনি আমাদের এই দেহরূপ ভেলাকে গুরু কর্ণধার রূপে অবতীর্ণ হইয়া করুণার বাতাসে ভবনদীর পরপারে লইয়া যাইবেন, আমাদেরও দুঃখ যাতনার শেষ হইবে।

ঘাটে দিচ্ছে খেওয়া গুরু কর্ণধার
কত হইতেছে রে পার (ভবনদীর ঘাটে)॥
মন, তুমি পরের ভাবনা ভাব কিরে,
পারে আপনি যাওয়া ভার॥
দিন থাকিতে দেও রে পাড়ি
বেলা নাই কো আর॥
অসময়ে ঘাটে গেলে,
তোমায়, কর্ব্বে না কো পার॥
ও মন, গয়া গঙ্গা তীর্থ আদি
যত দেখ আর
মন, তোর কোটী তীর্থের ফল হবে রে
কর গুরুর চরণ সার॥
অধর বলে এই না ভবে
আমি দুরাচার।
আমার না হলো রে গুরু ভজন
ভবে আসা যাওয়া সার॥

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ ওম্।

দীন সুরেন্দ্রমোহন।

:0:

উপদেশ—সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২২। গুরু অর্থে ভারী—যাঁর চেয়ে বড় আর কিছু হইতে পারেনা তাহাই গুরু। গুরুই ব্রহ্ম স্বরূপ। ভক্তের নিকট গুরুই ভগবান; কারণ ভক্ত জগতের সকলকেই আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার নিকট গুরু যে ভগবান, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারেনা। আর জ্ঞানীর নিকট গুরুই ব্রহ্ম, কারণ সে জগতের সকলই ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া অনুভব করে সুতরাং তাঁহার নিকটও গুরু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম।

২৩। গুরু ভাব শিষ্য অভাব। যতদিন অভাবে থাকিব তত দিন গুরু শিষ্য থাকিবে। শিষ্য গুরুতে আত্ম আহুতি প্রদান করিবে। গুরু কৃপায় যে দিন সব অভাব মিটিয়া যাইবে সে দিন গুরুও নাই শিষ্যও নাই। তখন শিষ্যও গুরুতে পরিণত হইয়া যাইবে।

২৪। অভাব হইলেই ইচ্ছা জন্মে। যার কোন অভাব নাই তার কোন ইচ্ছাও থাকিতে পারে না। কিন্তু একথা ব্রহ্ম সম্বন্ধে খাটে না, কারণ যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহার ইচ্ছা অভাব নহে! উহা ব্রহ্মের স্বভাব। কারণ ত্রিবিধ শক্তি (ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান) ব্রহ্মেরই পরিণতি এবং উহারা ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

২৫। সন্ন্যাসীর পক্ষে নিরবলম্ব ধ্যান প্রশস্ত। মনকে একেবারে অবলম্বনশূন্য করিয়া রাখিতে পারিলে সত্য উপলব্ধি হইবে। ক্রমশঃ সত্য তাহার নিকট ভাসিয়া উঠিবে।

২৬। আমরা চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দেখি ইহাই নিরবলম্ব অবস্থা—ইহাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাধারণতঃ সেই অবস্থা লাভ হয় না, কারণ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দেখা যায় না, বাসনা কামনা এবং চিন্তার ঢেউ আসিয়া সেই নিরবলম্ব অবস্থা নষ্ট করিয়া দেয়।

২৭। সাধারণ পক্ষে ধ্যানের অবস্থাই ভাল; ধ্যানও জ্ঞানের পথ। একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতেই সর্ব্বদা চিত্ত লীন রাখিতে হইবে, তদ্ব্যতীত আর সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

২৮। চক্ষু কিম্বা মন কিছুই দেখে না কিম্বা উপলব্ধি করে না। প্রকৃত পক্ষে আত্মাই ঐ সব দ্বার বা আধারের ভিতর দিয়া দর্শন করিয়া থাকেন।

২৯। স্থূল যাহা দেখিতে পায় সূক্ষ্ম তাহা হইতে অনেক অধিক দেখিতে পায়, এমন কি এ বিষয়ে সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের তুলনাই হইতে পারে না, স্থূল দেহ থাকাতেই আমরা এই জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে সক্ষম হই।

৩০। আমরা জগতের যে কোন অংশে চিন্তা মাত্রেই উপস্থিত হইতে পারিতাম কিন্তু স্থূল দেহে আবদ্ধ থাকা বিধায় ইচ্ছামত সেরূপ পারি না।

৩১। সূক্ষ্ম হইতে কারণ অবস্থায় আরও অধিক দর্শন ও অনুভূতি হইয়া থাকে;

কারণ যতই উচ্চস্তরের উপলব্ধি হইবে ততই দর্শন ও অনুভূতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

৩২। কারণ অবস্থায় গেলে মন নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ মনের কোন ক্রিয়াই থাকেনা; তথাপি অনুভূতি নষ্ট হয়না বরং আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কারণ অনুভূতিই স্বরূপ অবস্থা সুতরাং মন লয়ের সহিত উহার কখনও লয় হয়না।

৩৩। ভাব অর্থ পূর্ণত্ব। অভাবের বিপরীত ভাব; সুতরাং যতক্ষণ অভাব থাকিবে ততক্ষণ ভাবের স্থান নাই, অর্থাৎ যাহার ভাব আসিয়াছে তাহার কখনও অভাব আসিতে পারেনা। ভাব অতি উচ্চ অবস্থা।

৩৪। ভক্ত কখনও নিজের ভক্তি বুঝিতে পারেনা; যার যত ভক্তি আসিয়াছে সে তত ছোট হইয়া যায়—নিজকে আরও দীন হীন মনে করে। সে যেন সব চেয়ে ছোট, জগতের সবই যেন তাহা অপেক্ষা বড়। ইহাই ভক্তের লক্ষণ।

৩৫। মায়িক ভালবাসা স্বার্থমূলক। যখনই স্বার্থহানি ঘটিবে তখনই সেরূপ ভালবাসার অভাব হইবে। যাহাকে ভালবাসব সে যদি শত্রুতাচরণও করে, তাহা হইলেও তার প্রতি আমার ভালবাসা একরূপই থাকিবে—তার প্রীতি অপ্রীতিতে সমান ভাব থাকিবে, ইহার নাম প্রকৃত ভালবাসা।

৩৬। ব্যষ্টি আধারে ভালবাসা নিবদ্ধ থাকা প্রেম নহে উহা কাম। ভালবাসাই স্বভাব হওয়া উচিত তাহা হইলে জগতে যখন যেখানেই থাক না কেন, ভালবাসা সকলের উপর সমান এবং অবিচলিত থাকিবে। ইহাই প্রেমের লক্ষণ।

৩৭। আশাই বন্ধনের কারণ। যখনই আশা হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে যে বন্ধনের কারণ হইয়াছে। শুধু বর্ত্তমান লইয়া থাকাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। গত বিষয় আলোচনায় কোন ফল নাই, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা চিন্তা করায়ও কোন ফল নাই। যা হবার তা হবেই।

৩৮। ভগবানের মত সেবক আর নাই। তিনি জগতের সকলের সমান ভাবে সেবা করিতেছেন। যখন যেখানে যা দরকার সবই পূর্ব্বেই সংঘটন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা অতিক্রম করা জীবের পক্ষে অসাধ্য সুতরাং অনর্থক ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই।

৩৯। ভগবানকে যে যেমন ভাবে চায় সে তেমন ভাবেই পাইয়া থাকে। অনেক স্থলেই জীব আত্মসুখ কিম্বা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আপন মনোমত বা মনগড়া ভগবান চায়। ইহারা নিজেই প্রতারিত হয় এবং ভগবানকে স্বরূপে লাভ করিতে পারেনা। ক্রমশঃ।

স্বরূপানন্দ।

———:0:———

অনন্ত সুখ।

মানব অপূর্ণ জীব, অপূর্ণ হইয়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত; ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, বিনয় সকল বিষয়েই অপূর্ণ, "সকল বিষয়েই পূর্ণতা লাভ করিব, সকলেরই সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করিব"—আশার অনন্ত জ্যোতি অনন্ত বাহু বিস্তার করিয়া, অনন্ত সুখ ভোগ করিতে অগ্রসর হতেছে। কত দুঃখ, কত যন্ত্রনা, কত অনুতাপ উপভোগ করিয়া, কত সুখের প্রতি-কৃতিতে প্রতারিত হইয়া সুখ দুঃখের প্ররোচনায় উলটিয়া পালটিয়া জীবনকে শতধা বিভক্ত করিয়া, সেই আশার উজ্জল আলোকে অতীন্দ্রিয় গত পবিত্র পূর্ণ সুখ লাভে সচেষ্ট হইতেছে।

ঐ যে সুনীল নৈশ গগন-বিহারী নক্ষত্র-রাজি, সৌর কর-প্রদীপ্ত ধরাতল, অমল কমল-দল সুশোভিত সরোবর, গগনস্পর্শী হিমাদ্রি-শিখর, কোথাও পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে পারিতেছিনা। তথাপি যেন কেহ বলিয়া দেয় না; অথচ মানব পূর্ণ সুখের আশায় স্বতই অগ্রসর হইতেছে। কেহই দেখাইয়া দেয় না, অথচ স্বতই সেই পবিত্রধামে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। এই যে সংসারবিহারী অপূর্ণ মানবকে অপূর্ণ বলিয়া,—মোহান্ধ বলিয়া,—অলীক প্রমোদপ্রিয় বলিয়া ধিক্কার দিতেছি, ইহা আমাদের উচিত নহে। সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যই সেই পূর্ণ সুখ; যে মোহান্ধ মানব পূর্ণ সুখ পাইবে বলিয়া বিষবৃক্ষ আলিঙ্গন করে, তাহার ফল যাহাই হউক, অভিপ্রায় মন্দ নহে। তাহার রমণীয় বিলাসভবন, স্ফটিক পাত্রে রঞ্জিত সুরা, বেশ-বিন্যাসের কারুকার্য্য, পূর্ণ সুখ লালসার পরিচায়ক, অদৃষ্টনেমীর দুর্নিবার পেষণে গরলোৎপন্ন হইতেছে, কে রক্ষা করিবে?

তাই বলিতেছি মানবের ইচ্ছা মহৎ, ফল বিষময়, সকলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে ব্যগ্র; সাধু, চোর, দস্যু, লম্পট একই ভার বহন করে, এক নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে গমন করে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, সকলেই স্রষ্টার একটী অভিপ্রায় পালন করিতে অগ্রসর হইতেছে, এক নিয়মের অন্তর্ভূত, একটী মঙ্গলময় পথের পথিক, সকলেই একদিকে গমন করিতেছি সকলের উদ্দেশ্যই এক, কি মধুময় কথা? কি পবিত্র ভাব? কি মঙ্গলজনক নিয়ম? হে মানব! একবার স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা কর দেখি, কি সুখের সম্মিলন, আমরা সাধু, চোর দস্যু, প্রতারকে একত্র হইয়া, ভাই ভাই মিলিয়া, সংসারের দুরন্ত প্রলোভনে হাবু ডাবু খাইয়া অপমানিত হইতে হইতে, প্রশংসা পাইতে পাইতে, সেই পবিত্রপূর্ণ সুখধামে গমন করিতেছি।

আর তুমি একা, সকলকে নিন্দা করিতেছ, প্রশংসার পার্থিব সুখে মোহিত হইতেছে, যে অপরকে নিন্দা করিতে করিতে,—আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিতে করিতে, জীবন অতিবাহিত করিল, যে অনন্তসুখ-কামনায় কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিল, তাহার হিরণ-রত্ন-নির্ম্মিত গৃহদ্বার হউক,—ত্রিতল প্রাসাদোপরি দুগ্ধফেন-নিভ মনোহর শয্যা হউক,—চতুর্দ্দিক হইতে শত শত চাটুকার তাহার যশগীতি প্রতি-

ধ্বনিত করুক, আমরা দূর হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করিব, নিকটে যাইব না।

তাই বলিতেছি, এ সংসারে সেই একা, যে আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা শ্রবণেচ্ছুক, যে স্বীয় অনন্ত আশার, অনন্ত প্রতিকৃতি, অনন্ত সুখভোগে বিরত, ফলতঃ যে পরের অনিষ্ট করিয়া আত্মোদর পূর্ত্তি করে, সমাজ তাহাকে দণ্ড করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর, তাহাকে দণ্ড করিবেন কিনা জানি না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "আত্মানাং সততং রক্ষেৎদারৈরপি ধনৈরপি"। এই নৈতিক উক্তি অনুসারে আমরা আত্মরক্ষার্থে অনেক বহুল নীতি পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

ইহা আমাদের স্বাভাবিক নীতি, আমরা এই নীতিশাস্ত্র অবগত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান হইয়াছি, যেখানে সামাজিক নিয়মে, অথবা পিতাপিতামহের অপরিণামদর্শিতায় আত্মরক্ষায় অক্ষম হইব, তথায় আত্মরক্ষা করিতে যে অন্য নীতি বিনষ্ট হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

তবে কি আত্মরক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য? তাহাও নহে, সকল বিপদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিয়া পরহিতব্রতে আত্মধ্বংস করিব, তাহাতে কি আত্মঘাতীর পাপ হইবে না? যাউক, এ সকল বিচারে আমার প্রয়োজন নাই, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্মের এ সকল মহতী তর্কজালে আমার কি উপকার হইবে? কেবল চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিব, ধর্ম্মাধর্ম্ম, নিন্দা, প্রশংসা, সংসারী, বৈরাগী এ সকল কথার অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে চাই না, তাহাতে আমার চিত্তে শান্তি হইবে না। আমার সে জ্ঞানচক্ষু আজও প্রস্ফুটিত হয় নাই, আমি জানিতে চাই, সেই গোমুখী-মুখনিঃসৃত প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীর বিশালবক্ষ-বিভাসিত চন্দ্রকরলেখার ঈষৎ আন্দোলনে হৃদয় নৃত্য করে কেন? বিস্তৃত নদীবক্ষে সান্ধ্যসমীরসংস্পর্শে ঈষৎ বিকম্পিত হইলে,—নিশীথ সময় অবনীর ভয়াবহ কঠোর নিস্তব্ধতা ঝিঁ ঝিঁ রবে পরিণত হইলে, হৃদয়ে এক অননুভূত ভাবের আবির্ভাব হয় কেন?—পৃথিবীতে যাহা সুন্দর তাহাতে আমার মন আকৃষ্ট হয় কেন?—সুখ হইতে সুখান্তর প্রাপ্তিজন্য এত লালায়িত কেন? এ সংসারে কি কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, যাহা হইতে আমরা উন্নত হইব,—সুখী হইব,—দুঃখ কাহাকে বলে স্বপ্নেও জানিব না?

আমরা দুঃখ ভালবাসি না, আমাদের দুঃখ দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা আছে, দুঃখ আমাদের বিষবৎ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দুঃখ না থাকিলে কি সুখের এত আদর থাকিত? যে ইহজন্মে কোন দুঃখভোগ করে নাই, তাহার নিকট সুখ কি দুঃখী ব্যক্তির ন্যায় আদরণীয়? গুরুতর পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিলে যে সুখ, পরিশ্রম না করিলে কি সে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়? সুতরাং সংসারে চিরকালই দুঃখ থাকিবে, এবং আমরা চিরকালই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা সংসারে থাকিয়া আত্মজয়ী হইতে পারিব না, সংসারের প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আত্মজয়ী হওয়া অসম্ভব। সংসারে এমন অনেকগুলি কার্য্য আছে, সংসারী হইয়া

আমরা কোনমতেই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি না। যদি সংসারে থাকিয়া আত্মজয়ী হওয়া সম্ভব হইত, তবে পৃথিবী এতদিন স্বর্গতুল্য হইত। দুঃখ কাহাকে বলে তাহার নামও শুনিতে পাইতাম না। সংসারে থাকিয়া আত্মজয়ী হওয়ার জন্য,—দুঃখ বিনাশ করিয়া শান্তি সংস্থাপন জন্য, বহুকাল হইতে কত যোগী, কত ঋষি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, জ্ঞানকাণ্ড, মুখ্যকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। কত বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেলের সৃষ্টি হইয়াছে। কত স্বাতন্ত্র্যতা, সবর্ণতা, বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কত নিরীশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতার অবতারণা হইয়াছে, কিছুতেই সংসারে ধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক হইল না। সুতরাং সংসারে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, আত্মজয়ী হওয়া অসম্ভব। হায়! তবে কি সংসার পরিত্যাগ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়? তাঁহার এই মনোহর নাট্যশালা ত্যাগ করিয়া কি মানব অরণ্যবাসী হইবে? সংসার পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যবাসী হইয়া যদি সকলেই সংসারের প্রলোভন জয় করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার এই সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে কি ইহাই মঙ্গলময় নিয়ম? অতএব আমরা সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিব না; অথচ সংসারে থাকিয়াও আত্মজয়ী হইতে পারিব না, সুতরাং এ সংসারে আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহা স্থির করা কঠিন। ভব সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া কখন যোগী হই, বৈরাগী হই, সংসারী হই, কিছুই বিচিত্র নহে। সুতরাং এ সংসারে নিন্দা, প্রশংসার কোন মূল্য নাই, এক অন্ধকার হইতে আর এক অন্ধকারে পড়িতেছি মাত্র। নৈসর্গিক নিয়মের অব্যভিচারিতায় দৃঢ় আস্থা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং জীবন সেই অনন্ত সুখ লালসার দিকে প্রধাবিত হইতেছে।

সত্য বটে, সমাজিক নিন্দা প্রশংসা দ্বারা আমাদের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, অনেক কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত বলিয়া অগ্রগণ্য হইতে নিয়তই যত্নশীল হই, তথাপি যাঁহারা সংসারে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সংসারে সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দায় ভীত, কি প্রশংসায় গর্ব্বিত হয়েন না। সংসারের অবশ্য করণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে নিন্দা, প্রশংসার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। সুতরাং নিন্দা প্রশংসা সাধারণের উন্নতি করিতে যতদূর অগ্রগণ্য, গুণিগণের নিকট তাহার আদর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ যে ঘোর অমানিশায় পরধনাপহারী দস্যু স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সহিত নির্জ্জন-স্পৃহ নিমিলিতনয়ন-ঈশ্বর-ধ্যান-নিরত মৌনীর উদ্দেশ্যের অবশ্যই তুলনা হইতে পারে, উভয়ের উদ্দেশ্যই আন্তরিক সুখোৎপাদন; কিন্তু ফল দুইটী বিভিন্ন শাখায় পরিণত হইয়াছে। সেই ফল সামাজিক কি প্রাকৃতিক তাহাও বলিতে চাই না। কিন্তু বহির্জ্জগৎ যে নিয়মের চক্রে ঘুরিতেছে, অন্তর্জগৎও যে সেই নিয়মচক্রে ঘুরিতেছে তাহাও অবধারিত সত্য। সুতরাং মানুষ জ্ঞানোন্নতির যে দিন চরমোৎকর্ষ সাধিত

করিবে, সে দিন তাহার বাহ্যিক দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং তৎপর এক সূক্ষ্ম জ্ঞানময় পদার্থ হইয়া জগতে কার্য্য করিতে থাকিবে, তাহার বিচিত্র কি? বিজ্ঞানবিদ্ টিন্‌ডল সাহেব বলিয়াছেন যে "যখন দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমায়ু কমিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না যে শরীরশূন্য জ্ঞানময় জীব সকল এ পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?"*

এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল মানব জীবন চির-প্রবাহমান কালসমুদ্রে নিপতিত হইয়া যে, অনন্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতেও স্রষ্টার সেই অনুলঙ্ঘনীয় নিয়মের অব্যভিচারীতারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।

সুতরাং " মানব নিয়মাধীন " একথা যখন মনে উদয় হয়, তখন হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষাদি অনিবার্য্য চিত্ত-বিকৃতি হইতে আমরা স্বতঃই মুক্ত হইতে প্রয়াস পাই। এবং আমাদের চিত্ত সাংসারিক কার্য্যাবলীর ঘাত, প্রতিঘাত দ্বারায় ব্যাকুলিত কি আনন্দিত হইতেও সহজেই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

তথাপি মানব স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছে। আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অনুভব করিতেছে। এই ভাব হইতেই লোক হৃদয়ে কুকার্য্য ও সৎকার্য্যজনিত যথাক্রমে আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ মনুষ্য যখন কোন বাহ্য প্রতিবন্ধক বশতঃ—স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে না পারে, তখনই সে আপনাকে পরাধীন বলিয়া জ্ঞান করে, এবং কোন বাহ্য প্রতিবন্ধক না থাকিলেও স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলেই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া বুঝিতে পারে, ইহাই স্ব স্ব ভাবানুবর্ত্তীতার ফল। পরন্তু ইহার মধ্যে এ ভাবটীও নিহিত আছে যে, আমরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পাই বলিয়া স্বাধীন অথচ স্ব স্ব প্রকৃতির অধীন।

অতএব এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলাপী সংসার-ক্ষেত্র অনন্ত সুখের পরিচায়ক। বহির্জ্জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ এক সূক্ষ্ম সূত্রে নিবদ্ধ। মানব অপূর্ণ হইয়া পূর্ণ সুখস্পৃহায় ব্যাকুল। এই অনন্ত সুখের নিদানভূত যে ঈশ্বর, আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং মানব অপূর্ণ হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য কেন না ব্যাকুল হইবে? জ্ঞানী, অজ্ঞান সমভাবে সৎ ও অসৎ এই উভয়-বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারায় তাঁহার এই মঙ্গলময় অভিপ্রায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঈশ্বরের এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় কি কি কার্য্য দ্বারায় প্রতিপালন করা যাইতে পারে, মানুষ আজও তাহা স্থির করিতে পারে নাই, আজও মনুষ্য ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই, আজও পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হইতে মানব বহু যোজন ব্যবধানে আছে। বাহ্য-জগৎ ও অন্তর্জ্জগতে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া উভয় জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে

*এই অনুবাদের সঙ্গে আমাদের দেশীয় ২।১টি কথার উল্লেখ করিলাম, "সত্যযুগে মজ্জাগতপ্রাণা ইত্যাদ্যুক্ত্যা, একবিংশতি হস্ত পরিমিত মানব দেহ। এইরূপ ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের লক্ষণ দেখ? ক্রমশঃই মনুষ্যদেহই খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে।

পারিলেই অনন্ত সুখ লাভের অধিকারী হইতে পারা যায়, কিন্তু সৃষ্টি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত এই উভয় জগতে কেহ সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিয়াছেন কিনা—জানি না—জানি না, অথচ মানব এরূপ আশা করিয়া থাকে এবং সকল কার্য্যেই তাহার এই আশার প্রতিকৃতি প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় দেখিতে পাই। বহুকালের আশা, বহুকালের চেষ্টায়, বহুযত্নে, বহুকালে যে সফল না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এবং এখনও অনেকে জীবন্মুক্ত হইয়া ভগবানের এই মঙ্গলময় ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইতেছেন।

শ্রীমনোমোহন দাসগুপ্ত।

———0———

সমালোচনা।

স্তুতি-পঞ্চকম্। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদেন-বিরচিতম্। মূল্য /০ এক আনা মাত্র। পুস্তক খানিতে শ্রীশ্রীসরস্বতী, শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীকালীদেবীর চারিটী স্তোত্র এবং শ্রীশ্রীক্রমদীশ্বর-শম্ভুনাথের একটী জয়মঙ্গল গীতি-স্তোত্র আছে। স্তোত্র গুলি সংস্কৃতে লিখিত—সরল ও সুললিত ছন্দে গ্রথিত।

নিত্য-জ্যোতিঃ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ||/০ দশ আনা মাত্র। লেখক আমাদের পরিচিত; তিনি যুক্ত-প্রদেশের বান্দার সরকারী উকিল ছিলেন, অল্প বয়সেই তাহা ছাড়িয়া কাশীধামে নিজবাটীতে বসিয়া অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতেছেন। গ্রন্থখানি তাহারই সুধাময়ফল—ভোগ-চিন্তাপ্রসূত নহে। গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ পদ্যে ও উত্তরার্দ্ধ গদ্যে লিখিত হইয়াছে। উভয় শ্রেণীর লেখাতেই লেখকের শুদ্ধচিত্তের সুচিন্তিত তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

মালঞ্চ। শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্য-তীর্থ-প্রণীত। মূল্য আটআনা মাত্র। মালঞ্চ একখানি কবিতা পুস্তক, ইহাতে অনেক-গুলি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ আছে। কতক-গুলি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাগুলি কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা বর্জ্জিত, পবিত্র স্বভাবের মধুরতা ও সত্যের পবিত্রতা মণ্ডিত। তবে দুই একটি প্রবন্ধে কালের প্রভাব অতিক্রম করে নাই।

প্রবন্ধাষ্টক। আসাম-গৌহাটি কটন কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত—মূল্য ||/০ দশআনা মাত্র। গ্রন্থকার এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই আটটী প্রবন্ধ অল্প অল্প সংশোধন করিয়া এই গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন; প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

জগদানন্দলহরী। পরিব্রাজক শ্রীমজ্জগদানন্দ স্বামী সময় সময় ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়া যে সকল গান গাহিতেন,

তাঁহার শিষ্যবর্গ তাহার কতকাংশ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা মাত্র। ভক্তের ভাববিবশ-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতগুলি সমালোচ্য নহে,—পরম আস্বাদ্য।

সঙ্গীত-কুসুমাঞ্জলী। শ্রীযুক্ত রাম-কমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ।৹ আট-আনা-মাত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কীর্ত্তন গাহিয়া বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজে ভক্ত—তাই তাঁহার সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে ভক্ত মোহিত হয়। রাঢ়—দক্ষিন-খণ্ডের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া স্বর্গীয় বড় রসিক দাসকে কেহ "কীর্ত্তনাচার্য্য" উপাধি প্রদান করেন নাই, কিন্তু ঢাকা জেলায় আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাগ্যে সে সম্মান ঘটিয়াছে। নামের পূর্ব্বে ঐরূপ উপাধি সংযুক্ত করিয়া কেহ কেহ তাঁহার কীর্ত্তনের সংবাদ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন,—আমাদের পরমারাধ্য পরমহংসদেবও তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, সেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত ও প্রকাশিত সঙ্গীত-পুস্তকখানি পাইয়া আমরা সমধিক আনন্দিত হইলাম। "মা" নামের গানগুলি তুলনা রহিত—মায়ের নিকট প্রার্থনা বালকের আব্দারের ন্যায় সরলতামাখা। হরি-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি সুললিত ও ভক্তিপূর্ণ। রহস্যমূলক সামাজিক গান-গুলিও সময়োপযোগী। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য লেখকের গভীর দুঃখ অনেক সঙ্গীতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনের ভাব বাহির হইয়াছে সঙ্গীতগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা নিম্নে একটী উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনার উপসংহার করিলাম।—

আলেয়ামিশ্র—কাশ্মিরী।

থাকিয়ে থাকিয়ে জাগিয়ে উঠে, পূরবকাহিনী
পরাণে হায়।
কত কাল তাহা গিয়াছি ভুলিয়া, তবু তো সে
কথা ভুলা নাহি যায়॥
বসি সরস্বতী নদীর তীরেতে, উদাত্তানুদাত্ত
স্বরিত স্বরেতে,
উঠায়ে সুতান গাহিত যে গান, ছড়ায়ে পড়িত
ভুবন গায়॥
বেদগাথা গান গাহিত যখন, নাচিত চন্দ্র
নাচিত তপন,
নাচিত পিতৃ দেব ঋষিগণ, নাচিয়ে উঠিত
জগত তায়;—
নাচিয়ে তটিনী যাইত ছুটিয়ে, দুকূল ঝাঁপিয়ে
আকুল প্রায়॥
সকল বিশ্ব স্তব্ধ করিয়ে প্রণব ঝঙ্কার উঠিত নাচিয়ে
ঘুমান শক্তি চকিতে জাগিয়ে, যাইত ছুটিয়ে
মিলনাশায়;—
ভক্তি মুক্তি পড়িত লুটিয়া, আসিয়ে ঋষির
যুগল পায়॥
ভূদেব ব্রাহ্মণে ত্রিদিবে পূজিত, বিধি-বিষ্ণু-
শিব মানিয়ে চলিত,
ভুবন মঙ্গল বারতা গাহিত, থাকিত আত্ম-
সাধনায়;—
স্বার্থশূন্য বিশাল পরাণ, দুলিত বিশ্ব-প্রেমের বায়
এই কিরে মোরা তাঁদের তনয়, ভাবে অনুমানি
তাঁদের ত'নয়,
তাদের হইলে এমন কি হয়, সে সব স্বভাব
গেল কোথায়,—
সকল হারায়ে, কাঙ্গাল সাজিয়ে, শিখেছি
লুটিয়ে পড়িতে পায়।
এ দশা হইতে মরণ মঙ্গল, দ্বিজ রামকমল গায়

সাধনা ও সিদ্ধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাধক অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিভরে গ্রীবাদেশ সন্নমিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "কে মা আপনি ?"

দেবী মৃদুমধুর হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি যার উপাসনা করিতেছ। বৎস ! আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, তোমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তুমি জপ সমর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা কর।"

ভক্ত বলিলেন, "মা আপনার মূর্ত্তি যে আমার গুরূপদিষ্ট ধ্যেয় মূর্ত্তির সঙ্গে মিলিতেছেনা।"

দেবী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় করুণনয়নে চাহিয়া বলিলেন, "বৎস ! সে মূর্ত্তি দেখিলে তুমি ভয় পাইতে, তাই আমি তত্ত্বময়ী না হইয়া তোমার নিকট ভাবময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছি। যদি তুমি সে মূর্ত্তি দেখিতে চাও, পরে তাহা দেখাইব।"

সাধক বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। মরি মরি দেবী রমণী মূর্ত্তিতে কি মনোরমাঙ্গী, নবযৌবনা কুমারী, তাঁহার দেহকান্তি স্ফটিকের ন্যায়, কিন্তু রক্তবস্ত্র পরিধান করায় দাড়িম্বী কুসুমের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। রক্তোৎপল সদৃশ পদতল—অলক্তক রাগে রঞ্জিত, স্বর্ণ নুপুর মৃদুমন্দ শব্দে ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। ঘন জঘন—নিবিড় নিতম্ব, কটিতটে শব্দায়মান কিঙ্কিনী দাম। স্বর্ণ ও কাঞ্চি ভূষণ শব্দিত হইতেছে। বিশাল উরসে মুক্তাহার বিরাজ করিতেছে, কণ্ঠদেশে অমূল্য মণিখচিত কণ্ঠাভরণ শোভা পাইতেছে। বাহুতে কেয়ূর, করে কনক বলয়, হস্তে বরাভয়। তাঁহার মুখমণ্ডল কর্পূরপূর্ণ তাম্বুলের দ্বারা পরিপূরিত, দীপ্তিশালী কনকতাটঙ্ক দ্বারা বদনমণ্ডল পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, অতি শ্বেতবর্ণ বালকেতকপত্রের উপর সংশোভিত ভ্রমরের ন্যায় কর্ণ ও কপোল মধ্যবর্ত্তী কেশরাশি শোভা পাইতেছে, ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত, অধরবিম্ব অতি মনোহর, দশনাগ্র কুন্দপুষ্পের মুকুলের ন্যায় রমণীয়, কর্ণে চন্দ্ররেখার ন্যায় কর্ণভূষণ, নাসিকা উন্নত, নয়ন রক্তারবিন্দ সদৃশ, ভ্রূযুগল আয়ত, ললাটে সিন্দুর বিন্দু বিভূষিত, নিতম্বচুম্বিত তরঙ্গায়িত নিবিড় কৃষ্ণ কেশজাল মল্লিকা ও মালতীমালায় সুশোভিত এবং তদুপরি মণিখচিত মুকুট। সেই জগজ্জন-মনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্ত কৃতার্থ হইলেন। তদনন্তর দেবীর সেই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবারাধ্যা অতুল রাতুল চরণে ভক্ত জপ-সমর্পণপূর্ব্বক মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "মা ! দীন সন্তানের মাথায় চরণ দিন।"

দেবী হংসীর ন্যায় গ্রীবা বক্র করিলেন, কর্ণভূষণ মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল; তিনি ঈষৎ হেলিয়া বাম চরণ খানি উত্তোলন করতঃ ভক্তের শিরে ধীরে ধারণ করিলেন। মরি—মরি তখন তথায় না জানি কি শোভা ফুটিয়াছিল, দেবতারাও বুঝি উঁকি মারিয়া

সে মাধুরী দেখিয়াছিলেন ! ভক্ত ভগবানের এ মিলন—এ মধুর দৃশ্য দেবতার ভাগ্যে বুঝি ঘটে না !!

দেবী পদ নামাইয়া লইয়া প্রসন্নবদনে হাস্যমুখে বলিলেন, "বর লও বৎস !" ভক্ত বলিলেন, কি বর লইব মা ! আমি যে তোমাকে চাই।"

মত্ত কোকিলবৎ মধুরধ্বনি দেবী মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আমি সর্ব্বদাই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু এবং বরদাত্রী, তোমার বাঞ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। আমি তোমাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছি, এক্ষণে সাধনার ফলস্বরূপ বর গ্রহণ কর।"

ভক্ত বলিলেন,—"আপনি প্রেমপূর্ণা হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যেমন দর্শন দান করিলেন, সেইরূপ কৃপা করিয়া বলুন, আপনি কে,— সর্ব্ব বেদান্তপ্রসিদ্ধ আপনার স্বরূপ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পরন্তু শ্রুতিসম্মত জ্ঞান ও ভক্তিযোগ বলুন, যাহা শ্রবণে আমি আপনার সহিত অভিন্নতা লাভে সমর্থ হই। তত্ত্বজ্ঞান লাভই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বর চাহি না।"

পরমেশ্বরী ভক্তের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "বৎস ! যে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ মাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারে, সেই বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবিহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম। আমার আত্ম-স্বরূপকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্য আত্ম-স্বরূপ শ্রুতিগোচর পদার্থ, তাহা অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়। পরন্তু শ্রুতিও আত্মপদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদি দ্বারা নির্দ্দেশে সমর্থ নন, তাই আত্মতত্ত্ব অনির্দ্দেশ্য এবং তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ উপমারহিত ও জন্ম মরণাদি ষড়ভাব-বিকাশশূন্য পদার্থ। এই আত্মার স্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে, তিনি মায়া নামে বিখ্যাত। সেই মায়া ব্রহ্মের ন্যায় কালত্রয়বর্ত্তিনী নহে, কারণ আত্মজ্ঞান হইলেই ইহার বিলয় হইয়া থাকে। আবার বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় অসৎ পদার্থও নহে, কারণ জগদুপাদানরূপে সর্ব্বদাই ইহার সত্ত্বা অনুভূত হইতেছে। পরন্তু ইহাকে সত্ত্বাসত্ত্বরূপবিশিষ্ট বস্তু বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ, সত্ত্বাসত্ত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একদ্রব্যে একদা থাকিতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, অসত্ত্ব, এবং সত্ত্বাসত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ কোন অনির্ব্বচনীয় অনাদি বস্তু মায়া নামে বিখ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের মরীচি এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না তত্তৎ-সহজাত, তেমনি মায়াও আত্মার সহজা এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়িনী। যেমন দৈনন্দিন সুষুপ্তি অবস্থায় কর্ম্মাদি সমস্তই বিলীন অবস্থায় থাকে, সেই প্রকার প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম, জীব ও কাল ইহারা মায়ায় বিলীন হইয়া যায়, তৎপর প্রলয়াবসানে জীবের কর্ম্মানুসারে আমি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকি। জীবসকল কর্ম্মবশতঃই এই প্রকার ফলভোগী হয়, অতএব আমার কোনই বৈষম্যাদি দোষ নাই।

বৎস ! আমি নির্গুণা হইয়াও তাদৃশী মায়া-সমাযোগবশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত

হইতেছি। কিন্তু এই মায়াই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার এই মায়া-শক্তি চৈতন্যসহযোগে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, অতএব আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান কারণ। এই প্রকারে এক আমিই অংশ দ্বয়ের দ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি। আমার এই মায়াকে প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি, অজা প্রভৃতি নামে অভিহিত করে, আর বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ মনীষিগণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে নিগমাদি শাস্ত্রে ইহার বিবিধ নাম কীর্ত্তিত হইলেও এই পদার্থটী জড় এবং অসৎ। যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ, তাহাই জড়, এই প্রকার অনুমান প্রমাণ দ্বারা দৃশ্যা মায়ারও জড়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেমন ঘট-পটাদি দৃশ্য, অতএব জড়, মায়াও তাদৃশী জড়াত্মিকা, ইহা বুঝিতে হইবে। আমার যখন তত্ত্বজ্ঞান বিজৃম্ভিত হয়, তখন মায়ার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; অতএব মায়াকে প্রকৃত সত্ত্বাশালী পদার্থও বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্য দৃশ্য পদার্থ নহেন, অতএব তাহাকে জড় বলা যায় না। যদি চৈতন্য দৃশ্য হইতেন, তবে তাহারাও জড়ত্ব প্রসক্ত হইত। চৈতন্য স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। কারণ, চৈতন্য অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ইহা স্বীকার করিলে চৈতন্য-প্রকাশক আবার অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সে আবার অন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, এই প্রকারে অনবস্থা দোষ সংঘটিত হয়, স্বয়ং-প্রকাশ পদার্থের স্থিরতা হয় না, আবার চৈতন্য নিজে নিজের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েন, ইহাও বলা যায় না, কারণ, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তার বিরোধ হয়, এক পদার্থেই এককালে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব থাকিতে পারে না, অতএব দীপের ন্যায় চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে।

চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ হইয়াই অন্য চন্দ্র সূর্য্যাদি পদার্থকে প্রকাশ করেন, অতএব আমার সংবিৎরূপ তনুর (চিন্ময় বিগ্রহের) নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় পদার্থের ব্যভিচার হইতেছে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই সংবিৎ চৈতন্যের ব্যভিচার অনুভূত হইতেছে না, কারণ যে আমি জাগ্রত অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভব করিতেছি, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা চৈতন্যের সত্ত্বা সর্ব্ব অবস্থায় এক প্রকার অনুভূত হইতেছে। কোন কোন বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া থাকেন যে, সংবিদেরও অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব যাহা সৎ, তাহাই ক্ষণিক, এই প্রকার অনুমান দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যতা প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তাহা ভ্রান্তিমূলক, কারণ, যদিও সংবিৎ বা জ্ঞানরূপের অভাব অনুভূত হয়, তথাপি যে সাক্ষী দ্বারা সেই অভাবের অনুভব হয়, সেই সংবিৎরূপ সাক্ষীর অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা সংবিদের অভাব গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অতএব সংবিদের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। পরন্তু সংবিৎ পরমপ্রেমাস্পদ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন উহাকে সুখস্বরূপ

স্বীকার করিতে হইবে; কারণ অসুখকর পদার্থ কখনই প্রেমাস্পদ হইতে পারে না। কিন্তু আত্মবিষয়ক প্রেম সকলেরই অনুভাব্য বিষয়, আমার যেন অভাব হয় না, আমি যেন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকি; আত্মাতে এতাদৃশ প্রেম সর্ব্বদায় অবস্থিত রহিয়াছে। পরন্তু অন্য সমস্ত পদার্থই মায়াকল্পিত, সুতরাং রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় উহা মিথ্যা। অতএব রজ্জুতে কল্পিত সর্পের যে প্রকার সম্বন্ধ হয় না, তৈমতি মিথ্যাভূত প্রপঞ্চের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মা অসঙ্গ, ইহা সুব্যক্তরূপেই স্থিরীকৃত হইল এবং পরিচ্ছেদক সকল পদার্থই যখন মিথ্যা, তখন আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্বও সকলেরই সম্মত। যদি কেহ বলে; আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহে; কিন্তু জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ জ্ঞান যদি আত্মার ধর্ম্ম হয়, তবে আত্মার জড়ত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানাতিরিক্ত সকল পদার্থই জড়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে। পরন্তু জ্ঞানের জড়ত্ব কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা সম্ভবপরও নহে এবং আত্মা যখন চিৎ স্বরূপ, তখন চিৎ তাঁহার ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু চিৎ চিৎ হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতীতি হয় না। অতএব সর্ব্বদাই আত্মা জ্ঞান ও সুখস্বরূপ এবং সত্য, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতবর্জ্জিত। ইনি ইচ্ছা, অদৃষ্ট ও জীবযুক্ত স্বীয় মায়া দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সংস্কারবশতঃ কর্ম্মের বিপাক অনুসারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাবান্ হয়েন। প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেকজনিতই এই প্রকার সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে। বৎস! সুপ্ত পুরুষ যেমন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক নিদ্রোত্থিত হয়, তেমনি আত্মার এই সৃষ্টিও কালকর্ম্ম-সংস্কারবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বকই সংসাধিত হইয়া থাকে।

বৎস! আমি তোমার নিকট যে মদীয় লোকাতীত রূপের বর্ণনা করিলাম, ইহাই বেদে অব্যাকৃত, অব্যক্ত, মায়াশবল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের আদিভূত এবং সর্ব্বদানন্দ মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই আদিভূত তত্ত্ব প্রণব বা হ্রীঁকার মন্ত্রবাচ্য; ইহাতে সর্ব্ব প্রাণীর কর্ম্ম সমুদায় ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ—ইনিই সর্ব্বসাক্ষী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার আশ্রয়।

এই হ্রীঁকারবাচ্য আদিতত্ত্ব আত্মা হইতে ক্রমে শব্দ তন্মাত্ররূপ আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, বায়ু হইতে রূপাত্মক তেজ; তেজ তেজ হইতে রসাত্মক জল এবং জল হইতে গন্ধাত্মিকা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মভূত হইতে ব্যাপক সূত্র উৎপন্ন হয়; ইহাকে লিঙ্গদেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বাত্মক, ইহা আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা তাহা পরমাত্মা'র কারণ-দেহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই কারণদেহেই জগদুৎপত্তির বীজ নিহিত আছে এবং ইহা হইতেই লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চীকরণ প্রণালী অনুসারে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য বিরাট্ দেহ, ইহাই পরমাত্মার

স্থূল দেহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! ইতি-পূর্ব্বে আপনি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তির কথা বলিলেন, কিন্তু আমি শুনিয়াছি সপ্তদশ পদার্থের সমষ্টিতে লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন।"

দেবী হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন,—বৎস! এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতেই সপ্তদশ পদার্থের সমষ্টি লিঙ্গদেহ উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বাংশ মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের উৎপত্তি করে। এই অন্তঃকরণ এক পদার্থ হইলেও বৃত্তির তারতম্যানুসারে চতুর্ভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম মন, সংশয়হীন নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মক-বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম চিত্ত, এবং অভিমানাত্মক-বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার। আর পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজোংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং তাহাদের রজোংশ প্রত্যেকে মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর উৎপাদন করে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীরের উৎপত্তি হয়।

বৎস! আমার দেহত্রয়ের উৎপত্তি কারণ বলিলাম, এক্ষণে জীবেশ্বর বিভেদের কারণ বলিতেছি,—পূর্ব্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহা দুইভাগে বিভক্ত। সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতিকে মায়া ও মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করে না, এই মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। ইহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না, ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। আর অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্ব্বদুঃখের আশ্রয়। এই ঈশ্বর ও জীবের যথাক্রমে মায়া ও অবিদ্যাজনিত পূর্ব্বোক্ত দেহত্রয়াভিমান বশতঃ তিনটী নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণদেহাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ, সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীব তৈজস এবং স্থূল দেহাভিমানী জীব বিশ্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার ঈশ্বর ও কারণ-দেহাভিমানী হইয়া বিরাট নামে কথিত হয়েন। পরন্তু জীব ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টি দেহত্রয়াভিমানী, সুতরাং ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব দ্বারা নিত্য তৃপ্ত হইয়াও জীবগণের মুক্তি হইবে, এই ইচ্ছা বশতঃ নানাবিধ ভোগাশ্রয় এই বিশ্ব রচনা করেন এই কারণে তাহাকে করুণাসাগর বলে! বৎস! এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়া-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব রচনা করিয়া থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্জুতে সর্পবৎ ব্রহ্মরূপিণী আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাকেও আমারই শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে। এই চরাচর জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই মায়াশক্তি পরমার্থ-দৃষ্টিতে মদ্‌ব্যতিরিক্ত কোন অন্য পদার্থ নহে, কারণ,

সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে, উহা মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং আশ্রয়ের সত্বাতিরিক্ত মিথ্যা পদার্থের স্বতন্ত্র সত্বা নাই, সুতরাং পরমার্থকল্পে একমাত্র আমিই আছি, অন্য কোন পদার্থই প্রকৃত সত্বাশালী নহে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহা মায়া বিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে কথিতা হয় সত্য, কিন্তু তত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না; তখন একমাত্র তত্ব বা ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন।

বৎস! কূটস্থ ব্রহ্মরূপিন আমিই মায়া, অবিদ্যা এবং নানা সংস্কারের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এই অনন্ত জগৎ সৃষ্ট করতঃ প্রাণের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকি। আমি প্রাণাভিমানিনী হইয়া প্রবেশ করি, এই নিমিত্তই লোকান্তর গতি হইয়া থাকে, নচেৎ ব্যাপিকা আমার লোকান্তর গমন কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিককল্পে প্রাণেরই পরলোক গমনাদি হইয়া থাকে। পরন্তু আকাশ যেমন এক হইয়াও ঘটাদি উপাধি ভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আমিও মায়া দ্বারা নানারূপে বিরাজ করিয়া থাকি। যেমন সূর্য্য উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বিবিধ বস্তুকে আপন কিরণমালা দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া দূষিত হয়েন না, সেই প্রকার আমি জগদন্তঃপাতিনী হইয়াও জগদ্দোষে দূষিতা হই না। যাহারা বিমুগ্ধ, তাহারাই বুদ্ধ্যাদির কর্তৃত্ব আমাতে আরোপিত করিয়া, আত্মস্বরূপিনী আমি কর্ত্তা, এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা আমাকে সূর্য্যবৎ সাক্ষীরূপেই দেখিতে পান, সুতরাং আমাকে কর্ত্রী বলিয়া মনে করেন না।

বৎস! যেমন মায়া দ্বারা জীবেশ্বরের বিভাগ হইয়া থাকে, তেমন মায়া দ্বারাই ঈশ্বরের ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাদিরূপ বহুত্ব এবং অবিদ্যা দ্বারা মনুষ্য পশ্বাদি রূপে জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত অবিদ্যাই জীবভেদের কারণ এবং সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক বাসনা দ্বারা ভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদের কারণ, বাস্তবিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বরের বহুত্ব নাই। অতএব এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং আমিই কারণ দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল দেহাভিমানী বিরাট নামে অভিহিত।

আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীশক্তি, আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই তারকা, এবং আমিই পশু, পক্ষী, আমিই পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক, আমিই সাধু, আমিই ব্যাধ, সুতরাং আমিই তুমি তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎস! যে কোন দেশে যে কোন বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত বস্তুই পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহার অন্তর ও বাহিরে অবস্থিতা রহিয়াছি। আমি ব্যতীত এই চরাচরে আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র সদৃশ অসৎ। যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদি রূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপিনী একমাত্র আমিই ঈশ্বরাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। কল্পিত কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত সত্বা নাই, অতএব আমাতে কল্পিত এই

জগৎ এবং জগদন্তবর্ত্তী তুমিও আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান হইয়া থাক, এতদ্ব্যতীত তোমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বেদান্তাদি শাস্ত্রে আমার তত্ত্ব এইরূপে নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি তোমার কল্পিত নাম, রূপ, উপাধি মিথ্যা; সুতরাং তোমার স্বতন্ত্র সত্তাও মিথ্যা জানিয়া আমার স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক শাশ্বতী গতি ও পরাশান্তি প্রাপ্ত হও।

ভক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার কৃপায় দাস কৃতার্থ হইয়াছে, আমার সকল সন্দেহ অপনোদন হইয়াছে। এক্ষণে জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া কিরূপে জীব তোমার স্বারূপ্য লাভ করিতে পারিবে সবিস্তার তাহা বিবৃত কর।

দেবী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—আমার কৃপা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন, যোগ, দান, তপস্যা কিম্বা যজ্ঞ, ইহার কোন সাধন দ্বারাই কোন ব্যক্তি আমার তত্ত্ব অবগত হইয়া আমার স্বারূপ্য লাভ করিতে পারে না। এই মায়াময় সংসারে পরমাত্মাই উপাধি যোগ বশতঃ জীবত্ব এবং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাবিধ যোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন। পুনরপি সেই সুখ দুঃখের সংস্কার বশতঃ নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানা দেহ প্রাপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ দ্বারা সংযুক্ত হয়েন। ঘটিযন্ত্রের ন্যায় জন্ম-জরা-মরণ রূপ এই সংসারের কদাপি বিরাম হয় না। ইহা অনাদি ও অনন্ত কাল হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল, ইহা হইতে কাম ও কাম হইতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞান নাশের নিমিত্ত সততই মানব যত্নপর হইবে। এই অজ্ঞান নাশ করিতে পারিলেই স্বারূপ্য লাভ হইল—জন্মের সাফল্য হইল।

বৎস! এই অজ্ঞান নাশ করিতে একমাত্র জ্ঞানরূপিনী আমিই সমর্থা। যেমন অন্ধকার অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার অজ্ঞানজনিত কর্ম্ম অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে না, এবং সাধনাও কর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং তদ্দ্বারাও অজ্ঞান নাশের সম্ভব নাই, অতএব কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞান নাশ বিষয়ে কদাচ আশা করিও না। কর্ম্ম সকল একান্ত অনর্থকর, এই কর্ম্মবশেই জীবগণ পুনঃ পুনঃ বিষয়কামনা করে, এই কামনা হইতে বিষয়ানুরাগ, অনুরাগ হইতে ক্রোধাদি দোষ এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে মানবগণের যত্নকরা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত।

দীন—চিদানন্দ।

——:0:——

আশ্রম।

আশ্রম নামটী কতই পবিত্রতা মাখান! উহার প্রত্যেক অক্ষরে যেন পবিত্রতা ক্ষরিত হইতেছে। ধন্য আর্য্যঋষিগণ! ধন্য হিন্দু! শত ধন্য তোমাদের প্রতিভায়! আশ্রম বলিতেই তোমাদিগকে মনে পড়ে। তোমরা বাস্তবিকই স্বর্গীয়। তাই তোমাদের প্রত্যেক বিষয়ই স্বর্গীয় বিমল কিরণে, বিমল পবিত্রতায় অভিষিক্ত। তোমরা এত হৃদয়ভরা ভাবরাশি কোথায় পাইয়াছিলে? তোমরা সেই আনন্দের আনন্দ, পবিত্রতার পবিত্রতা পরম পদার্থ—সচ্চিদানন্দ-স্পর্শমণিসংযোগে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাই তোমাদের মধ্যে এত পবিত্রতা,—এত মহত্ত্ব। তোমরা যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতেই সেই ভাবরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাই পবিত্রতায় এবং মহত্বে অটুট ও অবিনশ্বর হইয়া গিয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম্ম আজ যুগান্ত-ব্যাপী ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই হিন্দুর জীবনযাপনের প্রথা এবং বিভাগ—আশ্রম। কাজেকাজেই ইহাতেও পবিত্রতা এবং মাধুর্য্য না থাকিবে কেন? আজ, কালের কুটিলগতিতে হিন্দুর সেই পবিত্র 'আশ্রম' শব্দের অপব্যবহার হইতেছে। আজকাল 'আশ্রম' বলিলে পূর্ব্বকার আর্য্যঋষিগণের সেই পবিত্রতাপূর্ণ জীবন-কালের অবস্থাবিশেষ জ্ঞাপনকরা দূরে থাক্, ভয়ানক কুরুচিপূর্ণ অপবিত্রতার উদ্রেক হয়।

পুরাকালে আর্য্যগণ জ্ঞানের অমল ধবল স্তরে উঠিয়া পবিত্র মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব,—মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব—এমন কি ব্রহ্মত্ব লাভের উপায় নিরাকরণ পূর্ব্বক, স্ব স্ব সমাজের হিতকল্পে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম-সংযমবিশিষ্ট, জীবন অতিবাহিত করিবার প্রণালী স্থির করিয়া আশ্রম আখ্যা দিয়াছিলেন; যথা, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ঐ সকল আশ্রমে থাকিয়া, অর্থাৎ অধিকার ভেদে ঐ সকল আশ্রমোচিত নিয়মাদি পালন করিয়া তাহারা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেন। ঐসকল আশ্রম এরূপ শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংস্কৃত যে একটু ভাবিয়া দেখিলেই উহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

বাল্যকালে উপযুক্ত বয়সে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুরু সকাশে মনুষ্যজীবনোচিত শিক্ষাদীক্ষাদি লাভ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মগুলি এমন সুন্দর যে ঐ গুলি পালন করিলে মানুষ সবল, সুস্থকায়, জ্ঞানী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া সমস্ত জীবন কি ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা 'হাতে কলমে' হইয়া থাকে। হাতে কলমে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার ন্যায় "পুস্তকস্থ" থাকিয়া 'কার্য্যকালে' অপ্রয়োজনীয় হওয়ার ন্যায় নহে। কারণ আজকালকার ঐ রূপ 'শিক্ষিত' নাম-ধারী যুবকগণকে স্কুল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে হয়। তখন

তাহাদের শিক্ষার সময় কোথায়? তৎপূর্ব্বেই তাহারা হয় ত পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া গোষ্ঠীপতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীষণ সংসার রূপ যুদ্ধক্ষেত্র তাহার সম্মুখে, সুতরাং তাহাদিগের তৎকালীন অবস্থা অনায়াসেই বোধগম্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যুদ্ধশিক্ষাক্ষেত্র আর সংসার সংগ্রামস্থল। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যরূপ যুদ্ধ শিক্ষা করতঃ সংসার রূপ সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার ব্যবস্থা ছিল; তাই তাঁহারা সংসারেও বীরত্ব দেখাইয়া বিপুল যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন। আর আজকাল যুদ্ধ শিক্ষা না করিয়া যোদ্ধা সাজেন, কাজেই সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবনভরা দুঃখ জ্বালা সহিয়া হা হুতাশে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। এই ত গেল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এখন;—

গৃহস্থাশ্রম।

আজকাল সকলেই গৃহী হইবার গর্ব্ব রাখেন এবং মুন্সিয়ানা চালে বলিয়া থাকেন—আমরা জনকের ন্যায় গৃহে থাকিয়া কি ধর্ম্মলাভ করিতে পারিব না? তাহাদের জানা উচিত ছিল যে জনক রাজাকে নির্লিপ্ত গৃহী হইবার পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া উগ্র তপস্যা করিতে হইয়াছিল। সংযমী সম্ভোগী হইতে পারে, কিন্তু সম্ভোগী কখনই সংযমী হইতে পারে না। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কিরূপ প্রয়োজনীয়তা তাহা বোধ-হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আজকাল দেখা যায়, যাহারা "জনকের" ন্যায় গৃহী, তাহারা কিরূপ সংযমী এবং সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন! বর্ত্তমানকালের গৃহস্থাশ্রম ভোজনালয় ও শয়নাগারের সমবায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুরু মহারাজ বলেন—"এখন আর "গৃহস্থাশ্রম" নাই, 'আশ্রম' এই পবিত্র শব্দ, বর্ত্তমান সময়ে 'গৃহস্থ' শব্দের সঙ্গে আর যোগ করা যায় না। এখন কেবল কুকুর-শিয়ালের সংসার হইয়াছে।" এখনকার গৃহীরা কেবল কায়-ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করে,—অগণন বংশ বৃদ্ধি করে, অতিকষ্টে উদর পূর্ত্তি করে,—আর অকালে কালকবলে পতিত হয়। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রোগে, শোকে ও দারিদ্র্যে গৃহী মাত্রেরই পঞ্জরাস্থিচূর্ণ; সুতরাং আজকাল-কার সংসারকে একটী বীভৎস ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার পুরাকালের দিকে চাহিয়া দেখ,—শাস্ত্রাদি পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর, দেখিবে তাঁহারা কেমন সুখে,—কেমন আনন্দে,—কেমন শান্তিতে এই গৃহস্থাশ্রমেই কালাতিপাত করিয়াছেন; আর নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অমল জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া অন্তিমে পরাশান্তি লাভ করিতেন তাঁহারা পরার্থে সর্ব্বস্ব, এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত হাসিমুখে উৎসর্গ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতিথিসেবা, সর্ব্বভূতে নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি মহাব্রতে তাঁহাদিগের জীবন অতিবাহিত হইত; সুতরাং তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা কত পবিত্র ও মধুর ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্যাশ্রম উদ্‌যাপন করতঃ—

বানপ্রস্থাশ্রম

অবলম্বন করিতেন;—অর্থাৎ কর্ম্মময় জীবনের ফল স্বরূপ পরাশান্তি লাভেচ্ছায় সকল বৈষয়িক কর্ম্মত্যাগ করতঃ পবিত্র জ্ঞান-চর্চ্চায় নির্জ্জনে কালাতিবাহিত করিতেন। এখন আর সেদিন নাই, ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপ ভিত্তির অভাবে প্রকৃত গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রম ভারত হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন কেবল মাত্র ধর্ম্মপ্রাণ বালকদিগকে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন কোন বৃদ্ধ গৃহী বলিয়া থাকেন "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" সুতরাং বৃদ্ধ হলে ধর্ম্মকর্ম্ম করিও। এখন তোমরা বালক, এবয়সে ওসব ভাল দেখায় না।" কিন্তু ঐরূপ বিজ্ঞ উপদেষ্টা-দিগের যে পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সে বিষয়ে তাহাদিগের আদৌ খেয়াল নাই; অন্যদিকে তাহারা একথাও ভুলিয়া গিয়াছেন যে "কেশেষু গৃহীত্বাইব মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।" তাহারা ভ্রমেও নিজের অবস্থা বুঝিতে পারেন না। সংসার ত্যাগকরা দূরে থাকুক, দিন দিন সংসারকে বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলেন—যে একদা তিনি দেখিতে পাইলেন, যে, একটী লোক ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়াছে. বাঘ উহাকে যতই বনের দিকে টানিয়া নিতেছিল, লোকটীও ততই সম্মুখস্থ বৃক্ষলতা সবলে জড়াইয়া ধরিতেছিল,। ঐ সকল বৃদ্ধও তদ্রূপ, যতই কালের করাল কবলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, ততই সংসার প্রাণরক্ষক ভাবিয়া আকড়াইয়া ধরিতেছে। এই ত আজকাল বানপ্রস্থাবলম্বীর অবস্থা; এক্ষণে—

সন্ন্যাসাশ্রম

সম্বন্ধে আলোচনা করতঃ প্রস্তাবিত প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। এখন অন্যান্য আশ্রমের যে দশা সন্ন্যাসেরও তদ্রূপ। এক্ষণে যত অজ্ঞান, অক্ষম, গোয়াড়গোবিন্দ সাধু সাজিয়া সন্ন্যাসের নামে কলঙ্ক আনিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, সংসার ও বানপ্রস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম সমাধানান্তে পবিত্র মোক্ষমূলক সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত হওয়া যায়। অধিক শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন নাই, কি উদ্দেশ্যে পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা হইত, তাহা, আধুনিক যুগের বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ-দেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সন্ন্যাসগ্রহণের প্রকৃত এবং মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, নিজকে "আমিত্বের" সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া ফেলা, অর্থাৎ পরার্থে আত্মোৎসর্গ করা। বহুজন সুখায়চ, বহুজন হিতায়চ, তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁহার মূলমন্ত্র "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

অতএব "আশ্রম" শব্দ কিরূপ পবিত্রতা-ব্যঞ্জক ও স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ ছিল, একটু স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আজ, কালের কঠোর পরিবর্ত্তনে 'আশ্রম' বলিলে আর পবিত্রতা বুঝায় না। এই পবিত্র 'আশ্রম' শব্দের কিরূপ অপব্যবহার হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে যুগপৎ দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আজকাল সহর বাজারে অতীব ঘৃণাকারজনক, দুর্গন্ধ-পূর্ণ, মদ্য, মাংস ও অন্ন বিক্রয়ের স্থান অর্থাৎ "হোটেল" অর্থেও "আশ্রম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া "আশ্রমের" গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে! ইহা অপেক্ষা আর্য্য ঋষিগণের সম্মানহানিকর বিষয় আর কি আছে? হিন্দু! ইহাও কি তুমি নীরবে সহ্য করিবে?

ওঁ শান্তি ওঁ!

দীন সুরেন্দ্রনাথ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব—গত ১৫ই বৈশাখ অক্ষয়া-তৃতীয়া দিবসে অত্র শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের আসামপ্রদেশীয় সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ৭ম বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ১৫ই হইতে ১৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু ব্রহ্মের পূজা, হোম, গীতা, চণ্ডী ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং নাম-যজ্ঞাদি বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুদূর বগুড়া, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিং হইতে ভক্তগণ সমাগত হইয়াছিলেন। যোরহাট হইতে একদল ভদ্র—ভক্তমণ্ডলী একমাইল দূরবর্ত্তী শান্তি আশ্রম ষ্টেশন হইতে ৺নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ১৫ই বৈশাখ প্রাতঃ-কালে পদব্রজে অত্র মঠে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনবরত নাম গানে উপস্থিতভক্তমণ্ডলীর পরম পরিতোষ উৎপাদন করেন। তাঁহাদিগের আগমনে. উৎসবের পূর্ণতা সম্পাদিত ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হোম, পূজা ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ নির্ম্মাল্য, ও যজ্ঞীয় ফোটা ধারণ করেন, পরে পরম পরিতোষের সহিত ফল, মূল, খিঁচুরী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়া যথাস্থানে গমন করেন।

আমরা সংবাদ পাইয়াছি, বগুড়ার ভক্তবৃন্দ উক্ত উৎসবোপলক্ষে অক্ষয়াতৃতীয়া দিবসে তথায় পূজা, ভোগ, আরত্রিকাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং ৺নাম সংকীর্ত্তনাদি করিয়া-ছিলেন। মঠের উৎসব স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের ঈদৃশ শুভানুষ্ঠান যে ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা কৃতজ্ঞান্তঃকরণে পরমপিতার নিকট তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

———0———

শঙ্করোৎসব।—১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্লাপঞ্চমীতিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অত্র মঠে হোম, পূজা, আরত্রিক ও গীতা, চণ্ডী ও স্তোত্রাদি পাঠ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত উৎসবের আনুসঙ্গিক হওয়ায় দূরাগত ভক্তবৃন্দ এই উৎসবেও যোগদান করিবার অবসর পাইয়াছিলেন সুতরাং শঙ্করোৎসবও বিশিষ্ট-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও উক্ত দিবসে শঙ্কর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গ-বাসীর গৃহে এরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নূতন। বঙ্গবাসী যে জ্ঞানাবতার জগদ্গুরু শঙ্করা-চার্য্যের আদর করিতে শিখিতেছেন তাহা স্মরণ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী মহারাজ অধুনা কলিকাতায় অবস্থান করিয়া যাহাতে বঙ্গদেশে শঙ্করমঠ স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মহত্ত্ব ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন।

———0———

বুদ্ধোৎসব—গত ২৩শে বৈশাখ—বৈশাখী পূর্ণিমাতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি দিনে পূজা আরতি, হোম, ভোগ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———0———

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

সাধনা ও সিদ্ধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুবক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মা! তবে সর্ব্বশাস্ত্রেই কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন কেন?"

দেবী বলিলেন,—বৎস! জ্ঞানই মুক্তির কারণ, তবে কর্ম্ম জ্ঞানের সহায় ও হিতকারী। যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অতি যত্নপূর্ব্বক বৈদিক সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা, ঐহিক-পারত্রিক-ফলভোগবিরাগ এবং অন্তঃকরণ-গত সত্বগুণের শুদ্ধি না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তৎপর আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ—আত্মার সহিত অন্তঃকরণাদির তাদাত্ম্যভাব বিদূরিত হইয়া যায়, সুতরাং তখন কর্ম্মের সম্ভব থাকে না। হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি পরলোকের ইচ্ছু, ইত্যাদি ভেদজ্ঞান থাকিলেই লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব তম ও আলোকের যেমন একত্র অবস্থিতি সম্ভব নহে, সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র স্থিতি হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম প্রতিপাদিকা শ্রুতি অজ্ঞানীর পক্ষে, ইহা বুঝিতে হইবে।

প্রথমতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণগত সত্বগুণের শুদ্ধি হইলে বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি অধীত বেদবেদার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া অকপট ভক্তি সহকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং আলস্যাদি দোষ পরিহারপূর্ব্বক নিত্য বেদান্ত বা-শ্রবণ ও আত্মবিচার করিবে। আত্মবিচার দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলেই

তখন পুরুষ নির্ভয় এবং মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব উভয়ের ঐক্য কেমন করিয়া প্রতিপাদিত হইবে? জীব অসর্ব্বজ্ঞত্ব ও অনুত্বাদি অপকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট এবং ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্ব ও ব্যাপকত্বাদি উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, অতএব বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে?

দেবী মধুরহাস্যে শত চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই ঈশ্বর এবং অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট ব্রহ্ম-চৈতন্যই জীব, সুতরাং চৈতন্যাংশে উভয়েরই ঐক্য আছে, কেবলমাত্র ধর্ম্ম দ্বারাই পরস্পরের ভিন্নতা হইয়াছে, অতএব উভয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা * চৈতন্য মাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ পদদ্বয়ের চৈতন্যই মুখ্য লক্ষ্যার্থ, সুতরাং লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলেই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল। এই প্রকারে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইলে ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান হইয়া জীব স্থুলাদি-দেহত্রয়-বিরহিত ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

জীবের স্থূলদেহ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সম্ভূত হয়, ইহা সমস্ত কর্ম্মের ভোগভূমি এবং জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিসংযুক্ত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থকে সূক্ষ্মদেহ বলে, ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, ইহাই জীবের সূক্ষ্মদেহ, ইহাদ্বারা আত্মার সুখাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। আর অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান আত্মার কারণদেহ—ইহা দ্বারা স্বরূপ আবরিত থাকে। এই দেহ ত্রয় আত্মার উপাধি সুতরাং মায়া-কল্পিত, অতএব মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। এই দেহত্রয়াভ্যন্তরেই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ অন্তর্ভূত আছে, এই পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, ইহাই শ্রুতিতে "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে অর্থাৎ—দৃশ্য শ্রব্যাদি যাহা কিছু, তৎসমস্তই আত্মা নহে, এইরূপে নিষেধের অবধিস্বরূপে আত্মা নিরূপিত হইয়াছেন। এই আত্মার কখনও জন্ম বা বিনাশ হয় না, এবং ইনি উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছেন, কারণ, ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন; এই শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচ বিনষ্ট হন না। যিনি কোন ব্যক্তিকে হত করিয়া "আত্মাহন্তা" ইহা মনে করেন এবং যিনি হত হইয়া "আত্মা হত হইয়াছেন" এই প্রকার মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই প্রকৃত তত্ত্বের অনভিজ্ঞ, কারণ, আত্মা কখনই কাহারও বধকরার কর্ত্তা হইতে পারেন না এবং কখন বধ্যও হইতে পারেন না। এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতে

* শব্দের মুখ্য অর্থ দ্বারা যদি তাৎপর্য্যের অসঙ্গতি হয়, তবে যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থের সংস্রব রাখিয়া অর্থান্তর কল্পিত হয়, সেই বৃত্তির নাম লক্ষণা।

সঃ আঃ দঃ—

মহত্তর, ইনি বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত আছেন, অর্থাৎ—একমাত্র বুদ্ধিগম্য পদার্থ। যিনি চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংকল্পবিকল্পরহিত, তিনিই তাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারেন এবং ইহাঁকে জানিয়া শোকরহিত হয়েন।

বৎস! এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথী, মন মুখরজ্জু (বল্গা বা লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। এই ইন্দ্রিয়-অশ্বগণের বিষয়সকলই গন্তব্য মার্গ। যিনি মনোরজ্জু দ্বারা বিষয়-অশ্বকে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি এই সংসার-সমুদ্রের-পরপারে গমন করিয়া আমার সচ্চিদানন্দ রূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

উত্তমাধিকারী ব্যক্তি এই প্রকারে বেদান্ত শ্রবণ, মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি শ্রুতিবাক্যের মনন দ্বারা সৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অধমাধিকারীকে নিধিদ্যাসন করিতে হইবে, নতুবা তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হইবে না। সুতরাং শ্রবন-মনন দ্বারা সংশয়-বিপর্য্যাস-রহিতভাবে আত্মাকে পরোক্ষভাবে জানিয়া সাক্ষাৎকারের জন্য তাহাকে একাগ্র-চিত্তে অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মরূপিনী আমাকে ভাবনা করিবে। এই প্রকার ভাবনার অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্ত সমাধিতে উপযুক্ত হইবে, সেই কালে নিজের শরীরে আমার প্রণব (হ্রীঙ্কার) মন্ত্র ও তাহার বাচ্য বিষয়কে ধ্যান করার নিমিত্ত প্রণবের অক্ষর ত্রয়কে বক্ষ্যমানরূপে ভাবনা করিতে হইবে। 'হ'কার স্থূলদেহ, 'র'সূক্ষ্মদেহ 'ঈ'কার কারণ দেহ এবং তুরীয়া ব্রহ্মরূপিনী আমিই বিন্দুরূপে অবস্থিত করিতেছি। এই প্রকারে ব্যষ্টি দেহে অক্ষরত্রয়ের চিন্তাকরিয়া সমষ্টিদেহেও যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত অক্ষরত্রয়ের চিন্তা করিবে। অনন্তর সমষ্টি ও ব্যষ্টির অর্থাৎ এই স্থূলপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব ভাবনা করিবে। সমাধির পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক এই প্রকার ভাবনা করিয়া লোচনদ্বয় নিমিলিত করতঃ দ্যোতনশীলা জগদীশ্বরী আমাকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলেই আমার সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া মৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারিবে।

বৎস! যাহারা জ্ঞান বিষয়ে অধিকারী নহে অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত এবং বেদান্তার্থ বিচার বা ধারণায় সক্ষম নহে, তাহারা অষ্টাঙ্গসমন্বিত যোগাভ্যাসদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবে। সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে নিরাকাঙ্ক্ষ, ক্রোধাদিদোষপরিশূন্য এবং মৎসরবিহীন হইয়া প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা নাসাভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অপকট ভক্তি সহকারে নিঃস্বন স্থানে বৈশ্বানরাত্মক 'হ'কার বাচ্য স্থূলদেহকে 'র'কার বাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিবে। অনন্তর তৈজসাত্মক 'র'কার বাচ্য সূক্ষ্মদেহকে ঈশ্বর বাচ্য কারণদেহে বিলীন করিয়া প্রজ্ঞাত্মক ঈশ্বরবাচ্য কারণ দেহকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। পরে বাচ্য-বাচক ভাববিহীন দ্বৈতবর্জ্জিত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপ শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে। তাহা হইলেই পরাৎপরা আত্মরূপিনী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান ও তদীয় কার্য্যাবলীর বিনাশপূর্ব্বক সৎ-স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে।

বৎস! জ্ঞান ও যোগ উভয় বিষয়ে যাহারা অনধিকারী তাহারা ফল, ফুল,

জন দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার স্থূল মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলেও আমার কৃপায় মৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারিবে। এই বিশ্বই আমার মূর্ত্তি, তদ্ব্যতীত আমার কালী, তারাদি দৈবী-মূর্ত্তি এবং রাম কৃষ্ণাদি অবতার মূর্ত্তিও অর্চ্চনার জন্য আশ্রয় করা যাইতে পারে। যাহারা অন্য দেবতা, পিতৃগণ বা ভূতের অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকেও আমি ফল প্রদান করিয়া থাকি। কারণ আমিই একমাত্র ফল-বিধাত্রী। আমার স্বরূপ না জানিয়াও কামনা-বশতঃ আমার আরাধনা করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে, কিন্তু মৎ-স্বরূপতা লাভে কদাচ সমর্থ হইবে না। এতদ্ব্যতীত আমার মন্ত্রজপ এবং নামগান করিয়াও মদীয় ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি মন্নিষ্ট ভক্তের একবার মাত্র পূজা করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

বৎস! সর্ব্ব প্রকারের অধিকারী ব্যক্তিই ভক্তিযোগ দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া সহজে মৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারে। গুণময়ী অপেক্ষা নির্গুণা ভক্তিই আশু মুক্তিদানে সমর্থা।

ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন,—মা! কৃপাপূর্ব্বক নির্গুণ ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আমাকে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করুন।

দেবী বলিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি নিয়ত আমার নাম কীর্ত্তন ও গুণ শ্রবণ করে, যাহার মন কল্যাণ ও গুণরত্নের আকর, আমাতেই তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সততই অবস্থিত থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার কারণ বা ফল আকাঙ্ক্ষা করে না, এমন কি সামীপ্য, সার্ষ্টি, সালোক্য ও সাযুজ্য মুক্তিরও কামনা করে না, যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাও করে না, যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া পরানুরক্তিপূর্ব্বক আমারই চিন্তা করে, এবং আমাকে নিজ হইতে ভিন্ন না করিয়া "আমিই সচ্চিদা-রূপিনী ভগবতী" এই প্রকার জ্ঞান করে. যে ব্যক্তি সমস্ত জীবকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং নিজ ও অন্যেতে সম্প্রীতিসম্পন্ন, যে ব্যক্তি চৈতন্যের সমানত্ব বশতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানা সর্ব্বব্যাপিনী আমার সহিত সর্ব্বদাই সকল জীবের অভিন্নতা জ্ঞান করে, যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগহেতু জীব-মাত্রকেই নমস্কার ও পূজা করে এবং কুত্রাপি যাহার দ্রোহবুদ্ধি নাই, যে ব্যক্তি আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয় শাস্ত্র শ্রবণে এবং আমার মন্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমপরি-পূর্ণবুদ্ধি, সুতরাং আমার কথা শুনিলেই রোমাঞ্চিত শরীর হয়, এবং প্রেমাশ্রু দ্বারা যাহার নয়ন পরিপূর্ণ ও গদগদ শব্দে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার নিত্যনৈমিত্তিক দিব্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, মদীয় উৎসব দর্শনে ও আমার উৎসবকরণে যাহার স্বভাবতঃই ইচ্ছা থাকে, যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে আমার নামগান করিতে করিতে নৃত্য করে, যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদি বিবর্জ্জিত এবং দেহাভিমান পরি-শূন্য, যে ব্যক্তি সমস্তই প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে

হয় জানিয়া আমার চিন্তা ব্যতীত দেহ রক্ষাদি বিষয়েও চিন্তা করে না, তাহার এতাদৃশী ভক্তিই পরাভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা জানিবে। এতাদৃশী ভক্তির উদয় হইলে তাহার চিত্তে দেবী ভিন্ন অন্য আর কোন বিষয়েরই চিন্তা থাকে না। বৎস! যাহার এতাদৃশী ভক্তি যথার্থরূপে উদয় হয়, সেই ব্যক্তি আমার চিন্ময়রূপে বিলীন হইয়া যায়। এতাদৃশ ভক্ত সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-বিধি ও লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি সর্ব্বান্তঃকরণে "মা-মা" বলিয়া কেবল আমাকে ডাকে, আমি "বৎস পাছে গাভীর ন্যায়' তাহার অনুসরণ করিয়া থাকি। বৎস! অধিক আর কি বলিব, যদি কেহ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাবচ্ছেদে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাহাকে অচিরকালমধ্যে পরা শান্তি দান করতঃ মৎ-স্বরূপতা প্রদান করিয়া থাকি।

একমাত্র আমার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। তখন হৃদয়-গ্রন্থি অর্থাৎ চৈতন্য ও অহঙ্কারের তাদাত্ম্য ভাব নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত জ্ঞেয়-বস্তু-বিষয়ক সকল সন্দেহই বিদূরিত হয় এবং সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার সহিত কখনই আমি বিযুক্ত হই না এবং তিনিও আমার সহিত বিযুক্ত হয়েন না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই আমি। যেখানেই তিনি অবস্থিতি করুন না কেন, সেইখানেই আমার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। আমি তীর্থে অবস্থান করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি করি না এবং বৈকুণ্ঠেও থাকি না, আমি কেবলমাত্র মৎপরায়ণ জ্ঞানীজনের হৃৎপদ্ম মধ্যেই বসতি করিয়া থাকি।

বৎস! তুমি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে আমার নিকট যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি তোমার নিকট বলিলাম, এই বিষয়ে অতঃপর আর কিছুই বক্তব্য নাই। বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠার নামই জ্ঞান। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জন্মটী বিনষ্ট হইল অর্থাৎ—মিথ্যা হইল। আর যাঁহার চিত্ত চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছে তাঁহার বংশ পবিত্র, তাঁহার জননী ধন্যা ও পৃথিবী তদ্দ্বারা পুণ্যশালিনী হয়। তুমি গুরুকৃপায় আমার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়াছ। তোমার বেদাদি শাস্ত্রের নানাবিধ বিধি নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হইবে না। তোমার সহিত আমি অভিন্নভাবে বিরাজ করিব। তুমি নিশ্চিন্তে—নির্ভয়ে প্রসন্নচিত্তে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া বেড়াও। যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু শুনিবে, যাহা কিছু খাইবে, যাহা কিছু বলিবে, সমস্ত ফলাফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার ভক্তগণের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিতে থাক, তৎপরে প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে মৎ-স্বরূপে লয় হইয়া যাইবে। বৎস! আমি এক্ষণে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করি, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমি আবার তোমার মনোময়ী মূর্ত্তিতে তোমার নিকট আবির্ভূতা হইব।

ভক্ত পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—মা! আমি তোমার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার সর্ব্ব-কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আপনি আমাকে আমার ইষ্টদেবীর ধ্যেয় মূর্ত্তি দেখাইতে সম্মত ছিলেন; তাই প্রার্থনা, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক যেমন আপনার সমষ্টিস্বরূপ বিরাট

রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই প্রকার উঁহা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করুন। আমি ঐরূপ দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছি।

অনন্তর ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী, ভক্তগণের কামদুঘা ও কল্যানরূপিনী স্বীয়রূপ দর্শনে ভক্তের ঔৎসুক্য জানিয়া মধুর হাস্য সহকারে "বৎস! অল্পভাগ্যব্যক্তিগণের পক্ষে আমার সেই অদ্ভুত মহৎরূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তোমার প্রতি বাৎসল্য বশতঃ সেই রূপ দর্শন করাইতেছি;—তৎসঙ্গে আমিও অন্তর্হিতা হইব" এই বলিয়া ভাগ্যবান্ যুবকের শিরে করপদ্ম স্পর্শ করাইলেন।

যুবক প্রণাম করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় তরল জ্যোতিরাকারে পরিণত হইয়া চরাচর উদ্ভাসিত করিয়াছেন। অনন্তর তিনি বক্ষ্যমান রূপে দেবীর পরাৎপর বিরাট্ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরিস্থিত সত্যলোকই এই বিরাট্ রূপিনীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক-সকল শ্রোত্র, বেদসকল বাক্য। বায়ু প্রাণ, বিশ্ব তাহার হৃদয়, পৃথিবী জঘনদেশ, নভস্থল নাভিদেশ, জ্যোতিষ্কমণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল, তপলোক তাঁহার ললাটফলক, ইন্দ্রাদি তাহার বাহু, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ, অশ্বিনীকুমার দ্বয় তাঁহার নাসিকা, গন্ধ ঘ্রানেন্দ্রিয় স্বরূপ, অগ্নি মুখাভ্যন্তর, দিবা ও রাত্রি তাঁহার নয়ন পক্ষদ্বয় রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রহ্মস্থান তাঁহার ভ্রূ বিকাশ স্বরূপ, জল তালু—তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ দংষ্ট্রা, স্নেহবিলাস দন্ত, মায়াই তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকটাক্ষ, লজ্জা ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ। লোভ অধর, এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠ ভাগ। জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্রদেশ, সমুদ্রসকল তাঁহার উদর, পর্ব্বতসমুহ সেই দেবীর অস্থি, সমস্ত নদীই তাঁহার নাড়ী এবং বৃক্ষাবলী লোম-রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কৌমার, যৌবন ও জরাই তাঁহার উত্তমাগতি, মেঘসমুহ কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই ব্যাপিকা দেবীর বসন,. চন্দ্রমা মহেশ্বরীর মন, হরি বিজ্ঞান শক্তি এবং রুদ্র সংহার শক্তি। সেই বিভূ জগদম্বিকার শ্রোণিদেশে অশ্বাদি জাতি এবং অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোক কটিদেশের অধোভাগে বিরাজ করিতে লাগিল। যুবক জগন্মাতার এতাদৃশ বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বোধ করিতে লাগিলেন, যেন সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। সেই মূর্ত্তি যেন জিহ্বা দ্বারা অনন্ত জগতের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে; দশনপংক্তির কট্‌কটা শব্দে ভীষণতা ধারণ করিয়াছে। সেই বিরাট মূর্ত্তি অক্ষি সমুহ অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে, সেই আকৃতি নানাবিধ আয়ুধ-ধারী ও অতীব বলসম্পন্ন। সেই আকৃতির সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র চরণ কোটি সূর্য্যের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান এবং কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। অতীব ভয়ঙ্কর, মন ও নয়নের ত্রাসজনক সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যুবকের হৃদয়দেশ বিকম্পিত হইতে লাগিল, তিনি অস্পষ্ট ভাষায় দেবী স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বামাচরণ তারামন্দিরে বসিয়া সবই দেখিতেছিলেন। শিষ্যকে চৈতন্য হারাইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গমন

করিলেন। তদনন্তর সস্নেহে যুবকের স্পন্দহীন দেহ স্বীয়ক্রোড়ে উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। যুবক অল্পক্ষণ পরেই নয়ন উন্মিলন করিলেন। দেবী তখন অন্তর্হিতা হইয়াছেন, বামাচরণের মুখে দৃষ্টিপড়িল। বামাচরণ আবেগ ও উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, "বৎস! ধন্ত তুই, তোর গুরু হইয়া আমিও ধন্ত হইয়া গিয়াছি।"

যুবক ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক উঠিতে গেলেন, কিন্তু মাতালের ন্যায় জড়িতপদে পড়িয়া গেলেন। তখন বামাচরণের পা দুখানি নিজ হৃদয়ের মধ্যে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া প্রেম বিগলিতপূর্ণ নয়নে বাষ্পরুদ্ধ গদ্গদ্কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—

নমস্তে নাথ ভগবান্ শিবায় গুরুরূপিনে।
বিদ্যাবতার সংসিদ্ধৌ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥
নারায়ণ স্বরূপায় পরমাত্মক মূর্ত্তয়।
সর্ব্বজ্ঞান তমোভেদ ভানবে চিদ্ঘনায়তে॥
স্বতন্ত্রায় দয়াক্লপ্ত বিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিনে॥
বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্ষায় বিমর্ষিনাং।
প্রকাশানাং প্রকাশয় জ্ঞানিনা জ্ঞানরূপিনে॥
তৎ প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়া মৃত্যু মহাপাশাৎ বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মিচ॥

বামাচরণ স্বীয় চরণ হইতে সাদরে শিষ্যকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তারামন্দিরে প্রাভাতিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বামাচরণ সস্নেহে শিষ্যের হাত ধরিয়া দেবী প্রণাম উদ্দেশ্যে মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পাঠকগণ! যাঁহার কৃপায় জীবের এ হেন সৌভাগ্যের সঞ্চার হয়, আমরা তাঁহার অতুল-রাতুল চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহং॥

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতঃ
দীন—চিদানন্দ।

—0—

প্রার্থনা।

হে দেব! হে প্রভো! তুমি পতিতপাবন,
অই শুধু ভরসা আমার,
সকল সংসারে মোর তুমি এক জন,
দৃষ্টিপথে রেখেছ তোমার।
তুমি দেখিতেছ—প্রাণের শকতি জাগে,
ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগে শতগুণে,
ক্ষুদ্রতায় বদ্ধ দেহ—বাধা এসে লাগে,—
সাগর কাঁপিয়া উঠে প্রাণে।
ইন্দ্রিয়ের শতমুখী অদম্য প্রেরণা
ভোগ-রাজ্য মাঝে দেয় ফেলে,
অশান্তি উদ্বেগ আসে অসহ যাতনা
প্রাণে প্রাণে শত বহ্নি জ্বলে।
মনে আসে—তুমি আছ দেখিতে আমারে,
তবু কেন এত জ্বালা পাই?
অনন্ত আনন্দ বিনে এ জীবন তরে,
তব কাছে কিছু চাহি নাই।
চলেছি এ দীর্ঘ পথে তোমারে লইয়া,
এ জীবন সে জীবন তরে,
আমি যে তোমার হে স্মরণ রাখিয়া
যা দিবার দিও দেব মোরে।

শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

—0—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব অনন্ত এবং অতীব দুরবগাহ গম্ভীর। পক্ষিগণ নিজ নিজ পক্ষবলের তারতম্য অনুসারে অনন্ত আকাশে যেরূপ উড্ডীন হইয়া আনন্দে বিচরণ করে, ভাবুক ভক্তগণও সেইরূপ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহজগতে পদার্থ বহুবিধ হইলেও উহাকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, একপ্রকার—প্রমেয়, অন্য প্রকার—প্রমাণ। যাহার বিষয় প্রমাণ করিতে হয় তাহাই প্রমেয়, আর যদ্দ্বারা ঐ সকলের বোধ উপলব্ধি হয় তাহাই প্রমাণ। প্রমেয় বস্তু বহুবিধ, উহার সংখ্যা করা যায় না; কিন্তু প্রমাণ সাধারণতঃ অষ্টবিধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণে প্রমাতার জ্ঞান বুদ্ধির অপেক্ষা আছে। নরগণ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষ-দুষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এই নিমিত্ত শাব্দ-প্রমাণ অর্থাৎ পূর্ব্বতন মুনিগণ দ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত আপ্তবাক্যই প্রমাণ শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ সমস্ত পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, উপনিষদাদিই সেই অপৌরুষেয় মহাবাক্য বেদেরই বিস্তার। বেদই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া তত্ত্ব-নিরূপণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ ও তৎসহ পুরাণাদির প্রামাণ্য স্বীকার না করা আর নাস্তিকতা একই। পরম দার্শনিক ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন ;—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।
নিরাশ্রয় মায়াবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

বেদ গান করিতেছেন,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।

ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবানকে রুক্মবর্ণ বলা হইয়াছে। রুক্মবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ। আবার কোনও কোনও শ্রুতি তাঁহাকে আদিত্য বর্ণ বলিয়াছেন। আদিত্যবর্ণ ও রুক্মবর্ণ একই বর্ণ। পরন্তু

ঈক্ষতে র্নাশব্দং।

প্রভৃতি সূত্রে তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদিরও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রকৃত নহে, উহা অপ্রাকৃত। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। মহাভারতে লিখিত আছে—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ বরাঙ্গ শ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ॥

পাঠক মহাশয়! একবার দেখুন দেখি ঐ যে কনককান্তি, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীটি ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া অমিয়বর্ষী শ্রীহরিগুণগানে পাপ-তাপপূর্ণ বিষম বিঘ্নসঙ্কুল সংসার মরুভূমিতে কলস্বনা অমৃতপ্রসবিনী সুরধুনী প্রবাহ ছুটাই-তেছেন, উহাতে ঐ সমস্ত গুণ আছে কিনা? ইহার বর্ণ আদিত্যতুল্য। সূর্য্যকিরণ যেরূপ ত্রিপল কাচের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইলে উহা নীল পীত লোহিতাদি বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয়, ইঁহাকেও সেইরূপ লীলারূপ ত্রিপলের ভিতর দিয়া দেখিলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইরূপ দেখায়। আবার ঐ নীল পীত লোহিতাদি কিরণ আর একটী

ত্রিপলের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত করিলে উহারা যেরূপ পূর্ব্ববৎ শুভ্র রৌদ্রে পরিণত হয়, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অন্ত লীলা ত্রিপলের মধ্য দিয়া দেখাতে পুনরায় রৌদ্রবর্ণ—গৌরবর্ণ দেখাইতেছে। এই নিমিত্তে গোস্বামীপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

> রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতি র্হ্লাদিনি শক্তিরস্মা
> দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
> রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমস্বরূপিনী হ্লাদিনী-শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরাধারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ইঁহারা একাত্মক হইলেও ইতিপূর্ব্বে লীলার নিমিত্ত দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা আবার একত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গৌরাঙ্গদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীযুক্ত নন্দ মহারাজের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের-নামকরণ উপলক্ষে গর্গ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

> আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনু।
> শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ইনি কখন শুক্লবর্ণ, কখনও রক্তবর্ণ, কখনও বা পীতবর্ণ হইয়া থাকেন। এক্ষণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারে ঐ সমস্তই কৃষ্ণবর্ণের অন্তর্গত হইয়াছে।

পীতবর্ণ কলিকালের গৌরাঙ্গ অবতারেরই বর্ণ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে কলিকালের অবতার বিষয়ে বলা হইয়াছে—

> কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
> যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ইহার অনুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ আছে—

> "কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
> অথবা কৃষ্ণকে তেঁহ বর্ণে নিজসুখে॥
> "কৃষ্ণ" বর্ণ শব্দের এই দুই ত প্রমাণ।
> কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
> কেহ যদি তাঁরে বলে কৃষ্ণবরণ।
> আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
> দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণবরণ।
> অকৃষ্ণ বরণে কহে পীতবরণ॥
> অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রকরে স্বকার্য্য সাধন।
> অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥
> অঙ্গ শব্দের অর্থ কহে শাস্ত্র পরমাণ।
> অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥
> জলশায়ী অন্তর্যামী সেই নারায়ণ।
> সেহ তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ॥
> অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহ সত্য হয়।
> মায়াকার্য্য নহে সব চিদানন্দময়॥
> অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
> অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
> অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
> সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
> নিত্যানন্দ গোসাঁই সাক্ষাৎ হলধর।
> অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
> শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লইয়া।
> দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
> পাষণ্ড দলন বানা নিত্যানন্দ রায়।
> আচার্য্য হুঙ্কারে সব পাষণ্ডী পলায়॥

সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুবুদ্ধি আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥"

যাঁহারা এই কয়পক্তি পয়ার মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এরূপ দুরূহ বিষয়ের এতাদৃশ প্রাঞ্জল অনুবাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ফলতঃ মূলশ্লোকে কলিকালে চৈতন্য-অবতারেরই কথা বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই শ্রীচৈতন্যদেবের তাৎকালিক আকৃতি দেখিলেই সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। তাঁহার চক্ষু প্রাকৃত আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে যেন কি এক অপ্রাকৃত পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছে, আর নিম্নদিক্ দিয়া হিমালয়-নিঃসৃত হিমনদীর ন্যায় অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। ইহাঁর দেহে অমানুষিক সাত্ত্বিক বিকার সমূহ সমকালে প্রকাশিত হইতেছে। প্রাকৃত দেহ, মন, বা ইন্দ্রিয়াদির কি এরূপ অপ্রাকৃত বৃত্তি সম্ভব হয়? তাহা না হইলেই ইনিই শ্রীভগবান্। যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও ধার্ম্মিকের পীড়ন এবং সত্য আবৃত হইতে থাকে তখন ইনিই অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের স্থাপন ও অধর্ম্মের ক্ষয় করিয়া থাকেন। যখন কংসাদি অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া বসুন্ধরা কাঁদিয়াছিলেন তখন ইনিই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার লোকে যখন কাপালিকগণের প্ররোচনায় কেবল ছাগাদি উৎসর্গে তৃপ্তিলাভ না করিয়া নরবলি প্রদান করিতেছিল,—যখন বন্ধনপ্রধান স্মৃতি সমূহের কুপিত ফণিফনোচ্ছ্রিত শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল,—যখন শ্রমণগণের পল্লি-বিবরণে সত্য ধর্ম্মের জলাঞ্জলি দিতেছিল, তখন তাহাদের পরিত্রাণার্থ তিনিই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীপুণ্ডরিকাক্ষ পদাভিলাষিণঃ।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:():—

সাধক—সঙ্গীত।

(৩)

মূলতান—কাওয়ালি

আমার একি হ'লো বল গো সহচরি!
শয়নে স্বপনে জাগরণে ভূতলে গগনে,
ভবনে বা বনে যে দিক নেহারি, সই রে,
সঘন সে ঘনবরণে নেহারি॥

পেতে রূপের ফাঁদ কালাচাঁদ,
দেখায়ে চান্দ মুখের ছান্দ
ভেঙ্গে দিলে কুলের বাঁধ কি করি ?
ফুটিল মরমে মোর, কুটিল কটাক্ষ শর,
ছুটিল ভরমে ঘরম বারি,—
বুঝি ধরম গেল রে সরমে মরি ॥
ও তার শ্যামাঙ্গ মহিমায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায়,
অনঙ্গ গরিমা করে চুরি—
অবয়ব সে রূপ এ নব বয়সে হেরি,
বাসনা আবাসে নাহি ফিরি ।
এলাম অবশেষে অবশে সই ! কি করি ?

শ্রীসধনা-চরিত ।

অনেকদিন অতীত হইল দাক্ষিনাত্যদেশে এক নগরে "শ্রীসধনা" নামে একজন কৃষ্ণভক্ত সাধু বাস করিতেন। সধনা নীচকুলোদ্ভব, জাতিতে কসাই; কিন্তু তথাপি তাহার প্রকৃতি কিম্বা ব্যবহার নীচকুলজাত অসভ্যের মত ঘৃণিত ছিল না। উন্নত স্বভাব ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। সধনা বাল্যকাল হইতেই ধীর, শান্ত, মিষ্টভাষী, উদার, পরদুঃখকাতর ও সত্যবাদী ছিলেন। মধুমাখা মিষ্ট কথায় ও সরল ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। পরদুঃখকাতর সধনা পরের দুঃখ দর্শনে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন;— তিনি সাধ্যানুসারে পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন; যদি না পারিতেন তবে কাঁদিয়া ফেলিতেন; আর তাহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই সধনা কৃষ্ণকে সখার ন্যায় ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে একা নির্জ্জনে বসিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চোখের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আকুল হৃদয়ে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতেন আর "তুমি আমাকে দেখা দিলে না" বলিয়া ছট ফট করিতেন। আবার কোন কোন সময় খেলার সাথীদের সহিত গান করিতেন ও নাচিতেন। এইরূপ আনন্দে সধনার কৈশোরজীবন অতিবাহিত হইল; ক্রমে ধীরে ধীরে যৌবনের বিকাশ হইতে লাগিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সধনা, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে একটী সংস্বভাবা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সধনা বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সংসারের কোন

বস্তুই তাঁহার ভাল লাগিত না; কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। কেবল মণিহারা ফণীর ন্যায় তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; আর "হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি প্রাণসখা দয়াল হরি! ওগো একবার দেখা দাও—আমার প্রাণ যে জ্বলে গেল" এই বলিয়া রোদন করিতেন।

এখন সধনার উপর সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল। এতদিন তিনি সংসারের কোনও সংবাদ রাখিতেন না; কিভাবে সংসার চলিত তাহার কিছুই জানিতেন না; কেবল আপন ভাবে, আপন মনে থাকিতেন, সংসারের কোন ভাবনাই ভাবিতেন না। কিন্তু এখন আর সংসারের ভাবনা না ভাবিলে চলে না—কারণ এখন অর্থাভাবে মধ্যে মধ্যে পরিবার-বর্গকে উপবাসী থাকিতে হইতেছে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া সধনা স্বীয় জাতীয় ব্যবসা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জাতীয় বৃত্তি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু প্রাণিহিংসা ত তাঁহার ন্যায় কোমল প্রাণে সম্ভবে না! সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে অন্য দোকান হইতে মাংস ক্রয় করিয়া আনিয়া পুনরায় তাহা বিক্রয় করিতে হইত। তাহাতে যাহা কিছু লাভ হইত তদ্দ্বারাই সংসার চলিত। নিজের শরীরে আঘাত করিলে যেরূপ ব্যথা লাগে, অপরকে আঘাত করিলে সেও সেইরূপ ব্যথা পায়, সধনার পরদুঃখকাতর প্রাণ ইহা জানিত, বিশেষতঃ অপরের দুঃখ দেখিলে যাহার প্রাণ আকুল, পাগলপারা হইয়া যাইত, তাঁহার দ্বারা কি জীবহিংসা কখনও সম্ভব?

একদিন সধনা পথের পার্শ্বে বসিয়া মাংস ওজন করিতেছিলেন; সেই পথ দিয়া একজন বৈষ্ণব যাইতেছিলেন। বৈষ্ণব ঠাকুর মাংস বিক্রির বাটখারা "শালগ্রাম শিলা" দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া তথায় দাঁড়াইলেন "যে শালগ্রাম শিলা স্বর্ণ সিংহাসনে রাখিয়া সুগন্ধি পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া লোকের তৃপ্তি হয় না, সেই শালগ্রাম শিলা দিয়া এই হীনপ্রাণ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করে?" এই অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি সধনার নিকট হইতে শালগ্রাম শিলাটী উদ্ধার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট যাইয়া একথা সে কথা বলিয়া, অবশেষে বলিলেন, "তোমার এ পাথরখানা আমাকে দাও, আমি তোমাকে আর একটী ভাল পাথর দিতেছি। সধনা বলিলেন "প্রভো এ পাথরখানা আমি দিতে পারিব না। এ পাথর খানার এমনি গুণ যে সের, পোওয়া, ছটাক প্রভৃতি যখন যে পরিমান মাংস মাপিবার প্রয়োজন হয়, তাহা আমার এই একখানা পাথরেই কলে, সুতরাং এ পাথর খানা প্রভুকে দিতে পারি না। পাথরের গুণের কথা শুনিয়া শালগ্রাম শিলা জাগ্রৎ ও শক্তিসম্পন্ন বুঝিতে পারিয়া বৈষ্ণব-ঠাকুরের শিলা খানি উদ্ধার করিবার ইচ্ছা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবল হইল। তিনি সধনাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, "তোমার এ পাথরখানা আমাকে দিতেই হইবে—না দিলে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইব"। সধনা চিরদিনই দেবদ্বিজ ও সাধু মহাপুরুষের প্রতি একান্ত অনুরক্ত

ও অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন; সুতরাং বৈষ্ণব-ঠাকুরের কথার আর প্রতিবাদ না করিয়া পাথরখানা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। বৈষ্ণবঠাকুর শালগ্রাম শিলা লইয়া চলিয়া গেলেন। পাথরখানা যে এরূপ শক্তিসম্পন্ন, সধনা তাহার কিছুই জানিলেন না।

বৈষ্ণবঠাকুর শালগ্রাম শিলা আনিয়া যথাবিহিত অভিষেককরতঃ নিজগৃহে স্থাপন করিলেন। নিত্য চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসীদলে তাঁহার পূজা ও ভোগ আরতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইলেন না; একদিন স্বপ্নে বৈষ্ণবঠাকুরকে বলিলেন।,, তুমি আমাকে এখানে আনিয়া বৃথা কেন কষ্ট দিতেছ? আমি সধনার নিকট অতি সুখে ছিলাম। আমি নিত্য হরিনাম শুনিয়া যে আনন্দ ভোগ করিতাম, তুমি কেন আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে? শীঘ্র আমাকে সধনার নিকট রাখিয়া আইস।" ভগবান কি কখনও ফুল-তুলসী বা পূজা অর্চ্চনায় ভুলেন? তিনি চান শুধু প্রাণ; প্রাণ দিতে না পারিলে কেবল বাহ্যাড়ম্বরে তিনি তুষ্ট হন না, সধনা প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণস্পর্শী ডাকে ভগবানে আসন টলিয়াছিল, তাই তিনি সধনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবঠাকুর গঙ্গাজলে শালগ্রাম শিলা স্নান করাইতেন আর সধনার নিকট তাহার দরবিগলিত প্রেমাশ্রুধারায় স্বভাবতঃই শালগ্রাম শিলা স্নাত হইত। স্বপ্ন দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুর বুঝিলেন সধনা ভক্ত ও ভাগ্যবান, তাহার প্রতি ভগবানের অশেষ করুণা। পূর্ব্বে নীচ জাতি বলিয়া তাহার প্রতি যে ঘৃণা ছিল তাহা দূর হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সধনার প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হইল।

বৈষ্ণবঠাকুর প্রত্যুষে শালগ্রাম শিলা লইয়া সধনার নিকট উপস্থিত হইলেন। সধনার ভক্তোচিত সাত্বিক ভাবের লক্ষণাদি দর্শন করতঃ প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া শালগ্রাম লইয়া গিয়াছিলাম। তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত; আমি না জানিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। তজ্জন্য আমি তোমার নিকট বড়ই অপরাধী। তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আর আমার উপায় নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সধনা বৈষ্ণবঠাকুরের এইরূপ গর্হিত কার্য্য দর্শন করিয়া ভীত ও ত্রস্তভাবে উঠিয়া বৈষ্ণব-ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! করিলেন কি? আমি অতি অধম, পাপী, নীচজাতি; আমাকে প্রণাম করিয়া মহা অপরাধী করিলেন, এ অপরাধের উপায় কি?" বৈষ্ণবঠাকুর বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই, তোমার চরণস্পর্শে আমার মত কত জন পবিত্র হইয়া যাইবে। আমি এখন চলিলাম। তোমার এই বাটখারা প্রকৃত বাটখারা নয়, তুমি যাহাকে ভজনা কর, সেই শ্রীকৃষ্ণই তোমার নিকট বাটখারারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি এই শালগ্রাম প্রত্যহ পূজা কর, তাহা হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া বৈষ্ণবঠাকুর চলিয়া গেলেন।

সধনা জাতীয় ব্যবসা, গৃহপরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত পরিত্যাগকরতঃ নির্জ্জন স্থান দেখিয়া একটী কুটীর নির্ম্মাণ

করিলেন। তথায় প্রত্যহ ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা শালগ্রামের নিয়মিত পূজা ও ভোগ আরতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে ভাবপ্রবণ সধনার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল; তাহার প্রাণ উধাও হইয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল পুরুষোত্তমধামে গেলেই তাঁহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত প্রাণধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল; তাঁহার আর এখন কিছুই ভাল লাগে না।—সর্ব্বদাই প্রাণ অস্থির ও ছট্‌ফট্‌ করে। আর থাকিতে না পারিয়া সধনা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে পুরুষোত্তমধামে চলিলেন। পথে অন্যান্য যাত্রিদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সধনা নিঃসম্বল—যাত্রিরা দয়া করিয়া কোন দিন তণ্ডুল, গোধূম প্রভৃতি যাহা কিছু খাইতে দিত তাহা দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ পথ চলিতেন।

কসাই বলিয়া যাত্রিরা সধনার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত। একদিন সধনা যাত্রিদের সঙ্গ হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য ভিক্ষার্থে এক গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলেন। সেখানে এক অভিনব বিপদ উপস্থিত হইল। সেই বাড়ীর গৃহস্থবধূ দুশ্চরিত্রা ও ভ্রষ্টা ছিল। সধনার সুগঠিত দেহ ও অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া সেই রমণী তাহারপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। ছলনাপূর্ব্বক আহারার্থে আহ্বান করতঃ তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পাপ বাসনা ব্যক্ত করিল। মহাপ্রাণ সধনা এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন এবং "দ্বার খুলিয়া দাও, আমি আমার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাই" বলিয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। মায়াবিনী বলিতে লাগিল "আমি তোমার,—আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে? আজ হইতে এই বাড়ী ঘর সমস্তই তোমার, আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, এখনই আমার স্বামীর মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া তোমাকে দিতেছি, তাহার স্বামী অন্যঘরে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। পিশাচী তখনই তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে তাহার মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া সধনার সম্মুখে রাখিল। সধনা এরূপ বীভৎস কাণ্ড দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

রমণী সধনার মন ভুলাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলে। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় সধনার মন কি কামিনীর বিলাস-বিভ্রমে কখনও বিচলিত হয়? যাহার মন একবার সেই মদনোন্মাদন মদনমোহনে মজিয়াছে তাঁহার মন কি কখনও কামিনীকাঞ্চনে মজে?—যাঁহার প্রাণ সেই অনন্ত প্রেমের আধার অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি, শ্যামসুন্দরের শ্যামরূপের পানে ছুটিয়াছে। তাঁহার মন কি কখনও কামিনীর কামকলুষিত তুচ্ছ দৈহিকরূপে বা তাহার কপটপ্রেমে মুগ্ধ হয়? কখনই না। সধনার মন প্রাণ পূর্ব্বেই সেই শিখিপুচ্ছধারী নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণের ভুবনভুলান রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাঁহার মন তাঁহাতে ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে নূতন করিয়া আর কিসে মুগ্ধ করিবে?

কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপে প্রকা-

শত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সধনার নিকট বার বার উপেক্ষিত হইয়া, কামুকী রমণী ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া তাঁহাকে সমুচিত প্রতিফল দিবার মানসে এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সে প্রতিবাসিদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা শীঘ্র আইস, চোরে আমার স্বামীকে হত্যা করতঃ যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে" ইত্যাদি। চীৎকার শব্দে প্রতিবাসীরা দৌড়াইয়া আসিয়া যেরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহারা সধনাকেই আততায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তাঁহাকে ধরিয়া বিচারালয়ে লইয়া গেল। বিচারক সধনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ইহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ?' সধনা মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, যদি সত্য কথা বলি তবে এই রমণীকে শূলে দিবে; যদিও রমণী অপরাধিনী তথাপি আমার নিকট অপরাধী নিরপরাধী সব সমান। সাধ্যানুসারে জীবের উপকার করাই আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং বিচারকের নিকট আমিই হত্যা করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব! পরে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে।

সধনা বিচারকের নিকট বলিলেন, "এই হত্যা আমিই করিয়াছি এবং ধনাদিও আমিই চুরি করিয়াছি। আহা ভক্তের কি প্রাণ! তার উপর এত অত্যাচার—এমন কি প্রাণনাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত হইল, তথাপি রমণীর প্রতি বিন্দুমাত্রও হিংসার উদয় হইল না। ধন্য ভক্ত! ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার পরদুঃখকাতরতা! নাই বা হইবে কেন? এরূপ হৃদয় না হইলে কি ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়? যে পরের দুঃখ বুঝে না,—যে পরকে দয়া করিতে পারে না, সে কি কখনও ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখা যায় না। আর মিথ্যার ভিত্তিই বা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্য সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়" ॥

কুলটার কুচক্র শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। গর্ব্বিতা রমণী নিজের কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি জানাইবার জন্য লোকের নিকট বলিতে লাগিল। "যাহার প্রণয় ভিখারিণী হইয়া স্বহস্তে স্বামীর শিরোচ্ছেদ করিয়াছি,—যাহাকে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিলাম, সে একটী বারও আমার দিকে তাকাইল না, আমাকে এতই তুচ্ছ জ্ঞান করিল? এখন তাহার সমুচিত ফলভোগ করুক।

একথা শীঘ্রই পরম্পর বিচারকের কর্ণগোচর হইল। বিচারক সধনাকে সাধু ভাবিয়া ছাড়িয়া দিয়া রমণীকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। মুক্ত হইয়া সধনা পুনরায় পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিলেন—আজ তাহার মনে বিপুল আনন্দ, মুখে কৃষ্ণগুণগাথা! সধনা যতই পুরীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ততই ভাবের তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কখনও হাসিতে হাসিতে, কখনও কাঁদিতে, কাঁদিতে কখনও বা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সধনা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজ সধনার নয়নে প্রেমধারা, অঙ্গে পুলক—আজ তাঁহার হৃদয়ের

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিয়াছে।

এদিগে ভগবান পাণ্ডাদিগকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "সধনা নামে আমার এক প্রিয় ভক্ত, আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিতেছে। তোমরা তাহাকে পাল্‌কীতে চড়াইয়া শীঘ্র আমার নিকট লইয়া আইস।" পাণ্ডারা, আদেশ পাইয়া পাল্‌কী লইয়া সধনার নিকট উপস্থিত হইল। সধনার কি সৌভাগ্য! স্বয়ং জগন্নাথ তাহার জন্য পাল্‌কি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভক্ত পথশ্রমে ক্লান্ত; ভগবান্ তাঁহার দুঃখ দেখিতে পারেন না; তাই তাঁহার কষ্ট দূর করিবার জন্য আজ তাহার নিকট দোলা পাঠাইলেন! ধন্য ভক্ত!

যথাসময়ে পাণ্ডারা সধনাকে শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সধনা অশ্রুনয়নে জগন্নাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে সে দারুময় মূর্ত্তি নাই। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার আরাধ্যদেবতা চিন্ময় শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি। এতদিন যাঁহার জন্য পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিয়াছেন,—যাঁহার জন্য চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া নির্জ্জনে রোদন করিয়াছেন,—যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া অরণ্যবাসী হইয় ছিলেন,— যাঁহার অভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব মনে হইত, সেই প্রাণের হইতেও প্রাণের—আদরের হইতেও আদরের নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণ আজ পীতধরা পরিহিত ত্রিভঙ্গিম ঠামে তাঁহার সম্মুখে। তাঁর গলে বনমালা, চূড়ায় শিখিপাখা করে মোহনবংশী, ইন্দু-বিনিন্দিত প্রফুল্ল মুখকমলে মৃদু মধুর, হাসি। তাঁর পদনখরের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কোটী সুধাংশু অংশু হইতেও দীপ্তিমান্।

সধনার হৃদয়-অন্ধকার আজ দূর হইয়া গেল। আজ তাঁহার হারানো নিধিকে ভিতরে বাহিরে পাইয়া আনন্দ উচ্ছ্বাসে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। আজ যে তাঁহার প্রেমের দেবতা তাহার হৃদয়কদম্বমূলে বাঁশরীবয়ানে তাঁহার মন প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছেন। জগৎ তাহার চক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। অন্তরে বাহিরে জাগিতেছেন শুধু সেই ননীচোরা। সধনার প্রাণে আজ যে আনন্দলহরী খেলা করিতেছে কে তাহা ধারণা করিবে? সধনা আনন্দসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। সাগরের কুল কিনারা আছে,—গভীরতার সীমা আছে, কিন্তু এ আনন্দ যে অপরিমেয়—এ যে অসীম, অতল!

যাহারা সধনাকে পথে কসাই বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল, তাহারা এখন সধনার ঐকান্তিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া সসম্মানে মস্তক অবনত করিল। তখন সকলেই তাঁহার চরণ ধূলি মাথায় দিয়া ও তাহার পাদোদক পান করিয়া জীবন কৃতার্থ মনে করিল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
দীন—প্রিয়নাথ।

——0——

নির্ভরতা।

পীনোন্নত পয়োধর হেরি যুবতীর,
নরকাগ্নি জ্বলে ধূধূ কামুকের প্রাণে,
কিন্তু, কথিত পুরাণে, হেরি পয়োধর,
ঋষি এক ত্যজেছিল ভিক্ষা অন্বেষণ,
শুনিল যখন, ভগবান রেখেছেন,
তারি তরে দুগ্ধ যোগাইয়া, যেই জন
জন্মিবে উদরে; ভেবে মনে যে দয়াল
না হইতে দেহ, করেছেন খাদ্যের সংস্থান
অবশ্যই রেখেছেন, মোর তরে কিছু।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

—0—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

সনাতন বেদশাস্ত্রের প্রতি হিন্দু মাত্রেরই আন্তরিক বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তি থাকা উচিত। বেদের উপদেশই, ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্তির "একমাত্র" অনুকূল উপায়। বেদের উপদেশ দ্বারাই আত্মজ্ঞানবিনাশিনী অবিদ্যা অপনোদিতা হয় এবং মোহপ্রদায়িনী সংসার বাসনা দূরে যায়। বেদের শরণাগত হইলে, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া পাপমল-বিরহিত পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে হিন্দুগণের অজ্ঞতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই অজ্ঞতার ফলে, আত্মমর্য্যাদাবোধের অভাবে অনেকে অহিন্দুর অনুকরণে প্রবৃত্ত। এই জন্যই বেদে বলিয়াছেন যে:—

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্ব্বিশ্লোকা
যন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্যন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে।
ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ (যজুর্ব্বেদ।)

মানবগণ! যিনি সকলের সমস্ত তাপ হরণ করতঃ সংসারদুঃখ বিনাশ করেন, যিনি ভক্তেরপ্রিয় ও ভক্তবৎসল, যিনি পরমধাম একবার মাত্র যাহাতে লীন হইলে আর পতন হয় না, সেই সর্ব্বদুঃখহারী পরব্রহ্মে ভক্তি-যুক্ত হও! নমস্কারাদি দ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ কর। বেদানুশীলনের দ্বারা পরাৎপর পরব্রহ্মে মন সমর্পণ করিলে তোমাদের অতুল কীর্ত্তি অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। পরমপদ লাভে সর্ব্বপ্রকার অতুলানন্দ অনুভব করিবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সেই জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের পুত্র। তাঁহারা সেই প্রভুর মহিমা প্রসাদেই স্বর্গধামে স্ব স্ব আধিপত্য করিতেছেন।

অতএব কিয়ৎকালের জন্যই বিষয়বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া সেই পরম পদার্থের অনুশরণে রত থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই কর্ত্তব্যের পরিপালনই, হিন্দুর রীতি, নীতি, সাধুতা ও সৎকর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক, তদ্দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের মহত্ব, ও পূর্ব্বমহাপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে অগ্রবর্ত্তিতা অবগত হইলে উল্লিখিত

অজ্ঞতার প্রশমন অসম্ভব নহে। অধিকন্তু নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের হাত এড়াইতে হইলেও, বেদাদি শাস্ত্রের বারম্বার আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে। বেদের অনুশীলনক্রমেই নানাবিধ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বেদ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও হিন্দুহৃদয়ে আজও যে বেদের প্রতি ভক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ইহাই বেদের মাহাত্ম্য বা "লীলাময়" চৈতন্যের লীলা। এইজন্যই অন্য বৃথা নামে অতিরঞ্জিত না করিয়া, এই প্রবন্ধের নাম "বৈদিক প্রসঙ্গ" রাখা হইল। বেদাদি সকল শাস্ত্রের ও সকল মতের আলোচনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহার ইচ্ছায় জগৎ চলিতেছে তাহার দয়ায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি অসম্ভব নহে।

"বেদ শব্দ ঈশ্বরবাচক কি না ?"

হিন্দুধর্ম্মের নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলেন যে, বেদ পৌরুষেয়, অর্থাৎ পুরুষ নির্ম্মিত, অপৌরুষেয় নহে। এইরূপে তাঁহারা হিন্দুর শ্রুতি, উপনিষদ, গীতা, দর্শন ও পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রকে ভ্রমকল্পিত ব্যাখ্যাকরতঃ বেদের ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে নানা স্থানে নানা জনের সংশয় জন্মাইয়া থাকেন। বেদ কাহাকে বলে ও বেদের স্বরূপ কি ? পুর্ব্বাপর বিচার না করিলে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান করিয়া বিচার করিলে, সকল ভ্রমের অপনোদনে শান্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে বেদ কাহাকে বলে ? ও বেদের স্বরূপ কি ? যাঁহারা বলেন যে, বেদ পুরুষনির্ম্মিত-হেতু কল্পিত সুতরাং ভ্রমপূর্ণ ; তাঁহাদের মতে সত্য ও অভ্রান্ত ধর্ম্ম থাকা অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু আলো না থাকিলে অন্ধকারজ্ঞান, সুখ না থাকিলে দুঃখজ্ঞান ও রজ্জু না থাকিলে সর্পজ্ঞান যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ সত্য না থাকিলে মিথ্যাজ্ঞান সম্ভব নহে। তাহাদের সেই সত্য পদার্থটা কি ? আর সেই সত্য এক কি বহু ?

ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে যে, পরাৎপর পরব্রহ্মই এই জগতের একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন কিছুই সত্য নহে ; তিনি জ্ঞানময় ও অনন্ত। এই জন্যই তৈত্তিরীয়োপনিষদে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। সামবেদে কথিত আছে যে, "সত্যমেব জয়তে" অর্থাৎ সত্যের জয় সর্ব্বত্র, সত্য এক ভিন্ন দুই কখন হইতে পারে না। সংশয়বাদীদের সত্য বস্তুটী ইহা ভিন্ন পৃথক আর কি হইতে পারে ? যদ্যপি ইহা ভিন্ন পৃথক ও "নূতন ধরণের" সত্যবস্তু তাঁহাদের কিছু থাকে, তবে সেই সত্যের অবস্থিতি কোথায় ? কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নূতন সত্য আবিষ্কার করাটা "শিলাশকলমঙ্কুরে" হইয়া থাকে। অর্থাৎ শিলাখণ্ডে যেমন কখনও অঙ্কুরোৎপাদন দেখা যায় না, তদ্রূপ সংশয়বাদীরা সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেও নূতন সত্যের আবির্ভাব হইবে না এবং হইতে পারে না। অতএব সত্যস্বরূপ পুর্ণ পর ব্রহ্ম এক, ইহা সকল শাস্ত্রানুমোদিত।

বেদ কাহাকে বলে ? পুর্ব্বে ভগবান্ আপস্তম্ভ বচনে নিরূপিত হইয়াছে যে, বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই অভেদে বেদনামে অভিহিত করা যায়। তন্মধ্যে কর্ম্ম লোকান্তরে ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহকালেই অবিদ্যা

বীজ বিদূরিত করিয়া দেয়। "উপনিষদ" উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্‌ধাতু ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া উপনিষদ পদ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা দ্বারা অবিদ্যার সমূলে নাশ হইয়া ব্রহ্ম বিজ্ঞান সাধিত হয়। জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নাশ হয়। অতএব "উপনিষদ" শব্দটী জ্ঞান বাচক হইতেছে। "বেদান্ত" বেদস্য অন্তঃ অর্থে বেদান্ত হয়। জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্তভাগ বিধায়ে, "বেদান্ত" শব্দে জ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইতেছে। "পুরাণ" ভূতকাল-বাচী পুরাণ বিদ্যা কিনা পুরাতনঃ বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যা বেদই বুঝাইতেছে। যেহেতু বেদ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ উপনিষদসমন্বিত। অতএব "পুরাণ" অর্থে পুরাতন বিদ্যা কিনা বেদ অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, বেদ-বাক্যে উপনিষদ অর্থ বুঝায় নাই। কিন্তু সামবেদের 'দশমে দিবসে' যজ্ঞান্তে পুরাণ বিদ্যা বেদঃ এই মন্ত্রের পুর্ব্ব প্রকরণে ঋগ্বেদাদি বেদ চতুষ্টয় "ইত্যস্ত শ্রবণং" স্থলে বেদ-বাক্য দ্বারা উপনিসদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "দর্শন" (দৃশ) অর্থে জ্ঞানই বুঝায়। যেহেতু আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু থাকিলেও, যাহার গুণে দর্শন কার্য্য সমাধা হয়, সেই বস্তুই চক্ষু পদ-বাচ্য। সেই সূক্ষ্ম বস্তুই চক্ষুরিন্দ্রিয়। সেই সূক্ষ্ম বস্তুর অভাবে, চক্ষু থাকিলেও না থাকা মধ্যে পরিগণিত হয়, (যেমন রাম, শ্যাম, যত্নর 'ক' পড়িতে কপাল ফাটে।) এই জন্যই বাহিরের চক্ষু যন্ত্র বিশেষ মাত্র। অতএব দেখা বলিলেই দেখা হয় না, দেখিবার বস্তু থাকা চাই, সেই বস্তুই জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইহেতু "দর্শন" অর্থে জ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইতেছে। "যেমন হংস" বিপরীত "সোহহং" (শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জীবের সর্ব্বদাই যাহা উচ্চারিত হইতেছে।) তদ্রূপ তাগী বিপরীত "গীতা"। দ্বাদশবার গী—তাগী—তাগী—তাগী—উচ্চারণ করিলেই গীতার অর্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানব কামনা বাসনা পরিশূন্যতায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ কর। আবার কামনা বাসনা ত্যাগ বলিলেই মুখের কথায় ত্যাগ হয় না। কামনা বা বাসনার অভাব বা ত্যাগই সন্ন্যাস নামে অভিহিত হয়। কামনা থাকিলে ত্যাগ বা সন্ন্যাস হয় না। যাহারা অজ্ঞান, তাহারাই কামনাযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। জ্ঞানবান যথাকামভাবে অবস্থান করিতে পারে না। এইজন্যই জ্ঞানে অকাম, আর অজ্ঞানে সকাম সর্ব্বত্রই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব কামনা বা বাসনা (অজ্ঞান) অন্য বস্তুর সাহায্য ব্যতীত নিরপেক্ষ বা স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া ত্যাগ হয় না। যে বস্তুর অনুকূলতায় কামনা-বাসনা (অজ্ঞান) ত্যাগ হয়, সেই বস্তুই জ্ঞান। অতএব যে "ত্যাগী" সেই জ্ঞানী, বিপরীত পক্ষে যে "গীতা" সেই জ্ঞানী বা জ্ঞানবান্‌ এই জন্যই ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন যে—

যোহভিমানেন গর্ব্বেন গীতা নিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূত সংপ্লবম্‌॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংজ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া গর্ব্ব সহকারে গীতার নিন্দা করে, সে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিয়া থাকে।

"শ্রুতি" আগম বা আপ্তবাক্যের অর্থ দ্বারাই শ্রুতি বুঝাইয়া থাকে। সৃষ্টিকালে

(সর্গাদি কালে) দেবগণ ও ঋষিগণ, ঈশ্বরের নিকট যে সকল বাক্য পাইয়াছিলেন, তাহাকেই আগম বা আপ্তবাক্য বলে। এই আপ্তবাক্য বা আগম দ্বারা শ্রুতি বা বেদকেই বুঝায়। সাংখ্যমতে আপ্তবাক্য অর্থাৎ শাব্দপ্রমাণ প্রমাণের অন্তর্ভূত। সংপুরুষের কথা হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই আপ্তবাক্য, আগম বা শাব্দপ্রমাণ। অতএব সং পুরুষ অর্থাং ঈশ্বরবাক্যই শ্রুতি, আর শ্রুতি দ্বারাই জ্ঞান, অতএব "শ্রুতি" অর্থে জ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইতেছে।

"প্রমাণ" যাহা দ্বারা জ্ঞান জন্মায়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে প্রতিপাদক তাহাকেই প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, পূর্ব্ববং, শেষবং, ও সামান্যতো দৃষ্ট; এইরূপে জন্য, জনক, ব্যাপ্য, ব্যাপক, উদ্দেশ্য, বিধেয়, সাধ্য, হেতু, প্রতিযোগী, অনুযোগী, আধার, আধেয়, সামান্য, বিশেষ, পরা, অপরা, কার্য্য, কারণ, সমবায়ী, অসমবায়ী, হেয়, উপাদেয়, ও উপলব্ধ, পক্ষান্তরে মতি, কেবল, নির্জ্জরা, সুনৃত, লাভ, মল, উপায়, স্বেদন, মর্দ্দন, মুর্চ্ছন, স্ফোট, ও নাদাভিব্যঙ্গ ইত্যাদি (দু পাঁচ কাহন) শব্দ সমস্তই জ্ঞানের জন্য বা জ্ঞানের হেতু হইতেছে। জ্ঞানের অতিরিক্ত কেহই নহে। আবার যাহা জ্ঞানের জন্য হইয়া থাকে, অর্থাং যাহা দ্বারা জ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, তাহাও শ্রেষ্ঠবিধায়ে আদরণীয় হয়। অতএব উপরোক্ত প্রমাণ উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্য—

পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন, যে "যাবদ্ বিজ্ঞান সামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠং বিবর্দ্ধতে"। কিন্তু যাহা প্রমাণ, তাহা চিরদিনই প্রমাণ। কাহার অনুরোধে কিম্বা বিরাট্ তর্কজালে, তাহা কখন প্রমাণ বা কখন অপ্রমাণ কদাচ হইবে না।

জ্ঞান চিরদিনই স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ম্প্রকাশ। কোন কারণান্তরের অপেক্ষা জ্ঞানে নাই। জ্ঞান ব্রহ্মত্বের অভিজ্ঞাপক, তাহার কারণ নহে; যেহেতু জ্ঞান বা ব্রহ্মত্ব নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানই সাধ্য, জ্ঞানই উপাস্য, এবং জ্ঞানই নিত্যানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম। শ্রুতি বলেন, "জ্ঞানময়ং তপঃ"। জ্ঞানই সবিতৃদেবতা ও বিরাট্ বিশ্বের রচয়িতা। জ্ঞানের শক্তিচমংকারিত্বই জগং রূপে বিকশিতা, আর তাহাই মায়ারূপে আরাধিতা। মায়ার অবসানেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মের সত্তা।

অতএব বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রুতি, গীতা, দর্শন ও পুরাণ ইত্যাদি কেবল রহস্যপর্য্যায় শব্দ মাত্র। সমস্তই জ্ঞানবাচক হইয়া, সকলের বেদত্ব প্রতিপাদিত হইল। এইজন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে যে:—

"স পুরাণান্ পঞ্চবেদান শাস্ত্রানি বিবিধানি- চ"।

অর্থাং মহাভারতাদি সমস্ত পুরাণ ও ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ সমুদয় পাঁচ বেদ হইতেছে।

শাস্ত্রের সার অর্থ সহজ ভাষায় আনিলেই সকল ভ্রমের শান্তি হয়। অন্যথায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য ও বৈদিক সংকর্ম্মের ফলাফল না বুঝিয়া মুখের কথায় বেদ কল্পিত, উপনিষদ ভ্রমমাত্র, ও দর্শন বা গীতা বৃথামাত্র বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষণা বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের সংশয় জন্মান, হিন্দুর পক্ষে সমীচীনতা

নহে। আবার সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া, কি উপায়ে সংসাররূপিনী মহতী মায়ার হাত এড়াইয়া চিত্তজয়ী হওয়া যায়, তাহার উপদেশে মন না দিয়া, নানা রকম বিরাট্ তর্কের অবতারণা করিলেও, ভগবানের দয়া পাওয়া যায় না। আর ঐরূপ তর্ককে মহা-বাক্যের বিচারও বলে না। পরন্তু উহা দ্বারা শান্তির স্থলে বিপ্লব, এবং সন্তোষের স্থলে অসন্তোষ জন্মাইয়া থাকে। এই সকল কারণেই আজকাল অনেকে হিন্দুশাস্ত্রের উপর শ্রীত-শ্রদ্ধ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছেন।

অতএব বর্ত্তমান সময়ে যদ্যপি হিন্দু ভ্রাতাগণকে কর্ত্তব্যের নিকট অঋণী হইতে হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদে দেবতা ও অসুরের পরস্পর বিবাদের সময় কি বলিয়াছেন, একবার মনঃসংযোগ সহকারে দেখা উচিত; যথাঃ—

উতত্রুতুংতু নো নিদো নিরণ্যতশ্চিরাদত।
মধানা ইংদ্র ইন্দুবঃ।
বৃহস্পতে তপুষশ্নেব বিধ্য—
বৃকদ্বরসো অসুরস্য বীরান্।
উজ্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পংচ জনা মম
হোত্রং জুষধ্বং।
তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনা সুরাঁ—
অভিদেবা অসাম।
(ঋগ্বদ ১০।৫৩।৪, ২।৩০।৪, ১।৪।৫)

দেবগণ বলিতেছেন যে,—"আমরা অজ্ঞানী অসুরের উপদ্রবে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আমাদের মঙ্গলকারিগণ (পুরোহিত) ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিয়া স্তুতি করুন। যেন দেবদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী, বেদনিন্দুক অজ্ঞানান্ধ অসুরেরা এইদেশে বা অন্যত্র মুখের আশ্বাস ও যত্ন অভ্যর্থনা না পায়। এইরূপ হইলেই তাহারা পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত হইবে। অন্যথায় অসুরগণ ধর্ম্মের ক্ষয় করতঃ পরিণামে আমাদের অর্থাৎ সকল দেবতার নাশক হইবে। হে বৃহস্পতে, তুমি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞান অসুরদের অজ্ঞান দূর কর। হে পঞ্চজনগণ! তোমরা অন্নভোজী ও যজ্ঞাধিকারী, আমাদের হোমে আসিয়া অবস্থান কর। আমরা সকলে একমত হইয়া, একমনে যে বাক্য উচ্চারণ করিলে ধর্ম্মদ্বেষী অজ্ঞানী অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব, সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বাক্য উচ্চারণ করি এস। তাহা হইলে অসুরদের নিশ্চয় পরাজয় ঘটিবে ও দেশে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হইবে। ধর্ম্মেতেই জয় ও পুণ্য, আর অধর্ম্মেতে পাপ ও পরাজয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

প্রেমে সমাধি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাসাগরে অঙ্গ ডুবাইয়া কৃষ্ণধন মহা সাধনার আসনে বসিয়াছিল। যে সাধনায় জীব প্রাণের জিনিষ লাভ করে,—যে সাধনায় মানুষ ইহ জগতেই

শান্তির সরস স্পর্শ অনুভব করে, কৃষ্ণধন আজ সেই সাধনায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোনও চিন্তাই আজ তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিতেছে না। কেবল নাম। চারিদিকেই আজ মায়ের নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক মহাসঙ্গীতে বিশ্ব পরিপূর্ণ, পাখীর কলরবে তাঁরই নাম, বাতাসের সন্ সন্ শব্দে তাঁরই নাম, নদীর কুল্ কুল সঙ্গীতে তাঁরই নাম, নির্ঝরিণীর মধুর নিক্কনেও তাঁরই নাম? আর সমগ্র পৃথিবীর উন্মুক্ত বক্ষের মাঝারেও তাঁরই নাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণধন আনন্দের অমৃত সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে. তখন কি আর আহারের কথা মনে থাকে? নিদ্রার কথা মনে থাকে? কৃষ্ণ পূর্ণিমার আলোকে স্নান করিয়া আসনে উপবেশন করিয়াছিল: আজ অন্ধকার! পাখী আর গান করে না, নদীও আর তান ধরে না। সকলেই নীরব, নিস্পন্দ,—ভয়ে জড়সড়। আজ অমাবস্যা। এ আঁধারে কি আর আলো ফুটিবে না? এ কান্নার মাঝারে কি আর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে না? কে জানে? জগতে কি এমনই হয়? প্রথমে আশার স্নিগ্ধ আলো মানবকে পাগল করিয়া দেয়; আমি তাহাকে পাইব,—আমি তাঁহাকে লাভ করিব; মানুষ মনে করে আমার আরাধ্যদেবতা নিশ্চয়ই আসিবেন। কিন্তু কৈ? আবার নিরাশা; আর বুঝি দেখা হইল না,—আর বুঝি পাইলাম না। আমানিশার আঁধারে হৃদয় পূর্ণ হয়; মানুষ অন্ধ আঁখিতে এদিক সেদিক হাতড়ায়, কিন্তু হারান জিনিষ আর মিলে না। তাহার পরে আবার আলো আসে কি? সে আলোতে সেই হারান মাণিক—সেই চিরবাঞ্ছিত ধন আর কি পাওয়া যায়? যায় বৈ কি। আবার আলো আসে, সে আলো সেই পূর্ণিমার আলো নয়, সে সেই মাণিকেরই আলো! অন্ধের নয়ন খুলিয়া যায়, চক্ষে পড়ে সেই মণির আলো, নয়ন জুড়াইয়া যায়, হৃদয় শীতল হয়। তাই আবার আলো আসে, জীবের ভুল ধরাইয়া দিবার জন্য, ব্যথিত হৃদয়ে শান্তির বারি সিঞ্চন করিবার জন্য আবার আলো আসে। বলে, এই দেখ আমি আছি, তোর বড় নিকটে রহিয়াছি, আমাকে তুই চিনিতে পারিস নাই?

আজ কৃষ্ণধন সেই অমাবস্যার অন্ধকারে খুঁজিতেছিল তার মাণিক,—তার হারান ধন। সহসা কৃষ্ণধন কাঁপিয়া উঠিল না? ওকি? তাহার প্রতি লোমকূপ হইতে জ্যোতির এক একটী স্নিগ্ধরশ্মি নির্গত হইতেছে না? তাই তো!

কৃষ্ণধনের সর্ব্ব শরীর হইতেই জ্যোতি বাহির হইতেছে। কি স্নিগ্ধ সে জ্যোতি মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে প্রকাণ্ড একটী জ্যোতি বাহির হইল। শরীরের সমস্ত জ্যোতিগুলিও বাহির হইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। পরে সকল জ্যোতির রশ্মিগুলি একীভূত হইয়া জ্যোতির এক গোলাকার পিণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। সেই জ্যোতির্গোলক ক্রমেই নিকটে আসিয়া অষ্টমবর্ষীয়া এক কুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কৃষ্ণধন বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল সেই মূর্ত্তি। আহা, কি সে রূপ? তার সরল শিশুর মত কোমল চাহনি, শিশুর মত নধর

অঙ্গ। কাঁচা অঙ্গের সে লাবণী যেন সমস্ত জগতের বক্ষে ঝরিয়া পরিতেছে! কি মধুর হাসিটী অধরে খেলা করিতেছে! মনে হয় চির জন্ম জন্ম ধরিয়া ওকে বুকে করিয়া রাখি, আদর করি, সোহাগ করি, মুখে চুমো খাই।

মা আমার বালিকার বেশে আসিয়াছেন। তাই আসেন। নিজের সৌন্দর্য্যে নিজে বিভোর' আপনার আনন্দে আপনি পাগল! হাসিতে সুধার ফোয়ারা ছুটাইয়া, চঞ্চল চাহনিতে কোটি কোটি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া, চরণে নূপুরের রুনু ঝুনু বোল তুলিয়া, মা আমার আসিয়াছেন। অধম জীব, তাহা না হইলে যে ভয় পাবি তোরা, তাঁহার সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পালাইয়া যাবি তোরা। তাই তিনি আসেন বালিকা মূর্ত্তিতে। তোদের করুণা দিতে,—তোদের অভয় দিতে,—প্রেমের মধুর স্পর্শে তোদের চেতন করিয়া দিতে,—তাই তিনি আসেন বালিকা মূর্ত্তিতে। কত আবদার করেন, কত কিছু তোদের কাছে চান; সমস্ত বিশ্ব যার, তোদের ভালবাসায়, তোদের প্রাণের টানে, চাঁপাকলির মত কোমল হাত দু'খানি পাতিয়া বলেন, দাও গো আমায় দাও; তোমরা যা দিয়া খুসী হও তাই দাও। না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যান, বালিকার উপরে তো রাগ করা চলে না, তাই তিনি আসেন বালিকা মূর্ত্তিতে।

আজও তাই আসিয়াছেন। প্রেমে ঢল ঢল আঁখি কৃষ্ণধনের মুখের উপরে রাখিয়া বলিলেন, বাছা! আমায় ডাকিয়াছ? 'হ্যাঁ মা,'—এ মূর্ত্তি দেখিয়া কৃষ্ণের আর সাধ হইল না উহাকে পরীক্ষা করিতে; হৃদয় হইতেই কে যেন বলিয়া দিল এই ই তোমার ইষ্টমূর্ত্তি।

'কেন ডাকিয়াছ বাবা'?
'সন্তান মাকে ডাকে কেন মা'?
'তুমিই বল বাছা কেন ডাকে'?

'ডাকতে ভাল লাগে, তাই ডাকে, প্রাণে শান্তি পায়, হৃদয়ে শক্তি জাগে; তোমার নামের স্রোতে ভাসিয়া চলিলে, আনন্দের স্ফুর্ত্তিতে শরীর অবশ হইয়া যায় মা, তাই ডাকে; আর, 'নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়,'—তোমার অঙ্গের স্পর্শ লাভ করিয়া সংসার দাব-দগ্ধ এ তাপিত প্রাণ শীতল করিতে ডাকে মা'।

'আয় তবে বাছা, কোলে আয়; মায়ের স্পর্শে সন্তানের সুখ হয়, সন্তানের স্পর্শে কি মায়ের সুখ হয় না বাপ?

দেবী কৃষ্ণধনকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কৃষ্ণধনের অঙ্গ এবার সত্য সত্যই অবশ হইল।

দেবী বলিলেন,—চাহিবার আর কি কিছুই নাই বাছা?"

কৃষ্ণধন বলিল, তোমাকে পাইয়াছি আর কি চাহিব মা? তবে যদি দয়া করিয়াছ তোমার সেই ত্রিভুবনজোরা মূর্ত্তিতে একবার দেখা দেও।

'সে মূর্ত্তি দেখিয়া কি তুমি স্থির থাকিতে পারিবে'?

'পারি বা না পারি তবুও একবার দেখিতে সাধ হয়'।

'আচ্ছা, তাহাই হউক,—এই দেখ আমার সেই রূপ'।

কৃষ্ণধন কি দেখিল? দেখিল, সেই বালিকা মূর্ত্তি, সাত্বিক ভাবের পূর্ণ অবতার অষ্টম বর্ষীয়া সেই বালিকা মূর্ত্তি। আজ এ কি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল! মস্তকের কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, বিশাল দুই নয়ন হইতে বহ্নির স্ফুলিঙ্গসম ধক্ ধক্ দুই শিখা সমস্ত বিশ্বকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থ তৃতীয় চক্ষু জগতের আদ্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, লেলিহান জিহ্বা রক্ত উদ্গীরণ করিয়া অধর প্রান্ত রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে, আলুলায়িত কুন্তল আকাশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এক হস্তে অসি বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছে, আর এক হস্ত মাভৈঃ মাভৈঃ রব ঘোষণা করিতে গগন পানে উত্থিত হইয়াছে, এক হস্তে নরশির আর এক হস্ত শান্ত মূর্ত্তিতে জগতের জীবকে বর প্রদানে উদ্যত; বক্ষে নরমুণ্ড মালা, কটিতে নরকরের কাঁচলী, পদভরে মেদিনী কম্পিতা। মূর্ত্তিমান প্রলয় আজ কৃষ্ণধনের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এ মূর্ত্তি কে সহ্য করিতে পারে? কৃষ্ণধন চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন সময় 'ভয় নাই' বলিয়া শ্যামানন্দ ছুটিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ যখন চক্ষু মেলিল তখন দেখিল সে স্নেহময় গুরুর ক্রোড়-দেশে শুইয়া রহিয়াছে, আর গুরু মধুর কণ্ঠে বলিতেছেন, ভয় পাইয়াছ বৎস?

---0---

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কি সুখেই দিনগুলি যাইতে লাগিল। কৃষ্ণধন হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছে। যাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই সেই দেবী মূর্ত্তি তাহার সাধনার ফলে,—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে আজ তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। একি কম সুখের কথা! কিন্তু এ সুখও বেশী-দিন রহিল না। প্রথম কয়েক দিন বড় শান্তিতেই দিনগুলি গিয়াছিল। শ্যামানন্দ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন, তিনি মনেও করিতে পারেন নাই, যে—কৃষ্ণধন এত শীঘ্রই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে।

কৃষ্ণধনের মনে আজকাল আবার এক নূতন সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল আমার শরীরের ভিতরে যে জিনিষটা ছিল সে জিনিষটা বাহির হইয়া গেল, কৈ, আমি তো কোনও অভাব অনুভব করিতেছি না! সে তাহার গুরুকে এ কথা বলিল। তিনি বলিলেন, প্রকৃত জ্ঞান না হইলে তো বুঝিতে পারিবে না বাবা; আমি তোমাকে অজ্ঞান বলিতেছি না, তুমি বোধহয় জান—কেবল তুমি কেন অনেকেই জানে, তোমার এ অভাব অভাব নয়। তুমি মনে করিতেছ, যে শক্তিটা তোমার শরীরের ভিতরে ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আইসে নাই; কিন্তু তাহা নয়। 'সর্ব্বমর্য়খল্বিদং ব্রহ্ম'—তিনি

সর্ব্ব-স্থানে বিরাজিত এখনও তোমার ভিতরেই আছেন। তাই বলিতেছিলাম এ অভাব অভাব নয়, তোমার বুঝিবার ভ্রম। সকলেই জানে তিনি সকল স্থানেই আছেন, কিন্তু কয়জনে প্রকৃত জানে? জানা শব্দের অর্থ বই পড়িয়া বা কাহারও কাছে শুনিয়া জানা নহে, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা। যে দিন প্রকৃতই জানিতে পারিবে তিনি সর্ব্বস্থানে বিরাজিত সেদিন আর এ সংশয় থাকিবে না। জ্ঞানীগুরুর অনুসন্ধান কর, তিনি তোমায় বৈদিক সন্ন্যাস দিবেন, তখন বুঝিতে পারিবে তিনি তোমার মুখে মুখ, বুকে বুক, তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া তোমাতে চির-আলিঙ্গনবদ্ধ রহিয়াছেন। আর বিচ্ছেদের ভয় থাকিবে না,—আর বঁধুর অসহ্য বিরহ দাহে অহরহ মন দগ্ধ হইবে না। আহা, কি সে সুখ, যে পাইয়াছে সেই জানে!

কৃষ্ণধন গুরুর আদেশে জ্ঞানীগুরু সন্ধানে আবার নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ তাহার মনে হইল নর্ম্মদার তীর সাধনার প্রশস্ত স্থান, সেই সকল স্থানে হয় তো জ্ঞানীগুরুর সন্ধান মিলিতে পারে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া কৃষ্ণধন নবীন উৎসাহে পথ চলিতে লাগিল।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে নীলাপুর গ্রাম। কৃষ্ণধন এক দিন রাত্রে সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইল। গৃহস্থের একটী বালবিধবা কন্যা ছিল, সে কৃষ্ণকে বড়ই আদর যত্ন করিতে লাগিল। বিধবার নাম ছিল মলিনা। মলিনা রূপবতী, কৃষ্ণধনও রূপবান্, অজ্ঞাতসারে বোধহয় তাই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এক দিন দুইদিন করিয়া কয়েকদিন চলিয়া গেল, কৃষ্ণধন গন্তব্য স্থানে যাইতে চাহে; মলিনা বলে,—'আরও কিছু দিন থাক না'। কৃষ্ণের মনে কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই; মলিনার মনে মনে বোধহয় কিছু ছিল। সে একদিন তো তাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াই ফেলিল। বলিল, দেখ, কেন ঐ নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজিতে চলিয়াছ? এ রূপ লইয়া এবয়সে এ কাজ শোভা পায় না। আমার হাতে কতকগুলি টাকা আছে, তাহাতেই আমাদের দুইজনের আজীবন চলিয়া যাইবে। চল আমরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোথাও লুকাইয়া মনের সুখে বসবাস করিতে থাকি। কৃষ্ণধন অসম্মত হইল। কিন্তু, হায়, রূপ! তুমি কি না করিতে পার? জগতের ইতিহাসে তোমার প্রতাপে কত কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে জান কি? আজ তুমি আবার সেই পাপপ্রভা লইয়া কৃষ্ণধনের ধর্ম্মনাশ করিতে চলিয়াছ, পারিবে কি? তুমি বোধহয় জান না তাহার পিছনে কি এক মহাশক্তি তাহাকে আপদে বিপদে রক্ষা করিতেছে। নিজের সর্ব্বনাশ করিও না, ভগবানের মহাবজ্র কেন সাধ করিয়া বুক পাতিয়া লও? —যাইও না তাহার কাছে।

কিন্তু কে শোনে? মলিনা মজিয়াছে। তাহার বিলোল কটাক্ষে কৃষ্ণধনকেও মজাইতে বসাইয়াছে। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া,—অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, মলিনা কৃষ্ণের মন গলাইল। কৃষ্ণধন অবশেষে মলিনার প্রস্তাবে সম্মত হইল। কোথায় গেল গুরু অন্বেষণের সে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কোথায় গেল সে প্রাণভরা ব্যাকুলতা;

রূপের অনলে পুড়িয়া সব ছাই হইয়া গেল। একদিন নিশীথ সময়ে মলিনা কৃষ্ণধনকে লইয়া পলাইল।

পূর্ব্বদিক ফরসা হয় হয়। এখনও প্রভাত হয় নাই। মলিনা আগে ২ ছুটিয়াছে, কৃষ্ণধন তাহার পিছনে। মলিনার নিকটে রাস্তা ঘাট পরিচিত, তাই মলিনা আগে গিয়াছে। কৃষ্ণের মাথার উপর দিয়া একটা কাক 'কা' 'কা' করিয়া ডাকিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিল। কৃষ্ণ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার গুরু, যে গুরু স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণধন অবাক হইল। কৃষ্ণকে অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া তিনি বিপরীত দিকে দৌড়িলেন। কৃষ্ণও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। মলিনা ফিরিয়া চাহিয়া দেখে কৃষ্ণধন অপর এক ব্যক্তির পশ্চাতে পরিত্রাহি দৌড়াইতেছে। সেও তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ 'ওগো আমায় ফেলিয়া কোথা যাও গো, তুমি ছাড়া আমার আর যে কেহ নাই গো' আমায় এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া যাবে গো' ইত্যাদি বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু যে এক মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণধন তাহার গুরুর পশ্চাৎ ছুটিয়াছে, আর কাহার আহ্বান সে শোনে, সে গতিও আর কে রোধ করে? মলিনা অনেক পিছাইয়া পড়িল। জাল ফেলিয়াছিল, ধরি ধরি করিয়াও আর ধরা হইল না।

সম্মুখেই সন্ন্যাসীর আশ্রম। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার তটদেশে, নিভৃত নিকুঞ্জের অন্তরালে কি সুন্দর সে আশ্রম! সেই আশ্রমে গুরুদেবের চরণে মাথা রাখিয়া আজ কৃষ্ণধন নয়নজলে মাটী ভিজাইতেছে। গুরু জ্ঞানানন্দ আজ তাহার চাঁচর চুল কাটিয়া দিলেন, সন্ন্যাসীর কৌষিক বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। আজ দণ্ড কমণ্ডলু হাতে দিয়া জ্ঞানানন্দ কৃষ্ণধনকে জ্ঞানের কাঙ্গাল সাজাইলেন।

আহা, কি মহিমাময় সে দৃশ্য,—আজ গুরু ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বেদধ্বনি করিতেছেন, যেন কি এক মহাশক্তিকে আহ্বান করিতে আজানুলম্বিত দুইবাহু ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। ভাবে সমস্ত শরীরের রোমাবলী দণ্ডায়মান হইয়াছে। তিনি সেই ঢল ঢল বক্ষে কৃষ্ণধনকে চাপিয়া ধরিলেন। যে মহাশক্তি তাঁহার হৃদয়ে আসিয়াছিল, তাহা কৃষ্ণধনের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ অচৈতন্য হইয়া গুরুর বুকের উপরে ঢলিয়া পড়িল।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:0:—

পাপ-পুণ্য-তত্ত্ব।

(বেদান্ত দর্শন।)

"এই দ্বৈত্য ব্যঞ্জক পৃথিবীতে পাপ পুণ্য ব্যাপার বলিয়া কিছুই নাই। উহা মাত্র বাক্যেই কথিত হয়। উহা শুধু মনেরই ধর্ম্ম।"—ভাগবতম্, ১১।২৭।

"যিনি বুদ্ধি-যোগযুক্ত, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন।"—গীতা ২।৫০।

যিনিই জাগতিক প্রপঞ্চ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারই নিকট ইহা প্রতীত হইয়াছে যে প্রকৃতি যেন তদীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী শক্তির অনুল্লঙ্ঘনীয় দ্বৈতপ্রভাবে দ্বিগুণিতা। পরিদৃশ্যমান জগতের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে এই বিরুদ্ধধর্ম্মা দুইটী শক্তিতে নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। উহাদের অনেক প্রকার নাম; যথা, সৎ-অসৎ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, আলোক-অন্ধকার, উত্তাপ-শৈত্য-আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ভক্তি-অভক্তি, সুখ-দুঃখ, স্বাস্থ্য-ব্যাধি, জীবন-মৃত্যু। একপক্ষে আমরা দেখি যে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে সততা, সদ্গুণ, জ্ঞান, প্রেম, অন্মোৎসর্গ, স্বাস্থ্য ও যে সমুদয় দ্রব্যের উপভোগে জীবন-ধারণ সার্থক হয় বা জীবন মধুময় হইয়া উঠে, তৎ সমুদয়ের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে: অপরপক্ষে আবার ইহাও দেখি যে অসৎ, পাপ, অজ্ঞান, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, হত্যা, মহামারী, ব্যাধি, প্লেগ, ভূমিকম্প ও যে সমুদয় ব্যাপারে জীবন তিক্ত, অসুখী, দুঃখময় হইয়া থাকে তাহাও রহিয়াছে। আমরা প্রকৃতির দুইটী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। একটী যেন তাহার আনন্দময়ী মূর্ত্তি, অপরটী ভয়ঙ্করা। প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে সুখ-শান্তি দিবার জন্য প্রস্তুত, ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকৃতি যেন উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে করিয়া সংহার কার্য্যে উদ্যতা। এক হস্তে সুখ-শান্তি, অন্য হস্তে সংহার! প্রকৃতির এই দুইটী বিভাব (Aspect) অস্বীকার করিবার যো নাই। ইহ জীবনে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমরা বাধ্য হইয়া উপরোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের একটা-না-একটা অনুভব করিতেছি। যখন আমরা প্রকৃতির প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখি, তখনই আমরা আনন্দে বিভোর হইয়া আপনাদিগকে মহা সুখী মনে করি। কিন্তু অন্য মূর্ত্তিটী দেখিলেই ভয়ে আমাদিগের হৃদয় কাঁপিতে থাকে ও শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। চিরকালই প্রকৃতি এই দুইটী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। এখন আমরা যাহা দেখিতেছি, সহস্র ২ বৎসর পূর্ব্বেও তাহা দেখা গিয়াছিল ও সহস্র ২ বৎসর পরেও তাহা যাইবে। কত শত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে,—কত শত জাতির তিরোভাব হইয়াছে কিন্তু প্রাকৃতিক গতির কখন কি ব্যতিক্রম হইয়াছে? তাহা কখনই হয় নাই। প্রকৃতির নিয়ম চিরস্থায়ী, তাহার গতি শাশ্বতী। প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির এই দুইটী বিভাব এখন যেরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইতেছে সেকালেও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছিল। প্রপঞ্চভূত জগতের এই সমুদয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-নিচয়ের ও বিরুদ্ধ-ধর্ম্মা ঘটনাবলীর হেতু কি তাহা নিরূপণ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলিতেছে।

প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিকগণ প্রকৃতির এই সৎ-অসৎ-বিভাব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিরূপ করিয়া এই দ্বৈতের সৃজন হইয়াছিল ও ইহার কারণই বা কি, তাঁহারা তাহারও নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মানব-চিত্ত পাপ-পুণ্য-তত্ত্বের যথার্থ মিমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অসৎ বস্তু জগতে কেন থাকে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দুঃখ ও যাতনা, অন্যায়ানুষ্ঠান ও পাপই বা কেন থাকে, আর কি উপায়েই বা ইহাদিগের নিরাকরণ হইতে পারে, মনুষ্যগণ এই সমুদয় তথ্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম, মত, ও দর্শনশাস্ত্র এই অনুসন্ধান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই সমুদয় অনুসন্ধান, চেষ্টা ও ব্যাখ্যা তিনটী নামে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথমতঃ শুভদর্শিনী (Optimistic), দ্বিতীয়তঃ অশুভ-দর্শিনী (Pessimistic); তৃতীয়তঃ, দ্বৈত-বিষয়িনী (Monistic)। প্রাচীন পারসীক বা ইরাণী জাতির জেন্দ্-অবেস্তা নামক ধর্ম্মগ্রন্থে আমরা প্রকৃতির দ্বৈত-বিভাগের শুভদর্শিনী ব্যাখ্যা সর্ব্ব প্রথমে জানিতে পাই। ঐ ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাচীন। ঐ সকল প্রাচীন পারসীক শুভদর্শিগণ প্রকৃতির ভাল মন্দ দুই প্রকার শক্তি দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহারা স্থির করেন যে, ঐ দুই প্রকার শক্তি চিরদিনই আছে ও দুই জন পৃথক ব্যক্তি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নাম—আহুর মস্‌দ। যিনি অসৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নাম—আহ্মন্। ব্রহ্মাণ্ডের এক অর্দ্ধাংশের সৃষ্টিকর্ত্তা আহুরমস্‌দ, ইনি শুভানুধ্যায়ী ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু সৎ ইনিই সে সমুদয়ের প্রবর্ত্তক, ইনিই সমুদয় সচ্চিন্তার প্রেরণা করিয়া থাকেন। অপর অর্দ্ধাংশ ও যাহা কিছু অসৎ সে সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা আহ্মন্। ইনি অশুভানুধ্যায়ী।

প্রথমে এই দুই জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল ও ইঁহারা একত্র বাস করিতেন। কিন্তু পরে আহুরমস্‌দর সহিত আহ্মনের বিরোধ হইল। আহ্মন পৃথক হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার সহিত চির শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। শুভানুধ্যায়ী ঈশ্বর আহুরমস্‌দ জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদ করিলে, অহিতকামী আহ্মন্ সেই সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে পাপ ও যাবতীয় অসদ্ বস্তুর বীজ কৌশল ক্রমে বপন করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। আহ্মনকেই ধূর্ত্ত সর্প বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আহুরমস্‌দ ইহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। তথাপি ইনি সেই পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত বিরোধ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। সমস্ত মনুষ্যের পাপ পুণ্যের বিচার একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হইবে। যত দিন সেই দিনটী না আসিবে ও যত দিন আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে না, ততদিন এই বিরোধ চলিতে থাকিবে। শেষ বিচারের দিন শুভ শক্তির জয় সম্পূর্ণ হইবে। অশুভ শক্তি পরাভূত হইয়া পড়িবে। তখন আহুরমস্‌দ এ জগৎ অপেক্ষা অন্য একটী উৎকৃষ্টতর জগৎ সৃষ্টি করিবেন। তাহাতে পাপ ও অসৎ বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। কয়েকটী শুভানুধ্যায়ী ঐশী-

আত্মা বা দেবদূত আহুরমস্দর আজ্ঞাধীন। আহ্রমনের ও অনেকগুলি অনিষ্টকারী সহচর আছে। আহুরমস্দ ও আহ্রমন উভয়েরই কার্য্য তাঁহাদের স্ব স্ব সহচর দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জেন্দ্ অবেস্থা নামক পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে সদসদ্ ব্যাপার এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পারসিকদিগের ধারণা ছিল যে সদ্ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একজন, অসদ্ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা অন্য আর একজন। প্রাচীন য়িহুদি জাতি যখন বাবিলন রাজ্যের অধীন তখন তাহারা পারসীক দিগের ঐ প্রকার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্ট জন্মের ৫৩৬ হইতে ৩৩৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন। পারসীক দিগের "এরিয়ান ভেজো" নামক স্বর্গই পরবর্ত্তী সময়ে "ওলড-টেষ্টামেণ্ট" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের "গার্ডেন অব ইডেন" হইয়া উঠিয়াছিল। ইজরেল বংশের জাতীয় দেবতা "ইলোহি জেহোভা" ব্রহ্মাণ্ডের ও যাবতীয় সদ্‌বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তায় পরিণত হইয়াছিলেন; আবার আহ্রমনের অনিষ্টকারিণী শক্তি জেহোভার পুরাতন ভৃত্য শয়তানের উপর আরোপিত হয়। এই শয়তানই শেষে "নিউটেষ্টামেণ্ট্" নামক ধর্ম্মপুস্তকোক্ত শয়তান বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়ে। এই সময়েই প্রাচীন হিব্রুজাতি পারসীকদিগের নিকট হইতে স্বর্গ, নরক ও দেবদূত প্রভৃতির ধারণা গ্রহণ করিতে থাকেন। পারসীকদিগের ন্যায় তাঁহারাও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর শাস্তিভোগ করিতে হয়, সূক্ষ্ম দেহ কবর হইতে উত্থিত হইয়া থাকে ও জগতের একজন অলৌকিক গুণসম্পন্ন ত্রাণকর্ত্তা আছেন। হিব্রু, খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে সদসতের হেতু সম্বন্ধে যে পৌরাণিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, উপরোক্ত প্রকারেই সেই ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। মুসলমানগণ আজিও পুরস্কার ও শাস্তি, পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসবান। খৃষ্টান ও হিব্রুজাতি যেরূপ ওল্‌ড্‌টেষ্টামেণ্টে আস্থাবান, মুসলমানগণও তদ্রূপ। পৃথক্ ২ কারণ হইতে সৎ ও অসতের উৎপত্তি হইয়াছে; সে কারণগুলিও অনাদি কাল হইতেই পরস্পর পৃথক। যীশুখৃষ্টের অনেক বাক্যেই ঈদৃশী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। একটী উদাহরণ এই:—"ভাল ফলের গাছে কখন মন্দ ফল জন্মে না; মন্দ ফলের গাছেও কখনও সুফল ফলে না।"—(মথি, ৭।১৮)। এই উপমাটি দ্বারা যীশু দেখাইলেন যে সৎ ও অসতের কারণ পৃথক্ পৃথক শুধু তাহাই নহে, তিনি ইহাও বলিলেন যে অসৎ হইতে সৎ, বা সৎ হইতে অসতের উদ্ভব হইতে পারে না। তাঁহার আর একটী বাক্য এই:—"যে বৃক্ষে সুফল ফলে না তাহা কর্ত্তিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।"—(মথি, ৭।১৯)। তাঁহার এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে অসৎকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত খৃষ্টীয় প্রত্যাদেশ আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি।—যীশুখৃষ্টের ধারণা এই ছিল যে দুষ্কৃতিকারীকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াই শাস্তি দেওয়া হয়। এই ধারণাটীই ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া খৃষ্টধর্ম্মোক্ত নরকাগ্নি মতে পরিণত হইয়াছে। যীশু ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির দেহ হইতে ভূত ছাড়াইতেন।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে তিনি ভূতযোনি বিশ্বাস করিতেন। যাবতীয় অসদ্বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা শয়তান ও দুষ্টাত্মাদিগের রাজপুত্র "বিল্‌জিবাব" এবং তদীয় অনুচরবর্গের অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাসবান ছিলেন।—(মথি, ১২।৬।২৭ দেখ)। ইহা ব্যতীত তিনি ঐশ-আত্মার প্রভাববলে শয়তানের আবেশ দূর করিতেন ও বলিতেন যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি কখনই কোন মন্দ কার্য্য করিতে পারেন না।

নিউটেষ্টামেণ্ট্‌ নামক ধর্ম্মগ্রন্থ বলেন যে সমুদয় পীড়া, দুঃখ, যাতনা, দুর্দ্দশা, পাপানুষ্ঠান ও যত কিছু মন্দ ব্যাপার সমস্তই সয়তানের কার্য্য। নিউটেষ্টামেণ্টের মতে সয়তান একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি; কেন না, পৃথিবীতে যে অসংখ্য ও অপরিমেয় অসৎ ব্যাপার দৃষ্ট হয়, সে তিনি সমুদয়েরই মূলীভূত কারণ। তিনি এই পৃথিবীর শাসক বা যুবরাজ।—(জন, ১২।৩১)। সংক্ষেপতঃ তিনিই মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, জুদাধর্ম্ম ও মজ্দ ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। এই প্রধান স্তম্ভটী অপসৃত হইলে যাবতীয় পাপ কারণশূন্য হইয়া পড়ে। অসৎবস্তু কোথা হইতে আসিল তাহার কারণ আর তাহা হইলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগতে পাপ পুণ্য-অনুষ্ঠানের কারণ বাইবেলে ঐরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথমাবধিই খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণ ও ধর্ম্মাত্মাগণ ঐ ব্যাখ্যা প্রচার ও গ্রহণ করিতেছেন; তত্রাচ বহু ব্যক্তির হৃদয়ে এই একটী প্রশ্ন আসিয়া উদয় হয় যে, ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাধার এবং এই পৃথিবীও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন শয়তান আসিয়া মানবগণকে প্রলুব্ধ করিল—পৃথিবীতে পাপ আনিয়া ফেলিল ও তাঁহার (ঈশ্বরের) সুন্দর সৃষ্টির পবিত্রতা ও মাধুর্য্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, তিনি কেন শয়তানের এই সব কার্য্যে বাধা দিলেন না? এই প্রশ্নটীও গুরুতর। ইহার সদুত্তর প্রদান করিবার জন্য খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। উহার উত্তর দিতে যাইয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরকে তাঁহারা ক্ষমতাশূন্য, পক্ষপাতী, অন্যায়কারী বা নির্দ্দয় প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কোন ২ হিব্রু-ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন যে ঈশ্বর পাপ পুণ্য উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা। "আমি ঈশ্বর, আর কেহ দ্বিতীয় নাই। আলোক ও অন্ধকার আমিই করিয়াছি। শান্তি ও অশান্তি সমুদয় আমারই কার্য্য। এই সমুদয় কার্য্যই আমার।"—(ঈশা ১৪।৬।৭,)। নিহেমিয়া বলিয়াছেন—"যত কিছু অসৎ ব্যাপার তাহা কি আমাদিগের ঈশ্বর আমাদিগকে প্রদান করেন নাই?"—(নিহেমিয়া, ১৩।১৮)। সপ্তদশ শতাব্দীর "কাল্‌ভিন্‌" মত বলম্বীগণ উত্তরকালে এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঈশ্বর পাপ-পুণ্য সমুদয় অনুষ্ঠানেরই প্রবর্ত্তক; নচেৎ তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত ঘটে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া তাঁহারাও ঈশ্বরকে পক্ষপাতী ও অন্যায়বান করিয়া ফেলিয়াছেন। পাপপুণ্য প্রশ্নের সমাধানকল্পে সেণ্ট আগষ্টাইন অদৃষ্টবাদ ও ভগবৎকৃপার অবতারণা করিয়াছেন উত্তরকালীন কাল্‌ভিন্‌ প্রচারিত মীমাংসা অপেক্ষা এ সমাধান উৎকৃষ্টতর নহে। পাপ-

পুণ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার পরিবর্ত্তে, উহাতে যাতনাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের হিসাবে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে অন্যায়বান ও নির্দ্দয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। একজন দুঃখ-ভোগ করিবে, অন্য-জন সুখভোগ করিবে, পূর্ব্বহইতে এরূপ ব্যবস্থা কেন হইয়া থাকে ? অদৃষ্টবাদ কোন হেতু নির্দ্দেশ করে না। এই প্রকার ব্যাখ্যা-প্রভাবে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ঈশ্বরে অবি-শ্বাসবান ও অশুভদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। পৃথিবীতে অনেকে নৃশংস আচরণ ও দুঃখ-যাত-নার দৃশ্য দেখিয়া হতাশচিত্তে বলিয়া উঠেন—"করুণাময়, ন্যায়বান ও প্রেমময় বলিয়া কোন ঈশ্বর নাই"।

মধ্যযুগের "ধর্ম্মজ্ঞ সম্প্রদায়ের" (Gnos-tics) বিশ্বাস ছিল যে মঙ্গলময় ঈশ্বর এই পৃথিবীর স্রষ্টিকর্ত্তা নহেন। ইহা শয়তানের সৃষ্টি। পরে করুণাময় ঈশ্বর যীশুখৃষ্ট দ্বারা ইহাকে ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে পবিত্র হইতে পবিত্রতর করিতেছেন। ঐ ধর্ম্মজ্ঞ-সম্প্রদায়ীদিগের সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও এমন বহু মনীষীগণের অবির্ভাব হইয়াছে যাঁহাদের বিশ্বাস এই যে করুণাময় ও ন্যায়বান ঈশ্বর এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা একজন পৈশাচিকপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। আগষ্ট কোম্ত আধুনিক মনীষিবৃন্দের অগ্রণী। এই পৃথিবীর ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্টি করিয়া ইনিও কাষ্টাইলের রাজা আল্‌ফান্সোর ন্যায় এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টির সময়ে যদি তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিতেন তবে সৃষ্টিকর্ত্তাকে উৎকৃষ্ট উপদেশ দিতেন।

অন্য এক শ্রেণীর শুভদর্শীরা বলিয়া থাকেন যে, এই জগৎ শোক-দুঃখ, দুর্দ্দশা পরিপূর্ণ হইলেও ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ আর একটী হইতে পারে না। জগতের বর্ত্তমানাবস্থাটী যেরূপ, তাহাতে দুঃখের হাত এড়াইবার যো নাই; কেননা পৈশাচিক প্রকৃতি জড়ে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব অসৎ ব্যাপারের প্রতি চক্ষু নিমীলিত করা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করাই আমাদিগের একণে কর্ত্তব্য। প্লেটো, লিবনিজ, ডাঃ মার্টিনো ও এই শ্রেণীর অন্যান্য শুভদর্শীদিগেরও মত এই প্রকার। অন্য এক শ্রেণীর শুভদর্শী মনীষী আছেন; তাঁহারা ন্যায়বান, করুণাময়, ও মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে অসৎ ব্যাপারের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে সমস্তই মঙ্গলময়, অসৎ বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। তাঁহারা প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক কার্য্যে মঙ্গল দেখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে দুঃখ দুর্দ্দশা, কষ্টভোগ সমুদয়ই আমাদিগের মঙ্গলের জন্য ঘটিয়া থাকে। আমরা যে আঘাত প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমাদিগের হিত-সাধনই হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যাপারই আমাদিগের হিতের জন্য সংঘটিত হইতেছে, এবং হইবেও; কারণ, সৃষ্টির প্রকৃতিই মূলতঃ মঙ্গলময়ী। তাঁহারা অসৎ বলিয়া যে কোন কিছু সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন মঙ্গল জিনিষটী খাঁটী সত্য; আমরা যাহাকে অসৎ বলি তাহা মঙ্গলের অভাব মাত্র। আপাততঃ প্রত্যেক বিষয়ে দৃষ্ট না হইলেও, জগতে পুণ্যেরই জয় হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহারা পাপের কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা উহার অস্তিত্বই অস্বীকার করেন ও

উহার দিকে চক্ষু নিমীলিত করেন। শুভদর্শীদিগের এই প্রকার দর্শনে একটী প্রান্ত দৃষ্ট হইতেছে; অশুভদর্শী মনীষিগণ আবার অন্ত প্রান্তে উপনীত হয়েন। তাঁহারা বলেন পাপই খাঁটী সত্য, পাপের অভাবই পুণ্য। তাঁহারা বলেন সংহার, মৃত্যু, দুর্দ্দশাই বিশ্বের লক্ষ্য। তাঁহারা পুণ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন দুঃখ দুর্দ্দশাই আমাদের জীবনের প্রকৃতি, আনন্দ ও সুখ দৈবাধীন ব্যাপার। জীবিত থাকিতে হইলেই আমাদিগকে উৎকট চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাতে কষ্ট-ভোগও হইয়া থাকে। সে কষ্ট অপরিহার্য্য। আমাদিগের মনে যে সমুদয় বাসনার উদয় হয়, সেগুলি উদয় হইবামাত্রই যদি পূর্ণ হহয়া যায়, তবে আমাদিগের সময় কিরূপে অতিবাহিত হইতে পারে? আমরা তাহা হইলে কি লইয়া জীবন কাটাইব? তাহা হইলে জীবনসংগ্রামই থাকে না, সুতরাং উদ্যোগ বা জীবনই লয় পায়। আমরা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বক্ষণই বায়ুর গুরুত্ব বহন করিতেছি। যদি এই গুরুত্ব অপসৃত হয়, তবে আমাদিগের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। অশুভদর্শীগণ বলেন যদি অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ পাপ প্রভৃতির বোঝা জীবন হইতে ঐরূপে অপনীত হয়, তবে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। মৃত্যু ব্যতীত ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এই সকল অশুভদর্শীদিগের মতে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাঁরা জীবনে কোন কিছু সুখের ব্যাপার দেখিতে পান না। ইহারা সর্ব্বত্রই অমঙ্গল দেখিয়া থাকেন। আত্মহত্যাই এই অমঙ্গলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। একজন ন্যায়বান, করুণাময়, মঙ্গলময় জগদীশ্বর কর্ত্তৃক এই শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, পাপসংকুল জগৎ সৃষ্ট হইল, এরূপ বিশ্বাস তাঁহারা করেন না। কে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বলেন না। অতএব, অশুভদর্শিনী ব্যাখ্যায় আমরা অন্য একটী প্রান্তে আসিয়া পড়ি। এরূপ ব্যাখ্যায় যুক্তিবাদীর মনে সন্তোষ জন্মে না।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ।

———০———

আশ্রম-সংবাদ।

ভক্তগণের আহ্বানে গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব মহারাজ সশিষ্য শিলচর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন; তথা হইতে কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমন করতঃ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

পাপ-পুণ্য-তত্ত্ব।

(বেদান্ত-দর্শন।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সৎ-অসতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে। শুভদর্শীরা প্রত্যেক স্থলেই মঙ্গল উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বলেন যে জগদীশ্বর আমাদিগের সুখ ও আনন্দের জন্যই এই পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন। আবার, অশুভদর্শীরা প্রত্যেক ব্যাপারেই অমঙ্গল দেখিতে পান। ইঁহারা বলেন যে শত২ ব্যক্তির দুঃখ দুর্দ্দশার নিমিত্তই তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। শুভদর্শীদিগের কথাটী যদি সত্য হয়, তবে অশুভদর্শীদিগের কথাও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। শুভ অশুভ এই দুই প্রকার দর্শন-পদ্ধতির কোনটীতেই মঙ্গলামঙ্গলের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। ঐ দুইটী মতে দুইটী প্রান্ত দৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। জগৎ হইতে স্বতন্ত্র মানবাকারবিশিষ্ট একজন ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যতদিন এই মত প্রচারিত হইবে, তত দিন মঙ্গলামঙ্গলের যথার্থ তত্ত্ব ঠিক বুঝা যাইবে না। পাশ্চাত্যদিগের এখন ভ্রম ও কুসংস্কারের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। তাঁহারা এখন ন্যায় ও বিজ্ঞানের আলোকে দেখিতে পাইতেছেন যে পাপ ও পুণ্যের দুইজন পৃথক২ সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহারা বিরোধে প্রবৃত্ত, এই সব ব্যাপার হইতে পারে না। তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে প্রকৃতির হিতসাধিনী, অহিত সাধিনী দুইটী শক্তির বিদ্যমানতাও অসম্ভব। কিন্তু, যাবতীয় নৈসর্গিক দৃশ্যই একই শাশ্বতী শক্তির অভিব্যক্তি। এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সেই সনাতনী শক্তিরই বিবর্ত্তন ফল। প্রকৃতি অদ্বিতীয়া, ইহা দুইটী নহে।

পাপ-পুণ্যের পৃথক ২ সৃষ্টিকর্ত্তা; এই মতের স্থান এখন বিবর্ত্তন-মত অধিকার করিয়াছে। বিশ্ব-নাট্যশালায় বহু শতাব্দী ধরিয়া অহুরমস্দ ও আহ্রমন জেহোভা শয়তান প্রভৃতি কত শত নামে অভিনয় করিয়াছে। এখন ধীরে ধীরে তাহারা অভিনয় ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া বিস্মৃতি রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে একজন জগৎ-স্বতন্ত্র ঈশ্বর কোন একটী বিশেষ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন; এখন সেই ধারণা ত্যাগ করিয়া তাহারা বুঝিতে শিখিয়াছেন যে—শত ২ শতাব্দীব্যাপিনী বিবর্ত্তন প্রণালী প্রভাবে এই সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে উক্ত প্রকার ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই। বৈজ্ঞানিকের চিত্ত "ইডেন্ গার্ডেন্" নামক স্বর্গের কথা শুনিয়া কিছু মাত্র আকৃষ্ট হয় না। উহা এখন নির্ব্বোধদিগের স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে। মানবের পতন এখন আর লোকে সম্ভব ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে না। উহা এখন পৌরাণিক উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছে। প্রতীচ্যখণ্ডের মনস্বী ও মনস্বিনিগণ যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মত উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় আসিয়া পড়িয়াছে যে লোকে ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা পাপপুণ্য প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রবৃত্ত। জগতে বাহ্যতঃ দুইটা পৃথক ধর্ম্মশক্তি দেখা যায়। ঐ দুইটা শক্তির মধ্যে একটী একত্বভাব বিদ্যমান আছে। সেইটার আবিষ্কার করা ও সেই প্রচ্ছন্ন একত্বভাবটীর সহায়তায় প্রপঞ্চ বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্য। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, ভারতীয় অদ্বৈতবাদীগণ ও বৈদান্তিকগণ প্রকৃতির এই একত্ব ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী যে কোন একটী বিশেষ দিনে ও কোন-একটা বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট নহে, তাহা তাঁহারা প্রথমেই প্রণিধান করিয়াছিলেন এবং ন্যায় ও যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা বিবর্ত্তন-বাদেও বিশ্বাসবান হইয়াছিলেন।

হিন্দু ঋষিদিগের বিপুল গ্রন্থরাজির কুত্রাপি এরূপ কথা নাই যে, কোন কিছু ছিল না; অকস্মাৎ এই সৃষ্টি হইয়া পড়িল। সৃষ্টি-বিষয়িনী যে কথাটী তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ "প্রক্ষেপন"। অধুনা বিবর্ত্তন শব্দে আমরা যেরূপ বুঝি, ঐ কথাটী অনেটা সেইরূপ। আজকাল, পাশ্চাত্যগণ প্রথমে একরূপ শিক্ষা করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। হিন্দু-ঋষিদিগের সেরূপ দশা কোন দিনই হয় নাই। কেননা, তাঁহারা ধীরে ধীরে ও ক্রমে২ পাপপুণ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করতঃ অতি সুন্দর-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, পাপপুণ্য শব্দ দুটী আপেক্ষিক, একটার অভাবে আর একটী থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা পুণ্য বলি, তাহা পাপের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। তদ্রূপ, পুণ্যের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াই পাপ বিদ্যমান থাকে। পরস্পর নির্ভরশীল শব্দ হওয়ায়, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যদি আমরা ঐ শব্দ দুটীকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ একটীর সহিত আর একটীর সংস্রব বিনষ্ট করিয়া ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাই, তবে তদ্দ্বারা আমরা উহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ সূচক অর্থই যে শুধু নষ্ট করিব

তাহা নহে, উহাতে মূল শব্দ দুটীরই ধ্বংস সাধন হইবে। যখনই তুমি অমঙ্গল হইতে মঙ্গল পৃথক্ করিবে তখনই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। অমঙ্গল একাকী বিদ্যমান থাকিতে পারে না। মঙ্গলের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া যখনই তুমি অমঙ্গলকে একাকী দাঁড় করাইবে, তখনই তুমি উহাকে আর অমঙ্গল বলিয়া চিনিতে পারিবে না; কাজে কাজেই, বৈদান্তিকদিগের মতে পাপপুণ্যের পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে, কিন্তু পরিমাণগত। আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য যেরূপ, উহাদিগের পার্থক্য সেইরূপ। আবার দেখ, একই বস্তু অবস্থাবিশেষে কখন ভাল, কখন মন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা এক অবস্থায় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই আবার সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অগ্নি আমাদিগকে জীবন ও আরাম প্রদান করিতেছে, সুখ দান করিতেছে। যে ব্যক্তি তুষার স্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া মর-মর, অগ্নি তাহার জীবন রক্ষা করে। মহা শীতে উহা আমাদিগকে উত্তাপ-প্রদান করে। উহার সাহায্যে আমরা রন্ধন করি, বা পথ দেখিয়া চলি। এসব সময়ে অগ্নি আমাদিগের পরম কল্যানকর। কিন্তু যখন উহাতে জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, বা মানবের শিল্প তদীয় সম্পত্তির ক্ষতি হইয়া থাকে, তখন উহাকে ঘোর অকল্যানকর বলিয়া মনে হয়। অথচ, অগ্নির প্রকৃতিই দগ্ধ করা, এবং এই প্রকৃতির কখন পরিবর্ত্তন হয় না। লণ্ডন সহরের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে বহুজীবন বিনষ্ট ও বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু, উহাতে আবার মহামারীর জীবাণু সমূলে নির্ম্মূল হয়। ঐ বীজাণু থাকিয়া গেলে, হয়তঃ উহা অগ্নিকাণ্ড অপেক্ষাও গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিত।

অতএব, ঐ অগ্নিকাণ্ডে মঙ্গল-অমঙ্গল যুগপৎ দুইই হইয়াছিল। মাধ্যাকর্ষণশক্তি-প্রভাবে যখন আমাদিগের দৈহিক পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের অণু-পরমাণু সংযুক্ত থাকে, আমাদিগের গৃহাদির, দেহের ও যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি সেই পৃথিবীর আকার স্থির থাকে, তখন উহাকে কল্যানকারিনী বলিতে পারি; কিন্তু যখন একটী লোক উহার প্রভাবে ছাদ হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়ে তখন একটী উহা অমঙ্গলপ্রসবিনী বলিতে পারা যায়। সৌদামিনী যখন আলোক প্রদান করে, যান পরিচালিত করে, বেদনা আরাম করে, অথবা পীড়ার উপশম করে, তখন উহা মঙ্গলময়ী। কিন্তু যখন উহার প্রচণ্ড বেগে একটী লোক বিচূর্ণ হইয়া যায় তখন উহা অকল্যানকারিনী। তড়িত ব্যক্ত-অব্যক্ত (Positive or Negative) যাহাই হউক নিজে না-ভাল, না-মন্দ। কিন্তু উহার ফল দেখিয়া উহাকে আমরা ভাল মন্দ আখ্যা দিয়া থাকি। একটী বেগবতী নদীর স্রোতে এক দিকের কুলে সুখ সমৃদ্ধি, বিপরীত দিকের কুলে ক্ষতি ও ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকে। নৈসর্গিক শক্তি নিচয়ও ঐরূপ নদীর মত এই বিশ্বমাঝে প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর যে কুলে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করে, সেই কুলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা বলিয়া থাকি নদীটি বড় উপকারী, ইহা কল্যানপ্রসবিনী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঠিক

বিপরীত কূলে দাঁড়াইয়া ঐ একই নদীকে আমরা অকল্যানকারিনী, সর্ব্বনাশিনী বলিতে পারি। এইরূপে, নৈসর্গিক শক্তি নিচয়কে আমরা স্ব ২ স্বার্থ, ধারণা, লাভালাভের পরিমাণানুসারে ভাল মন্দ বলিয়া থাকি। একপক্ষে, সারযুক্ত পলি মাটী বিকীর্ণ করিয়া নদী দেশকে উর্ব্বরা ও শস্যাদি বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে; অপরপক্ষে, আবার ঐ একই নদী কত শত পল্লী ধ্বংস করিতেছে। যাহা সম্মুখে পড়িতেছে উহা তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

পাপপুণ্য আমাদিগের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। যাহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তাহাকে পুণ্য, যাহাতে আমাদের দুর্দ্দশা বা অনভীষ্ট আনয়ন করে তাহাকে আমরা পাপ বলিয়া থাকি। নৈসর্গিক ব্যাপার গুলির মধ্যে পরস্পরের একটা সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধটি মনে না রাখিয়া উহাদের প্রত্যেকটী যদি আমরা পৃথক্ ২ করিয়া দেখি, তবে আমরা ঘটনাবলীর সুচারু ব্যাখ্যা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ আছে ও উহারা অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংসৃষ্ট এটুকু মনে রাখিয়া যদি আমরা উহাদিগকে দেখিতে থাকি তবে আমরা প্রকৃত তথ্য জানিতে পারি। তখন আর আমাদিগকে গোলে পড়িতে হয় না, তখনই পাপপুণ্যের প্রকৃত হেতু আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। অখণ্ড বস্তুর সহিত উহার অংশগত সম্বন্ধের অনুপলব্ধি ও বস্তুনিচয়ের সসীমত্ব-জ্ঞানই সৎ-অসৎ জ্ঞানের প্রকৃত কারণ। ভারতীয় অদ্বৈতবাদীগণের মতানুসারে এই পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুই পরস্পর সাপেক্ষ। সুতরাং এখানে কোন-কিছুতেই বিশুদ্ধ মঙ্গল বা সম্পূর্ণ অমঙ্গল আশা করা যায় না। যাহাকে আমরা সৎ বলি সেটী একটী দিক্ মাত্র, অপর দিকটীর নাম অসৎ। একটা দিক্ উপেক্ষা করিলেই অন্য দিকটী স্বতন্ত্রভাবে চক্ষের উপর পড়ে। একই ঘটনা এক স্থানে অমঙ্গল অন্য স্থানে মঙ্গল উৎপাদন করিতেছে। ভারতীয় দুর্ভিক্ষে শত ২ ব্যক্তি অনশনে মৃত্যুমুখে পড়িল। আবার মার্কিন কৃষকগণ উহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী হইলেন ঐ দুর্ভিক্ষ ভারতের অমঙ্গল কিন্তু আমেরিকার মঙ্গল সাধন করিয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদিগের জীবন আমাদিগের নিকট মহা সুখের জিনিস। কিন্তু উহা অন্যের জীবনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অন্য সহস্র সহস্র জীবকে মারিতে হয়। আমাদিগের খাদ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ ইতর জন্তু প্রত্যহ বিনষ্ট হইতেছে প্রত্যেক পাকস্থলী এক একটি সমাধিক্ষেত্র ও প্রত্যেক দন্ত এক একটী সমাধিশিলা বিশেষ। একজন একজনকে খুন করিবার সময় মনে করে যে উহাতে আমার নিজের বা পরিবারবর্গের বা সমাজের মঙ্গল হইবে। কিম্বা হত্যাকারী অন্য কোন শুভ উদ্দেশ্য মনে করিয়াও ঐরূপ খুনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। হত্যাকারীর বিশ্বাস থাকিতে পারে যে সে হত্যাদ্বারা কাহারও উপকার করিল কিন্তু অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত সে "হত্যাকারী" নামে অভিহিত হয় এবং কেহই তাহাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। সমাজ এবং রাজশক্তিও তাহাকে

দণ্ড প্রদান করেন। একজন ভীষণ হত্যাকারী অন্যের রাজ্যলোলুপ হইয়া শত ২ হত্যা সম্পাদন করতঃ সমর ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমরা তাহাকে সুবিখ্যাত বীর বলিয়া সম্মান করি ও তাহার গুণ-কীর্ত্তন করতঃ তাহাকে পুরস্কার দিয়া থাকি। কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই ব্যক্তি তাহার দেশের মঙ্গলের জন্য বহু হত্যা করিয়াছে। বহুলোকের হত্যাকারী দ্বারা যেমন একটী দেশের উপকার হইয়া থাকে; তদ্রূপ এক ব্যক্তির হত্যাকারী দ্বারাও কাহারও উপকার হইতে পারে, যদিও সে উপকারকে উপকার বলিয় আমরা মনে করি না। আমাদিগের বুদ্ধি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্না; কাজে কাজেই; আমরা স্ব স্ব কার্য্যের যথার্থ ফল সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। নিসর্গীভূত জড়শক্তির পরিণামপুঞ্জের মধ্যে সৎ-অসৎ ঠিক করিয়া যেমন রেখাপাত করা যায় না, এবং এটা নিখুঁতভাবে সৎ এ কথাও বলা চলে না, তদ্রূপ আমাদিগের নৈতিক কার্য্য-ফলেরও ভাল মন্দ পৃথক করা যায় না। যাহা এক ক্ষেত্রে নৈতিক, শুভপ্রদ তাহাই আবার অন্য ক্ষেত্রে অশুভদায়ক হইয়া থাকে। উদাহরণ দেখ, ঈশ্বরের আজ্ঞা শুভদা বলিয়া আমরা জানি। শলকে ঈশ্বর যে আদেশ করিয়াছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখ;— "তোমরা এক্ষণে যাও, ও অমালেকগণকে প্রহার কর। তাহাদের যাহা আছে সে সমুদয় সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস কর। উহাদিগকে রাখিও না; কিন্তু, পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও দুগ্ধ-পোষ্য শিশুপর্য্যন্ত সকলকেই সংহার কর। গো, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সব বিনাশ কর।"— (সামুয়েল, ১৫।৩)। ইহা ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া আমরা ইহাকে সৎকার্য্য কহিয়া থাকি। কিন্তু যদি কোন মনুষ্য অন্য এক জন মনুষ্যকে এই প্রকার ভয়াবহ কার্য্য করিতে আদেশ করে, তবে তোমরা তাহাকে কি বলিবে! আমাদিগের বিচার এই প্রকার। আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি কিন্তু কেন বলি তাহা জানি না। কোন্‌দিকে কতটা মঙ্গল হইতেছে এবং অমঙ্গলের সহিত কিরূপ ভাবে উহা সংসৃষ্ট তাহা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যে কার্য্যই আমরা করিয়া থাকি তাহার একটী না একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য আবার হয় কাহারও মঙ্গল, নয় কাহারও অমঙ্গলের জন্য নিরূপিত থাকে। এই ব্যাপার আমরা উপলব্ধি করিতেও পারি, না করিতেও পারি। কিন্তু আমাদিগের কার্য্যফল সততই মঙ্গল ও অমঙ্গলে জড়িত থাকে। একটা অতি সহজ উদাহরণ দেখ। আমি তোমাদিগের সহিত কথা বলিতেছি; হয় তো আমি কিছু ভাল করিতেছি ভাল করিবার ইচ্ছাও অন্ততঃ পক্ষে আমার আছে। কিন্তু আমি সঙ্গে২ কোটী কোটী জীবাণুর ধ্বংসাসাধন করিতেছি। জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিবার বক্তৃতা তোমার আমার নিকট মঙ্গলময়ী হইলেও বেচারা জীবাণুগুলি কখনই ইহাকে কল্যানকারিণী বলিবে না। আমাদিগের দিক্ চাহিয়া বলিতে হইলে আমরা এই কার্য্যকে সৎ বলিব কিন্তু জীবাণুগুলির দিক্ চাহিয়া বলিলে উহা সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াই বোধ হইবে। উহারা নিশ্চয়ই এ কার্য্যকে অমঙ্গলজনক

বলিবে। আমাদিগের বিবেচনাকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা প্রত্যেক ব্যাপারের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই; তবে বিচার্য্য বিষয়টী সৎ কি অসৎ তাহা আমরা কখনই বুঝিতে পারি না; কেন না, আমাদিগের বিবেচনা সংকীর্ণা ও অসম্পূর্ণা। যাঁহারা ভিন্ন ২ দিক্ হইতে কার্য্যের পরিণাম আলোচনা না করেন তাঁহারা সমুদয় প্রকার ভ্রম প্রমাদে পতিত হয়েন। যদি আমি আপন আদর্শে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের বিচার করিতে বসি তবে আমার বিচার অতীব নগণ্য প্রকারের হইবে। কিন্তু যদি ভিন্ন ২ আদর্শে বস্তুর বিচার করি তবে বুঝিতে পারি যে, একই বস্তু অবস্থা বিশেষে সৎ, অসৎ উভয়ই হইতে পারে। আমাদিগের প্রত্যেক ভ্রমটীই সময়ে মহান শিক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। অতএব, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল ও মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল বিদ্যমান আছে সুতরাং মঙ্গল অমঙ্গল একত্র বিচরণ করে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যেখানেই অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের প্রাধান্য উপলব্ধি করি সেখানেই ক্ষেত্রটীকে মঙ্গলময় বলিয়া থাকি। বিপরীত হইলে অকল্যানকর বলি। আবার, যাহা একজনের পক্ষে পাপ-জনক, অন্যের পক্ষে তাহাই পুণ্যজনক। বিবেচনা করিয়া দেখ যে মুসলমান্, মর্ম্মন, ও খৃষ্টানদিগের পাপের আদর্শ কত ভিন্ন২ প্রকার। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে "ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট।গ্রন্থে যেটী পুণ্য, অপর ধর্ম্মানুসারে সেটী পাপ। খৃষ্টানদিগের নিকট বহু বিবাহ পাপানুষ্ঠান হইলেও মুসলমান্, মর্ম্মন এবং প্রাচীন যিহুদীদিগের নিকট উহা পুণ্যকার্য্য। এক ধর্ম্মানুসারে যে কার্য্য পুণ্যজনক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, অন্য ধর্ম্মে তাহা পাপের প্রসূতি বলিয়া নিষিদ্ধ।

তাই বলিতেছিলাম, সৎ-অসতের মাঝে আমরা একটী স্পষ্ট রেখাপাত করিতে পারি না। বেদান্তদর্শনের মতে শাস্তি ও পুরস্কার আমাদিগের স্ব ২ কার্য্যের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহারা বলেন যে প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী করিয়া অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে। কার্য্যটি ভাল হইলে প্রতিক্রিয়াটীও তদ্রূপ হইবে। বেদান্তদর্শন বলেন যে— "অগ্নি যেমন ধূমাবৃত থাকে তদ্রূপ প্রত্যেক কার্য্যই সদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হউক, আর অসৎ-উদ্দেশ্যেই আচরিত হউক, বিপরীত ভাবটীতে আবৃত থাকে।" আমাদিগের স্ব ২ জীবন আলোচনা করিয়া দেখিলেও আমরা দেখিতে পাই যে অমঙ্গল হইতে সাধারণতঃই মঙ্গল নিঃসৃত হইতেছে। অধিকাংশ অমঙ্গলের মধ্যে যখন মঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন যে ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন তাঁহার সেই সৌভাগ্যের অন্তরালে এমন কিছু আছে যাহার জন্য হয় তাঁহাকে নয় অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুশোচনা করিতে হয়।

বৈদান্তিকগণ কার্য্য-করণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম দ্বারা বাহিক শাস্তি ও পুরস্কার ব্যাপার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন: পদার্থবিদ্যা বিষয়ক নিয়ম এই কথা বলে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিপরীত এবং তুল্য। কিছু করিলে আমাদিগকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যের বিস্মৃতি না ঘটিতে ২ যদি ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে তবে আমরা তাহাকে পুরস্কার বা শাস্তি

বলিয়া থাকি। একটী সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, ফলোৎপত্তি হইয়া সঙ্গে সঙ্গেও হইতে পারে বা বহু বৎসর পরেও তাহার সুফল ফলিয়া থাকে। ঈশ্বর কখনই পাপীকে শাস্তি বা পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার প্রদান করেন না। সূর্য্য যেমন পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের উপরেই কিরণ বর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাঁহার করুণাও পাপাত্মা ধর্ম্মাত্মা সকলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। শাস্তি বা পুরস্কার আমাদিগের স্ব ২ কর্ম্মেরই ফল। কার্য্য-কারণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম সুচারু রূপে বুঝিতে পারিলে আমরা আর ঈশ্বরকে কিম্বা কোন জগৎ-স্বতন্ত্র পাপের সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করি না। তখন আমরা আর এ কথা বলি না যে বহির্দ্দেশ হইতে পাপ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সনাতনী শক্তি বা ভাগবতী ইচ্ছা সৎ-অসৎ নামক আপেক্ষিক শব্দের বহু পেছনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন। যদি আমরা বুঝিতে পারি যে বাহ্য-অন্তর সকল প্রকার নৈসর্গিক শক্তিই সেই সনাতনী শক্তিরই স্ফুরন মাত্র, তবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সদসৎ বলিয়া কোন কিছু খুঁজিয়া পাই না; তাহা হইলে আমরা সর্ব্বত্রই সেই "ভাগবতী ইচ্ছার" অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিব। কারণের প্রকৃতি যেরূপ কার্য্যের প্রকৃতি ঠিক সেই-রূপই হইবে; কেন না, কার্য্য কারণেরই ব্যক্তাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি একটী সনাতনী ভাগবতী শক্তিই এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয় তবে সমষ্টিভাবে ধরিলে এই ব্রহ্মাণ্ডটী সদ-অসৎ কিছুই নহে। আমাদিগের চক্ষুর পরে আপেক্ষিক আদর্শের সংকীর্ণ সসীম চশমা রহিয়াছে। আমরা উহার ভিতর দিয়া জীবনের ঘটনাবলি দৃষ্টি করিতেছি। উহা অপসৃত করিয়া যদি আমরা আমাদিগের মনশ্চক্ষুতে দিব্য শক্তি বা জাগতিক ইচ্ছার চশমা পরিধান করি, তবে সদসৎ, পাপপুণ্য, পুরস্কার-শাস্তি এ সব আর দৃষ্টিপথে পড়িবে না। সর্ব্বত্র তখন একই কার্য্য-কারণভাবের পরিস্ফুরণ পরিলক্ষিত হইবে। তখন আমরা আর আমাদিগের পিতামাতা কিম্বা শয়তান কিম্বা ঈশ্বর কিম্বা অন্য কাহাকেও নিন্দা করি না; কিন্তু মনে ২ বুঝিয়া লই যে আমাদিগের যাহা কিছু দুঃখ তাহা আমাদের ইহ জন্মেরই হউক বা গত কোন জন্মেরই হউক কর্ম্মফল মাত্র। যদি আমরা বুঝি যে তড়িৎ যেমন নিজে ব্যক্তাব্যক্ত নহে কিন্তু চুম্বক প্রস্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইবার সময় ঐরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র; তদ্রূপ আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি যে নৈসর্গিক নিয়মাবলী নিজেরা সৎ বা অসৎ নহে। কিন্তু জাগতিক প্রপঞ্চের সুবিরাট অয়স্কান্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়ায় উহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা ধারণা করিতে পারি যে সনাতনী শক্তি বা ভাগবতী ইচ্ছা আমাদিগের চিত্ত ও জীবনের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়াই কল্যানকারিণী বা অমঙ্গলপ্রসবিনী বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা ভারতীয় মহর্ষিগণের ন্যায় বলিতে পারি যে—"ঈশ্বর মঙ্গল-অমঙ্গল সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ করেন না। তিনি পাপীকেও শাস্তি দেন না বা পুণ্যাত্মাকেও পুরস্কৃত করেন না। আমাদিগের বুদ্ধি যেন অজ্ঞান ও আপেক্ষিকতার ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন

হইয়া রহিয়াছে। আমরা ভ্রমান্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মনে হয় যে, ঈশ্বর মঙ্গল অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন; মনে হয় যে তাঁহার সৃষ্টি মঙ্গল-অমঙ্গল মিশ্রিত এবং তিনি শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন।" ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর ভগবান অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগের পাপপুণ্যের অনুভূতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি সেই অনুভূতির বহু ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃত "সত্য" আমরা পরিজ্ঞাত নহি বলিয়াই ঐ ভগবৎ সত্তা অনুভব করিতে সক্ষম হই না।

সদসতের মায়িক দৃশ্যের অন্তরালে যাইয়া উপরোক্ত ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদিগকে যাবতীয় প্রপঞ্চের অক্ষয় প্রস্রবণের সমীপে উপনীত হইতে হইবে। প্রথমে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক একত্ব জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে আরোহন করিতে হইবে। সেই ভাগবতী ইচ্ছার ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে এইটী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে সৎ-অসৎ তাঁহারই দুইটী বিভাব মাত্র; কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সদসৎ কিছুই নহেন। তিনি গুণাতীত। যখন আমরা এতটা করিয়া উঠিতে পারিব কেবল তখনই আমরা পাপ পুণ্যের অতীত হইয়া পড়িব এবং ইহ জীবনেই চিরশান্তি উপভোগ করিতে থাকিব।

প্রশ্নোত্তরঃ—

প্রশ্ন—বেদান্ত শুভদর্শী না অশুভদর্শী?

উত্তর—বেদান্তদর্শন না শুভদর্শী, না অশুভদর্শী। ইহা সদসতের যথার্থ প্রকৃতি অনুসন্ধান করতঃ উহাদিগের সাপেক্ষ ভাবের বর্ণনা করিয়াছে এবং পরিশেষে যে ঈশ-আত্মা যাবতীয় প্রপঞ্চভূত পদার্থের সার-সর্ব্বস্ব তাহারই অনুভূতির দিকে মানব-মনকে পরিচালিত করিয়াছে।

প্রশ্ন—পাপ ও পুণ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা কি পৃথক্ নহে?

উত্তর—বেদান্ত বিবর্ত্তন-শিক্ষা দিয়া থাকে, কোন-একটী বিশেষ দিনে সৃষ্টি হইল এমন কথা বেদান্তে নাই। কাজে কাজেই, এমন অবৈজ্ঞানিক কল্পনা উহার আবশ্যক হয় নাই যে দুইজন জগৎ-স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়া একজন সৎ অন্যজন অসৎ বস্তু-নিচয় সৃষ্টি করিলেন।

প্রশ্ন—বিবর্ত্তন প্রণালীর সাহায্যে কিরূপ ভাবে পাপ পুণ্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে?

উত্তর—বিবর্ত্তন প্রণালীতে যাহা অবস্থা বিশেষে আমাদিগের উপকারী তাহাই পুণ্য, যাহা কোনরূপে আমাদিগের অনিষ্টজনক তাহাই পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন—মনুষ্যগণের আদি পুরুষ পাপ করিয়াছিল তাহার ফল উহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। এ সম্বন্ধে বেদান্তের মত কি?

উত্তর—কোন এক আদিকালে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মনুষ্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পাপ গ্রহণ করিতে বাধ্য, এরূপ কথা বেদান্ত স্বীকার করিতে চাহে না।

প্রশ্ন—পাপ কথাটার অর্থ ও কারণ কি?

উত্তর—পাপ অর্থ স্বার্থপরতা । উহা কাহারও যথার্থ প্রকৃতি কিনা ঐশ-আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানাভাবেরই পরিণাম ।

প্রশ্ন—স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা সম্বন্ধে বেদান্ত কোন অনুকূল মত দিয়া থাকে কি ?

উত্তর—না । আমাদিগের অন্তরে যে ঐশ-আত্মা আছেন প্রথমে তাঁহার উপলব্ধি, পরে পরমাত্মার সহিত একত্ব-জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে । ইহাই বেদান্তের শিক্ষা ।

প্রশ্ন—পাপী কি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?

উত্তর—হাঁ । আত্মা নির্ম্মল, নিষ্পাপ ও দিব্য । পাপী যদি এই আত্মার সহিত একত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয়, অমনি সে সমুদয় প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং চিরকালই মুক্তাবস্থায় অবস্থান করে ।

প্রশ্ন—আমরা কি আমাদিগের সদসৎ কার্য্যের জন্য দায়ী ?

উত্তর—হাঁ । মানসিক ও কায়িক সকল প্রকার কার্য্যের জন্যই আমরা দায়ী । তাহা ব্যতীত, আমরা ফলভোগ করিতে বাধ্য । কার্য্য নিশ্চয়ই কর্ত্তার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে ।

প্রশ্ন—কিরূপে সদসৎ কার্য্যের পার্থক্য অনুভব করা যায় ?

উত্তর—কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য দ্বারা সদসৎ স্থির করিতে হইবে । অসৎ কার্য্য দ্বারাও কখন ২ অন্যের উপকার হইতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া সে কার্য্যকে সৎ বলা যায় না । উহার অনুষ্ঠাতাও উহাতে পুণ্যভাগী হয় না । ইতি

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ ।

—:0:—

লাঞ্ছিতের মান ।

প্রভো,

নাহি জানি কিবা অর্থ এর—
সংসারের ধূলি মাঝে ছিনু এক কোণে,
কেহ কোন দিন নাহি শুধা'ল বারতা—
অবজ্ঞেয় আমি সারা জগতের !
কেন দেব সে দৈন্য করিলে দূর ?
আপনার অঙ্গে মাখি মোর ধূলোরাশি,
কেন বা তুলিয়া লইলে, ধুয়ে আঁখিজলে—
ছিন্ন তারে তান একি সুমধুর ?

নিজ হাতে যদি সাজালে আমায়
ভিখারীরে দিলে যদি রাজসিংহাসন—
এর অপমান যেন, ওহে মহারাজ !
নাহি হয় কভু । তব গরিমায়,
তব শক্তি লয়ে যেন দলি পদতলে,
তোমার শাসন দেব, যেই অবহেলে ।

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র ।

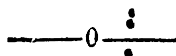
—0—

বিরহে।

সেদিন হৃদয় বীণা বেজেছিল শেষ
পড়ে র'ত শূন্যপ্রাণে
অলক্ষিতে এক কোণে
ধূলি ধূসরিত গাত্রে লাঞ্ছনা অশেষ
ছিন্ন তন্ত্রী নাহি তাহে ঝঙ্কারের লেশ।

আবেগ উচ্ছাসময় সুধাকণ্ঠস্বনে
আর না মিলাবে সুর,
বাদক গিয়াছে দূর
কে আর তুষিবে তোমা প্রেম আলিঙ্গনে
কে আর জাগাবে মৃদু অঙ্গুলি চালনে?

সুরেন্দ্রনাথ।



সাধুসঙ্গের প্রভাব।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
বিজ্ঞান সারথিযস্তু মন প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,——

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম, ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ এই গুলিই ভোগের বিষয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এই তিনের সামঞ্জস্য মতে অর্থাৎ কেহ কাহার বিরোধী না হয় এইরূপ ভাবে যদি বিষয় ভোগ করা হয় তবে ভোক্তার মঙ্গল হয়।

যে বিজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি, যুক্তমনা সদশ্ব যেমন সারথির বশীভূত থাকে, তেমনি তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে। ...

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, মন যাঁর সংযত, তিনি ভবসাগর পার হইয়া শ্রীবিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্রে যতপ্রকার সাধন আছে, সমস্তই জীবের মঙ্গল সাধন করে অর্থাৎ জড়াভিনিবেশ দূর করে। কতকগুলি সাধন দেহের, কতকগুলি মনের ও কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে। অর্থাৎ জীবের বিষয় সক্তি খর্ব্ব করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে।

জীবের রাগ বা আসক্তি এক, তাহা দুইদিকে যাইতে পারে না। যদি জড়ীয় কোন পদার্থের দিকে চিত্তের রাগ যায় তবে কৃষ্ণের দিকে কমিয়া আইসে। এবং কৃষ্ণের দিকে যাইলে জড়ের প্রতি কম হইয়া আইসে। শৈশবাবধি আমাদের রাগ জড়পদার্থের প্রতি লিপ্ত আছে; এজন্য কৃষ্ণের দিকে শীঘ্র যাইতে চায় না। অনেক চেষ্টা করিলেও মনের গতি ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে

পারা যায় না। বৈধ-ভক্তির আলোচনা, সাধুসঙ্গ ও ভগবল্লীলা পাঠ করিতে করিতে যখন মনোমল দূর হয়, তখন ক্রমে রাগ ঈশ্বরের দিকে যাইতে থাকে। এজন্য সাধনার প্রয়োজন।

যে সকল সাধনের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি—যথা বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গণের বিষয়রাগ খর্ব্ব করে।

তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও অনেক প্রকার যোগসাধন শরীরের উপকার করে।
তিতিক্ষা, আর্জ্জব, অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা, সাংখ্য ইত্যাদি অনেক প্রক্রিয়া মনের উপকার করে।

বিষয়াসক্তি খর্ব্ব করিয়া মনের রাগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবার জন্যই সাধনা।

ঐ সকল সাধন দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হইলে আত্মার স্বরূপোপলব্ধি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ আত্মার জড়াসক্তি বা জড়াভিনিবেশ দূর হয়। প্রকৃত বিষয় সকল হইতে আত্মার নিরসন ক্রমে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হইলে আত্মার স্ববৃত্তিরূপ ভক্তির প্রকাশ হয়।

ঐ সকল দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক সাধনদ্বারা দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক পাপ সকল নষ্ট হয়। ঐ সকল দোষই জীবের আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ের পথে ব্যাঘাত ঘটায়। ঐ সকল পাপক্ষয় হইলে আত্মশুদ্ধি হয়। আত্মশুদ্ধি হইলে জীব ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়।

যেষাং অন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মনাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তো ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

তীর্থসেবা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্তমল দূর হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মানকরের নিকট মড়ো বলিয়া একটি গ্রাম আছে, তথায় জীবন নামধারী একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কোন প্রকারে সংসারের দুঃখ নিরাকরণ করিতে না পারিয়া শেষে বারানসীতে গিয়া ধনপ্রাপ্তি ইচ্ছায় শিবের নিকট "ধন্না" দেন। তৃতীয় দিবসে বিশ্বেশ্বর মহাদেবের আদেশ হয় যে তুমি বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন কর, সেখানে তাঁহার নিকট অর্থ পাইবে। জীবন তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া সনাতনের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সনাতন গোস্বামী ভজনে অভিনিবিষ্ট, তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, গাত্র রোমাঞ্চিত এবং পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে, জীবন নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। জীবনের তখন সনাতনের প্রতি বড় ভক্তি হইয়াছে। প্রণাম করিবামাত্র সনাতন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! আমার নিকট কিছু প্রয়োজন আছে কি? তখন জীবন আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমি বড় দরিদ্র, ধন কামনা করিয়া কাশীধামে বাবা বিশ্বেশ্বরের নিকট তপস্যা করিয়াছিলাম, তিনি স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন 'বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট গমন কর ধন পাইবে।' বাবার আদেশমত অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনার নিকট

আসিলাম; আপনি অনুগ্রহ করিলেই আমার দুঃখ দূর হইবে।”

তখন সনাতন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “আমি যখন বাদ্‌সাহের মন্ত্রী ছিলাম, তখন আমার প্রচুর ধন ছিল, কিন্তু জড়ীয়ধনের অনিত্যতা বুঝিয়া এবং উহাতে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি করিয়া নরকের দিকে লইয়া যায় জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে ভজন করিতেছি, এখানে আমি ধন কোথায় পাইব?” তখন জীবন হতাশ হইয়া বলিলেন,—“তবে কি বাবা বিশ্বেশ্বর মিথ্যাবাক্যের দ্বারায় আমাকে প্রতারণা করিয়াছেন?” সনাতন বলিলেন, “তাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? তবে আমি স্মরণ করিয়া দেখি, আমার সন্ধানে কোন অর্থ আছে কি না?” কিছুক্ষণ চিন্তার পর সনাতন বলিলেন,—“হাঁ, হাঁ, ঠিক কথা, আমার স্মরণ হইল—একটি পরেশমণি আমার সন্ধানে আছে! আমি এক দিবস যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম একটি পরেশমণি পথে পতিত রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা একটি বৃক্ষতলে রাখিয়া একখণ্ড প্রস্তর চাপা দিলাম। মনে করিলাম যদি কেহ অর্থের যাচক আসে তাহাকে দিব। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, কেহ যাচক আইসে নাই, তাই বোধহয় বাবা বিশ্বেশ্বর আমার মনোভাবানুসারে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ যমুনার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষমূলে প্রস্তর চাপা পরেশমণিটী আপনি লইয়া আসুন।” তখন জীবন বলিলেন,—“আপনি আনিয়া স্বহস্তে আমায় অর্পণ করুন। তখন সনাতন কহিলেন,—“আমি স্নান করিয়াছি আর সেই অপবিত্র জিনিসটা স্পর্শ করিব না। আপনি যাইয়া প্রস্তরের তলদেশস্থিত সেই স্পর্শমণিটী লইয়া আসুন।” জীবন বড় সুখী হইলেন, স্পর্শমণিটী লইয়া আসিলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক সনাতনকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে জীবন কত ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই স্পর্শমণি লৌহ স্পর্শ করিলে লৌহ স্বর্ণ হয়, তবে আর ভাবনা কি? স্বর্ণে ঘর পুরিয়া যাইবে। লাখরাজ জমি করিব, পাকা বাড়ী করিব, জমিদারী খরিদ করিব এবং অর্থের দ্বারা অনেক লোকের উপকার করিব। আমার বহু মান হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সনাতন গোস্বামীর কথা মনে হইল। তাঁহার সেই পুলক, অশ্রু, স্বাত্বিক ভাব, দেবমূর্ত্তি, বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অর্থের প্রতি ঘৃণা এই সকল ভাব তাঁহার মনে হইল। তখন বিবেচনা করিল যে, যে অর্থের জন্য আমি কঠোর তপস্যা করিলাম, কি আশ্চর্য্য! সনাতন গোস্বামী তাহা অপবিত্র বিবেচনায় স্পর্শ করিলেন না। ইহাপেক্ষা অবশ্য এমন কোন উৎকৃষ্ট অর্থ আছে যাহা পাইয়া ঐ সাধু এই অর্থকে ঘৃণা করিলেন। আমি সেই উৎকৃষ্ট অর্থই লইব। এ অর্থে আমার প্রয়োজন নাই, এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় গোস্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, কারণ তখন সনাতনের প্রতি তাঁহার বড় ভক্তি হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—“আবার ফিরিলে কেন? তুমি ত অর্থ পাইয়াছ। জড়জগতে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট

অর্থ আর নাই। উহাতেই তোমার জড়জগতের অর্থের সাধ পূর্ণ হইবে। যে এই মণি পায় এই ভবসংসারে তাহার কোন বস্তুর অভাব থাকে না।" তখন জীবন করযোড়ে বলিলেন "স্বামিন্! আমি এই অর্থ আর চাই না, যে অর্থ লাভ করিয়া এই অর্থকে সামান্য জানিয়া ঘৃণা করিলেন আমি সেই অর্থ চাই, এ অর্থে আর প্রয়োজন নাই।" তখন সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—"মনুষ্য দুইবস্তু এক কালে প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই দুই বস্তু বড় বিরোধ-ভাবাপন্ন। যাহার জড়ীয় অর্থের প্রতি স্পৃহা থাকে, সে কখনই জড়াতীত পরম পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর যিনি পরমার্থ পাইয়াছেন, তিনি জড়ীয় অর্থকে কাকবিষ্ঠার মত অপবিত্র বিবেচনা করেন। তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা লইয়া গৃহে যাও। ইহা দ্বারা তুমি একজন বড়লোক হইবে।"

সনাতনের স্বভাব, বৈরাগ্য ও তেজ দেখিয়া জীবনের দিব্যজ্ঞান হইয়াছে এবং সব তত্ত্বই বুঝিয়াছে। তখন জীবন বলিলেন,—"এই অর্থের দ্বারায় কেবল দম্ভ, দর্প ও অহংকার বৃদ্ধি হইবে কিন্তু আমি আর কয় দিন বাঁচিব! মৃত্যুর পর ইহাতে আর আমার কোন ফল হইবে না। যে অর্থ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে এবং যাহা হইতে আমি আর কখনও বঞ্চিত হইব না আমাকে সেই অর্থ প্রদান করুন, আমি এই অর্থ যমুনার জলে ফেলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া জীবন ত্বরায় যমুনার নিকট গিয়া ঐ বহুমূল্য স্পর্শমণি (যাহা সাত রাজার ধন বলিয়া বিদিত) মধ্য-যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া সনাতনকে প্রণাম করিলেন।

সনাতন গোস্বামী জীবনের ভক্তিপরায়ণতা এবং ধর্ম্মে শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্ব উপদেশ দিয়া প্রবীণ করতঃ পরে দীক্ষা দিলেন। জীবন সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। আর বাড়ী ফিরিলেন না।

তাঁহার বংশধরেরা, এখনও আছেন এবং গোস্বামী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের অধিকাংশেই বড় বড় পণ্ডিত, গোস্বামীশাস্ত্রে পারদর্শী এবং বিখ্যাত বৈষ্ণব।

তীর্থদর্শনে ও সাধুসঙ্গে যে সুফল ফলে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে এবং দেখা যাইতেছে। আমি স্বয়ং তীর্থ দর্শনে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি।*

শ্রীবৈষ্ণবচরণরজপ্রার্থী।

শ্রীললিত মোহন ঘোষ।

---

* প্রবন্ধলেখক একজন ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ; ঈশ্বরানুরাগী ও বৈষ্ণব ভক্ত। একদা কোন কারণ বশতঃ শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়া "শ্রীবাস আঙ্গিনা" দেখিয়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন, সেই স্থানটী আজ পতিত ও প্রাণী মাত্রেরই মলমূত্র ত্যাগের স্থান হইয়াছে। ইহা দেখিয়া প্রাণে তিনি দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলেন। তিনি নিঃস্ব;—সংসারে থাকিয়া এ ক্লেশ দূর হইল হইল না। তাই তিনি আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। মায়াপুরে

শ্রীমন্দিরের নিকট অদ্য প্রায় তিন মাস যাবৎ বাস করিতেছেন। ইঁহার ইচ্ছা "শ্রীবাস আঙ্গিনাকে" পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠা করা। ইনি নিঃস্ব ও বৃদ্ধ হইলেও যুবকের অধ্যবসায় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। সম্প্রতি পশুচারণ ও মলমূত্র ত্যাগ নিবারণের জন্য বেড়া দিয়া ফুল বাগান করিয়া রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন। বর্ষার পর শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মানের জন্য যত্ন করিবেন।

সৎকার্য্যের ভগবান্ সহায়। তাই অল্পদিনেই ভক্তগণ তাঁহার সাধু ইচ্ছা অবগত হইয়া চারিদিক হইতে উৎসাহ দিতেছেন। যাঁহার প্রেরণায় তিনি এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে তাহা সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি "শ্রীবাস আঙ্গিনা" আর পতিত থাকিবে না; তাই এই বৃদ্ধ ভক্তকে তিনিও প্রবুদ্ধ করিয়াছেন! গৌরভক্তগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা, বৃদ্ধ যাহাতে ইহার চরম উন্নতি দেখিয়া হাসিমুখে মরিতে পারেন, অচিরে আপনারা তাহার ব্যবস্থা করুন। আশা আছে, গৌরভক্তের কৃপায় শীঘ্রই আমরা "শ্রীবাস আঙ্গিনা" প্রতিষ্ঠা দেখিব। ভগবান্ লেখকের উদ্যম সফল করুন। সং আঃ দং।

———0———

সাধক সঙ্গীত।

(৪)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পড়েছি যে বড় অসময়ে হরি! কি করি॥
চর্ম্মপাশ লয়ে মোর, শমন সেনা চারিপাশ
সকলি যেন ত্যজিল এখন, তুমিও কি রলে পাশরি॥
করাল কফে চাপিল বুক সরে না কথা মুখে আর
যায় যায় হে প্রাণ সব হয়ে এল অন্ধকার;—
কৃপাকরে এই আন্ধারে, সঙ্গে লয়ে শ্রীরাধারে,
দাঁড়াও হে সম্মুখে একবার ধরে মোহন, বাঁশরী॥
অহং মদে মাতি তখন, দিই নাই মন তোমা পানে,
জায়া সুতে মায়া সুতে গেঁথে রেখেছিনু প্রাণে,
অসময়ে ত্যজল তারা, তুমি এখন কৃপা করি,
এস হে করুণাময়! ভবসাগর-কাণ্ডারী।

নৈলে কাল-রাত্রি যোগে! ভবার্ণবের ভীষণ বেগে,
কে আর কাঙ্গালের সখা! পার করে এ ভাঙ্গাতরী ॥
রক্ষ মোরে মাধব মুরারে মধুসূদন!
কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামণ!
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"
গোবিন্দের এই ডাকার শেষ, রুদ্ধ হল কণ্ঠদেশ
তার হে তারকব্রহ্ম—নইলে যে আজ ডুবে মরি ॥

———0———

দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব।

শক্তি উপাসনা আধুনিক নহে। আর্য্য-জাতির প্রবল জ্ঞানোন্নতির সময়ে তাঁহারা মহাশক্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই মহাশক্তি নিত্যা, জন্ম-মৃত্যুরহিতস্বভাবা, জগতের আদি কারণ, তাঁহা হইতে এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। যে অনাদি মূলশক্তি হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞানও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। এই নিখিল জগতের মূলে যে অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য, অনন্ত, অজ্ঞেয় এক মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাঁহারা এই মহাশক্তির অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন। আর আর্য্য-গণ জ্ঞান ও ভক্তির সরলমার্গে গমন করিয়া সেই মহাশক্তির দর্শন পাইয়াছিলেন।

উপনিষদের যুগে আর্য্যগণ বুঝিতে পারিলেন, যে শক্তিতে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন,—যে শক্তিতে অগ্নি বিশ্বদহন করিতে পারেন—যে শক্তিতে পবন বিশ্ব আলোড়ন করিতে পারেন, সেই সেই শক্তি তাঁহাদের নিজ শক্তি নহে; অন্য এক মহাশক্তি হইতে তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে সেই মহাশক্তি আর্য্যদিগকে ভগবতীরূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

বেদান্তবাদিগণ এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোড়ন করিয়া উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব অদ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থকে দ্রষ্টারূপে সংস্থাপন করিয়াছেন ও তন্নিম্নে—তাঁহারই আশ্রয়ে দৃশ্যরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত পদার্থকে রক্ষা করিয়া বিশ্বলীলার সুন্দর মিমাংসা করিয়াছেন। সাংখ্যকারও ঐ উপরিতন পদার্থে পুরুষ ও অধস্তন পদার্থকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুর আরাধ্য—মহাশক্তি এতদুভয়ের বিশাল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জড়-অজড়, চর-অচর,-সমস্তই ইহাঁর অনন্ত সত্তার অন্তর্গত। সুতরাং ইনি

নির্গুণ সময়ে তুরীয়,—সগুণ অবস্থায় সত্ত্বরজস্তমোময়ী,—তখন রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই মহাশক্তি-তত্ত্ব বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আর্য্য-সন্তানগণ মূলতঃ এই মহাশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। মহাশক্তি জগন্ময়ী—এই অনন্ত বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি; তাই হিন্দুগণ দেব-নরে, চন্দ্র-সূর্য্যে, গ্রহ-উপগ্রহে, অগ্নি বায়ুতে, জলে-স্থলে, গঙ্গা-গোদাবরীতে, অশ্বত্থ-বটে—সর্ব্ব ঘটেই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন। হিমালয়ের প্রশ্নে দেবী ভগবতী বলিয়াছিলেন,—"হে ভূধর! সূক্ষ্মরূপের ন্যায় স্থূল রূপেও আমি এই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি; সুতরাং সমস্ত রূপই আমার স্থূলরূপের মধ্যে গণ্য। আমার যে রূপ পর, সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, গুণাতীত, নিরাকার, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী অথচ নিরংশ, ব্যাক্যাতীত সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নিত্য-চৈতন্যময়, নিত্যানন্দময়, আমার সেইরূপ মুমুক্ষুব্যক্তিরা দেহবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত অবলম্বন করেন। হে রাজন্! মায়ামুগ্ধ-ব্যক্তিরা সর্ব্বগত অদ্বৈতস্বরূপ আমার অব্যয় রূপকে জানিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্থূলরূপের ভজনা করেন, তাঁহারাও আমার পরমরূপ অবগত হইয়া মায়াজাল হইতে উত্তীর্ণ হন। আর আমার দৈবীমূর্ত্তির উপাসনা করিলেও আশুমুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।"

আর্য্যজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিমার্গের পঞ্চ-উপাসকই মূলতঃ মহাশক্তির দৈবীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আবার শাক্ত-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দশমহাবিদ্যার উপাসক। কারণ, দেবী ভগবতী স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

"মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণামস্তু বিমুক্তিদা॥"

শ্রীভগবতী গীতা

এই দশ মহাবিদ্যা শাক্তের উপাস্যা ও আশুমুক্তিপ্রদা। এই দশ মহাবিদ্যা দেবী মূর্ত্তি; অর্থাৎ—বিশেষ কার্য্যহেতু স্বেচ্ছায় আবির্ভূতা বা স্বয়ং উৎপন্না। এই দশ মহা-বিদ্যার তত্ত্বালোচনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। অগ্রে মহাশক্তি কোন সময়ে কি জন্য দশ মহাবিদ্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান ভাবটী সংক্ষেপে বলিয়া রাখি।

একদা কোন এক যজ্ঞস্থলে মহাদেব দক্ষ প্রজাপতিকে নমস্কার না করাতে, দক্ষ আপনাকে অতিশয় অপমানিত জ্ঞান করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল শিবকেই নিমন্ত্রন করা হইল না।

দক্ষের কনিষ্ঠাকন্যাটী—আদরের সতী স্বেচ্ছায় শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি নারদের মুখে পিতার মহা সমারোহে যজ্ঞানু-ষ্ঠানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু পিতা তাঁহাদের এ যজ্ঞে নিমন্ত্রন করিলেন না, তাঁহার পতির অপমান করিতেই এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই ভাবিয়া সতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তিনি কারণ জানিবার জন্য

পিতৃ সন্নিধানে গমন করিতে বাসনা করিয়া মহাদেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

মহাদেব অসম্মত হইলেন। দেবীও নানাযুক্তি প্রদর্শন করিয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শিব হাসিয়া সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "সতি! আমার মান-অপমান নাই, আমি তোমাকে লইয়া পরম সুখে কৈলাসে কালাতিপাত করিব, আমার যজ্ঞভাগে কোন প্রয়োজন নাই, ভাল হইল—এখন হইতে যজ্ঞভাগের জন্য আর তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইবে না। তোমার পিতা তোমার কথা রাখিবেন না, উপরন্তু আমাকে কটু কথা বলিবেন। তুই অভিমানিনী,—সে কথা প্রাণে সহ্য করিতে পারিবিনা—দেহ ছাড়িবি। কেন বল'ত ভিখারীকে কাঁদাবি। তাই বল্‌ছি 'অন্নপানি', ছাড়লেও আমি কোনমতে তোমায় যাইতে দিব না।"

দক্ষযজ্ঞে যাইতে সতী পুনঃ পুনঃ নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া উৎকণ্ঠিত হইভেছিলেন। শিবের শেষ উক্তি শুনিয়া ক্রোধের উদ্রেক হওয়াতে তাহার অঙ্গ ঘনঘন কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হইল তিনি সেই রোষাগ্নি দ্বারা ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর তখন সতীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে দিকে যখন মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, সেই দিকে সতীর এক এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাই দশ মহাবিদ্যার আবির্ভাব। এই কারণে দশমহাবিদ্যা দৈবী মূর্ত্তি। তাই ইহাঁর যে কোন মূর্ত্তির উপাসনায় সাধক আশুমুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দশমহাবিদ্যা কি তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

উপরে যে উপাখ্যানভাগ বিবৃত হইল, তাহা পুরাণের রূপক। রূপকের এমন তাৎপর্য্য, এমন ভাব আছে,—যাহা বিশ্লেষণ করিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। এখানে দক্ষ কর্ম্মশক্তি, দক্ষ কাল বঞ্চনায় চেষ্টা করিলেন। তিনি আপন কর্ম্মশক্তির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভাবিলেন, মহাকাল শঙ্কর,—শঙ্করকে মান্য করা কি জন্য? ভগবান বিষ্ণু আছেন, তাঁহাকে ভজনা করা জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু মহাকালকে কেন? কর্ম্মশক্তির দ্বারা কালকে জয়করা যায়,—কালকে অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু কাল'ত ঈশ্বরেরই বিকাশ,—কাল, কর্ম্মকে প্রণত হইবেন কেন? কাল কর্ম্মকে গ্রাহ্য করেন নাই। তাই কর্ম্ম ক্রুদ্ধ হইয়া আরও বিকাশে কালকে হীন করিতে প্রয়াস পাইলেন। শক্তি লাভ করিতে হইলেই যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন,—তাই দক্ষ ত্রিলোকব্যাপী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

কালের শক্তি সতী অথবা অপরা প্রকৃতি। এখন, কর্ম্মশক্তির পরিচালনায় অপরা শক্তিকে বাধ্য হইতেই হইবে। তুমি ঈশ্বরকে ডাক আর নাই ডাক,—ঈশ্বরকে বুঝ আর নাই বুঝ,—ঈশ্বরকে মান আর নাই মান,—কর্ম্ম করিলে শক্তিকে আসিতেই হইবে। কিন্তু ঈশ্বরহীন কর্ম্ম দক্ষযজ্ঞ।

সতী দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা এবং আদরের পাত্রী,—তাহার ভাব এই যে, সকল আসক্তিময় অবস্থার পরিণামে প্রকাশ হয়েন বলিয়া উঁহাকে কনিষ্ঠা বলা হইয়াছে। কাজেই

সেই মহাশক্তি স্বরূপা অবিদ্যারূপিনী অপরা প্রকৃতির উপরে কাহার না প্রবলাসক্তি! কিন্তু অবিদ্যাই আবার মহাবিদ্যা, কাজেই তিনি ব্রহ্মপরা বা নিবৃত্তিপরা বলিয়া মহা-মোহিত কর্ম্মমতি দক্ষ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি যদি কালের কোলে না থাকিয়া কেবল কর্ম্মে বিরাজিত হইতেন, তবে দক্ষের এ জাতক্রোধ হইত না। সতী কালের কোলে কালী। শ্মশানবাসিনী—যোগিনী ডাকিনী সহচারিণী উলঙ্গিনী মুক্তকেশী। ঐশ্বর্য্যমদ-গর্ব্বিত কর্ম্মমতি দক্ষ এমন কন্যা দেখিতেও চাহেন না। অথচ শক্তিসাধকের আকর্ষণ শক্তি অবহেলা করিতে পারেন না। অথচ শক্তি অবহেলা করিতে পারেন না। শক্তিকে ডাকিলেই—শক্তির সাধনা করিলেই শক্তিকে ছুটিতে হইবে। শক্তি আর থাকেন কি করিয়া, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। কালহীন কালীর গমনে যে কুফল হয়, দক্ষের কার্য্যে তাহা হউক; কিন্তু দক্ষ যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে তাঁহাকে যাইতেই হইবে।

যখন কর্ম্মমতির সাধনাফলে সেই মহেশ্বরের সহিত প্রকৃতি বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইল, তখনও মহাকাল প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। শক্তি তখন কর্ম্মপথাতি-গামিনী,—তিনি কালকে ভীত করিতে স্বরূপ প্রকাশ করিলেন;—দশদিকে দশমহাবিদ্যা হইলেন।

প্রথম মহাবিদ্যা মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি কালী এবং দ্বিতীয় মহাবিদ্যা অনন্ত দেশের প্রকৃতিরূপিনী—দেশশক্তি তারা। কালী ও তারার তত্ত্ব প্রায়ই একরূপ; দেশ ও কালে যে বিভিন্নতা তারা ও কালীতেও সেই প্রভেদ। কালী-তারা উভয়েই কাল ও দেশে আত্মশক্তিতে সংহারকারিণী। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তদ্রূপ সমুদয় কালজ পদার্থ কালীতে এবং দেশজ পদার্থ তারাতে বিলীন হইয়া থাকে। এইজন্য সেই নিগুর্ণ, নিরাকার, বিশ্বহিতৈষিণী কালশক্তি কৃষ্ণবর্ণ এবং দেশ শক্তি নীলবর্ণ। ইহাঁরা নিত্যা, অক্ষয়া ও কল্যাণময়ী। অমৃতত্বপ্রযুক্ত ইহাঁদের ললাটে চন্দ্রকলা। সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা সচরাচর জগৎ দৃশ্যমান হইতেছে, তাই তাঁহারা ত্রিনয়না। কাল ও দেশ অনন্ত বলিয়া কালী ও তারা আবরণশূন্যা, অর্থাৎ—উলঙ্গিনী। কালী-তারা প্রভৃতি সমস্ত মূর্ত্তিই ধ্যানজরূপ,—ধ্যানজরূপ সকল সূক্ষ্ম শক্তির প্রতিমা। আকাশই কাল ও দেশ। উক্ত দুই মহা-বিদ্যা সেই কাল ও দেশশক্তি। আবার আকাশই সর্ব্বশক্তির আধার। সুতরাং সেই আকাশ হইতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর উৎপত্তি। কারণ, শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে, অক্ষুণ্ণ না থাকিলে তাহা শক্তি হইবে কিরূপে? এইজন্য শক্তি চিরযৌবনা ষোড়শী। ষোড়শী সর্ব্ব শক্তির শ্রেষ্ঠ, • এজন্য রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বল, বীর্য্য সকলই। তাই এই সর্ব্ব শক্তিরূপিনী রাজরাজেশ্বরীকে পঞ্চদেবতা ধ্যান করিতেছেন। কারণ, এই আদ্যাশক্তি হইতেই তাঁহাদের শক্তি লাভ হইয়াছে। কালী তারা মহাবিদ্যা হইতে এই তৃতীয় বিদ্যার উৎপত্তি। এই তৃতীয় বিদ্যাকে ঋষিগণ ত্রিগুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া সমষ্টি

অর্থে ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে দেখাইয়াছেন। তাই চতুর্থ বিদ্যার নাম ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ, এক কোমল কান্তি, আর এক প্রচণ্ডরূপ। ভুবনেশ্বরী মনোহর রূপে দেখা দিয়াছেন। আর ভৈরবীর চণ্ডীশক্তি অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত অষ্ট নায়িকা। তন্ত্র, শক্তির এইরূপ নানা ধ্যানজরূপ দেখাইয়া শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। আর কোন বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তিকে এরূপ তন্ন তন্ন বিভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন? সেই অষ্টনায়িকা ভিন্ন ভৈরবী আবার ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। তাই ছিন্নমস্তা পরম্পরা-রূপে ষষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিতা। ভগবতী সর্ব্বমূর্ত্তিতেই বিশ্বপালিকা শক্তি। কারণ, তিনি যেমন বিশ্বের সৃষ্টির কারণ তেমনি স্থিতির কারণ। ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে পালিকা-শক্তিই প্রবলা থাকাতে তিনি ভৈরবীমূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্রা হইয়াছেন। সর্ব্বরূপেই একই ভগবতী, তবে উপাসনার্থ বিভিন্ন ধ্যানজরূপের প্রতিমা গ্রহণ করা হয় মাত্র। ছিন্নমস্তা-রূপে কি প্রকারে পালন শক্তির প্রাবল্য হইয়াছে? ছিন্নমস্তায় আমরা ভগবতী অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তিবিভাগ দেখিতে পাই। অন্নপূর্ণা যে ভোক্তৃ, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপ হইয়াছেন, তাহাই ছিন্নমস্তার ত্রিধারক্তধারা। ছিন্নমস্তা নিজ দেহের ত্রিধা রক্তধারা পান করিয়া অন্নপূর্ণাকে পরিষ্কার-রূপে দেখাইতেছেন। কখন জগৎ ভোক্তৃ-রূপে নিজ জগদ্দেহ হইতেই ভোগ্য অন্ন সংগ্রহ করিতেছেন, কখন সেই ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করিয়া পরিপুষ্ট ও পালিত হইতেছেন। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিনই পৃথক্ শক্তিরূপে দেখা যায়। ভোক্তা, থাকিতে পারে, ভোগ্যও থাকিতে পারে, কিন্তু ভোগ না হইলে কি পুষ্টি সাধন হয়? ভোগ না হইলে ভোগ্য কিছুই নহে। পীড়িতের কাছে ভোগ্য আছে, কিন্তু ভোগ নাই। ভোগই জগতের পালন হেতু। সেইজন্য ভোগধারাই ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন, আর অপর দুইধারা একাত্ম-সখীদ্বয় পান করিতে-ছেন। তাঁহারা ভোক্তৃ ও ভোগ্যশক্তি-রূপা এবং সেই সেই রূপা বলিয়া স্বতন্ত্র দেহী। অতএব, ছিন্নমস্তায় আমরা অন্নপূর্ণার জগৎ-পালনরীতি অতি পরিষ্কৃত রূপে দেখিতে পাই। জগতের ভোগ পূর্ণ হইলে কি হয়?— প্রলয় হয়। তাই আমরা ছিন্নমস্তার পর ভগবতীর প্রলয়রূপিনী ধূমাবতীকে দেখিতে পাই। ধূমাবতী ভগবতীর ঘোর প্রলয়মূর্ত্তি। প্রলয়কালে জগতের ভোগ শেষ হইলে জরাজীর্ণা ভগবতী বৃদ্ধাবেশে কাকধ্বজ যমের প্রলয়রথে আরূঢ়া হইয়া ক্ষুধাতুরা, বিস্তার-বদনা সর্ব্ব বিশ্বকে কুলা-হস্তে সংগ্রহ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করেন। ধূমাবতী এই প্রলয়রূপিনী ভৈরবীর ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি রক্তবর্ণা রজোরূপিনী বগলা। এই মূর্ত্তিতে ভগবতী ঘোর বেদবিরোধী অসুরের বিনাশ সাধন করেন। সেই অসুরনাশে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই নির্ম্মল জ্ঞা রূপিনী ভগবৎ-শক্তিই মাতঙ্গিনী [illegible] মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপিনী ভগবতী অজ্ঞান-নাশিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিনী শক্তি। সমস্ত শক্তিধারিণী হইয়া ভগবতী অষ্টৈশ্বর্য-শালিনী কমলারূপে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি।

যে ব্রহ্মাণ্ডকমল ব্রহ্মার আসন রূপে কারণ-বারি হইতে সঞ্জাত হইয়াছিল, সেই কমলে কমলার ব্রাহ্মীশক্তি এবং অপরাবিদ্যারও আসন কল্পিত হইয়াছে। কেবল কালী ও তারা মূর্ত্তিতে ভগবতী মহাকাল ও মহাদেব রূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের উপর অবস্থিতা। এই কালী ও তারা মূর্ত্তিই প্রধানতঃ মহাবিদ্যা। অন্য অষ্ট মূর্ত্তি তদুৎপন্ন পরপর বিদ্যা ও সিদ্ধ-বিদ্যারূপে তন্ত্র-পুরাণ শাস্ত্রে বিভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং যে বিশ্বকমল ত্রিগুণময় হইয়া ত্রিভুবনে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই সেই অষ্ট বিদ্যার আসন স্বরূপ হইয়াছে। এই দশমহাবিদ্যা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গিনী সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী প্রকৃতি শক্তিরূপা হইয়া উজ্জ্বল বর্ণে একাসনেই বিরাজিতা আছেন।

পাঠক! দশমহাবিদ্যা কি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। দশবিধ প্রকৃতি-শক্তিই দশমহাবিদ্যা। আর এই দশমহাবিদ্যার সমষ্টি রূপই দশভুজা ভগবতী। সুতরাং দশমহাবিদ্যার যে কোন মূর্ত্তিকে দৃঢ়ভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনা করিলে শীঘ্রই মুক্তি হয়। তাই মহাশক্তির দশমহাবিদ্যারূপ উপাসনার প্রথা হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে যে কোন বিদ্যার মন্ত্র গ্রহণ করতঃ কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিবে, তাঁহার নাম জপে সমুৎসুক হইবে, এবং তদ্‌ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার পূজাদি প্রসঙ্গে প্রীতিযুক্তমানস হইবে। যে পর্য্যন্ত স্থূলরূপে চিন্তানৈপুণ্য না হয়, সেই পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণ গমন করিতে পারে না; অতএব প্রথমতঃ স্থূলরূপ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াযোগ ও ধ্যানযোগ দ্বারা সেই স্থূলরূপের বিধি বিধানে অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই প্রকার শাস্ত্র-বিধিবিহিত কর্ম্ম করিয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে দেবীর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হইয়া থাকে। তখন গুরূপদেশ সহকারে বেদান্তাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার নিত্য কলেবর সেই অপার আনন্দসাগর কোনও সময়ে অত্যল্প কালের জন্য অন্তঃকরণে স্পর্শ হয়; তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য সুখের কারণ বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকে না; জগতের কোনও রমণীয় বস্তুকে তদপেক্ষা রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না; জগতের কোনও লাভকে তল্লাভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না; সুতরাং কামনা পরিত্যাগ হইয়া যায়। সমুদয় জীব-পদার্থে দেবীর সত্ত্বা নিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরম যত্ন উপস্থিত হয়; সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। এবম্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তখন তত্ত্ববিদ্যা আবির্ভূতা হন, ইহাতে সংশয় নাই। তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই মহাশক্তি ভগবতীদেবীর নিত্যানন্দ বিগ্রহ-মূর্ত্তি অর্থাৎ পরমার্থ ভাব তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়; তাহাতেই সাধকের জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি ও অন্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

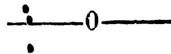
মহাশক্তির আরাধনায় সাধক শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; কারণ, শক্তি যে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে জড়িত তাই মহাশক্তির দশবিধ বিদ্যারূপ-সাধনার প্রথা শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশেষ রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সেই-জন্য তন্ত্রশাস্ত্র ভগবান্‌কে শক্তিমান না বলিয়া

শক্তিময়ী রূপেই প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শক্তি উপাসনা অবৈজ্ঞানিক নহে। আর্য্যজাতির প্রবল জ্ঞানোন্নতির সময়েই শক্তি উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দশ-মহাবিদ্যা সেই মহাশক্তিরই ক্রমবিকাশ! এস পাঠক, আমরা আমাদের হৃতা শক্তি ও দৃঢ়াভক্তি পাইবার আশায় সেই ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবারাধ্যা বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়া যোগমায়ার শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম করিঃ—

ওঁ সূর্য্যেন্দু বহ্নিপীঠেতু বেন্দবে পরমেশ্বরী।
নমামি দক্ষিণামূর্ত্তিং কালিকাং পর ভৈরবী॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তি সাত্বং কিং স্তুয়সে সদা॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।



সেবা।

জগতে জীব মাত্রই কর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। জীব বলিলেই বুঝিতে হইবে,—"কর্ম্মসমষ্টি"। জীব মাত্রই যেন কর্ম্মময় একটী যন্ত্র। সুতরাং কেহই কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মহীন হইয়া থাকিলে জীবের জীবত্ব কোথায় থাকিবে?—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"

যখন আমাদিগকে অবশ্যই কর্ম্ম করিতে হইবে, তখন কর্ম্ম সমন্ধে বিচার করাও অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার কতকগুলি সমাজের দৃষ্টিতে হিতকর ও কতকগুলি অহিতকর। কতক-গুলি ন্যায়ানুমোদিত আবার কতকগুলি অন্যায়, এইরূপ কতকগুলি মন্দ! অবশ্য এই জগ-তেই মানুষ এমন অবস্থা লাভ করিতে পারে যে অবস্থায় ভালমন্দ প্রভৃতি কিছুই থাকেনা,—দ্বন্দ্বরহিত অবস্থা। যেখান হইতে দেখিলে জগতে ভালমন্দ যাহা কিছু ঘটে, তাহা সবই ভাল, সকলই মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত বিবেচিত হইবে।

হিতাহিত ভেদে স্থুলতঃ কর্ম্ম দ্বিবিধ। যাহার দ্বারা অধিকাংশের হিত এবং অল্পের ক্ষতি হয় তাহাই শাস্ত্রানুমোদিত বিহিত কর্ম্ম এবং যাহাতে অল্পের হিত এবং বহুর অপ-কার হয় তাহা শাস্ত্রাননুমোদিত অবিহিত কর্ম্ম এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কিছু করা যাউক না কেন, তাহাতেই একের মঙ্গল এবং অন্যের অমঙ্গল নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হইবে। জগতের নিয়মই এই যে,—ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইবে। এমন কি শ্বাসগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিবার জন্য নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে শত শত জীবকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে হইতেছে। সুতরাং বিচার করিয়া কর্ম্ম করাও একরূপ অসম্ভব। আবার আমাদিগকে কর্ম্মও করিতে হইবে; কর্ম্ম না করিলে আমরা একমুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আমাদিগকে শাস্ত্রানুমোদিত যথাসাধ্য

বিহিত কর্ম্মেরই অনুসরণ করিতে হইবে। আবার কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হইবে, কিন্তু শাস্ত্রে ইহাও দেখিতে পাই যে আমরা জ্ঞানের দ্বারা সেই কর্ম্মফল নষ্ট করিতে পারি। ফলাফলে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বিহিত কর্ম্মাদি সম্পন্নকরাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাতে আমরা দেখিব যে আমাদের 'অহং' রূপ ক্ষুদ্রগণ্ডী ভগ্ন হইয়া বিশ্বে মিশিতেছে, এবং আমাদের চরম লক্ষ্য ভগবানে পৌঁছিতেছে। তখন দেখিব যে, কর্ম্ম আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য না করিয়া জন্মমৃত্যু এবং ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিয়া অতুল আনন্দের অধিকারী করিতেছে এবং অন্তিমে মোক্ষের কারণ হইতেছে।

জীবসেবা কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইলেও ইহাতে যেমন সেবককে ভগবন্মুখী করে অন্যান্য কর্ম্মে সেরূপ পারে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি দিতে না পারিলে বা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে সেবা করিবার উপযুক্ত হওয়া যায় না। কারণ যতক্ষণ "অহং" রূপ গণ্ডীর মধ্যে থাকিব, ততক্ষণ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। কি করিলে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইবে, এমন কি জগতের বিনিময়ে তাহারই অনুধাবনে ব্যস্ত থাকিব * সুতরাং অপরের সেবার অবসর কোথায়? সেইজন্যই আত্মবলি দিবার প্রয়োজন। কারণ, তখন আর নিজের বলিয়া কিছুই থাকিবে না, যাহা করিব পরের জন্যই; তখনই কেবল সেবক হইতে পারিব। আবার আমরা যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিব, তখন বুঝিব জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই আত্মার বিকাশ, সুতরাং আমি এবং অবশিষ্ট যাহা কিছু তৎসমুদয় এক। আমার কিছুই পর নহে, তখন বুঝিব অপরের হিতার্থে যাহা কিছু করিতেছি, তাহা প্রকারান্তরে আমার জন্যই করিতেছি, তখনই আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং জগতের গুপ্তরহস্য আমার নিকট প্রকাশিত হইবে, ভাল-মন্দ হিংসা-দ্বেষ পূর্ণ এই জগতই আমার নিকট নূতন ভাব ধারণ করিবে। তখন বিড়ম্বনাময় এই জীবনই অশেষ শান্তিপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেইজন্যই এক আত্মজ্ঞানী অথবা যিনি অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই সেবক নামের উপযুক্ত,—অন্যে নহে। অতএব যিনি যতই সেবক নামের বড়াই করুন না কেন তিনি প্রকৃত সেবক নহেন।

যিনি প্রকৃত সেবক হইতে চান, তাঁহার সর্ব্ব প্রথম আত্মজ্ঞান লাভ করা উচিত। জগতে যাঁহারা সেবক বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মজ্ঞানী ছিলেন। জীবের সাংসারিক অভাব অনাটন দূর করিয়া প্রাণে শান্তি দান করা সেবার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এইরূপে কখনই স্থায়ীভাবে কার্য্য হয় না। অনিত্য জগতের সকলই অনিত্য, সুতরাং অনিত্য বস্তুতে স্থায়ী

---

* বর্দ্ধমান বিভাগে জলপ্লাবনে সাধারণ সেবকগণের সুখ-সুবিধার জন্য চা-বিস্কুটের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বহু গৃহান্নশূন্য ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইত। কিন্তু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবকগণের জন্য আদৌ কোন ব্যয় বহন করিতে হয় নাই।

ভাবে কাহারও কিছু করা যায় না। অতএব নিত্যজ্ঞান দানেই আমরা প্রকৃত সেবা করিতে পারি। আর সেই জ্ঞান নিজে লাভ না করিলেও পরকে দেওয়া যায় না। সেইজন্য আত্মজ্ঞানীই প্রকৃত সেবক পদবাচ্য। তবেই দেখা গেল সেবক—আত্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানীই—সেবক। সুতরাং যাহারা মনেপ্রাণে সেবক হইতে চেষ্টা করেন তাহারা নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন। এই জন্যই ধর্ম্মজগতে কাম্য কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে জন হিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই হিন্দুর অধিকারী ভেদ। তাহারা প্রথমতঃ সমাজে থাকিয়া জনহিতকর কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন। দরিদ্রকে ধনাদি বিতরণ, ব্রাহ্মণভোজন, অতিথিসেবা, সমাজের হিতসাধন ইত্যাদি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। পরে গার্হস্থ্যধর্ম্মের পরিপাকে যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন (এখন সে প্রথা না থাকিলেও, এককালে তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় ছিল) তখন "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জীবনের উদ্দেশ্য হয়। তখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগতে সেই জ্ঞান বিতরণই তাহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। তখন অর্থাদি অনিত্য বস্তুতে তাঁহাদিগের প্রয়োজন থাকে না। কেবল জ্ঞানান্বেষণ এবং তাহার বিতরণ দ্বারা জগতের সেবা তাহাদের ধর্ম্ম হয়। এইরূপে তাহারা প্রকৃত সেবা করেন বলিয়া সমাজ তাহাদিগকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। এবং তজ্জন্যই দীনহীন ভিখারি হইতে রাজাধিরাজের শির তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিত। তাঁহাদের বাক্য বেদবাক্য এবং তাঁহাদের ইচ্ছা ভগবতী ইচ্ছা। যদি সেবক নামের সার্থকতা থাকে তবে তাঁহারাই তাহার মূর্ত্তিমান আদর্শ।

আমাদের এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা প্রথমেই যে প্রকৃত সেবক হইতে পারিব তাহা নহে, আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ হইতে হইবে। আমরা যে পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্রকন্যা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনে লিপ্ত থাকি তাহাও সেবা, তবে তাহা জ্ঞানের অভাবে সংকীর্ণ ভাব ধারণ করায় উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া আমিত্বের পরিপোষণ করিয়া থাকে। এইরূপে যাহাদের সহিত স্বার্থ বিজড়িত, গৌণভাবে তাহাদের সেবা করিতে গিয়া মুখ্যভাবে ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া থাকি; আর তাহারা ত আমাদের রিপু (শত্রু) বই নয়, যথাসাধ্য আমাদের অধঃপতনের একশেষ করিয়া দেয়। সুতরাং আমরা যদি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবে দেখিব ঐ রিপুগুলি শত্রু না হইয়া মিত্রে পরিণত হইতে বাধ্য হইবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত হওয়ায় আমরা অধিকতর মানসিক শক্তি এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইব। তখন আর পদে পদে বিড়ম্বিত না হইয়া অধিকতর শান্তিময় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইব। আমা কর্ত্তৃক কোন জীবের উপকার বই অপকারের সম্ভাবনা না থাকায়, জগৎ আনন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং সকলেই আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে। এইজন্যই আত্মজ্ঞানী সাধুগণের নিকট অতীব হিংস্র পশুও শান্তভাব ধারণ করে।

আমরা সুখ বা শান্তির জন্য লালায়িত; কিন্তু কি করিয়া শান্তি বা সুখ লাভ করা যায়, সে জ্ঞান বা শিক্ষা না থাকায় আমরা জীবনে কেবল বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকি, আর জীবন ধারণ কেবলমাত্র দুঃখের কারণ মনে করিয়া নিরশায় হা হুতাশে কালাতিপাত করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা এইটুকু বুঝিবার চেষ্টা করি না যে, ঐ ত কোনরূপ সংস্থান-বিহীন, কৌপীনমাত্রধারী, বৃক্ষমূলাশ্রয়ী, ভিক্ষান্নোপজীবি, সংসারবিরাগী সাধু কেমন লাবণ্য ও তেজঃপুঞ্জ কলেবরে, সানন্দভাবে কালযাপন করিতেছেন। জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ড তাঁহার নিকট উন্মুক্ত। পাপী, তাপী যে কেহ হউক না কেন, ক্ষণেকের তরে তাহার আশ্রয় পাইলেই সকল জ্বালা দূর করিতে সক্ষম হইবে। এসব কিসে হইল? আর ঘোর সংসারী তুমি, অমিত বিত্ত, দাসদাসী, প্রচুর ভোগবিলাসের অধিকারী হইয়াও ব্যাধি-পীড়িত, অন্তঃসারহীন ক্ষীণদেহে, নিরশাজনিত শুষ্কমুখে, অজ্ঞানের ন্যায় কাল যাপন করিতেছ, আর দীর্ঘশ্বাসে তোমার সুতল হর্ম্মারাজি কলুষিত হইয়া উঠিতেছ, এসবই বা কেন? এ সকলের একমাত্র উত্তর,—তুমি অজ্ঞ জগদ্-রহস্য আলোচনা কর নাই, কি করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হয়, বিশ্বকোষে তাহা অনুসন্ধান কর নাই, তাই তুমি ঘৃণিত পশু-জীবন বহন করিতেছ। আর ঐ যে বৃক্ষ-মুলাশ্রয়ী সাধু সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি বিজ্ঞ, তাই তিনি নিজের বলিতে যাহা কিছু ছিল জগতের জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন। এমন কি বিলাসভোগের আধার এই আদরের দেহটীও ত্যাগ করিয়াছেন (কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ কালে সন্ন্যাসীরা মৃতের পিণ্ডদানের ন্যায় নিজ দেহের পিণ্ড দান করেন এবং আপনাদিগকে দেহহীন আত্মা-স্বরূপ চিন্তা করিতে থাকেন,) তবেই তিনি সুখী হইতে পারিয়াছেন, এবং সমুদয় হারাইয়াও আত্মস্বরূপ অনন্ত বিভবের অধিকারী হইয়াছেন। আর আমরা যতই আমার ২ করিয়া সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, ততই প্রলোভিত হইতেছি, আর দেখিতেছি আমার বলিতে কিছুই নাই। ভিক্ষুক বলিয়া সাধু সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষুক নহেন, প্রকৃত পক্ষে আমরাই ভিক্ষুক। তাহারা আমাদের কৃপার পাত্র নহেন; আমরাই তাহাদের কৃপার পাত্র। তাহারা যে আমাদিগের নিকট একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করেন, সেই অনিত্য পদার্থের বিনিময়ে আমাদিগকে নিত্যবস্তু জ্ঞান বিতরণ করেন। তাঁহারা প্রার্থনা করিতে আসেন না, দান করিতে আসেন। তাঁহারা সেবা পাইতে আসেন না, সেবা করিয়া যান্। এক্ষণে হিন্দুসমাজের অধঃপতন হইয়াছে, তাই যে সাধুসন্ন্যাসীর কথায় সাম্রাজ্য পরিচালিত হইত, যাঁহাদের বেদ বেদান্ত, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্রাদির কৃপায় হিন্দুসমাজ আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, জগৎ যাঁহাদিগের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী, তাঁহারা আজ নানা প্রকারে লাঞ্ছিত, সমাজের নিকট ঘৃণিত ও গলগ্রহ বলিয়া বিবেচিত। অবশ্য সমাজের তুলনায় সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও শত শত দোষ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগের তুলনা জগতে অতুলনীয়। ঐ আশ্রম এক্ষণে যে ভাবেই চলুক না কেন, উহার মধ্যেই বীজ রক্ষিত হইতেছে।

কালে ঐ বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়া জগতকে আবার শান্তিছায়া বিতরণ করিবে। সুতরাং আদর্শ রক্ষা করিতেই হইবে।

জগতে আমরা সবই করিতেছি, কিন্তু একমাত্র হৃদয়ের অভাবে সব পণ্ড হইয়া যাইতেছে। অজ্ঞানের ন্যায় অন্ধভাবে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইতেছি। আমরা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন ভূতের ন্যায় খাটিতেছি, আর মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি। যদি আমরা জ্ঞানের আশ্রয় লই, তবেই হৃদয় খুলিয়া যাইবে, প্রেম প্রবাহে জগত প্লাবিত হইবে। পাপী, তাপী, দীন-দুঃখী, হীন-পীড়িত সকলকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারিব। তাহাদের প্রতি সমপ্রাণতা আসিবে, তখন আর ছোটবড়, উচ্চনীচ জ্ঞান থাকিবে না, কেবল তখনই তাহাদের সেবা করিবার উপযুক্ত হইব।

সেবার মহান উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিলেও সমাজ জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা অভাবনীয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া না চলিলে, মানুষে ও পশুতে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না, সুতরাং মনুষ্যকে পদে পদে অপরের সহানুভূতি, সাহায্য প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য যদি কেহ ঐরূপ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়, তবে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে এবং হিতকারীর প্রত্যুপকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাকিলে সমাজে হিংসা-দ্বেষভাব দূরীভূত হইয়া অচিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং সমাজ জীবন অধিকতর সুখকর হইবে।

এইরূপে সেবাদ্বারা যে বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা যাঁহারা কখন সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন বা যাহারা এইরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন। এরূপ আনন্দ আর কিছুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

আমরা জগদ্রহস্য আলোচনা করিলে দেখিব, সেই পরম পিতা পরমেশ্বর হইতে অতি তুচ্ছ ধুলিকণা পর্য্যন্ত কেবল সেবা ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন। ভগবান এই জগত ব্রহ্মাণ্ড রূপে বিকাশ হইয়া আপনাকে এমন কি ইহার অণুপরমাণুতে বিলাইয়া দিয়াছেন, নিজের বলিতে কিছুই রাখেন নাই, জীবের হিতে জীবের সেবায়, শত শত প্রয়োজনীয় জিনিষ রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সেবকের আদর্শরূপে জগৎকে সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি নিজের জন্য কি করে? জগতের হিতের জন্য কি না করিতেছে? এইরূপ বায়ু, জল, অগ্নি—যাহা কিছু দেখি সবই যেন একসুরে গাথা,—কেবল সেবার মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে।

আমরা জাগতিক যে কোন পদার্থের নিকট এই সেবার দীক্ষা লইতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুষ্পকে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করা যাউক। এই পুষ্প কাননে লোকলোচনের প্রত্যক্ষে বা অন্তরালে সমভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া কানন হাসাইয়া—সৌরভ বিলাইয়া—দেবতা হইতে অজ্ঞান শিশুর প্রীতি আকর্ষণ করিয়া অবশেষে ঝরিয়া পড়ে। দেবতার

মস্তকে উঠিয়াও গর্ব্ব নাই, কিংবা বিলাসীর প্রমোদবাসরের শোভাসম্পাদন করতঃ পদদলিত হইয়াও অপমান বোধ নাই। ভালমন্দ কিছুর বিচার করিতে জানে না। জানে কেবল সকলকে আনন্দ দান করিতে। যদি সেবক হইবে, তবে পুষ্পের ন্যায় ব্যবহার শিক্ষা কর! তোমাকে যে, যে ভাবেই লউক না কেন, ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজকে জগতের জন্য বিলাইয়া দাও। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর!

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—0—

উপদেশ।

যেই ধর্ম্ম পথে সদা
চলে সুধীজন।
সেই পথে ঠিক ভাবে
কর বিচরণ॥
পাপ পথে মন কভু
যেতে নাহি দিয়ো।
ধরম পরম বস্তু
কভু না ছাড়িয়ো॥
ভগবানে মতি রেখো
জীবনে মরণে।
অন্তিমে পাইবে শান্তি
শান্তি-নিকেতনে॥
নিষ্কাম হইয়ে কর্ম্ম
কর অনিবার।
পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি
আদেশ "গীতার"॥

শ্রীপ্রভাতবন্ধু নিয়োগী।

—0—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।*

(ষষ্ঠ বর্ষের ২৬৯ পৃষ্ঠার পর।)

পোরবন্দর সহর।

সহরের পক্ষে বাজার মন্দ নয়। পরী-কোঠা নামক ৯০ ফুট উচ্চ একটী আলোক-স্তম্ভ আছে; ইহার আলোক সমুদ্রবক্ষে ৮ ক্রোশ দূর হইতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীনগর, ঘুমলি, রণপুর ও ছায়া এই কয়টী নগর পর্য্যায়ক্রমে জেঠোয়া রাজপুত দিগের রাজধানী ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ

* প্রবন্ধ বাহুল্যে এই প্রবন্ধের শেষ অংশ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই; পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। সঃ আঃ দঃ।

হইতে পোরবন্দর সহরেই রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। করাচি, ভেরোয়াল, দ্বারকা, বেদীবন্দর, মঙ্গরোল প্রভৃতি বন্দরের সহিত প্রতিযোগীতা সত্ত্বেও ইহার বাণিজ্যের অবস্থা প্রশংসনীয় এবং বাজার হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে আয় হইয়া থাকে। কঙ্কন, মালাবার, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পারস্যোপসাগর, আরব, ও আফ্রিকা দেশের সহিত পোরবন্দরের বাণিজ্য সম্বন্ধ। জাহাজ ছাড়া দেশী নৌকাতেও মাল আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। বাণিজ্যের আমদানী বার্ষিক প্রায় ১৮ লক্ষ ও রপ্তানী প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। লোকসংখ্যা ২৫ হাজার; তন্মধ্যে ১৭ হাজার হিন্দু, ৭ হাজার মুসলমান ও ১ হাজার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। ভবনগর, গোণ্ডাল-জুনাগড়, পোরবন্দর রেল হইতে বার্ষিক ৭০।৮০ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে।

সহরের রাস্তাগুলি অতি সুন্দর ও পরিপাটী। পথের দুইধারেই সুদৃশ্য হর্ম্ম্যনিকেতন, তন্মধ্যে রাণার প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; এতদ্ব্যতীত রাজসরকারের আরও কয়েকটী সরকারী ইমারত, হাস্পাতাল, স্কুল ও ক্লাব ঘর আছে। রাণার দুর্গ তদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাণা সুলতানজী ১৮৬১খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন; এখানে গৃহাদি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; পাথরের উপর সাজাইয়া ইমারত গাথা হয়, ইহাতে মাল মশলার কোন প্রয়োজন নাই। পাথর সাজাইবার পর একবার বৃষ্টির জল পাইলেই পাথরগুলি জুড়িয়া যায়। সহরে ৬টী রাজোদ্যান আছে; তন্মধ্যে রাণার নিজ প্রসাদের সম্মুখে যে উদ্যানটী আছে, সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ও মনোমুগ্ধকর; তথায় প্রতি প্রহরে ব্যাণ্ড (Band) বাজিয়া থাকে। রাণী রূপালিবা ১৮৩১ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সহরস্থিত কেদারেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও কেদারেশ্বর কুণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ভিন্ন "মিঠা তালাও" নামীয় পুষ্করিণী রাণীজির অন্য একটী কীর্ত্তি।

২৩শে চৈত্র শুক্রবার—অদ্য প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর গাড়োয়ান ও ধর্ম্মশালার রক্ষকের সঙ্গে দেনা পাওনা মিটাইয়া ৭টার মধ্যেই ষ্টেশনে রওয়ানা হইলাম। ১১-৩৫ মিনিটের সময় গাড়ী আসিলে আমরা গাড়ীতে উঠিলাম; গাড়ী ডাকোরাভিমুখে রওয়ানা হইল। রাত্রি বারটার সময় বিরামগাঁ ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি গাড়ীতেই কাটাইলাম। পোরবন্দর হইতে ডাকোর রেলভাড়া ৪৸০ আনা।

২৪শে চৈত্র শনিবার—বেলা ১০টার সময় গাড়ী আনন্দ ষ্টেশনে পহুছিল; এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করতঃ আমরা স্নানাহার ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; প্রায় ১২ টার সময় গাড়ী ডাকোর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া বেলা ৩টার সময় তথায় পহুছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করতঃ ডাকোর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। আনন্দ ষ্টেশন বরদা রাজ্যের অন্তর্গত, এদেশে গাঁজা ও আফিং লইয়া যাতায়াত নিষিদ্ধ; যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন; সৌভাগ্যের বিষয় যাতায়াতের সময় আমাদিগকে কেহ পরীক্ষা করে নাই।

২৫শে চৈত্র রবিবার—অদ্য ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গোমতী গঙ্গায় স্নান করতঃ ভগবান ডাকোরজীকে দর্শন ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়া প্রত্যেকে ২।৶ আনা হিসাবে ভাড়া দিয়া উজ্জয়িনীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম; দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বেলা ১২টায় সময় গাড়ী গুদরা ষ্টেশনে পহুছিল। এখানে গাড়ী বদল করতঃ পুনরায় রওয়ানা হইলাম; রাত্রি ৭টার সময় রতমল ষ্টেশনে পহুছিলাম; এখানেও গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি প্রায় ১০৷৷টার সময় উজ্জয়িনী ষ্টেশনে অবতরণ করতঃ পূর্ব্ব পরিচিত পাণ্ডা মহাশয়ের বাসায় আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইলাম।

২৬শে চৈত্র সোমবার—অদ্য ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে তাড়াতাড়ি স্নানাহার ক্রিয়া-সমাপন পূর্ব্বক সহর পরিভ্রমনে বাহির হইলাম। রাত্রি ১০৷৷টার ভূপালাভিমুখে রওয়ানা হইয়া সারা রাত্রি গাড়ীতেই কাটাইলাম।

২৭শে মঙ্গলবার—বেলা ১০টার সময় গাড়ী ভূপাল পহুছিল; তথায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতঃ পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলাম; বেলা ৩টার সময় গাড়ী ইটরাশি পহুছিল; এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমরা তথাকার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। রাত্রি ১২টার গাড়ীতে উঠিয়া সমস্ত রাত্রি গাড়ীতেই কাটাইলাম।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

(৩)

বেদের স্বরূপ কি ?

"গতবারে বেদ কাহাকে বলে" প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয় বেদের স্বরূপ কি ?

স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলেই আকার-জ্ঞান প্রয়োজন। অতএব বেদের আকার কি ? অর্থাৎ সাকার না নিরাকার। শাস্ত্রে কথিত আছে যে "স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ আকারং ত্রিবিধং স্মৃতম্"। আকার মাত্রেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিন প্রকার অবয়ব আছে। বেদ এই তিনের মধ্যে কোন অবয়ব বিশিষ্ট ? বেদ যদ্যপি স্থূল লিঙ্গ হয়, তাহা হইলে স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি, "যাহা শ্রুতি মতে সত্যং অর্থাৎ আকাশাদি ভূত পঞ্চক হইতে জন্মাইতেছে"

সমস্তই বেদ। বৈশেষিক মতে যা "দ্রব্য বা ত্র্যসরেণু", (দৃশ্য বা স্থূলের আদ্য অবস্থা, যাহা ক্রমে স্থূল দৃশ্য সৃষ্টি করে) সাংখ্য মতে "পঞ্চ স্থূল ভূত" (পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং) এবং সপ্তভঙ্গিয়ে নামক ন্যায় মতে "স্যাদস্তি"; "যাহা রূপে ও আকারে আছে" সমস্তই বেদ। বেদ যদ্যপি সূক্ষ্ম লিঙ্গ হয়, তাহা হইলে "জ্যোতি", পতঞ্জলি মতে "বিশোকা" বৈশেষিক মতে "দ্ব্যনুক অনু", (দ্ব্যনুক পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম) সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত; "যাহার উপাদান কারণ অহঙ্কার", এবং সপ্তভঙ্গি ন্যায় মতে "স্যাদস্তি চা বক্তব্য" সমস্তই বেদ। আর বেদ যদ্যপি কারণ লিঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহা নিরাকার, নির্গুণ ও মনোবাণীর অতীত; বৈশেষিক মতে যাহা দ্রব্যের সত্ত্বা, লোকলোচনের অগোচর ও নিরাকার; সাংখ্যমতে শুদ্ধ প্রকৃতি—যিনি বিশ্ব সংসারের মূল ও উপাদান কারণ, যাঁহার উৎপত্তি ও বিকৃতি নাই; আর সপ্তভঙ্গি ন্যায় মতে "স্যান্নাস্তি" যাহার রূপ নাই, সমস্তই বেদ। ইহা ভিন্ন নূতন কিছু হইবে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই।

পক্ষান্তরে যদ্যপি ছাপার অক্ষর, বাঁধান চকচকে বই, অথবা হাতে লেখা পুঁথি, কাগজ, কালী প্রভৃতি বেদ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই পাঠশালের পাতাড়ী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহী, লাইব্রেরীর বহী, মহাফেজখানার কাগজ, ও হাতে লেখা দৈনিক জমাখরচের খাতা প্রভৃতি সমস্তই বেদ হইতে পারে। আর বেদ যদ্যপি আকাশ হয়, তাহা হইলে একই আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়া অনাদি অনন্ত কাল হইতে নিরবয়ব অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ভগবান বশিষ্ঠদেবের মতে নিরবয়ব বা নিরাকার স্থলে কোনরূপ উপাধি বা নামরূপ আকার হইতে পারে না যথা "উপাধি কল্পনা জাল মনাখ্যেনোপপদ্যতে।" বেদ যদ্যপি শব্দ হয়, তাহা হইলে শব্দ মাত্রই আকাশের গুণ; সুতরাং সমস্ত শব্দই বেদ হইতে পারে। আর বেদ যদ্যপি মিথ্যাই সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাও একটী বস্তু বা পদার্থ বটে; অতএব সেই মিথ্যা বস্তুর অবস্থিতি কোথায়? জগতের বাহিরে যেখানে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ মন, বাক্য ও কর্ম্ম যাইতে পারে না; । তথায় মিথ্যার স্থান অসম্ভব। অতএব জগতের মধ্যেই মিথ্যার স্থান হইতেছে। আবার সমান সমান বস্তুর নিকটে সমান বস্তুরই স্থান বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অসমান বস্তুর সহিত মিলন বা সম্বন্ধ অসম্ভব। অর্থাৎ যেমন আলোকের নিকট অন্ধকারের এবং আতপের নিকট ছায়ার স্থান হইতে পারে না; তদ্রূপ সত্য বস্তুর নিকট মিথ্যা থাকিতে পারে না। জগৎ যদ্যপি সত্যই হইত তাহা হইলে মিথ্যা কখন সেখানে আশ্রয় পাইত না এবং পাইবার সম্ভাবনাও নাই। অন্ধকার যেমন অন্ধকারের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ মিথ্যার সহিত মিথ্যারই সম্বন্ধ বা মিলন হইয়া থাকে। অতএব জগৎ মিথ্যা (মতান্তরে অনিত্য) কাজেই "মিথ্যা বস্তুর স্থান" জগতের মধ্যেই হইতেছে। জগৎ মিথ্যা বা অনিত্য, সুতরাং জগতের সবই মিথ্যা বা অনিত্য। আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, যাহারা বেদ উপনিষদ ও গীতা ইত্যাদি

মিথ্যা বলিয়া সংশয় জন্মায় তাহারাও মিথ্যা। অতএব মিথ্যার কথা কেহ শুনিবে না, মিথ্যার ব্যাখ্যায় কেহ কাণ ও দিবে না; মিথ্যার কথা চিরদিনই মিথ্যা হয়। পরন্তু যে নিজে মিথ্যা সত্যের অর্থ বুঝে না, মিথ্যায় যাঁহার আনন্দ ও মিথ্যার প্রাধান্য যিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার সত্য মিথ্যার আলোচনা বৃথায় পর্য্যবসিত হয়।

আবার সাক্ষীহীন কথা প্রমাণের অনুপযুক্ত। বেদ যে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ নির্ম্মিত তাহার সাক্ষী কে? যাহারা হিন্দুর উপনিষদ গীতা ও পুরাণাদি শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী নহেন। অতএব তাহাদের কথা প্রমাণযোগ্য নহে। পরন্তু মিথ্যাই সাব্যস্ত হয়।

আর বেদ যদ্যপি সত্য হয়, তাহা হইলে অনাদি অনন্তকাল সত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। তিনি শ্রুতি মতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। স্বার্থের বশীভূত হইয়া মিথ্যা বলিলে তিনি মিথ্যা হইবেন না। আর কাহারও উপরোধ অনুরোধে নূতন কিছু হইবে না। তিনি যাহা আছেন, চিরদিনই তাহা থাকিবেন।

বেদ যদ্যপি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে জ্ঞান এক ভিন্ন দুই কখন হইতে পারে না। যাঁহার জ্ঞানের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র আছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞস্বভাব পরমেশ্বর। এই সৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির বিকাশ বলিয়া বিজ্ঞান সৃষ্টি বা জ্ঞানের বিকাশ মাত্র। শ্রুতি মতে তিনিই "অমৃতস্য পরং সেতুং," সংসার মায়া এড়াইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। তিনি "বিশ্বস্যৈকং" অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী। "পরিবেষ্টিতারং" জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আবার তিনিই বিশ্বরূপং ও ভবভূতমীড়ং। বিশ্বই তাঁহার রূপ, স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্বভূত তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। সেই জ্ঞানময় পরম পিতা পরমেশ্বর হইতেই জগৎ প্রকাশ পায় ও অবস্থান কালে তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ও বেদাদির স্তবনীয়। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, জীব পরমশান্তি লাভ করে ও সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বদা সুখস্রোতে ভাসিতে থাকে।

জগতের মধ্যেই সত্য মিথ্যার খেলা। জগতের বাহিরে অনন্ত আকাশে নাম রূপাদি বর্জ্জিত, মনোবাণীর অতীত, সংসার দুর্গের অন্তঃসাক্ষী স্বরূপ—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" বেদ যখন জগৎ ছাড়া নয়, আবার জগৎ যখন জ্ঞানেরই বিকাশ মাত্র বা জ্ঞানেরই শক্তি চমৎকারিত্বে বিকশিত; তখন বেদও বিকাশ জ্ঞানের বা জ্ঞানই বেদের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইল।

গতবারে "বেদ কাহাকে বলে" আলোচনায় জ্ঞানই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবারে বেদের স্বরূপ নির্ণয়ে জ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইতেছে। অতএব বেদ অর্থে জ্ঞান, আর জ্ঞান অর্থে বেদ সাব্যস্ত হইল। ইহাতে কোনরূপ সংশয় অথবা প্রতিবন্ধক দোষাদির সমবধান হইতে পারে না।

অতঃপর সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান সত্য হইলে বেদও সত্য। জ্ঞান মিথ্যা

হইলে বেদও মিথ্যা। জ্ঞান সাকার হইলে বেদও সাকার, আর জ্ঞান নিরাকার হইলে বেদও নিরাকার। জ্ঞান কার্য্যকারণবর্জ্জিত অনাদি অনন্ত হইলে বেদও কার্য্যকারণ-বর্জ্জিত অনাদি অনন্ত। জ্ঞান পৌরুষেয় বা পুরুষকল্পিত হইলে বেদও পৌরুষেয় বা পুরুষ-কল্পিত।

শ্রুতি বলেন "ক্ষরং প্রধানম্ মৃতাক্ষরং হরঃ।" এই জগৎ বিনশ্বর। কেবল এক মাত্র জ্ঞানিই পরমাত্মাস্বরূপ ও প্রধান এবং অক্ষর ও সত্য স্বরূপ। অতএব জ্ঞান সত্য, মিথ্যা নহে। সুতরাং বেদ ও সত্য, কদাচ মিথ্যা নহে।

পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন যে—

স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃ জ্ঞানান্তরা ভাবাদ জ্ঞেয়ো নত্ব সত্তয়া॥

পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাই স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ ও স্বয়ম্প্রকাশ। তিনি জ্ঞেয়স্বরূপ নহেন। স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তরের অভাব নিবন্ধন তিনি অজ্ঞেয়। নতুবা জ্ঞানের অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন। অতএব জ্ঞানের সত্তা বিদ্যমান থাকায়, জ্ঞান সত্য। সুতরাং বেদও সত্য, মিথ্যা কদাচ নহে।

বেদান্ত বলেন যে "সত্যপ্যুপাস্য জ্ঞান" সর্ব্বত্রই উপাস্য জ্ঞান এক এবং সত্য। অতএব বেদ সত্য ও অভ্রান্ত।

শিব সংহিতাতে বলিয়াছেন যে—

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানাং তস্মাৎ সনাতনম্।

যখন জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তখন জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই নিত্য বস্তু, অতএব জ্ঞান নিত্য বস্তু, অনিত্য বা মিথ্যা নহে। সুতরাং বেদও নিত্য বস্তু, অনিত্য বা মিথ্যা নহে।

যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন যে—

কয়াচিদপি যুক্ত্যেহ সত্তোঃ সত্বং ন যুজ্যতে।
সর্ব্বাত্মা সাত্মগুপ্তেন কর্পূরেনেব দৃশ্যতে।

কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই জ্ঞান রূপ সৎ পদার্থের অসত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কর্পূরকে বাক্সের ভিতর রাখিলেও যেমন গন্ধ দ্বারা উহার প্রত্যক্ষতা অনুভূত হয়; তদ্রূপ জ্ঞানকে মিথ্যার আবরণে বিশেষ রূপে আবরিত করিলেও উহার প্রভাব স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, জ্ঞান সত্য স্বরূপ। সুতরাং বেদকেও উড়াইবার উপায় নাই। বেদ সত্য ও স্বতঃপ্রমাণ।

শ্রুতি বলেন যে, জ্ঞান "নিষ্কলং" জ্ঞানের কোন অবয়ব নাই। স্বীয় মাহাত্ম্য প্রভাবেই জ্ঞান সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। আবার জ্ঞান "সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিধায়ে অনন্ত। যাহা অনন্ত তাহাই অনাদি। যাহার আদি নাই, তাহার উৎপত্তি নাই। সুতরাং অসৃষ্ট। যাহা অনন্ত, তাহার অন্ত নাই অর্থাৎ লয় নাই। অতএব জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞানের উৎপত্তি ও লয় নাই। জ্ঞানকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। "গ্রাহ্য গ্রাহক বৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে" "অর্থাৎ যে যেমন অধিকারী তাহার নিকট জ্ঞান সেইরূপেই প্রকাশিত হয়! অতএব বেদ ও অনাদি অনন্ত এবং উৎপত্তি লয়-

সৃষ্ট; সুতরাং অসৃষ্ট। আবার যাহা অসৃষ্ট তাহা পৌরুষেয় বা পুরুষকল্পিত নহে। তাহা অপৌরুষেয়, অতএব বেদ নিরাকার ও অপৌরুষেয়।

এই জন্যই ত্রিকালদর্শী ঋষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন যে, "নিরাকারন্তু নিশ্চলম্" অর্থাৎ মনোবাণীর অতীত নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্বই একমাত্র সত্য ও নিত্যবস্তু। অতএব বেদানুশীলনের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, জীব পরম পুরুষ পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিলে ভবরূপ মহার্ণবের পারে গমন করিতে পারে।

সামবেদে বলিয়াছেন যে—

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি
বিশ্বস্যা অরাতেঃ।
উত দ্বিষো মর্ত্ত্যস্য।

হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানরূপ মহাধন দান করিয়া অজ্ঞানিদের তমোরাশি নাশ করতঃ যাবতীয় অরাতি হইতে অপিচ নানা লোকের বিদ্বেষ হইতে ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্মগতপ্রাণ সাধু ও দেবতাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

যে সুখের আস্বাদ পাইলে মনের অরুচি হয় না, যে সুখকে মন উপেক্ষা করিতে চায় না, তাহারই নাম প্রকৃত সুখ। একমাত্র ধর্ম্মই সেই প্রকৃত সুখের আকর ও ভাণ্ডার। ধর্ম্ম আমাদের প্রকৃতি ও অস্তিত্বের সহিত গাথা। হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশে কল্পনার অনুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই আর্য্যপ্রকৃতির অনুমোদিত। ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা বিবেক, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ধৃতি ও ক্ষমা ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিকাশ হইয়া মানসিক প্রকৃতির একতা সাধিত হয়। তখন ঈর্ষা, হিংসা, অসূয়া ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া, পরস্পরের নিমিত্ত পরস্পরের সহানুভূতিতে সকলেই সকলের সুখে সুখী ও সকলের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি, স্বার্থপরতাদি বিমিশ্রিত হইয়া "প্রকৃত অর্থসঙ্কোচে", সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে। ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

———0———

আশ্রম-সংবাদ।

জন্মোৎসব—বর্ত্তমান মাসের ২০শে তারিখ বুধবার ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে। আমরা গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণকে উৎসবে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছি। আশাকরি উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

———0———

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

বৈদিক—প্রসঙ্গ।

(৪)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা রক্ষা করিতে হইলে,—ধর্ম্মবল বৃদ্ধিতে মনুষ্যাত্মার পূর্ণতা বজায় রাখিতে হইলে,—ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনায় মনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতায় জীবনী শক্তিকে সবল ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে,—বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলোচনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধায়ে সমীচীন হইতেছে। যেহেতু ন্যায়ানুসারে স্বার্থপরিশূন্যতায় সার্ব্বজনীন হিতার্থে হিতকরী বিষয়িনী আলোচনা রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকাংশ স্থলে সুফল প্রাপ্তির প্রত্যক্ষতা, যত্ন ও চেষ্টার সফলতা, এবং অধ্যবসায়ের অব্যর্থতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা নিবারিত হইয়া থাকে। স্বার্থ ও আলস্য পরিবর্জ্জন দ্বারা ভূয়ো ভূয়ো আলোচনাই ইহার প্রধানতম কারণ। স্বার্থান্ধ বা অলসাকুল ব্যক্তি দ্বারা সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আন্তরিক উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় রত হইলে, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সার্ব্বভৌমিক হিতার্থে মনোনিবেশ করিলে; দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বৈকুল্য প্রযুক্ত যদ্যপি উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা ফলোৎপত্তি না হয়; "অর্থাৎ ধর্ম্মের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটে" তবে অধ্যবসায়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল বিবেচনায় পুনঃ পুনঃ তদালোচনায় যত্নবান ও চেষ্টান্বিত হওয়া উচিত। ঐকান্তিক উদ্যম পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মালোচনায় রত হইলেও যদ্যপি ফল প্রত্যক্ষ না হয়, তথাপি তাহা দ্বারা কর্ত্তব্যের নিকট অঋণী হওয়া যায়। এই অঋণীতার ফলেই "সর্ব্ব শাস্ত্রের সার কি,"—আলোচনায় "নাস্তি বেদাৎ

পরং শাস্ত্রং” ব্যাখ্যায় বেদ কাহাকে বলে, সর্ব্বাগ্রে জানিবার প্রয়োজন হওয়ায়, পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, বেদ অর্থে জ্ঞান আর জ্ঞান অর্থে বেদ। পূর্ণ-জ্ঞান পরব্রহ্মই বিশ্বের আকার ধারণ করতঃ স্বীয় পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর নিরাকার হইয়াও সাকার, এবং সাকার হইয়াও পরিণামে নিরাকার অর্থাৎ সাকার নিরাকার অখণ্ডাকারে একই বিরাট পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান রূপে অনাদি অনন্ত-কাল স্বতঃপ্রকাশ আছেন। জ্ঞানই নিত্য-সিদ্ধ ব্রহ্মত্বের অভিজ্ঞাপক। অতএব জ্ঞান শব্দ ঈশ্বরবাচক বা ঈশ্বর প্রতিপাদক হওয়ায়, বেদ শব্দও ঈশ্বরবাচক বা ঈশ্বর প্রতিপাদক মিমাংসিত হইল।

“সর্ব্বভূত হিতকারী” বেদ হইতেই অঘমর্ষণসূক্ত, দেবব্রতসূক্ত, সত্যবতীসূক্ত, কুষ্মাণ্ডীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, অভীষ্টরূপদা, প্রণবাদি সাবিত্রীসূক্ত, সপ্তব্যাহৃতি, ভারুণ্ড-সামমন্ত্র, গায়ত্রীচ্ছন্দোগ্রথিত মন্ত্র, পুরুষব্রত, ভাবমন্ত্র, সোমমন্ত্র, অবিজ্ঞেয় বার্হস্পত্যমন্ত্র, বাকসূক্ত, অনৃতমন্ত্র, শতরুদ্রীমন্ত্র, অথর্ব্বশিরা-মন্ত্র, ত্রিসুপর্ণা, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয়, অগ্নিব্রত, ও রথন্তর প্রভৃতি শান্তি উৎপাদক পবিত্র মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বৈদিক মন্ত্র গান করিলে জীব সমূহ পবিত্র হয়। এবং ক্রমশঃ ইহা দ্বারাই অজ্ঞানোৎপাদিনী “কামনা বাসনা” অপসারিতা হইয়া সত্যের স্বারূপ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইজন্যই পূজ্যপাদ ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যেঃ—

তত্রাক্ষরে সম্যগধীয়মানে
পুনাতি তদ্ব্রহ্ম যথাবদিষ্টম্।

বেদের অক্ষর মাত্র বিহিতরূপে অধীত হইলে, সেই অক্ষরাত্মক বেদ দ্বারা দুষ্কর্ম বিনষ্ট হইয়া পবিত্রতা এবং পরিণামে পরমা শান্তি লাভ হয়।

পতঞ্জলী বলিয়াছেনঃ—

“স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ।”

ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত বেদাভ্যাসে রত হইলে বা বৈদিক মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা হইলে, ইচ্ছামত দেবদর্শন লাভ হইয়া থাকে বা পরব্রহ্মের প্রেমাস্পদ হইয়া পরম জ্ঞান বিকাশিত হয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন যেঃ—

তামাসেক ঋচং যেন পঠ্যতে ভক্তিতো যদি।
স যৎ সাযুজ্য পদবীং প্রাপ্নোতি মুনি দুর্ল্লভাম্।

ব্রহ্মাচর্য্যাদেশপূর্ব্বক বেদ বা উপনিষদের একটী মাত্র মন্ত্র আন্তরিক ভক্তির সহিত পঠিত হইলে, মুনিগণের দুষ্প্রাপ্য ভগবানের সাযুজ্যপদ লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—

প্রমাণা সৌষ্ঠব রূতম সংশয়াদি ন বাস্তবম্।
শ্রুতি প্রমাণ সুষ্ঠুত্বে জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্।

যে বস্তুর আশ্রয়ে প্রমাণের অনুৎকর্ষ হেতু সংশয়াদি দোষ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান লাভ হয় সে বস্তু বাস্তব নহে। তাহা অবাস্তব বিধায়ে সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। পরন্ত বেদবাক্য (শ্রুতির প্রমাণ) সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার পৌনঃপুনিক আলোচনা ও অভ্যাসের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাই বাস্তব জ্ঞান বা পরমার্থ জ্ঞান। অতএব সংসার বৃক্ষের

মূলোৎপাটন করিতে হইলে,—মোহ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে,—বিষয়বাসনালোলুপা চিত্তকে আত্ম-তত্ত্বে পরিনিবেষ্টিত করিতে হইলে, বাস্তব জ্ঞানের অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয় ।

পক্ষান্তরে যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহারা হিন্দুর ষষ্ঠীপূজা হইতে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ যোগী-গণের ব্রহ্মোপাসনা সমস্তই স্বীকার করেন । তাঁহাদের নিকট হিন্দুর বেদবেদান্ত, উপ-নিষদগীতা, দর্শনপুরাণ, তন্ত্রসংহিতা, স্মৃতি-ভাগবত ইত্যাদি সকল শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় । যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, যিনি স্থূলসূক্ষ্ম ধর্ম্মরহিত, সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর নিরাকার, অজ্ঞেয়, দৃশত্বাদি ধর্ম্মশূন্য অর্থাৎ অদৃশ্য; কিন্তু তন্ময় জগৎ সাকার,—সুবিজ্ঞেয় । সুতরাং প্রথম অধিকারীকে জ্ঞানের উর্দ্ধে-দেশে উঠিতে হইলে অগ্রে সাকার সুবি-জ্ঞেয় জগৎকে ধরা উচিত । একবারে নিরাকার, দুর্বিজ্ঞেয় ব্রহ্মকে ধরিয়া কদাচ উঠিতে পারে না । যেমন হাতে খড়ি দ্বারা 'ক'—'খ' না পড়িয়া বোধোদয় পড়া কদাচ সম্ভবে না । এই জন্যই পূর্ব্বকালে যে ত্রিকাল-দর্শী ঋষি হিন্দুর ষষ্ঠী পূজার বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তৎপরবর্ত্তীকালে যিনি রাস, দোল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি পূজার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে অদ্যাপি হিন্দু সমাজে সম্মান পূজা পাইতেছেন । যেহেতু রাস, দোল দ্বারা ষষ্ঠী পূজার নিরাশ বা ষষ্ঠী পূজা দ্বারা দুর্গোৎসবের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই বা সেই বিজ্ঞানের কোন পরিবাদ ঘটে নাই । হিন্দু জানে যে, আজ ষষ্ঠীকে ধরিয়া রাস, দোলে কৃষ্ণ ও দুর্গোৎ-সবে দুর্গা পাইয়াছি; পরিণামে হয়তঃ ইহা দ্বারা কোন অমূল্য নিত্য বস্তু লাভ হইবে । হিন্দু-হৃদয়ের অন্তরালবর্ত্তিনী এই বিশ্বাস ভক্তিই ধর্ম্মানুগামী হইয়া,—হিন্দু জীবনকে অনন্তের পথে পরিচালিত করিতেছে ।

আর যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ কাহাকে বলে তাহার অর্থও বুঝেন না, স্বার্থপ্রযুক্ত মুখে একভাব ও অন্তরে অন্যভাব দেখাইয়া বেদের ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে সংশয় জন্মান; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের অপমানকারী ভণ্ড । তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্মানুসারে চলিয়া যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস না করেন তাহারা উভয়েই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না । পরন্তু চিরকাল অশান্তিভোগই তাহাদের, পরিণাম হয় । অতএব শাস্ত্রনিন্দুক 'অনাত্ম-জ্ঞানীর উপদেশে হিন্দুশাস্ত্র বা ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ করা উচিত নয় । অবিবেকতাবশতঃ ধর্ম্ম বা ঋষিবাক্যে সন্দিহান হইলে, জরামরণরহিত শান্তিময় রাজ্য গমনের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হয় । শেষে এ কুল ওকুল দুকুল হারাইয়া শ্রুতি মতে "হীন-তরং বা বিশন্তি" অর্থাৎ তির্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করিতে হয় ।

আবার হিন্দুশাস্ত্রেই স্পষ্টতঃ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষি ধর্ম্মবলেই চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন । অসিত, দেবল, ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক প্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিব্যযোগসম্পন্ন এবং দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ।

এই সকল ত্রিকালদর্শী অমর সদৃশ ঋষিরা বেদোক্ত বিষয়কে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া বেদের উপদেশই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া সর্ব্বত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদ উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রসন্দিহান মুগ্ধব্যক্তিরা, নিজ বুদ্ধি মাত্র প্রমাণ অবলম্বনে অহঙ্কারগর্ব্বিত হইয়া, চিরমঙ্গলকর হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের অবমাননা করতঃ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কাল-ত্রয়ের নির্ণায়ক ঋষিদিগের ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহারা অন্যান্য প্রমাণ অস্বীকারে লৌকিক ইন্দ্রিয়-প্রীতি-সম্বন্ধীয় যে কিছু বিষয় তাহাই মানিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন মোহান্ধ হইয়া "অতীন্দ্রিয় পরোক্ষ" বিষয়ের অবধারণ করিতে পারে না। অতএব অবিবেকীর উপদেশে শাস্ত্রের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বেদনিন্দক, অনাত্ম-জ্ঞানীর উপদেশশক্তি, ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনি উপকারক হয় না। পরন্তু তাহা দ্বারা আত্মজ্ঞান বিনাশিনী অজ্ঞানের শক্তিই প্রবলা হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ম্।

বিত্তমোহে পরিমুগ্ধ প্রমাদী ও অবিবেকীর নিকট পরলোকপ্রাপ্তিসাধন শাস্ত্রীয় উপদেশ স্থান পায় না, বা পরলোক বিষয়ক উপায় প্রতিভাত হইতে পারে না। অতএব যিনি অবিবেকী ভণ্ডের হাত এড়াইয়া সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিই অবিদ্যাসম্ভূত অজ্ঞানের শক্তি অতিক্রম করিতে পারেন।

ঋগ্বেদে বলিয়াছেন যে—

ন তং বিদাথ য ইমা
জজানান্য দ্যুষ্মাকমন্তরং বভুব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
চাসুতৃপ উকথ শাসশ্চরন্তি।
(১০।৮২।৭)

অবিবেকিগণ! তোমরা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পূর্ণ, পরব্রহ্মকে জান না। তোমাদে মলিন অন্তঃকরণ তাঁহাকে বুঝিবার ক্ষমতা পায় নাই। নীহারাবৃত হইয়া লোকে যেরূপ নানা প্রকার কল্পনা করে, আপন প্রাণের তৃপ্তিসাধন জন্য আহারাদি করে এবং স্তব-স্তুতি উচ্চারণপূর্ব্বক বিচরণ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকারে আবদ্ধ হইয়া তোমরাও ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতেছ। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, একই জ্ঞান বস্তুকে লইয়া বিপরীত অর্থ প্রকাশ করতঃ সাধারণের সংশয় জন্মাইয়া স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করিতেছ।

অতএব হে সংশয়বাদিগণ! তোমাদের বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদাদি সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক। সকল শাস্ত্রেরই প্রতি-পাদ্য বিষয় পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর। এই জন্যই মহাবরাহপুরাণে বলিয়াছেন যে—

"মুখ্যশ্চ সর্ব্ব বেদানাং তাৎপর্য্যং শ্রীপতৌ পরে"।

পরমাত্মরূপী শ্রীপতিই একমাত্র বেদ সকলের মুখ্য তাৎপর্য্য। যাহাকে জানিতে পারিলে বা ভক্তির সহিত হৃদয়ে ধারণা করিলে, অধঃপতনসাধিনী অবিদ্যার নাশ হইয়া চির-শান্তি লাভ সাধিত হয়।

যজুর্ব্বেদে বলিয়াছেন যে:—

"অসৌ লোকো যজুর্ভিঃ বেদ যেষু"।

যিনি সংসারধান্ত বিনাশী পরাৎপর ব্রহ্মকে বুঝিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্ববেদ ও সমস্ত ভুবন অবিদিত থাকে না। অতএব বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক ভিন্ন পৃথক নহে।

তোমাদের আরও জানা উচিত যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে যে বেদ,—যে শ্রুতি,—যে জ্ঞান—এবং পঞ্চ মহাভূত যেমন ছিল, বর্ত্তমানেও ঠিক তাহাই আছে। নূতন সৃষ্টি কেহই করিতে পারেন না এবং ভবিষ্যতেও পারিবেন না। যে বস্তু বিশ্বের আকার ধারণ করিয়া আছে, তাহাই অনাদি অনন্তকাল বিরাজমান আছে। পুরাকালে ভারতের দিকদিগন্ত, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "ব্রহ্মাহমস্মি" "অয়মাত্ম ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা স্বাহা, স্বধা, বষট প্রভৃতি মন্ত্রে যেরূপ মুখরিত ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাই আছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারত তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্র বা পাঞ্চভৌতিক জগতের নূতন, পুরাতন বা, সত্যমিথ্যা কিছুই নাই। অন্তর্দর্শিতার অভাবে পরমার্থ বিষয়ক সারবস্তু গ্রহণের পরিবর্ত্তে বৃথা সংশয় জন্মাইয়া সত্য পথ হইতে কাহাকেও বিচলিত করা হিন্দুর পক্ষে সমীচীন নহে। হিন্দু জানে জ্ঞান এক ভিন্ন যখন দুই নহে, বেদ ও জ্ঞান শব্দ যখন একার্থ প্রতিপাদক, এবং পরব্রহ্মই যখন পূর্ণজ্ঞান; তখন "বেদ শব্দ ঈশ্বরবাচক"; কোন রূপ শঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুরের সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

:0:

সমর্পণ।

"তোমারে সঁপেছি সব"—
বলিবারে দাও অধিকার;
আমি যদি নাহি দিই
কেড়ে নাও আসন তোমার।

জীবন যৌবন মোর
যাহা কিছু আছে গরবের,
নত হোক্ তারা সব
ধুলি কণা চুমি' চরণের।

বাসনার উচ্চ শির
চূর্ণ কর হানিয়া বজর,—
হোক্ বিদারিত হিয়া—
তাহে যেন করো না কাতর!

আঁকড়ি' রেখেছি যাহা—
একে একে সব যদি যায়,
বলি যেন হাসি মুখে,—
"ঢেলে দিছি দেবতার পায়!

বিনিময়ে পাইয়াছি
মৃদু হাসি অধরের কোণে—
চাহিয়া দেখেছি শুধু
একবার অপাঙ্গ নয়নে"।

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র

0

শ্যাম গরবে গরবিনী রাই।

শ্যাম গরবে গরবিনী রাই,
তোমার গরবে গরব আমার।
হই যদি ছোট,
পড়ে যদি রই,
তবুও জানিও ক্ষুদ্র আমি নই।

জগৎ না দেখে
না পুছে আমায়
ক্ষুদ্রপ্রাণে রব, ক্ষতি কিবা তায়;
অন্তরেতে যদি জাগে মূরতি তোমার।

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—0—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।*

(৭ম বর্ষের ১২৪ পৃষ্ঠার পর।)

২৮শে—অদ্য বেলা ৮টার সময় আমরা মিরগঞ্জে পহুছিলাম; এখান হইতে নর্ম্মদা দর্শনে যাইবার মনস্থ করতঃ ২৷৹আনায় এক খানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া মালপত্রাদি গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আমরা ইতস্ততঃ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পদব্রজে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশন হইতে নর্ম্মদা প্রায় ২৷৩ক্রোশ দূর হইবে। আমরা বেলা ১১টার সময় নর্ম্মদায় পহুছিয়া আমাদের পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুক্ত মহাবীর পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম; তিনি নর্ম্মদা তীরস্থিত কোন গুজরাটী বণিকের বাসভবনে আমাদের আশ্রয়স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমরা নর্ম্মদায় যথাবিহিত স্নান তর্পণাদি সমাপন করতঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মাধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করতঃ বিকালে দেবদেবী ও দর্শনযোগ্য স্থানগুলি যথাসম্ভব দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

২৯শে চৈত্র বৃহস্পতিবার—অদ্য ভোরে পাণ্ডাজীর গোমস্তা ভায়ারামকে সঙ্গে লইয়া গৌরীশঙ্কর, হিন্দুটেম্পল, নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিয়া আসিলাম।

৩০শে শুক্রবার—অদ্য জব্বলপুর যাইবার মনস্থ করতঃ ষ্টেশনে আসিয়া জানিতে পারিলাম যাত্রী সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় আর কাহাকেও টিকেট দেওয়া হইবে না; অগত্যা আমরা ৪৲ টাকায় একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া পদব্রজে জব্বলপুর রওয়ানা হইলাম। মিরগঞ্জ হইতে জব্বলপুর ৬৷৭ ক্রোশ দূর; সুতরাং আমরা অতিকষ্টে বেলা ৪টার সময় জব্বলপুর পহুছিলাম। আমরা তথায় শ্রীযুত রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৩১শে চৈত্র শনিবার—এলাহাবাদ রওয়ানা করিতে মনস্থ করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে বহুলোকের জনতার মধ্যে টিকেট করিবার সময় আমার পকেট হইতে মনিব্যাগ সহ দুই টাকা চুরি হইয়াছিল, যাহা-

হউক অতিকষ্টে টিকেট করতঃ বেলা ৮½ টার সময় জব্বলপুর হইতে রওয়ানা হইয়া বিকালে ৬টার সময় এলাহাবাদ পহুছিলাম। ষ্টেশনে ৪।০ আনায় তিন খানা গরুর গাড়ী ভাড়া করতঃ ত্রিবেণী পাণ্ডার বাঁড়ী রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার পথে যাত্রীদিগের পরীক্ষা গৃহ আছে, এখানে যাত্রীদিগের সমস্ত মালপত্র খুলিয়া দেখে। আমরা কর্ম্মকর্ত্তাকে ।০ আনা সেলামী প্রদান করতঃ পরীক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। রাত্রি ৭½ টার সময় পাণ্ডাজীর বাড়ী পহুছিয়া নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। পাণ্ডার নাম শ্রীকেদারনাথ প্রয়াগী। ইহার স্বভাব চরিত্র মন্দ নয়; যাত্রীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার নাই।

১লা বৈশাখ রবিবার—১৩১৯ সন; অদ্য পাণ্ডাজীর গোমস্তার সহিত ত্রিবেণী স্নানে রওয়ানা হইলাম—এইক্ষণ সঙ্গমস্থল অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই মাইল বালুচর ভাঙ্গিয়া বেলা ৮টার সময় ঘাটে পহুছিলাম, তথায় স্নান, দান, তর্পণাদি সমাপন করতঃ ১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বেলা ৪টার সময় বেণীমাধব দর্শন ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করতঃ সন্ধ্যার পর ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

২রা বৈশাখ সোমবার—অদ্য সকালে তাড়াতাড়ি স্নানাহারাদি সম্পন্ন করতঃ কাশীধাম যাইবার মানসে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা ১টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া বেলা ৪টার সময় মোগলসরাই পহুছিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে রাজঘাটের গাড়ীতে উঠিয়া ৫টার সময় কাশীষ্টেশনে পহুছিলাম। তথা হইতে বাঙ্গালীটোলা শ্রীযুত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ রাত্রি বিশ্রাম করিলাম।

৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে স্নানান্তে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণা দেবী দর্শন করতঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৪ঠা বৈশাখ বুধবার—অদ্য প্রাতে স্নানাদি সমাপনান্তে, যাহারা নূতন যাত্রী তাহাদিগের দর্শনীয় স্থান সমূহে যাওয়ার যথাযোগ্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অন্যান্য সকলে বেলা ৩টার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫ই বৃহস্পতিবার—অদ্য বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

৬ই বৈশাখ শুক্রবার—অদ্য কুমারী পূজা, দণ্ডী ও ব্রাহ্মণ ভোজন ক্রিয়া সমাধা করাইয়া আমরা ধন্য হইলাম।

৭ই বৈশাখ শনিবার—অদ্য সকালে স্নান ও দেবদর্শনাদি ক্রিয়া সমাপন করতঃ ষ্টেশনে আসিলাম; বেলা ২টার সময় কাশী হইতে গয়াধাম রওয়ানা হইয়া রাত্রি ৪টার সময় তথায় পহুছিলাম। কাশী হইতে গয়ার ভাড়া ১৸৶ আনা।

৮ই বৈশাখ রবিবার—প্রাতে ফল্গু নদীতে স্নান তর্পণাদি সমাপনান্তর বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া যথাবিহিত ক্রিয়ান্তে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

৯ই বৈশাখ সোমবার—বেলা ১০টার মধ্যে আহারাদি সমাধান্তে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, প্রায় ১১টার সময় গাড়ী ছাড়িল;

রাত্রি ৪টার সময় বাণ্ডেল ষ্টেশনে পহুছিলাম।

১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার—অদ্য ভোরে ব্যাণ্ডেল হইতে রওয়ানা হইয়া ভোরে ৭½টার সময় নৈহাটী পহুছিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। রাত্রি ৮½টার সময় গোয়ালন্দ অভিমুখে রওয়ানা হইয়া ভোরে গোয়ালন্দ পহুছিয়া সিরাজগঞ্জের ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম।

১১ই বৈশাখ বুধবার—গোয়ালন্দ হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১০½টার সময় সিরাজগঞ্জে পহুছিলাম। তথা হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১২টার সময় ধানবাড়ি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাস করিলাম।

১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রাতে ৭টার সময় রমণী বাবুর বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১০টার সময় নিরাপদে বাটী পহুছিলাম। ইতি।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—o—

সাধক সঙ্গীত।

[৫]

দামোদর দৈত্য-দলন গোবর্দ্ধনধারী।
কাল কালিয়-সর্প দমনকারী দর্পহারী ॥
তব নিখুঁত নখরবৃন্দ,
আধ ভাদর চন্দ্র,
ইন্দ্র নীল রতন কান্তি, ইন্দ্র ধনুক চূড়ান্তে ভ্রান্তি,
ইন্দীবর নিন্দি নয়ন ইন্দ্রিয় মনোহারী ॥
ওহে গোপীজন-বল্লভ,
তুমি যোগী-জন দুর্ল্লভ,
ভোগীজন ভাগ্য রতন, ভক্তি-ভাবারোগ্যকারী,
পাপ অনলে করহে দান বারি,—হে দানবারি ॥
তুমি অপার করুণা সিন্ধু
দীননাথ দীনবন্ধু
ধরম বীজ রোপণে অন্ধ, অধম পাপী দ্বিজ গোবিন্দ,
কণ্ঠ নিরোধ সময়ে তোমারে চায় হে নরকান্তকারী ॥

—o—

যোগপ্রক্রিয়ায় রোগারোগ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যোগশাস্ত্রে নানা প্রকার আসনের উল্লেখ আছে। শরীর না পড়ে, না টলে, না বেদনা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের কোনরূপ উদ্বেগ না জন্মে এইরূপভাবে সুখে উপবেশন করার নাম আসন। আসন অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ—শীত,-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষ ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। অনেকে মনে করিতে পারেন, কেবল মাত্র বসিবার কৌশলে এরূপ ফললাভ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহার মধ্যে কথা আছে,—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসিলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-বৃত্তির ঐকান্তিকতা জন্মে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, দুঃখের চিন্তায় বা নিরাশায় লোকে গণ্ডে হাত দিয়া উপবেশনই করিয়া থাকে। সেই সময় ঐরূপ অবস্থায় উপবেশন যেন স্বাভাবিক এবং সেই চিন্তার উপযোগী। যোগিগণ বলেন, "বিভিন্ন সাধনায় বিভিন্ন আসনে শরীর ও মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।" বিশেষতঃ কৌশলে উপবেশন ব্যতীত দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে। যোগাভ্যাসকালে যোগীর যে দৈহিক নূতন ক্রিয়া বা স্নায়ুপ্রবাহ নূতন প্রবাহে বা নূতন পথে চালিত হয়, তাহা মেরুদণ্ডের মধ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং মেরুদণ্ডকে যে ভাবে ও যে অবস্থায় রাখিলে ঐ ক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে তাহাই আসন-প্রণালীতে বিধিবদ্ধ আছে। মেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, গ্রীবা, মস্তক ও পঞ্জরাস্থি এই সকল গুলি যে ভাবে রাখা আবশ্যক, তাহা ঐ আসনের বসিবার প্রণালীতেই ঠিক করা আছে; আসন করিয়া বসিলে, সেজন্য আর অন্য কিছু শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না। এক্ষণে কিরূপভাবে বসিলে কোন্ রোগ আরোগ্য হইবে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সিদ্ধাসন। বাম গুল্ফ (গোড়ালি) দ্বারা যোনিদেশ (গুহ্যদেশের উপরিভাগ) জোরে চাপিয়া ধরিয়া অন্য গুল্ফ উপস্থোপরি রাখিবে এবং চিবুক হৃদয়োপরি স্থাপিত করিবে; পরে স্থির ও সরল হইয়া নির্নিমেষ নয়নে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। এই সিদ্ধাসন সর্ব্বব্যাধিনাশক। সিদ্ধাসনের দ্বারা বায়ুর পথ সরল ও সহজগম্য হইয়া থাকে। ইহাতে স্নায়ুর বিকাশ ও সমস্ত শরীরের তাড়িৎ-শক্তি চলাচলের সুবিধা হয়।

পদ্মাসন। বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ রাখিয়া হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশ দিয়া বামহস্ত দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলী ও দক্ষিন হস্ত দ্বারা দক্ষিন পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলী দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষের উপর চিবুক বিন্যস্তপূর্ব্বক একদৃষ্টে নাসাগ্রভাগ দর্শন করিবে। ইহাই পদ্মাসন বলিয়া প্রথিত। পদ্মাসন অভ্যাস করিলে নিদ্রা, আলস্য ও জড়তা প্রভৃতি দেহের গ্লানি দূরীভূত হয়। পদ্মাসনে বসিয়া দন্তমূলে জিহ্বাগ্র ধারণ করিলে সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয়। আর রেচক-পূরক-কুম্ভক করিতে পারিলে অশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

ভদ্রাসন। যোনিদেশে গুল্‌ফদ্বয় বিপরীতভাবে রাখিয়া পৃষ্ঠ দিয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করতঃ পদযুগলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। অনন্তর নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণকরতঃ গলদেশে ধারণ করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ একদৃষ্টে অবলোকন করিবে। ইহাই ভদ্রাসন নামে অভিহিত, এই আসন অভ্যাসদ্বারা রোগরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সিংহাসন। অণ্ডকোষের নিম্নে গুল্‌ফ-দ্বয়কে পরস্পর ব্যৎক্রমভাবে (উল্টা করিয়া) স্থাপন করতঃ উর্দ্ধদিকে বহিষ্কৃত করিয়া জানুদ্বয় ভূতলে বিন্যস্ত করিবে এবং গলদেশের শিরাসমূহ বন্ধন করতঃ হৃদয়ে চিবুক সংস্থাপন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে নাসিকাগ্র নিরীক্ষণ করিলেই সিংহাসন সাধিত হয়। এই আসন দ্বারা নিখিল রোগ বিনষ্ট হয়।

শবাসন। শবের ন্যায় চিৎ হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেই মৃতাসন বা শবাসন সাধিত হয়। এই আসন শ্রমদূর করে এবং ইহা চিত্ত বিশ্রামের হেতু বলিয়া কথিত।

ভুজঙ্গাসন। নাভি হইতে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত দেহের অধোভাগ ভূতলে সংস্থাপিত করতঃ করতল যুগল দ্বারা মৃত্তিকা আশ্রয় পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় শিরোদেশ উর্দ্ধভাগে সমুত্তোলন করিলেই ভুজঙ্গাসন হয়। ইহা দ্বারা শরীরস্থ অগ্নি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ময়ূরাসন। দুই করতল দ্বারা মৃত্তি-কাতে সম্যক্ ভর করিয়া কনুইদ্বয় নাভির পার্শ্বে স্থাপন করিবে এবং মস্তক ও পাদযুগল দণ্ডবৎ আকাশে সমুন্নয়ন করতঃ সংস্থিত হইবে। ইহার নাম ময়ূরাসন। এই আসন অভ্যাস দ্বারা আভ্যন্তরিক ব্যাধি ও বিষের বিনাশ হইয়া থাকে।

উগ্রাসন। উপবিষ্ট হইয়া পদদ্বয় যেন পরস্পর সংলগ্ন না হয়, এই প্রকার ভাবে বাম চরণতলে বামহস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয় এবং দক্ষিণ চরণতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয় রাখিয়া বামকরতল দ্বারা বামপদের অঙ্গুলি সকল দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া জানুদ্বয়ের মধ্যস্থলে মস্তক বিন্যস্ত করিবে। ইহাই উগ্রাসন, কেহ কেহ ইহাকে পশ্চিমোত্তান আসনও বলিয়া থাকেন। এই আসন অভ্যাস করিলে জঠরানল প্রদীপ্ত এবং শরীরের অবসাদও বিদূরীত হইয়া থাকে।

স্বস্তিকাসন। উভয় জানুদেশ ও উভয় উরুদেশের মধ্যভাগে চরণতল রাখিয়া সরল দেহ হইয়া উপবেশন করার নাম স্বস্তি-কাসন। এই আসনে সমাসীন হইয়া বায়ু-সাধন করিলে সাধকের দেহে কোনপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। এইজন্য ইহা সুখাসন নামেও কথিত হইয়া থাকে।

মৎস্যাসন। মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া কনুই দ্বারা শিরোদেশ পরিবেষ্টন করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই মৎস্যাসন সাধিত হয়। এই আসন নিখিল ব্যাধির বিনাশক।

মকরাসন। অধোবদনে শয়নপূর্ব্বক মৃত্তিকাতে বক্ষঃস্থল স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় বিস্তারিত করতঃ হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তক ধরিলেই মকরাসন হইয়া থাকে। এই আসন অভ্যাস দ্বারা শরীরস্থ তেজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বজ্রাসন। জঙ্ঘাদ্বয় বজ্রাকার করতঃ গুহ্যের দুইদিকে পাদদ্বয় বিন্যস্ত করিলেই বজ্রাসন হয়। প্রত্যহ আহারান্তে ১০।১৫ মিনিট এই আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া থাকিলে যতদিনের বাত হউক না কেন নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দুই পা পশ্চাৎ দিকে মুড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিলে কখন বাতরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

যোগশাস্ত্রে নানা প্রকার আসনের বিষয় কথিত আছে। ভূমণ্ডলে প্রাণিগণ যেমন অসংখ্য, আসনও তেমন অসংখ্য। আমরা তাহার মধ্যে কেবল কয়েকটি সহজসাধ্য ও পরীক্ষিত আসনের বিষয় বিবৃত করিলাম। প্রাগুক্ত আসনের মধ্যে যাহার যেরূপ আসনে বসিলে কোন প্রকার কষ্টানুভব না হয়, তাহার সেই প্রকার আসন অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। আসন করিয়া বসিলে সমস্ত শরীরে বেদনা বা কোনরূপ কষ্ট অনুভব না হইয়া একরূপ আনন্দের উদয় হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে আসনের কৌশল সাধকের আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে যোগশাস্ত্রোক্ত মুদ্রাগুলির রোগনাশক শক্তির আলোচনা করা যাউক।

মূলবন্ধ। বাম গুল্‌ফ দ্বারা গুহ্যদেশ আকুঞ্চন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে মেরুদণ্ডে নাভি-গ্রন্থি সংযুক্ত ও পীড়ন করিবে। আর উপস্থকে দক্ষিণ গুল্‌ফ দ্বারা সংবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাকেই মূলবন্ধ বলে। এই মুদ্রা জরা বিনাশ করিয়া থাকে।

নভোমুদ্রা। সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে স্থিরীভূত ও ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু-রোধ করিয়া অবস্থিতি করিবে। ইহারই নাম নভোমুদ্রা, এই মুদ্রা অভ্যাসকারীর সমস্ত রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

খেচরীমুদ্রা। জিহ্বার নিম্নভাগে জিহ্বামূল ও জিহ্বা এই দুইটীকে সংযুক্ত করতঃ যে নাড়ী আছে, তাহা ছেদন করিয়া সর্ব্বদা রসনার নীচে রসনার অগ্রদেশকে পরিচালিত করিবে। আর জিহ্বাকে নবনীত দ্বারা দোহন করতঃ লৌহময়ী লেখনী (চিম্‌টা) দ্বারা কর্ষণ করিতে হইবে। প্রতিদিন এইপ্রকার করিলে জিহ্বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দ্বারা রসনাকে এইরূপ লম্বিত করিবে যে, উহা অনায়াসে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিতে পারে। জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালু মধ্যে লইয়া যাইবে। তালুদেশের মধ্যস্থ গহ্বরকেই কপাল কুহর বলে। জিহ্বাকে ঐ কপাল-কুহরের মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে বিপরীত ভাবে প্রবেশিত করাইয়া একদৃষ্টে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে। ইহাকেই খেচরীমুদ্রা বলে। যে ব্যক্তি এই খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করেন, মূর্চ্ছা, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না, আলস্যও তাঁহার শরীরে স্থান পায় না, তাঁহার রোগ, জরাদি দূর হয়, তিনি দেবদেহ সদৃশ দেহ লাভ করিয়া থাকেন। খেচরীমুদ্রাকারী ব্যক্তির দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্য সমুদিত হয় এবং কপাল ও মুখ এই দুইটীর মিলনে তাঁহার জিহ্বায় নানারূপ অমৃতোপম রসের সঞ্চার হয়। রসাস্বাদ বিশেষে পৃথক ফল হইয়া থাকে। ক্ষীরের স্বাদ অনুভূত হইলে

ব্যাধি নষ্ট, আর ঘৃতের স্বাদ পাইলে অমর হয়।

যে ব্যক্তি এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার রসনায় অহরহ অদ্ভুত রস-সঞ্চার হয় এবং তাঁহার চিত্তে দিন দিন নব নব আনন্দ সমুদ্ভুত হইয়া থাকে। খেচরীমুদ্রা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র গলিত সোমধারা পান করিলে অভূতপূর্ব্ব নেশা হয়, মাথা ঘোরে, চক্ষু আপনি অর্দ্ধ নিমীলিত ও স্থির থাকে; ক্ষুধা-তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়। খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধাধারা ক্ষরণ হয়, তাহা সাধকের সর্ব্বশরীর প্লাবিত করে। তাহাতে সাধক দৃঢ়কায়, বলিপলি ও জরা-রহিত কন্দর্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং পরাক্রমশালী হয়েন। প্রকৃত খেচরীমুদ্রা সাধন করিতে পারিলে সাধক ছয় মাস মধ্যে সর্ব্বব্যাধি মুক্ত হয়েন। দীর্ঘকালে অভ্যাসে চিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে।

বিপরীতকরণী মুদ্রা। মস্তক ভূতলে সংস্থাপনপূর্ব্বক হস্ত যুগল পাতিয়া রাখিবে। আর পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে সমুত্থাপিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ুরোধ করতঃ সমাসীন হইবে। ইহাকে বিপরীতকরণী মুদ্রা বলে। নাভিপদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে অরুণ বর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল আছে, সহস্রারস্থিত অমাকলা হইতে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, সেই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হয়। বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে গ্রস্ত হইতে ঐ ক্ষরিত অমৃত রক্ষা করিতে পারিলে দেহ বলিপলি ও জরারহিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

শক্তিচালনী মুদ্রা। বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা নাভি বেষ্টন করিবে এবং ঐ বস্ত্রখণ্ডকে কটিসূত্রদ্বারা সংবদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর ভস্ম দ্বারা শরীর লিপ্ত করতঃ সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক উভয় নাসাপুট দিয়া ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিবে। যথাসাধ্য বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক করতঃ ধীরে ধীরে গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে থাকিবে। ইহারই নাম শক্তিচালনীমুদ্রা, এই মুদ্রার অভ্যাসে সমস্ত রোগরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ।)

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

———0———

প্রেমের সাধন।

সরে থাকি দূরে দূরে, আঁখিভরে হের তারে,
ভূলেও তাঁহার কাছে করো'না গমন।
তোমার পরশে হায়, যদি সে মলিন হয়,
ধূলার পরশে হয় কুসুম যেমন॥

এ দুঃখ রাখিতে তবে, স্থান না পাইবে ভবে,
অঙ্কুরে হইবে নাশ সব আকিঞ্চন।
মনে মনে বেসে ভাল, শুধু অশ্রুধার ঢাল।
বিরহে পুড়িয়ে মর চেয়ো' না মিলন॥

আগুণে কাঞ্চন যথা, দূর করে মলিনতা,
প্রেমের মাধুরী বাড়ে বিরহে তেমন।
ভালবাস তুমি তাঁকে, একথা এন' না মুখে,
যতনে হৃদয়ে রাখ করিয়ে গোপন॥

ভাল গো বাসিবে যাঁরে, পরশ করো'না তাঁরে,
পরশে পঙ্কিল হয় প্রণয় রতন।
সাধিতে তাঁহার কাজ, কখন করো'না ব্যাজ,
তাঁরি কাজে দেহ মন কর সমর্পণ ॥

তাঁরি সুখে ভেবো সুখ, তাঁরি দুঃখে তব দুখ,
ধীরে ধীরে তাঁরি সনে মিশাও আপনি।
তাঁহারি সুখের লাগি, হও তুমি সর্ব্বত্যাগী'
আপন সুখের চিন্তা করো'না কখন ॥

করে কাজ তাঁরি তরে, যেতো'না গো অহঙ্কারে
নীরবে আপন কাজ করোগো সাধন ॥
এতটুকু অহংকারে, সব যাবে ছারেখারে,
কণিকা গোমূত্রে হয় দুগধ যেমন ॥

করো'না মানের আশা, কিম্বা প্রীতি, ভালবাসা
চেয়োনাকো তাঁর কাছে কভু প্রতিদান।
সে তোমা বাসে না ভাল, তাতে কিবা এল গেল
তোমার কর্ত্তব্যে তুমি হও আগুয়ান ॥

ভাল গো বাসিয়ে হায়, যেবা প্রতিদান চায়,
স্বার্থপর জানে না সে প্রেম কি রতন।
প্রেম যে পরশমণি, সে যে শান্তি সুধাখনি
তাহার তুলনা দিতে নাহি কোন ধন ॥

জগতে প্রেমিক ধন্য, প্রেমের পরশ ধন্য
প্রেমের পরশে লোহা হয় গো কাঞ্চন।
স্থাপিয়ে হৃদয়ে তারে, পূজভক্তি উপচারে,
তাঁরি সনে কর তব আত্ম-সংমিশ্রন ॥

তোমার তুমিত্ব তুলি, দেও গো তাহাতে ডালি,
তটিনী মিশিয়ে যায় সাগরে যেমন।
দু'য়ে মিলে এক হও, তাহাতে ডুবিয়ে যাও,
হবে তাহে বিশ্বময় তাঁহার স্ফুরণ ॥

ভেদাভেদ নাহি রবে, সে যে বিশ্বব্যাপী হবে,
ঘটে ঘটে তাঁরি রূপ হবে দরশন।
তোমার তুমিত্ব যাবে, কেবল জাগিবে সেই,
হবে তাহে উদ্যাপন প্রেমের সাধন ॥

দীন—স্বরূপানন্দ।

———0———

পাগলের দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাংখ্যকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পথে লীলায় রত গুণের কেন্দ্রগুলিকে জীবভাবে চব্বিশ-তত্ত্বে বিভাগ করিয়াছেন এবং অন্যান্য দার্শনিকগণও এই বিষয়টীকে নানারূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষও যাহা, জগতের ভূমা অব্যক্ত গুণকেন্দ্রও তাহার বর্ত্তমানতার কারণ-ব্রহ্মও তাহাই, বিষয়টী হিসাবের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। সাংখ্যভাবের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ভূমাভাবে জাগতিক লীলায় খুজিতে গেলে যে সকল গুণকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়, গণিতশাস্ত্রের দশম সংখ্যার মধ্যেও তাহাই পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতের এক একটী কেন্দ্রে যেমন পরবর্ত্তী পরিণতির বীজ বর্ত্তমান থাকে, গণিতেও সেইরূপ একএকটী সংখ্যার পরিবর্ত্তী স্থূল ও সূক্ষ্ম সংখ্যার শক্তি

বীজাবস্থায় অবস্থিত থাকে। তাই যেখানে এক, সেই খানেই দুইয়ের যোগ ও বিয়োগ উভয়ের যৌগিক বীজ বর্ত্তমান থাকে। হিসাবটী দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যাহা গণিত, তাহা সূক্ষ্ম দর্শনের স্থূল বিভূতি। দর্শন সূক্ষ্ম, গণিত তাহার সাকার মূর্ত্তি। আর্য্যঋষিদের এই অদ্ভুত আবিষ্কার জগতের সর্ব্বপ্রকার আবিষ্কার হইতে শ্রেষ্ঠ; বাস্তবিক পাশ্চাত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এইরূপ দশম সংখ্যার গণনাদ্বারা গণিত, রোমীয় ও গ্রীক গণনা পদ্ধতিকে হারাইয়া দিয়াছে। ক্ষেত্রতত্ব, বীজগণিত প্রভৃতিও পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের নিকট হইতে ধার করিয়া নিয়াছে। এসিয়ার চীন্, আফ্রিকায় ইজিপ্ট ইহা প্রথমে শিক্ষা করিয়াছিল। তাই এই সকল জাতির সভ্যতা অতি প্রাচীন।

সাংখ্যকার, সূক্ষ্মজগতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখে জীবভাবে জগতকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি যাহা, সূক্ষ্ম-জগতের অব্যক্ত গুণকেন্দ্রও তাহাই। যেহেতু যেখানে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সেখানে গুণত্রয় স্ব স্ব বিকাশ অভাবে অব্যক্ত বীজরূপে বর্ত্তমান। এই অব্যক্ত বীজই অব্যক্ত গুণ-কেন্দ্র। এই গুণ যাহার সহবাসে চৈতন্যময় হয়, তিনিই খণ্ডরূপে পুরুষ, ভূমাবস্থায় ব্রহ্ম। গণিতের যোগ ও বিয়োগ এবং উভয়ের স্থিতি যেখানে সাম্য, সেই কেন্দ্রই $\left\{\begin{matrix}-১\\ \hline +১\end{matrix}\right\}$, এই উভয়ের বিকাশের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রটী যাহার ইচ্ছায় সচেতন্ থাকে, তাহাই শূন্যের অবস্থান কেন্দ্র। এইজন্য শূন্য ভিন্ন এককের বর্ত্তমানতা অসম্ভব, তাই অন্ধকার ভিন্ন আলোর প্রকাশ হয় না, ধ্বংশ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। অথচ উভয়ে নিত্য সম্বন্ধে জড়িত। ভক্তের নিকট ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ। অসাম্য ভিন্ন সাম্যের বিকাশ হয় না বলিয়া, প্রকৃতি অসাম্যের দিকে অগ্রসর হয়েন; এবং এইদিকে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে চৈতন্য হইতে একটা স্পন্দন দ্বারা অনন্ত সৃষ্টি করিয়া লীলাক্ষেত্রে অনন্তলীলা প্রকাশ করিতে হয়। তাই এক দুইয়ে পরিণত হইতে ছুটে, সৃষ্টি ধ্বংশ হইতে ছুটে, সত্ব রজের সাহায্যে তমের দিকে ধাবিত হয়। এই গতির প্রকাশে স্বভাবে যে প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, সূক্ষ্ম জগতে তাহাই কেন্দ্র প্রতিভিকর্ষিণী স্বভাব, জীবের ইহা সৎ অসৎ বুদ্ধিকেন্দ্র ইচ্ছা। এখানেই জীব স্বীয় শক্তিতে একটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ মহান্ ভাব অনুভব করে, এবং জাগতিক ভূমা স্বভাব হইতে খণ্ডরূপে স্বীয় শক্তি প্রকাশে যত্নবান হয়। ইহাই মহতত্ব। গণিতে ইহা $\left\{\begin{matrix}-২\\ \hline +২\end{matrix}\right\}$, উভয়ের বিকাশ কেন্দ্র। গতি প্রকাশের প্রবৃত্তি শক্তি সম্পন্ন নিষ্ক্রিয়; সুতরাং ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের প্রকাশের, কারণ কেন্দ্র আশ্রয় করিতে হয়; তাই জীবের অহংকারের বিকাশ হয়। অহংকারের সাহায্যে জীব সদসৎ উভয় দিকে শক্তির বিকাশ করিতে পারে। গণিতের ইহাই $\left\{\begin{matrix}-৩\\ \hline +৩\end{matrix}\right\}$ কেন্দ্র।

অহংকার জ্ঞানের সাহায্যে শক্তির প্রকাশ করেন। শক্তি গতিরূপে প্রকাশিত হইতেই

একটা প্রকাশ ক্ষেত্রের দরকার, কিন্তু ক্ষেত্রটী ভূমা না হইলে গতি অনন্ত হইতে পারে না, তাই দশদিকের প্রকাশ। দশদিকেই অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতে সংকল্প ও বিকল্প উভয়বিধ পথের গতি কেন্দ্র সৃষ্ট হয়। এই গতির কেন্দ্রই মন, দশদিকে শক্তির প্রকাশিত পথই দশ ইন্দ্রিয় এবং এই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনোপযোগী ক্ষেত্রই পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম শক্তি। পঞ্চভাব ভিন্ন প্রকাশ কার্য্য সম্ভব নয় বলিয়াই তন্মাত্র পঞ্চভাবে বিভক্ত এবং স্থূলাবস্থায় পঞ্চভূত ও পঞ্চরূপে বর্ত্তমান।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ অনন্তকাল ও অনন্ত স্থানের বিস্তার শক্তির দরকার। বিস্তার কার্য্য গতির সাহায্য ভিন্ন প্রকাশিত হইতে পারে না বলিয়া তাহার বিস্তারের গতির কারণ উৎপন্ন হয়। গতি প্রকাশিত হইতে হইলে, তাহাকে কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়; ইহা হইতে খণ্ড কারণশক্তির প্রকাশ। কিন্তু সম্মুখগতি যেমন, অব্যক্ত পশ্চাৎ গতির সহায়তা ভিন্ন প্রকাশিত হয় না; অর্থাৎ অগ্রসর হইতে হইলে যেমন পশ্চাতের সৃষ্টি না করিয়া অগ্রসর কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না, সেইরূপ খণ্ড কারণ শক্তির বহির্ম্মুখী গতি সংযোগ কারণ অন্তর্ম্মুখী গতির সাহায্য ভিন্ন প্রকাশিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ গতিকেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া যতই ভূমার দিকে অগ্রসর হউক না, কেন্দ্রের সহিত একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, ইহাই সংযোগ কারণ শক্তি। এই সংযোগ কারণ শক্তির অনন্ত হইতে কাঠিন্যের উৎপত্তি, ইহাই পরমাণুর কারণ; এই ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র কেন্দ্রটী জাগতিক স্থূল গতির কার্য্য, গণিতের ইহা $\left\{\begin{matrix}-৪\\ \text{---}\\ +৪\end{matrix}\right\}$ মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র। কাঠিন্যের চরম পরিণতির পরই তাহার অব্যক্ততা জন্মে অর্থাৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই লয়ের পথেই দশদিক প্রসবিনী পঞ্চ তন্মাত্রের পঞ্চ মহাশক্তি স্থূলতম হইয়া স্বীয় স্বরূপের পরিবর্ত্তনের জন্য কেন্দ্রের দিকে উৎপত্তির পথে ধাবিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতির যৌগিক কেন্দ্রে যাইয়া পহুছে।

এই স্থূলতম কেন্দ্রই গণিতের $\left\{\begin{matrix}-৫\\ \text{---}\\ +৫\end{matrix}\right\}$ মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র। জীবের এই স্থানেই বার্দ্ধক্যের উৎপত্তি; এবং প্রকাশের স্তরে স্তরে অন্তর্ম্মুখী পথে ধাবিত হইয়া মৃত্যু কেন্দ্রে যাইয়া পৌছে। গণিতে ইহা ষষ্ঠ হইতে দশমের উৎপত্তি। এইরূপে সাংখ্যকার জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আধুনিক গণিতও ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝাযায় শূন্য হইতে একটা গতি প্রকাশিত হইয়া পুনরায় শূন্যে আসিয়া লীন হওয়ার পথটীই এক দশক। সাংখ্যের ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। স্থূলভাবে জগৎ। বৈজ্ঞানিকভাবে তাড়িত শক্তি। দার্শনিক ভাবে চৈতন্যের ভূমাগুণ প্রকাশক স্পন্দন। তাড়িৎ শক্তির Positive এবং Negative যেমন দুইটী গুণ, ভূমা গতিরও সেইরূপ অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী দুইটী গুণ। বস্তুতঃ ভূমাগতি শক্তিটীই স্থূলরূপে তাড়িৎ শক্তি। ভূতমধ্যে এই শক্তি দ্বয় চরম স্থূলাবস্থায় অগ্নি ও জলের স্থূলশক্তিরূপে বিরাজমান। আকাশ ও বায়ুর শক্তি কেবল এই শক্তিদ্বয়ের চরম স্থূল পরিণতির সহায়তাকারী।

ভূতত্রয়ের বিস্তারের দরুণ আকাশ, সক্রিয় হওয়ার জন্য বায়ু। চরম স্থূলাবস্থায় সকলে মিলিয়া ক্ষিতি। ইহাই জাগতিক স্থূলত্বের শেষ সীমা।

কস্যচিৎ পাগলস্য।

—0—

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

৪০। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে যে দিকেই যাও বা যে ভাবেই থাক না কেন, লক্ষ্যের বিচারে কাজ করিতে হইবে।

৪১। প্রত্যেকের আপন আপন বংশ, জাতি, দেশ ও সমাজানুমোদিত কার্য্যই তাহার স্বধর্ম্ম।

৪২। জ্ঞানিগণ সমাজের ও দেশের হিতার্থে স্বধর্ম্ম পালন করেন।

৪৩। ভক্তি-অহৈতুকী, ভক্তিতে সকলের সমান অধিকার; ভক্তি বাহ্যমুখী হইলে আসক্তিতে পরিণত হয়, আর অন্তর্ম্মুখী বা ভগবন্মুখী হইলেই ভক্তি।

৪৪। কাম ও প্রেম একই কথা; কামের উৎকর্ষই প্রেম; যাহার কাম নাই সে কোন দিন প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না; তাই নপুংসক যোগ, যাগ বা ভগবৎ সাধনের অধিকারী হয় না। কেন না কামহীন ব্যক্তির হৃদয় নীরস, বন্ধুর, ইহাতে সদ্বৃত্তির উন্মেষ হয় না।

৪৫। জ্ঞান, যোগ বা বিদ্যার অধিকারী সকলে হইতে পারে না; কিন্তু ভক্তির অধিকারী সকলেই হইতে পারে। ভক্তি আমাদের স্বাভাবিক সম্পত্তি। শুধু মোড় ফিরাইয়া দিলেই হইল।

৪৬। কাম ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হওযায় অন্তরে জমাট বাঁধিতে পারে না। তাই হৃদয় শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়, আর প্রেমের বিকাশ হয় না।

৪৭। নীল রং নয়নানন্দকর; নীল রং মানবের জীবনপ্রদ, তাই আকাশ, সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষলতাদি নীল।

৪৮। কামে অবসাদ আসে, প্রেমে উত্তেজনা বাড়ে; কিন্তু সে উত্তেজনা সুখপ্রদ, সত্বগুণ বৃদ্ধি করে; আর কামে অবসাদ আনিয়া তমগুণ বৃদ্ধি করতঃ মানবকে অধঃপাতিত করে।

৪৯। যতক্ষণ "আমি" আছে, ততক্ষণ কাজ কর্ম্মে অবসাদ বা ক্লান্তি আসিবে, "আমির" বিনাশ হইলে অবসাদের বিনাশ হইবে, তখন কেবল সম্মুখগতি।

৫০। আপন ভাবে জগৎ ভুলে আছে, আপনি চোর, তাই জগৎ চোর আপনি সাধু জগৎ সাধু।

৫১। যখন সন্ন্যাসী গুরুদত্ত নাম ভুলিয়া যায় তখনই সে পতিত।

৫২। সাধুগণ জীবিতাবস্থায় ত লোকের হিতসাধন করিয়াই থাকেন, দেহান্তর হইলেও তাঁহাদের দেহের অণুপরমাণুগুলি জগন্ময় ব্যাপ্ত হইয়া জীবজগতের হিতসাধন করিয়া থাকে; তাই সাধুসঙ্গের এত ফল।

৫৩। অহংকার নাশ করিবার জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন।

৫৪। কর্ম্মই কীর্ত্তি—যে যত বেশী কর্ম্ম করে সে তত বেশী দীর্ঘজীবী ও কীর্ত্তিমান।

৫৫। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করাকে কর্ম্ম বলে।

৫৬। সরল বিশ্বাসী কে?—যে ভগবানকে জানিয়াছে।

৫৭। মৃন্ময় মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা চিন্ময় মূর্ত্তি বর্ত্তমান; তাহাই দেখা মানব জীবনের কর্ত্তব্য; চিন্ময় মূর্ত্তিতে মৃন্ময় মূর্ত্তি নাই কেন না উহা মৃন্ময় জগতের অনেক উপরে অবস্থিত।

৫৮। সুখ দুঃখ কেন?—আমার 'আমিত্বকে' দেহের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি।

৫৯। বিবাহ কাহার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে?—যে দুর্ব্বল অর্থাৎ যাহার সংযমাভাব তাহার জন্যই বিবাহ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬০। গুরুসেবা যতটকু করিবে কায়মনোবাক্যে করিবে।

৬১। জ্ঞানীর মধ্যে একদেশদর্শিতা বা গোড়ামী নাই।

৬২। জীবন ত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্বভাব বদল হয় না।

৬৩। যে যে পথে সত্যে পহুছিয়াছে, সে তাহাই পছন্দ করে, তাহারই অনুমোদন করে। ইহা তাহার স্বভাব—সংস্কার নহে। সাধুদের সংস্কার থাকে না কিন্তু স্বভাবের দাগ কিছু কিছু থাকে।

৬৪। মুখ চাহিয়া কাজ করিলে কর্ত্তব্যের অপব্যবহার হয়।

৬৫। ভক্তি বিশ্বাস না থাকিলে প্রসাদ, চরণামৃত সেবনে কোন ফল পাই কি?

ক্রমশঃ।

স্বরূপানন্দ।

বন্ধুর পত্র।

সুরেন, আমার প্রাণাধিক সুরেন! আমার সেই বুকভরা পাগলকরা সুরেন! তোমাকে আমি পত্র লিখিয়া সুখী করিতে পারিব না, দুধের সাধ জলে মিটাইতে পারিব না; তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, তোমার উন্নতস্মৃতি তোমার জাগাঘুম, তোমার ঘুমঘোরের সুখস্বপ্ন বিজড়িত নির্ব্বাক ভাব যখনই চিন্তা করি তখনই আমি যেন কেমনতর হইয়া যাই। আমিও যেন তুমি হইয়া যাই। ইহাতে সুখ আছে কিন্তু পূর্ণ নহে, শান্তি

আছে কিন্তু বিকলাঙ্গ; ভাব আছে কিন্তু ধারাবাহিক নহে। আছে সব কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা। তাই বলিতে চাই আমরা কি এই অশান্তি কষ্ট দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম? মায়ের কি তাই অভিপ্রায়? কখনই নহে। করুণাময়ী মা যে সুখসম্পদরাশি হাতে তুলিয়া অযাচিত ভাবে অননুভূত অবস্থা দিয়াছেন, তাহা আমাদের অশান্তির তুষানলে মৃদু মৃদু বাতাস দিয়া আগুণ জাগ্রত রাখিবার জন্য নহে, তাহা আমাদের চঞ্চল চিত্তকে দ্বিগুণ চঞ্চল করিয়া মাতৃচরণ হইতে দূর দূরান্তরে বিদূরিত করিবার জন্য নহে; যাহাতে আমাদের বিশৃঙ্খল বৃত্তি সকল এক কেন্দ্রীভূত হইতে শিক্ষা করে, যাহাতে আমরা শনৈঃ শনৈঃ নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহার জন্যই এই মিলন, এই বিচ্ছেদ, এই ভালবাসা, এই ঐকান্তিকতা। আমরা যদি ভালবাসার, ঐকান্তিকতার বাহিরের খোলস লইয়াই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা বর্ত্তমানেই পর্য্যবসিত হইবে, আমাদের প্রাণের আবেগ পত্রদেহে বিলীন হইবে। তাই পত্র লিখা চাই। কিন্তু তরঙ্গসঙ্কুল নহে, পত্র লিখা চাই, কিন্তু ব্যাকুলতার পরিমাপক চিহ্ন স্বরূপ নহে, পত্র লিখা চাই, কিন্তু অশান্তির আগুণ বৃদ্ধি ... শুধু হা হুতাশ করিবার জন্য নহে। ধীর, স্থির, অচঞ্চল ভাবে, আমরা উভয়ে উভয়ের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিয়া যাইব, যাহার নিকট যেটুকু আছে, তাহার আদান প্রদান করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দুজনে এক ভোলে দাঁড়াইব। এই একীভূত ভাব, এই সমতা, আমাদিগকে এখানে ইহসংসারে তুল্য ভাবে গ্রহণ করিবে; আবার দেহান্তে সেই একতার রাজপথে, আমরা হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে কোন এক অজ্ঞাত সুখময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইব; এই ভাবে, এই ভাষায় কথা কহিতে কহিতে দুজনে একত্র চলিতে থাকিব। পরে যেখানে পৌছাইব, সেখানেও তুমি তারা আমি সুরেন;-সুরেন তারা মিলিয়া,—তারা সুরেন মিলিয়া, এক তুমি হইব; সর্ব্বশেষে এক আমি হইয়া মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িব।

সুরেন, ভাব দেখি, সেই হাতধরাধরি করিয়া দুজনে সেই অজ্ঞাত রাজ্যে কত খেলিতেছি,—পথে চলিতে চলিতে কত কথা কহিতেছি—মায়ের কোলে দুজনে কত একত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি; তখন, তুমিও নাই, আমিও নাই—কেমন এক অবিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছি! মরি, মরি, সেদিন আমাদের কবে হইবে! আমাদের এই একতা, সমতা চির অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, উভয় রাজ্যের যাবতীয় দূরপথ অতিক্রম করিয়া গলাগলি ধরিয়া মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িব। লীলাময়ীর শেষ লীলা পর্য্যন্ত তাঁহার খেলার সঙ্গী থাকিয়া যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানে গিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইব। আমাদের অহমিকা ঘুচিয়া যাইবে, আমরা কেবল "আমি" হইব।

মনে রেখো "কি কাজে এসেছি কি কাজে বা গেল কেমনে জানিব কি খেলা হলো।"

মনে রেখো, "মেঘ বরিষণে নদীর জনম শুকাইলে নদী মেঘেতে ধায়,

ধরায় যত কুসুম সুন্দর, ফুল ঝরে পরে
ধরার গায়।"
আকাশ হইতে শব্দ জনম, সঙ্গীত ধ্বনি
মিশিছে তায়,
মা হতে যখন আমার জনম কবে তবে আমি
মিশিব মায়।"

বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ সেই ভুবনমোহিনীর রাজ্যে যাইবার পথ মধ্যে, অথবা সঙ্গী মাত্র। ইঁহারা সেই সুখ দিতে পারে না, যে সুখ সেই রাজ্যে পাওয়া যায়। ইহারা সে শান্তি ভোগ করে নাই, যাহা সেই দেশে চিরপ্রবাহিত, যাহারা নিজ কৃতিত্ব দেখাইতে চায়, তাহারাই কায়মনোবাক্যে ইহাদের সেবা করিয়া থাকে, একদিক ফেলিয়া রাখিয়া এই সমস্ত বাহাড়ম্বর লইয়া যশস্বী হইতে চায়। আমরা যশ চাই না, আড়ম্বরে কি করিব? আমরা চাই মাকে, আমরা চাই প্রাণের আরাধ্যনিধিকে! আমরা চাই প্রাণের কবাট খুলিয়া ভিতরে বাহিরে মা, মা বলিয়া কাঁদিতে। এই কাঁদার নাম বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, তপ জপ ইত্যাদি যদি হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? আমি তাহার নাম কাঁদা বলিব; যাহাতে আমাদের ক্ষমতা আছে তাহাতেই আমাদের অধিকার।

তবে একটী কথা আছে। এই কাঁদা যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার জন্ত সংযম আবশ্যক; তাহার জন্তই ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম নিদিধ্যাসন প্রভৃতি চাই। চিত্ত যদি দুর্ব্বল হয়, তবে তাহা করিও। পাছে কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হও, যদি এই আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ কাঁদার সঙ্গে সঙ্গে এগুলাকেও রাখিও। কিন্তু দেখিও পথে চলিবার জন্ত যেন পথ হাটিয়া মরিও না। লক্ষ্যস্থির রাখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত, জপ, তপ, প্রাণায়াম ও হাসা কাঁদা যাহা দরকার তাহা করিও। না করিলে বাস্তবিক ভয়ের আশঙ্কা।—অন্ততঃ তোমার আমার সম্বন্ধে।

ব্রহ্মচর্য্য যে এ কার্য্যের মূল ভিত্তি তাহা লিখা বাহুল্য। আমরা সংসারী, আমাদের সম্বন্ধে নিয়মাধীন থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ব্যবস্থেয়। সুতরাং সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য একটা নিয়ম স্থির করিবে। আহারাদি তামস হইতে রাজস পরে সাত্ত্বিক করিবার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তদনুযায়ী চলিতে আরম্ভ করিবে। যখন চিত্তটা যত উন্নত বোধ হইবে, অর্থাৎ যতই নির্ম্মলানন্দ অধিক পাইতেছ দেখিবে, ততই আহারাদি সম্বন্ধে সাত্বিকতা রক্ষার সম্বন্ধে ঝোক বাড়াইবে, দিবা-রাত্রির মধ্যে অন্যূন দুই ঘণ্টা নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিবে। কাঁদিবার সময়—সংসার যতই এদিক ওদিক হইতে কম উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে দেখিবে, ততই তুমি অগ্রসর হইতেছ জানিবে। অন্ততঃ একজনকেও জীবনের সর্ব্ব কার্য্যে সাথী রাখিবে। স্ত্রী একার্য্যে সর্ব্ব প্রথম ও উত্তম সাথী, অনেকের ভাগ্যে এমন সাথী মিলে না। কিন্তু যে মানুষ বনের বাঘ নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন ও স্বার্থসিদ্ধি করে, সে মানুষ একটী স্ত্রীকে বশে আনিতে পারে না ইহা কেবল তাহারই ঔদাসীন্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ তুমি আমি এত দুর্ভাগ্য হইয়া যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা তো বোধ হয় না। একান্ত অনুপায় দেখিলে

তাহার ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও কার্য্যের সঙ্গে এই কার্য্যের দুই একটী বর্ণমালা যোগ করিয়া দিয়া নূতন ভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা উচিত। ইহা যে ঐহিক পারত্রিক এত দরকারের মধ্যে কেন আসিল, তাহা বুঝিতে না পারিলে পরে বলিব। ভগবান পরমহংসদেবের কথা (এ সম্বন্ধে) ছাড়িয়া দাও। তুমি আমি পরমহংসদেবের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন কি না, এ কথা কি লিখিয়া জানাইতে হইবে? অত্যন্ত পতন হইতে ক্ষুদ্র পতন যে অনেকটা শুভসূচক তাহা কে অস্বীকার করিবে? ৺কেশবচন্দ্র সেন যেদিন জাতি বিচারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়ছিলেন, ভগবান পরমহংসদেব কি উত্তর দিয়াছিলেন মনে আছে? তিনি উত্তর দেন, কাঁচা ফল টানিয়া ছেঁড় কেন? পাকিলে আপনিই পড়িয়া যাইবে। আর মায়ের দেওয়া জিনিষ তুমি ঘৃণা করিতে পার না,—উপেক্ষা করিয়া তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে পার না; করিলে মা রাগ করিবেন। হয়ত তোমার উপর রাগ করিয়া, মা, তুমি যা খেলিতে যাইতেছ তাহা সব ভাঙ্গিয়া দিবেন। কানে জল ঢুকিয়াছে, জল না দিলে জল বাহির হইবে কেন? লাফালাফি করিয়া বাহির করিতে গেলে পা যদি মচ্‌কাইয়া যায়, তখন আবার নূতন রোগের সৃষ্টি হইবে।

আর মায়ের ছেলে হইয়া অত ভয়ই বা কেন? সংসার কিছু তুমি আমি গড়ি নাই। (যে গড়ার কথা মনে সন্দেহ হয় তা এখন ছাড়িয়া দেও।) যদি মা গড়িয়া থাকেন তবে তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার দরকার আছে। আর দেখ, তুচ্ছ এই একটা ভয়েই যদি তোমার আমার দুর্ব্বল চিত্ত এত ভীত হয়, তবে জানিও তোমা আমা দ্বারা কোন কার্য্যই হইবে না। ভালও হইবে না—মন্দও হইবে না। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না, তোমার পূর্ণ মতের আশায় রহিলাম।

আনন্দপ্রবাহ সর্ব্বদা অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তুমি আমি কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহি জানিয়া মায়ের ইচ্ছা শক্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া পরমহংসদেবের ন্যায় বল্‌তে শিক্ষা করবে, "আমি খাই দাই আর থাকি, আর সব মা জানে।" যে খানে গেলে আনন্দ নষ্ট হয়, চিত্তের বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তেমন স্থানে যাতায়াত বন্ধ করিবে। গেলেও অন্যমনস্ক ভাবে কতক্ষণ থাকিয়া দশ কথার উত্তর দুটা একটা "হাঁ" "না" বলিয়া সরিয়া পরিবে। বাহিক ব্যবহার পরিচ্ছদাদি মনের অনুযায়ী না হইলে মন স্থির থাকেনা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া অবরুদ্ধ হৃদবাষ্প নিয়ত বাহির হইয়া কর্ম্ম-এঞ্জিন যেন মধ্য রাস্তায় দাড়াইয়া না যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কি সঙ্গত নহে? আমরা যে সংসারী! আমরা যে জনক রাজার আসনে অধিষ্ঠিত! বলতো সুরেন "জনক" মানে কি? এবার এই পথেই থাক। দরকার হইলে মা নিজেই তোমাকে বাসনানুযায়ী বেশ ভূষায় সজ্জিত কর্ব্বেন, তুমি ব্যস্ত হও কেন? ছুটাছুটি করিয়া, একটা গলী-ঘুঁচিতে যাইয়া শেষে কি হারাইয়া যাইবে? তুমি তো আর সকল পথের সঙ্গে পরিচিত নও। কে জানে তুমি বাড়ীর পথটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবে না?

মনুষ্যপ্রেম জগতে তুচ্ছ নহে, মনুষ্য-

প্রীতি উপেক্ষার সামগ্রী নহে। কিন্তু মনুষ্য-প্রেম আমরা বাস্তবিক কি ভাবে লইয়া থাকি ? ইহা কি বিশ্বপ্রেমের কথা ভুলাইয়া দিয়া ব্যক্তিগত করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে মোহজলপূর্ণ সসীম কূপমণ্ডূক করিয়া রাখে না ? ইহা কি কার্য্য কারণ সম্বন্ধের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া অস্তিত্ব নাস্তিত্বের সৌধ ভাঙে গড়ে না ? যদি তাই হয়, তবে মনুষ্যপ্রেম বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। আর যদি তাহা না করিয়া ক্রমে বিশ্বপতির অপার করুণাসাগরে মিলিত হয় তবে আর চিন্তা কি ? পাছে সেই................. শরাসন নিক্ষিপ্ত বান মধ্যপথে স্তম্ভিত হয়, সেই ভয়ে মনুষ্য প্রেমে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করি, আচরণে নিষেধ নাই।

সুরেন, তোমাকে তুলিতে যাইয়া এখন আমি দেখি ডুবিয়া মরি। তুমি তো চিত্তকে রাগে হউক, দুঃখে হউক, সরাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখ, কিন্তু আমি বুঝি তা পারিব না। তোমার উপর আমার রাগ হইবে না, পত্র না পাইলে দুঃখ করিবার অভ্যাসও আমার নাই। তুমি হয়ত দুঃখে রাগে আমার কাছে পত্র লিখা বন্ধ করিবে। আমি এখানে দুঃখও করিব না, রাগও করিব না, কেবল হাঁ করিয়া আকাশ পাতাল, পূর্ব্বস্মৃতি নিজের অকার্য্যকারিতা, নিজের আলস্য ঔদাস্য "আছে থাকুক,, হচ্ছে হবে" র সঙ্গে ডুবিয়া মরিয়া যাইব। তোমাকে হারাইয়া ফেলিব। এ তরঙ্গের এক আঘাতে তুমি কোথায় গিয়া পড়িবে। আর আমি ক্রমে অতল জলে আত্মবিসর্জ্জন দিব। সুরেন, আমার প্রাণাধিক সুরেন, আমার সুখচিন্তা সুরেন ! আমার স্মৃতির উজ্জল প্রতিকৃতি সুরেন, আমার উপর রাগ করিওনা, আমি পত্র না লিখিলে অসন্তুষ্ট হইও না, মনে রাখিও তুমি পত্র লিখ আর নাই লিখ, সর্ব্বদা তোমার পরিস্ফুট চিন্তা, সর্ব্বদা তোমার ঢল-ঢল, হাসিমাখা মুখ, সর্ব্বদা তোমার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, পূর্ণ সাহায্য, সর্ব্বদা তোমার সরল মধুর, ভাবমাখা, প্রেমময়, আনন্দময়, সুখময় ভালবাসা, সর্ব্বদা তোমার প্রাণমনচিত্তবিনোদন মধুরস্মৃতি আমি হৃদয়ে আদরে সোহাগে ধারণ করিয়া আছি। আজ আমার সকল চিন্তার উপর, সুরেনের সুখচিন্তা, সকল কার্য্যের উপর সুরেনের নিকট পত্র লিখা। সকল কর্ত্তব্যের উপর সুরেনের সঙ্গে এই সুদূর বিদেশ হইতেও প্রাণের দুই একটী কথা কহিবার প্রয়াস—প্রবল ভাবে চলিতেছে। সুরেন, তুমি কি বোঝ না আমি তোমাকে কত ভালবাসি ? সুরেন তুমি কি জান না তোমার জন্য প্রাণের কোন নিভৃত কন্দরে দিবারাত্রি কি দারুণ আগুণ জ্বলিতেছে ? সুরেন তুমি কি ভাবনা এই মূহুর্ত্তে তোমার জন্য প্রাণ আমার কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আর চিরকাল এই ভাবে অক্ষুন্ন থাকিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে ? সুরেন, তোমার সঙ্গে এই সমস্ত কথা বলিবার সময় আমার যে চক্ষে বারে বারে কত জল আসিতেছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ ? এইক্ষণ মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদিস্ কেন ? আমি বলিলাম, "মা ! সুরেন আমাকে পাগল করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। সুরেন এক এক বার বড় হেচ্‌ড়া টান দিতেছে।" তোমার সম্বন্ধে মা কত বলিলেন শুনিয়া প্রাণ আরও শীতল হইল; কিন্তু দ্বিগুণ কান্না আসিল

সুরেন, আমি এই পত্র লিখিতে লিখিতে কাঁদিলাম, তুমিও এই পত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিবে। মরি, মরি, আমাদের এই কান্নার যিনি প্রবর্ত্তয়িতা, এই কান্নার যিনি প্রথম উদ্ভাবনকর্ত্তা, এই কান্নার যিনি মূলভিত্তি-সংস্থাপক, অশ্রুবিন্দু! যাও, সেই করুণাময়ী জগদম্বার চরণ ধৌত করিবার জন্য আমার সুরেনের অশ্রুবিন্দুর সহিত মিলিত হও। অশ্রুবিন্দু, যাও, আমার সুরেন যখন এই পত্র পড়িবে, তখন তাহার নয়ন ফাটিয়া বাহির হইয়া প্রকাশ কর" "তোমরা দূরে অবস্থিত, কিন্তু আমরা সাগরসঙ্গমে চলিয়াছি। সুরেন, সুরেন, বড়ই জোরে জোরে ডাকিতেছি। সুরেন তুমি কি আমায় দেখিতে পাইতেছ? সুরেন তোমার তারা এই যে তোমার সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে! এস সুরেন, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া বুকের মধ্যে লই। এস সুরেন, তোমাকে বুকে ধরিয়া হৃদয় শীতল করি। এস সুরেন, তুমি আমি এক হই। তুমি আমি যে দেহগত ভাবে যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া—দেখাদেখা করিয়া আজ ব্যাকুল হইয়াছি, একবার প্রাণে প্রাণে মিলিয়া সে বিভিন্নতা, সে দূরতা ভুলিয়া যাই। আর সুরেন, একদিন দেহের সৌভাগ্য হইয়াছিল, আজ প্রাণে প্রাণে, আঁখিজলে আঁখিজলে, কোলাকোলি করিয়া আমরা কতকটা শীতল হই, ব্যাকুলতাকে দূরে তাড়াইয়া দেই! আয় সুরেন, আমার বুকে, আয়!

মাকে বলিলাম, "মা আমাকে কাঁদাও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার সুরেনকে যেন আমার জন্য ছাড়া আর কাহারও জন্য সংসারের কাঁদা কাঁদাইওনা।" মা বলিলেন, "তাই হবে।" তাই হবে সুরেন? ধন্য জীবন আমার! ধন্য ভালবাসা তোমার! সুরেন অকৃত্রিম জিনিষের এমন শক্তি, আজ আমি তোমার জন্য কাঁদিতেছি, আজ তুমি সেখানে আমার জন্য কাঁদিতেছ—যেন মায়ের দুই চক্ষে অনর্গল আনন্দাশ্রু পতিত হইতেছে! বাঃ কি আনন্দ! আনন্দময়ীর দুই ছেলে, মায়ের দুই অঞ্চলের নীচে কাঁদিতেছে, তাই দেখিয়া আনন্দময়ী নিজচক্ষের জলধারা পাঠাইয়া দিয়া নিজে আনন্দাশ্রু ফেলিতেছেন। আজ মায়ে ছেলেতে মিলিয়া কাঁদিতেছে একই কারণে, কিন্তু তিনদিকে তিন জনের অশ্রুধারা প্রবাহিত! কেহ কাহাকেও নাকি দেখিতে পাইতেছে না? মিথ্যা কথা? আমি দেখিতেছি আমরা তিন জনেই এক কান্না কাঁদিতেছি। আমি ধন্য, (কাঁদিতেছি সেই জন্য) তুমি ধন্য (কাঁদিতে শিখিয়াছ সেই জন্য) মাও ধন্য (এক কারণে দুই ছেলেকে কাঁদাইতে পারিয়াছেন সেই জন্য।) কে বলে জগতে প্রেম নাই? কে বলে জগৎ শরীরে আত্মা নাই? কে বলে মায়ের সঙ্গে ছেলের পরিচয় নাই? জগৎ কাঁদিয়া মাকে কাঁদাইতে পারে কি না তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করুক, আমার সুরেনকে জিজ্ঞাসা করুক, আর পারে তো মাকে জিজ্ঞাসা করুক।

সবদিন এই কান্না পায় না, সবদিন এ চক্ষের জল আসে না। আজ আসিয়াছে, আজ পাইতেছে, তাই জীবনের আজ আমার আর এক মাহেন্দ্রক্ষণ, আর একটী স্মারক দিন।

সুরেন! যেদিন * * * হইতে রওয়ানা হই, সেইদিন আমাদের পুনর্মিলনে যত ব্যবধান

রহিয়াছিল, আজ তাহা হইতে এক মাস আটদিন কম হইয়াছে। একদিন এমন দিন আসিবে যেদিন আর ব্যবধান থাকিবে না। সেদিন যদি এক বৎসর পরে হয়, তবে শান্ত হও, আর এগার মাস বাকী, যদি ছয় মাস পরে হয়, তবে আর পাঁচ মাস বাকী, তবে চিন্তা কি? ব্যাকুলতা কি? সে দিন তো দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। তুমিও স্থির হও, আমাকেও স্থির রাখিতে চেষ্টা কর। তুমি বদলে আমি হইতে চাই কেন শুনিবে সুরেন? আমি আর যন্ত্রনা সহ্য করিতে পারি না, তাই সব "আমির" যন্ত্রনা সব "তুমিতে" ডুবাইয়া—তোমার তুমি ভাঙ্গিয়া, আমার আমি ভাঙ্গিয়া একটা নূতন তুমি অর্থাৎ আমি নামে যে তুমি সেই তুমিকে আমার নিকটে রাখিতে চাই, তাহা হইলে তোমারও কষ্ট হইবে না, আমারও কষ্ট হইবে না। যত দোষ সব তুমির উপর চাপাইয়া আমি লইয়া আমরা সুখে থাকিব। আমি যে আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। সেই আমির সুখে আমরা সুখী, সেই আমির দুঃখে আমরা দুঃখী। তুমি কেন ইহাতে থাকিবে? আমি তুমি হইতে যত ইচ্ছুক না হই, আমি আমি হইয়া তোমাকেও আমি করিতে আমি তত ইচ্ছুক, তত প্রয়াসী। তুমিকে তাড়াইয়া দিয়া আমিকে রাজা করিতে পারিলেই যেন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে এই আমার বিশ্বাস।

সুরেন, মনে মনে বড়ই আক্ষেপ হয়, সাড়ে চারি মাস * * *তে থাকিয়াও তোমার সহিত আমি অনেক দিন সুখসঙ্গ ভোগ করিতে পারি নাই। এখন মনে হয়, সর্ব্বদাই কেন তোমার সহিত একত্র থাকি নাই, সর্ব্বদাই কেন তোমার মুখে আমার পরমারাধ্য দেবতার নাম শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই, তুমি ছুটিয়া ছুটিয়া আমার নিকট আসিতে আর হতভাগা আমি তুচ্ছ অর্থ চেষ্টায় দৌড়াইতাম। আমার দৌড় ঝাঁপ অচিরকালস্থায়ী—তাহা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাণে যে আশা আকাঙ্ক্ষা আজ ধু—ধু শব্দে জ্বলিতেছে, তাহা বড়ই প্রবল, বড়ই যন্ত্রনাদায়ক। হায় পূর্ণিমার শশী! আজিও তো তুমি বিমল জ্যোৎস্নায় * * *র আকাশতল প্লাবিত করিতেছ। কিন্তু আমি কোথায়? আমার সুরেন কোথায়? হায় সান্ধ্যতপন! তোমার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গেই না আমাদের উভয়ের প্রাণ কি এক অপার্থিব সুখচিন্তায় নাচিয়া উঠিত, সে সন্ধ্যা তো আজিও হইতেছে, কিন্তু কৈ, সে সুখচিন্তার পরিবর্ত্তে নিরাশার গাঢ় উষ্ণ নিশ্বাসে আমাকে এত সন্তপ্ত করিতেছে কেন? হায় পুণ্যসলিলে করতোয়ে, তোমার কোলে বসিয়া আমরা না কত ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাতময়ী রজনীতে বাহ্য জগতের তীব্র কোলাহলে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তন্ময়ভাবে ঘুমাইয়া পড়িতাম, কৈ মা, আমার সেই প্রেমময় সুখস্মৃতি! সেই আবেশময় ঘুমঘোর, কোথায় লুকাইয়া রাখিলে মা? রজনীর গাঢ় অন্ধকার আজ তুমি এত বিকট খলখল হাস্তে বিদ্রূপ করিতেছ কেন? কতদিন না তোমার অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়াও আমরা প্রাণে প্রাণে ডুবিয়া থাকিতাম। তখন তো তোমার অন্ধকারের আবরণে আমার সুরেনকে লুকাইয়া রাখিতে পার নাই। আজ একি কাল যবনিকা সম্মুখে বিস্তার করিয়াছ? হায় হায়, আমার

তাহার অমায়িক, সরল, বিনম্র ব্যবহারের বাটীস্থ সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন; তাহার স্বভাব চরিত্রে সকলেই তাহার বশীভূত ছিলেন, তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া সান্যাল মহাশয় সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার তাহার উপরই অর্পণ করিয়াছিলেন। দেবদ্বিজে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সন্ধ্যাহ্নিক, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি যথারূপে সম্পন্ন করতঃ বাকী সময় সাংসারিক কাজকর্ম্মে কাটাইতেন। গোপাল তাহাকে মা বলিতেন, সুতরাং আমরাও তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিব।

পূর্ব্বোক্ত সান্যাল মহাশয়ের বাটীর অতি সন্নিকটে পার্ব্বতী নাম্নী একটী নিম্ন শ্রেণীর বিধবা বাস করিত; তাহার রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুইটী শিশু পুত্র ছিল; অবস্থা অতি শোচনীয় বিধায় ভিক্ষান্নে অতিকষ্টে নিজের ও সন্তান দুটীর ভরণপোষণ করিত। পার্ব্বতী নীচ কুলোদ্ভবা হইলেও দেখিতে যেরূপ সুন্দরী, স্বভাব চরিত্র তেমনি পবিত্র ছিল। তাহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও যত্ন করিত। ভেক গ্রহণ করতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া সে কায়মনোবাক্যে আপন অভীষ্ট দেবতার চিন্তা করতঃ ছেলে দুটিকে বুকে করিয়া দিন কাটাইত। স্বভাব চরিত্রে, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে পার্ব্বতী "পার্ব্বতী" নাম সার্থক করিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডলে এমনি একটী চিত্তাকর্ষক পবিত্র জ্যোতি ছিল যে তাহাকে দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইত। পার্ব্বতী "কালীর উপাসনা করিত। সে অনেক সময় গ্রামস্থ বারোয়ারী কালী-বাড়ীতে ধ্যান জপে কাটাইত। দেবদ্বিজে তাহারও অতীব নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল। "রতনে রতন চিনে।" তাই অতি সহজে "মার" সঙ্গে পার্ব্বতীর হৃদ্যতা জন্মিল। সে দিনান্তে একবার "মার" কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিত না; আর পার্ব্বতী না আসিলে "মা" তাহাকে লোক পাঠাইয়া আনাইতেন। পার্ব্বতীর সঙ্গে "মা"র এমনি ভাব জন্মিয়াছিল যে, পার্ব্বতীকে কাছে পাইলেই তাহার প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিত—তাহার সঙ্গে ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে আত্মবিস্মৃতা হইয়া যাইতেন; পার্ব্বতী নীচ জাতীয়া, অস্পৃশ্যা, একথা একবারে ভুলিয়া যাইতেন।

কিছুদিন গত হইলে একদিন পার্ব্বতীর প্রতি "কালীর" এই স্বপ্নাদেশ হইল যে, "তুই আমাকে ভজনা করিয়া কি করিবি। যাহাকে ভজনা করিলে তোর ভক্তি মুক্তি দুইই লাভ হইবে, সে ঘাটে কাঠের নীচে পড়িয়া আছে, তাহাকে আনিয়া ছেলের মত যত্ন করিলে তাহাতে তোর সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে।" পরদিন অতি প্রত্যূষে পার্ব্বতী ঘাটে অনুসন্ধান করতঃ একটী পিতলের মূর্ত্তি পাইল। ভগবানের অপার লীলা; তিনি কখন কাহাকে কি ভাবে কৃপা করেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার নিকট উচ্চনীচ নাই,—স্ত্রী পুরুষ,—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বিচার নাই, যে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তিনি তার। তাই আজ ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু, অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, ব্রজেরগোপাল, নন্দদুলাল, কালাচাঁদ, শাস্ত্রজ্ঞান বিরহিতা, অস্পৃশ্যা নীচ জাতীয়া দীনহীনা পার্ব্বতীকে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। যে গোপাল ব্রজে নন্দের বাধা বহন করিয়া-

ছিলেন,—যিনি সর্ব্ব শক্তিমান হইয়াও যশোদার হাতে উদূখলে বাধা পড়িয়াছিলেন; সেই গোপাল আজ পার্ব্বতীর নিকট গোপালবেশে উপস্থিত হইয়া তাহার সকল সাধ পূর্ণ করিলেন। পার্ব্বতী গোপালের স্পর্শে কি যেন কি হইয়া গেল,—তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—তার আর আনন্দ ধরে না, সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোপালকে বুকে করতঃ মার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল এবং গোপালকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা ইহা কি? এবং ইহার পূজার্চ্চনার পদ্ধতিই বা কিরূপ?" মা তাহার কথা শুনিয়া অবাক্; তিনি পূর্ব্ব হইতেই পার্ব্বতীকে ভাল বাসিতেন ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; আজ পার্ব্বতীর সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া আরও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন "এ "যে গোপাল" তোর ছেলে, তোর আবার পূজার্চ্চনার নিয়ম কি? তোর প্রাণে যা আসে সেই ভাবেই পূজার্চ্চনা করিস্।" পার্ব্বতী বলিল—"হাঁ মা, আমি তবে গোপালের মা—গোপাল আমার ছেলে"—এই বলিয়া পার্ব্বতী আবেগভরে গোপালকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—ভাবে তন্ময় হইয়া গেল। মা পার্ব্বতীর ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন—পার্ব্বতীর প্রতি ভগবানের অপার করুণা উপলব্ধি করতঃ মনে মনে তাহাকে ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিলেন। মাও এখন পার্ব্বতীগতপ্রাণা হইলেন; পার্ব্বতীর সঙ্গ আরও সহজলভ্য হইবে আশায় তাহাদের বাড়ীর আরও কাছে একখানা ঘর উঠাইয়া দিলেন,—এবং গোপালের পূজার্চ্চনার ভোগাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না; পার্ব্বতী এখন মায়ের নিত্য সহচরী হইলেন।

পার্ব্বতী এখন আর সে পার্ব্বতী নাই, মানবী দেবী হইয়াছে,—চণ্ডালিনী, ব্রাহ্মণী ত দূরের কথা, আজ বুঝি ইন্দ্রের ইন্দ্রানী—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণীও পার্ব্বতীর সৌভাগ্যের দাবী করেন। পার্ব্বতী আজ নন্দরাণী যশোদা—পার্ব্বতীর ভাগ্যের আজ পরিসীমা নাই, কেননা যিনি যোগীজনদুর্লভ,-চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখেও যাহার গুণ বর্ণনা করিতে সক্ষম নন, দেবাদিদেব মহাদেব যাহার নামগানে মত্ত হইয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতঃ শ্মশান আপনার আবাস ভূমি করিয়াছেন,—সেই মুনিজনগণদুর্ল্লভ, দেবাদিদেব আরাধ্য, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তবৎসল ভগবান আজ গোপাল বেশে পার্ব্বতীর অঙ্কশোভা করিতেছেন। পার্ব্বতী এখন গোপাল গতপ্রাণ।—পার্ব্বতীর অন্তরে সদাই গোপালের চিন্তা,—কিসে গোপালকে সুখে রাখিবে,—গোপালকে কি খাওয়াইবে—কি করিলে গোপাল সুখী হইবে—এই চিন্তায় পার্ব্বতী আত্মবিস্মৃতা; তার মুখে সদাই গোপালের কথা,—হৃদয়ে গোপালের চিন্তা, দেহ গোপালের সেবায় ব্যস্ত। কিন্তু ইহাতেও গোপালের মন উঠিতেছে না। কেননা, গোপাল যে বড় অভিমানী ছেলে, ভালবাসার ষোলআনা না পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হন না; যে যে ভাবে তাঁহাকে হৃদয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, সে স্থানে তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারিবে না; তিনিই সেই হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর; সে স্থানে ভক্ত ভগবান ভিন্ন অন্তের স্থান নাই বা হইতে পারে না। অবিশ্রান্ত তৈলধারার

ন্যায় ভক্তের চিত্তের গতি ভগবমুখী হইবে; ইহাই গোপালের অলঙ্ঘনীয় চিরন্তন প্রথা। এখনও গোপালের প্রতি পার্ব্বতীর চিত্তের গতি একমুখী হয় নাই, পার্ব্বতী যে এখনও মায়া-মোহজড়িতা, রাম লক্ষ্মণ নামে তাহার দুই পুত্র এখনও জীবিত; পার্ব্বতীর হৃদয় কন্দর হইতে নিঃসৃত ভালবাসার স্রোত মৃদুমন্দভাবে পার্ব্বতীর অজ্ঞাতে তাহাদিগের পানে প্রবাহিত হইতেছিল। গোপাল যাহার ছেলে—গোপাল যাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—সে কি কখন মায়ামোহে জড়িতা হইতে পারে? সে যে মায়াতীতা, স্নেহময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী জননী! ভগবানের ইহা কখনই ইচ্ছা নয় যে ভক্ত নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যে জড়াইয়া থাকুক,—ভক্ত অধঃপাতে যাউক। গোপাল দেখিলেন রাম লক্ষ্মণের জন্য পার্ব্বতীর চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না, পার্ব্বতী অজ্ঞাতসারে মায়ায় জড়াইয়া পড়িতেছে। তাই গোপাল পার্ব্বতীর প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া পার্ব্বতীর সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন! তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ হইল না; সুতরাং ইচ্ছা পূর্ণ হইল! তিনি রামলক্ষ্মণকে বুকে টানিয়া লইলেন—রাম লক্ষ্মণের উদ্ধার হইল, পার্ব্বতীরও বন্ধন ঘুচিল। পার্ব্বতীর চিত্তের বর্হিন্মুখী গতির পথ রুদ্ধ হইল। কিন্তু হইলে কি হইবে? জন্মজন্মান্তরীন সংস্কার ত সহজে মুছিবার নয়! তাই পার্ব্বতী পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া কান্দিতে লাগিল। যে ভগবান, ভক্ত, জ্ঞানী অর্জ্জুনের সখা ছিলেন, যিনি ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন; সেই অর্জ্জুনও তাঁহাকে চিনিতে না পারায় ভগবান বলিয়াছিলেন,:— (ক্রমশঃ।)

জনৈক দর্শক।

—0—

হিন্দু-ধর্ম্ম।

"এক বই আর কিছু নাই; সুধিগণ উঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন!"

ঋগ্বেদ, ১।১৬৪, ৪৬।

হিন্দু-ধর্ম্ম ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উর্ব্বর প্রদেশে আর্য্যদিগের প্রথম অভ্যুদয়ের সমসাময়িক। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মত এই যে ভারতীয় আর্য্যগণ, পারসীকগণ, গ্রীকগণ, রোমকগণ, জর্ম্মানগণ এংলোস্যাক্সনগণ এবং অধুনা যাঁহারা আর্য্যবংশধর বলিয়া পরিচিত, ইহারা সকলেই আর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত। প্রাগৈতিহাসিককালে, ইহাদিগের সকলের পূর্ব্বপুরুষই এক ছিলেন। এক্ষণে যে গোঁড়া গঙ্গাতীরবাসী হিন্দু, একজন ইউরোপবাসীকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন, তিনি জানেন না যে ঐ ম্লেচ্ছ তাঁহারই ভ্রাতা বা ভগিনী; তবে সহোদর বা সহোদরা অপেক্ষা সম্পর্কটা একটু দূর হইয়াছে মাত্র। উভয়েই এক; কেবল আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিগত একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে মাত্র।

একজন খাঁটী জর্ম্মান, ফরাসী, এংলোস্তাক্সন্ বা আমেরিকাবাসীর এবং একজন হিন্দুর ভিতরে একই আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে; অথচ কৃষ্ণকায় বলিয়া বা ধর্ম্মবিশ্বাসের পার্থক্যবশতঃ হিন্দুগণ পৌত্তলিক বলিয়া অভিহিত ও ঘৃণিত হইতেছেন। জর্ম্মান প্রভৃতি শ্বেতকায়গণ জ্ঞাত নহেন যে এই তথা-কথিত পৌত্তলিক তাঁহাদিগেরই স্বজাতি এবং ইহারা সেই প্রাচীন আর্য্যপূর্ব্বপুরুষগণের অনুপম ধর্ম্ম আজিও রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। চিন্তা করিবার প্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, চিন্তা বিষয়ে স্বাধীনতা ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা বিষয়ে একজন আধুনিক শিক্ষিত জর্ম্মান বা উন্নতচেতা আমেরিকাবাসীর সহিত এক্ষণকার একজন শিক্ষিত হিন্দুর খুব বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। একজন ইহুদী বা অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য ততটা নহে। একজন হিন্দু ও একজন আমেরিকাবাসী বাহ্যতঃ যতই পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হউন না কেন, উঁহারা যে একই আর্য্যবংশোদ্ভব ইহা সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আর্য্যবংশের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে "হিন্দু" শব্দটী "আর্য্য" শব্দের মত প্রাচীন নহে। এ শব্দটীর সৃষ্টি কিছু দিন পরে হইয়াছিল। ভারতের পারসীক বিজেতৃগণ এই শব্দটী প্রথমে ব্যবহার করেন। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ নিজেরা ঐ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ভারতীয় জাতির প্রকৃত নাম আর্য্য। তথা-কথিত হিন্দুগণ আজও আপনাদিগকে 'আর্য্য' বলিয়া থাকেন। উহাঁদিগের ধর্ম্মের নাম—না হিন্দুধর্ম্ম না ব্রাহ্মণধর্ম্ম। উহাঁদিগের নিকট এ দুটী নামের কোন অর্থানুভূতি নাই। এ দুটী নাম ভারতবাসীর প্রদত্ত নহে, উহা বিদেশীয়গণের প্রদত্ত। উহাঁদিগের ধর্ম্মের নাম—আর্য্যধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। আর্য্যধর্ম্ম কিনা পুরাকালীন আর্য্যগণের আচরিত ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্ম কিনা চিরস্থায়ী ধর্ম্ম। পারসীক বিজেতৃগণ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সিন্ধুনদ তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়িল। 'সিন্ধু' নামটী সংস্কৃত; কিন্তু পারসীকগণ 'সিন্ধু' নামের পরিবর্ত্তে 'হিন্দু' নাম গড়িয়া বসিলেন। তাঁহারা ঐ নদীটিকেই হিন্দু বলিতে লাগিলেন। যে সকল ব্যক্তি ঐ নদের পূর্ব্বপারে বসতি করিতেন, তাঁহাদিগকেও পারসীকগণ হিন্দু বলিতে আরম্ভ করিলেন। আর যবন ও খৃষ্টান বিজেতৃগণ ইহাঁদের ধর্ম্মকে 'হিন্দুধর্ম্ম' আখ্যা দিলেন। 'ব্রাহ্মণধর্ম্ম' কথাটি আরও আধুনিক। খৃষ্টান পাদরিগণ এই নামের আবিষ্কর্ত্তা। পাশ্চাত্যগণের সাধারণ ধারণা এই যে প্রাচীন আর্য্য কিনা ভারতীয় আর্য্যগণ সুসভ্য ছিলেন না এবং তাঁহাদিগের কোন একটা ধর্ম্ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ঋগ্‌বেদ পড়িয়াছেন তাঁহারাই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন যে বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্যগণ খৃষ্টজন্মের দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এববং যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ভৌতিক নিয়মে ব্যবহারিক জগৎ শাসিত হইতেছে তাঁহারা সে নিয়মাবলীও সুচারুরূপে অবগত ছিলেন। ঋগ্‌বেদে এই সব তথ্য পাওয়া যায়; ঋগ্‌বেদ আজকালকার জিনিস নহে। মহামহোপাধ্যায়গণ স্থির করিয়াছেন যে উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ সত্যের দ্রষ্টা ছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের নাম ঋষি। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা তাঁহারা সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল বর্ণনা সকল যুগেই পাঠকের প্রাণে একটা উৎসাহ, একটা জীবন্তভাব প্রদান করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান যে কত গভীর, পরলোক বিষয়িণী অনুভূতি যে কত তীক্ষ্ণ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা যে কত উচ্চ এবং মানবের অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস যে কত দৃঢ় ও উচ্চ, তাহা তাঁহাদের উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়।

উপরোক্ত নিয়মগুলি মাত্র অনুভূতি-গ্রাহ্য হইলেও তাঁহারা তাহাদের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বর্ণনা জগতে লিপিবিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বেই বংশপরম্পরা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। উহা শুনিয়া মনে করিয়া রাখিতে হইত। সেইজন্য সংস্কৃতে উহাকে শ্রুতি বলা হয়। শ্রুতি অর্থ যাহা শুনা যায়। পরে, সেইগুলি একত্রিত হইল, তখন তাহাদের নাম হইল বেদ। 'বেদ' অর্থ জ্ঞান। বেদ বলিতে কোন লিখিত পুস্তক বুঝিতে হইবে না; ইহাতে পুরাকালীন ঋষিদিগের সংগৃহীত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। বেদ কি না সংগৃহীত জ্ঞানই তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া উহাকে "বৈদিক ধর্ম্ম বলা হয়। "বেদান্ত ধর্ম্ম" আখ্যাটী আর ও যুক্তিসঙ্গত।

এই বৈদিক ঋষিগণ সকলেই বড় বড় দার্শনিক। সেইপ্রাচীনকালে যখন পাশ্চাত্য দেশের আর্য্যগণ গিরি গহ্বরে বাস ও উলঙ্গ অবস্থায় স্ব স্ব দেহ চিত্রিত করিতেন, তখনই ইহাঁরা (ভারতীয় আর্য্যগণ) জাগতিক বিবর্ত্তন-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া উত্তমরূপে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে নৈতিক ও পারলৌকিক নিয়মে আত্মার উচ্চাবস্থা নিয়মিত, ইহাঁরা তাহাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

'সত্যের দ্রষ্টা' বলিতে হিন্দুরা অসার কল্পনাকারী ব্যক্তিকে বুঝেন না। যে সকল মহা মহা দার্শনিক ও সাধু মহাত্মা প্রজ্ঞান-(Superconscious perception) বলে উচ্চতর সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। ওল্ড্-টেষ্টামেণ্টের ভবিষ্যদ্বক্তাগণের মধ্যে প্রায় কেহই দার্শনিক ছিলেন না। কোন উচ্চ অঙ্গের সত্যও তাঁহারা আবিষ্কার করেন নাই। যে সময়ে সাধারণের অবনতি ঘটে সেই সময়ে তাঁহারা ।ব্যক্তিবর্গের ভূল প্রদর্শন করিয়া, জেহোবা শাস্তি দিবেন বলিয়া, তাহাদিগকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়া, তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দিয়াছেন। যাহা ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতেন এবং যদি উহা ঘটিত তবে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া খ্যাত হইতেন। বেদান্ত কি না ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম পুরাকালীন ঋষিবৃন্দের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহা সম্পূর্ণ ভাবে অপৌরুষেয়; হিন্দুদিগের ধর্ম্মের কেহ প্রবর্ত্তক ছিলেন না। এই ধর্ম্ম যে কোন সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু জোরো-

য়াস্ত্রিয়ান্ ধর্ম্ম, জুদাধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি অন্ত সকল ধর্ম্মেরই একজন করিয়া প্রবর্ত্তক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম কোন পুস্তক বা কোন ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। আমরা প্রাচীনতম কোন ঋষির কথা আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে তিনি তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাত্মার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন্ যে এই সত্য পূর্ব্বেও ছিল এবং সেই মহাত্মা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্তই প্রতীত হয় যে ভারতীয় আর্য্যগণ কোন একটা বিশেষ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়েন নাই। ঋষিগণ যাহা কিছু সনাতন নিয়মের অনুকূল বলিয়া বুঝিতেন তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইত।

প্রথম হইতেই এই ধর্ম্ম সমীরণের স্তায় স্বাধীন। সমীর যেমন কুসুমনিকর চুম্বন করিয়া সৌরভটুকু লইয়া যায়, তদ্রূপ, যাহা কিছু সত্য ও মানবের হিতকর, এই ধর্ম্ম সে সমুদয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। মস্তকোপরিস্থ গগনমণ্ডলের স্তায় উহা সমুদয় দেশের ও সমুদয় জাতির আধ্যাত্মিক জগৎ ব্যাপিয়া আছে। প্রাচীনতা, ভাবৈশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য, দার্শনিকতত্ত্ব এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বর-বিষয়িণী অনুভূতিতে বেদান্তধর্ম্ম জোরোয়াস্ত্রিয়ান ধর্ম্ম, জুদা ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। হিন্দুগণের ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাময় নিগু'ণ হইয়াও সগুণ (Impersonally personal) তিনি জেনেসিস নামক সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণিত জগৎ-স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তার স্তায় নহেন। তিনি নিসর্গে অনুপ্রবিষ্ট এবং নিসর্গবিহারী। তিনি ইহুদিদিগের দেবতা ইলোহিম জেহোভা অপেক্ষা অধিকতর দয়ালু, অধিকতর, স্তায়বান, অধিকতর অপক্ষপাতী, অধিকতর স্নেহপরায়ণ। জোরোয়াস্ত্রিয়ান্ ধর্ম্মের অহুরমস্‌দ অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের ঈশ্বর অধিকতর হিতৈষী। তাঁহার ক্ষমতা এবং গাম্ভীর্য্যও অধিক।

খৃষ্টাব্দের ১৫০০ পূর্ব্বে ইহুদীরা জেহোভার ষাঁড় বা গোবৎস মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা বলি দিয়া—শুধু তাহাই নহে, নরবলি পর্য্যন্ত দিয়া জেহোভার সন্তোষ সাধন করিতেন। তাঁহারা এখন ক্রমে ২ সূর্য্যোপাসনা, কিবান বা শনৈশ্চর-পূজা, বৃক্ষ এবং সর্পপূজা পরিত্যাগ করতঃ একেশ্বর বিষয়িণী অনুভূতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন ইহুদিদিগের অবস্থা এইরূপ, তখন সেই অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাণে ২ সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, একই সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গম সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা। যখন পারস্যদেশে জোরোআস্তার সৎ-অসতের পৃথক ২ সৃষ্টিকর্ত্তা, এই দ্বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন, তখন ভারতীয় আর্য্যঋষিরা জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতেছিলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা দুইজন নহেন, তিনি একই জন, তিনি সৎ অসৎ উভয়েরই অতীত। "এক বই দুই নাই; সুধিগণ তাঁহাকে ভিন্ন ২ নামে অভিহিত করেন।"—(ঋক্‌বেদ ১।১৬৪,৪৬।)

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মোজেজ যখন যাযাবর জাতীয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত দুরন্ত ইহুদীদিগকে জেহোভার নামে দশটী প্রত্যাদেশ

শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শান্ত শিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সেই প্রাচীন কালের পূর্ব্বেও বৈদিক ঋষিদিগের নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং শিষ্য-শাখা বেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা সুচারুরূপে পালন করিতেছিলেন। সেই সময়েই ভারতীয় খৃষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবিনশ্বর ভগবদ্গীতার ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্যর এড্উইন্ আর্ণল্ড্ গীতার আখ্যা দিয়াছেন—"স্বর্গীয় সঙ্গীত"।

যে সময়ে ইহুদী জাতির মনস্বিগণ মানব-জাতির ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং যখন তাঁহারা চাল্ডিয়ান ফিনিসীয়, ব্যাবিলো-নীয়, ও পারসীক জাতির সৃষ্টি বিষয়ক পৌরা-ণিক গল্পাংশ সংগ্রহ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতীয় আর্য্যদার্শনিকগণ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, এক সনাতনী শক্তির বিবর্ত্তন প্রণালীতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে; সংস্কৃতে এই শক্তিকেই "প্রকৃতি" বলে। তাঁহারাই প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে—ইতর প্রাণী হইতে বিবর্ত্তন প্রণালীতে মানুষ হইয়াছে। অধ্যাপক হক্স্লীও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন:—"ভারতীয় ঋষিদিগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। টারসসের পল জন্মগ্রহণ করিবার বহু যুগ পূর্ব্বেও তাঁহারা বিবর্ত্তন-বাদ অতি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন।"

জোহোভার উপাসকগণ যখন মৃত্যুর পর-পারের কল্পনাও করিতে পারেন নাই, দেহা-তিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্ব সম্বন্ধীয় ধারণাও যখন তাঁহাদের ছিল না, তখন সেই প্রাচীনকালেও আর্য্যদার্শনিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা মানবাত্মার প্রকৃতি বিষয়ে দার্শনিক ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে তাঁহারা সেই সময়েই প্রচার করিয়াছিলেন যে, আত্মা অনাদি, অনন্ত এবং অবিনশ্বর। বেদ বলিতেছেন:—উহা (মানবাত্মা) অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে সিক্ত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, অস্ত্রে খণ্ডিত হয় না।" (ক্রমশঃ।)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

—0—

সংবাদ ও মন্তব্য।

শোকসংবাদ—আমাদের মাতৃস্বরূপিনী, ভারতের রাজপ্রতিনিধি, মহামান্য লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের সহধর্ম্মিনী আর ইহলোকে নাই; তিনি পতি-পুত্র আত্মীয় পরিজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার আত্মার পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় অত্র আশ্রমে পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবান তাহার আত্মার পার-লৌকিক মঙ্গলবিধান এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনকে শান্তি প্রদান করুন,—ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দু-ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ইজরেল বংশ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৩৬ পর্য্যন্ত ব্যাবিলোনিয়া রাজ্যের অধীন ছিলেন। সেই সময় তাহারা পারসীকদিগের নিকট হইতে স্বর্গ ও নরকের ধারণা করিতে শিক্ষা করেন। তাঁহাদের জেহোভা প্রথমে সাম্প্রদায়িক দেবতা ছিল। পরে তাহাকে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর পদে বরিত করেন ও পারসীকদিগের অহুর মস্‌দের গুণাবলী তাহাতে আরোপিত করেন। যখন ইজরেল্ বংশের এই দশা এবং যখন তাঁহারা পারসিকদিগের নিকট হইতে পরী, দেবদূত প্রভৃতি বহুবিধ স্বর্গীয় প্রাণীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যখন তাহারা পারসিকদিগের ন্যায় বিশ্বাস করিতেছিলেন যে মৃত্যুর পর কবর হইতে দেহ উঠিয়া থাকে, তখন সেই প্রাচীনকালেও আর্য্যধর্ম্মের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের শুভাগমনই সে গৌরবের পরিচায়ক। তাঁহার ন্যায় বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন যে স্বর্গ ও নরক আমাদিগের মনোমধ্যেই আছে, জগৎ-স্বতন্ত্র মানবাকারবিশিষ্ট ঈশ্বরের অর্চ্চনা সমীচীন নহে, এবং পরী-দেবদূত দূর প্রভৃতি অস্তিত্বে বিশ্বাস কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছু নহে।

ইহুদীদিগের মধ্যে ফারিসীগণ যখন বিশ্বাস করিতেছিলেন যে স্বর্গ, বলিয়া স্থান আছে এবং সেখানে যাইয়া চির সুখ উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ, বুদ্ধ তখন ভারতে জন্মান্তর ও কর্ম্মফল প্রচার করতঃ স্বর্গ-সুখবাসনার বিরুদ্ধে অতি সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিতেছিলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে ঐ সুখ অস্থায়ী; সুখভোগ

মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য নহে, মুক্তিই লক্ষ্য। তিনি বলিয়াছিলেন,—আত্মবঞ্চনার শৃঙ্খল আত্মা হইতে খুলিয়া গেলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বেদান্তধর্ম্ম বলেন, কোন একটা সুখভোগের স্থানে গমন করা বা কোন মানবাকার ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট হাজির হওয়া জীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। ইহাঁর মতে ইহজীবনেই দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে আমাদিগের যথার্থ আধ্যাত্মিক-প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা এবং অজ্ঞান, স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দোষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই জীবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পঁহুছিতে না পারিলে আমাদিগের পার্থিবজীবন পশুর জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় না। সে ক্ষেত্রে, আমাদিগের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব আছে। ইহা ন্যায়, বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়িয়া এক পদও চলে না, এই টুকুই সেই বিশেষত্ব। ইহা যেন একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ; চতুর্দ্দিকেই যেন ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া একটী বিশাল ভূখণ্ড আবৃত করিয়াছে; ইহার তলায় যাবতীয় ধর্ম্মচিন্তা এবং যাবতীয় দর্শন মতেরই স্থান হইতে পারে। কাণ্ট্ বা হিগেলের সর্ব্বোচ্চ চিন্তা-ধারা হইতে, বার্ক্‌লি ও স্পিনোজার মায়াবাদ হইতে, প্লেটো-ব্যাখ্যাত মতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে, আধুনিক প্রত্যক্ষ-বাদীর চরম সিদ্ধান্ত হইতে, যাজ্ঞিক বাহ্য অনুষ্ঠান ঘটিত পূজা, মূর্ত্তি পূজা, বীর পূজা প্রভৃতি মনুষ্যকল্পিত যে কোন সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীর পূজা পর্য্যন্ত এই বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় পাইতে পারে। এ সমুদয়ই সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের গ্রাহ্য; কেন না, মাত্র হিন্দুরাই বুঝিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে বিবর্ত্তনের ক্রম অনুসারে ধর্ম্মজ্ঞানের ও উচ্চাবস্থা ও নীচাবস্থা আছে। কজিন বলিয়াছেনঃ—"ভারতের দর্শন জগতের দর্শনের সংক্ষেপ মাত্র।"

এই কারণে অতি অল্প লোকই এই বিপুল দার্শনিকজাতির ধর্ম্মটী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এই ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহা এই জন্যই বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—যখন হিন্দুধর্ম্মের এত বেশী মতানৈক্য, তখন সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু প্রাচীন বৈদান্তিকগণ ইহার উত্তর করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মমত পৃথক্ হইলেও তাহার মধ্যে ঐক্য আছে। এবং বাহ্যতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও ঐ সকল ধর্ম্মমতের একটা সামঞ্জস্য উহাতে আছে। বাহিরের লোক ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের বিচার করিতে পারেন না। একজন বিদেশী ভারতে যাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ কতকগুলি বিখ্যাত মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দেখেন বা মন্দিরাভ্যন্তরে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহারা ঐ গুলির মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া দাঁ করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, হিন্দুদিগের কোন ধর্ম্ম নাই, তাহারা পৌত্তলিক, তাহারা যা—তা পূজা করিয়া থাকে। যে সকল বিদেশী, হিন্দুজীবন ও হিন্দু-আদর্শের অনুভূতি সম্বন্ধে ঐরূপ ঘোর ভ্রমে পতিত হন, তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে ইহুদীদিগের জাতীয় দেবতাই প্রকৃত ঈশ্বর। উহাদের ধারণা যে যত গোঁড়া ও ধর্ম্মোন্মাদ গ্রস্ত আধ্যাত্মিক অনুশীলন তাহার তত বেশী। অধিকাংশ বিদেশীরই এইরূপ ধারণা; যাঁহার চরিত্রে আদৌ সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার নাই কেবল তিনিই এইরূপ বিসদৃশ ধারণা করিয়া বসেন না। এই কথাটী খৃষ্টান পাদরীদিগের পক্ষে বিশেষভাবে খাটে। তাঁহাদের প্রকৃতি অত্যন্ত গোঁড়া; সেই কারণেই, তাঁহারা

পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা করিতে পারেন না। তাঁহারা সংকীর্ণতার গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া দৃষ্টিপাত করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত ও অভ্রান্ত রূপে দেখিতে পান না।

পাদরী মহাশয়রা ভারতে যাইয়া প্রথমে বল প্রয়োগ দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে স্ব-ধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। যাঁহারা ভারত-ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে পর্ত্তুগীজ পাদ্রীগণ বন্দুক ও তরবারি হস্তে করিয়া বাইবেল প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল ধর্ম্মোন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কৃপার পাত্র মনে করি, কেননা, ইহাঁরা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই ধর্ম্মের নামে অশান্তি এবং বিবাদের বীজ বপন করিয়াছেন। এবং এমন উন্নত সময়েও ইহাঁদের ধারণা এই যে যাহারা ইজ্রেলের সাম্প্রদায়িক দেবতা জেহোভার অর্চ্চনা না করে ও যীশুখৃষ্টকে মানব জাতির একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মোন্মাদ-জনক স্কুল-কালেজের জন্য বৃথা অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের জন্য দুঃখিত। এমন কি প্রমাণ আছে যে ইলোহিম জেহোভার অর্চ্চনাই প্রকৃত ঈশ্বরার্চ্চন এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে অন্য নামে পূজা করিলেই বা ভ্রমের কার্য্য হইবে কেন? হিন্দু-ধর্ম্ম অর্থে বৃথা দেব-দেবীর পূজা নহে। ইহা পৌত্তলিকতা নহে। হিন্দুগণ কখনই পুত্তলিকা পূজা করেন না। হিন্দুদিগের মুখে তোমরা কখন তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিয়াছ কি? তোমরা পাদরী মহাশয়গণের মুখেই হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়াছ, কিন্তু হিন্দুগণ কিরূপ দেবের অর্চ্চনা করেন তাহা তোমরা হিন্দুর আপন মুখে না শুনিয়াছ কেন? হিন্দুর মুখে হিন্দুর কথা না শুনিয়া তোমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে একতর্ফা আলোচনা কর কেন?

সত্যই হিন্দুর আদর্শ, সত্যের পূজাই তাঁহার ধর্ম্ম এবং সত্য-প্রাপ্তিই তাঁহার লক্ষ্য। সেই জিনিসটী সত্য, যাহার কোন উপাধি বা আকার নাই। হিন্দুগণ পৌত্তলিক কিনা সে বিষয়টী আমি এখানে পরিষ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। হিন্দুদিগের মধ্যে পুত্তলিকার পূজা বলিয়া কোনকিছু নাই! তোমরা ভারতে গেলে দেখিতে পাইবে যে মন্দিরের মধ্যে একজন পুরোহিত বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে কৃষ্ণ বা বুদ্ধ বা রাম বা কোন বিখ্যাত অবতার বা কোন আচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে! যাহাকে পুত্তলিকা বলা হয় তাহা এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি বা মাত্র কোন চিহ্ন। হিন্দুগণ উহাদিগকে এইরূপই বুঝিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি বা চিহ্ন দ্বারা কি বুঝিতে হয়, জান? ঐ গুলি ঐশীশক্তির, ভগবদ্-গুণাবলীর, বা এমন কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের মূর্ত্তি যাহা ঐরূপ একটা প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত ধারণায় আইসে না। পুরোহিত যে সকল প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকে এক সময়ে জীবিত ছিলেন। মৃত মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলে, সেই মহাত্মাকেই সম্মান দেখান হইয়া থাকে। কেহ এই পুরোহিতের নিকট যাইয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলে ইনি বলিবেন যে :—"ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান, অনন্ত। তাঁহার প্রভাব বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। তিনি নিরাকার ও নিরুপাধিক, তিনি পরাৎপর। তিনি তজ্জ-লান। ইহা কি পৌত্তালিকতা? ইহা কিরূপ পৌত্তলিকতা? একজন যে-সে ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, ইহা প্রকৃত ঈশ্বরের পূজা নহে, ইহাও পুত্তলিকার পূজা বিশেষ; কিন্তু যিনি ব্যাপারটী অভিনিবেশ সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং হিন্দুদিগের আপন মুখে সমুদয় জ্ঞাত হন, তিনি সহজেই উপ-রোক্ত ধারণার অসারতা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা অপরাধে যদি হিন্দুগণকে পৌত্ত-লিক বলা হইয়া থাকে, তবে খৃষ্টানগণ খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতির সম্মুখে জানু পাতিয়া খৃষ্টকে সম্মান করেন বলিয়া তাঁহা-দিগকেই বা পৌত্তলিক বলা না হইবে কেন? ক্রুশ, ত্রিভুজ, বৃত্ত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মচিহ্নের প্রতি দৃষ্টি স্থির করতঃ মনের একগ্রতা সাধনের অপরাধে যদি হিন্দুকে পৌত্তলিক বলা হয় তবে খৃষ্টানকেই বা উহা না বলা হইবে কেন; যে হেতু তিনি খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া থাকেন কিম্বা বেদির উপর উহা রক্ষা করেন। খৃষ্টান দিগের নিকট হইতে হিন্দুরা কি ক্রুশ বা ত্রিভুজ প্রাপ্ত হইয়াছেন? ইতিহাস বলেন খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতে ক্রুশ নামক ধর্ম্ম চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হিন্দু কখন অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করেন না, কিম্বা কেহ ঈশ্বরকে বালকোচিত ভাবে অথবা সাকার ভাবিয়া পূজার্চ্চনা করিলেও হিন্দু সেরূপ পূজার দোষ অনু-সন্ধান করেন না।

হিন্দুরা বলেন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-মত বা আচার-পদ্ধতির উপর বিশ্বাস রাখিলেই যে ধর্ম্ম হইল তাহা নহে; আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ-প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। দিব্যজ্ঞান লাভ করা অর্থই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর হইয়া উঠা। আত্মবর্দ্ধন জন্য মানুষের যে স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা ও বাসনা থাকে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে হইলে তাহা দমন করিতে হইবে এবং ঐশ-প্রেম, সত্যবাদিতা ও সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শণ করিতে হইবে। জীবাত্মাকে পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত করাই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষ্য।

কেহ কেহ বলেন যে হিন্দুরা অসাধু এবং তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পাপাসক্ত জাতি। আমি আজ যে গৃহে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছি গত বৎসর ঠিক এই গৃহেই আমার স্বদেশী কয়েক জন স্ত্রী ও পুরুষ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরা পাপাসক্ত, তাঁহা-দের ধর্ম্ম বা নীতি বলিয়া কিছু নাই। উক্ত নর-নারী আমার স্বদেশী হইলেও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা এইরূপ বলায় আমি লজ্জিত হইয়াছি। মত-প্রচারিণী উৎকণ্ঠায় যেন জ্ঞান শূন্য হইয়াই তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু, বন্ধুগণ! হিন্দুধর্ম্ম আর কিছু না করিলেও অনেকটা করিয়াছে। যে সকল ভয়ানক পাপ আজও খৃষ্টান জাতির মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা ভারতে দেখা যায় না। আমেরিকার দৈনিক সংবাদপত্র গুলি যে সকল পাপ ও অপরাধে পূর্ণ তাহা ভারতে নিতান্ত বিসদৃশ। যখন তখন শুনা যায় যে, মাত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রভাবেই

নর-নারীর প্রকৃতি নীতি মার্গানুসারিণী হইতে পারে। এরূপ শুনিয়া একজন হিন্দু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন পাশ্চাত্য দেশের লোক খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণ-কার অপেক্ষা আরও বেশী নীতিপরায়ণ না হইয়াছেন কেন? ভাবিয়া দেখুন দেখি এই যুক্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র কি ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ড তথাকথিত খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া প্রত্যহ সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত হইতেছে! এখানকার (আমেরিকার) জেলখানা ও বাতুলাশ্রমগুলি কয়েদী ও উন্মাদে পরিপূর্ণ। ইহা হইতেই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে খৃষ্টধর্ম্ম কোন কাজেরই নহে? মাত্র খৃষ্টধর্ম্মেই লোক নীতিপরায়ণ হয় একথা কি আর বলা চলে? বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান এবং অধিকাংশ চীনবাসী একেবারেই সুরা ব্যবহার করেন না। এই কারণেই অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত উত্তেজিত হয় না বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে পাশবিকতা, নৃশংস আচার, জীবের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতির পরিমাণ অতীব অল্প। এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিষ্ঠুরতা ও ন্যূনতা (Failure) পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সমস্ত দিকটা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচ্য-জাতিরা পাপী হইবে আর খৃষ্টানগণ পুণ্যাত্মা হইবেন একথার কোনই অর্থ নাই। মানব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হইলেও সমগ্র পৃথিবীতে উহা একই প্রকারের।

যে জাতির বয়ঃক্রম আজও ২০০ বৎসর হয় নাই তাহার মধ্যে অপরাধী ও উন্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমপ্রযুক্ত রাজ্যে বৎসরে দশ হাজার নরহত্যা হইয়া থাকে, পতিত স্থানে, ভস্মাধারে, নদী-মধ্যে, পথিপার্শ্বে শত শত জারজ মৃতদেহ দৃষ্ট হয়। এই অপরাধ ও পাপের দমন-কল্পে খৃষ্ট ধর্ম্ম কি করিতে পারিয়াছেন? যাহারা নিজের গুরুতর দোষও দেখিতে পায়না অথচ পরের দোষ অতি ক্ষুদ্র হই-লেও দেখিতে পায়, তাহা-দিগকে খৃষ্ট যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা অধুনা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। গৃহেই প্রথমে সংস্কার আরম্ভ করা উচিত। প্রাচ্য ভূমির ভ্রম-প্রমাদের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগের দোষ পরিহার চেষ্টা করা খৃষ্টান জাতিদিগের কর্ত্তব্য।

ডঃ জে, এইচ, ব্যরোস্ চিকাগো নগরের ধর্ম্ম-সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ভারতে মাত্র তিন মাস অবস্থান করিয়া নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, করিয়া, কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন আমি তাহাকে একটী বক্তৃতায় বলিতে শুনিয়াছি :—"হিন্দুদিগের কোনও নীতি নাই, কোনও বিজ্ঞান নাই; কোন দর্শন নাই, কোন ধর্ম্ম নাই, এখন তাহাদের যা-কিছু দেখা যায় সে সমুদয় তাহারা খৃষ্টান পাদরীদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে।" একথা সম্পূর্ণ ভুল। যিনি পক্ষপাত শূন্য হইয়া হিন্দুদিগের চিন্তা-প্রসূত পুস্তকাবলী আলোচনা করিয়াছেন তিনি প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে হিন্দুগণের দর্শন ও ধর্ম্ম অত্যুচ্চ নীতি-বিজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলার বলেন—"আমরা আদিতে নীতিবিজ্ঞান, মধ্যস্থলে নীতিবিজ্ঞান ও শেষেও নীতিবিজ্ঞান দেখিতে পাই।" সম্পূর্ণ ভাবে নীতিপরায়ণ হইতে না পারিলে কোন মানুষই প্রকৃতরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে না। নৈতিক সম্পূর্ণ

তাই আধ্যাত্মিক জীবন বা আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশের প্রথম সোপান। অজ্ঞান ও স্বার্থপরতাই পাপ এবং কদাচারের প্রসূতি। এই প্রবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করিতে পারিলেই ও ঐশভাবের অভিব্যক্তি হইতে থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। যিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক, তিনি আত্মজয়ী। পাশবিক প্রকৃতির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়, বাসনা এবং পাশবিক প্রকৃতির দাস সে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে যতই উচ্চ শ্রেণীর নীতিমান হউক না তাহাকে আধ্যাত্মিক বলা দূরে থাক্ প্রকৃত নৈতিক বলাও যায় না।

হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাঁ পাপের প্রশ্রয় দান করেন না। সুরাপান ত্যাগ করিতে ইহাঁ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন; কেননা সুরাপায়ী আত্ম-সংযম লাভে সমর্থ হয় না। মিতাচার-সমিতি বাল্যবিবাহ-নিবারণী-বালক-নিগ্রহ-নিবারনী-সমিতি কিম্বা পশু-ক্লেশ-নিবারণী সভার সাহায্য গ্রহণ করা হিন্দুধর্ম্মের আবশ্যক হয় না। হিন্দুরা এই সভা-সমিতির কথাও জানেন না। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রভাবেই তাঁহারা প্রাণীবৃন্দের প্রতি দয়ালু হইয়া থাকেন হিন্দুধর্ম্মের এমনি মহিমা যে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক স্ত্রীলোককে পৃথিবীতে ঐশী জননীর প্রতিনিধি স্বরূপা মনে করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। দু'চারিটী কুপ্রথা হিন্দুসমাজে কাল সহকারে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ গুলিকে নির্ম্মূল করিবার আগ্রহাতিশয্যে কোন কোন খৃষ্টান স্বধর্ম্মত্যাগী অন্যায় পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মই ঐ কুপ্রথার মূলীভূত কারণ। তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ যে হিন্দুধর্ম্ম বলেন স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। যাঁহারা আপনারা পড়া-শুনা করেন না বা খোঁজ-খবর রাখেন না, তাঁহারাই এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিশ্বাস করেন। কোন হিন্দুই এ প্রকার অসার কল্পনা করেন না, আর্য্য ধর্ম্মের কুত্রাপি আমরা এরূপ কথা দেখিতে পাই না। সিমাইটীক্ জাতির (হিব্রু প্রভৃতির) ধারণা ছিল যে পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয় এই অদ্ভুত কথাই শেষে হিন্দুর ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। স্ত্রীজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উচ্চ বিশ্বাসটী আজও খৃষ্টান বাইবেলে দৃষ্ট হইয়া থাকে! হিন্দুগণ জানেন যে আত্মার স্ত্রীপুরুষ নাই; উহা জীবনের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই ভূর্লোকে স্ত্রীপুরুষরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

তোমাদিগের কাহার কাহার এরূপ ভুল ধারণা থাকিতে পারে যে হিন্দ থাকিতে পারে যে হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীলোকের মুক্তির কোন উপায় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা-গ্রন্থের অল্প একটু পাঠ করিলেই তোমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাইবে:—"ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক সমুদয় পুরুষ ও সমুদয় স্ত্রীই শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক মুক্তি লাভ করিতে বাধ্য।"

খৃষ্টান-সভ্যতা বানিজ্য বিষয়িনী প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতির মর্য্যাদা উহাতে গৌণস্থান অধিকার করিয়াছে। তদ্রূপ ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা নৈতিক ভিত্তির উপরেই গঠিত, ইহাতে ব্যবসায় বুদ্ধি একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছে। ফলও যেমন. হওয়া

উচিত তাহাই হইয়াছে। খৃষ্টান জাতি বানিজ্য সম্ভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অপর পক্ষে, হিন্দু জাতি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আদর্শ নৈতিক জীবন যাপন করতঃ জগৎকে অধ্যাত্ম বিষয়িণী শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ও পরে যে সমুদয় গ্রীস দেশীয় ও চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা ভারত ভ্রমন করিয়া ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখ। মোক্ষমূলারের প্রসিদ্ধ পুস্তক "আমরা ভারতের নিকট কি শিক্ষা করিতে পারি" ও "রাম কৃষ্ণের জীবনী ও উক্তি" পাঠ করিয়া দেখ। পাঠ করিয়া নিজে নিজেরা সত্য অবগত হও।

এখনও এই স্বার্থপরতার ও ব্যবসাবানিজ্যের সময়েও হিন্দুধর্ম্ম খৃষ্ট ও বুদ্ধের ন্যায় পুরুষ এবং সারদা দেবীর ন্যায় স্ত্রী প্রস্তুত করিতেছেন। যে ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহার প্রভাবে ঐরূপ নর-নারী কিরূপ করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে? উঁহাদের কাহারও কাহারও জীবন ও চরিত্র, গত দশ বৎসর কাল বহু সহস্র লোকের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। যীশু বলিয়াছেন যে:—"ফল দেখিয়া গাছের ভাল মন্দ স্থির করিতে হয়।" তাঁহার এ কথাটী বড়ই সত্য। উপরোক্ত নর-নারীর চরিত্র নীতি-সমষ্টি মাত্র। তাঁহারা নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণ অবতার। অতএব যখনই তোমরা দেখিবে কোন ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্মের বৃথা নিন্দা করিতেছে, তখনি বুঝিবে যে ঐ ব্যক্তি হয় অজ্ঞতাবশতঃ ঐ রূপ করিতেছে কিম্বা ভারতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করতঃ উঁহাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবার জন্য একান্ত আগ্রহ হওয়াতেই সে নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ রূপ নিন্দাকারী ব্যক্তিগণ মনে করে যে তথা কথিত পৌত্তলিক দিগের জীবত্মাকে অনন্ত নরক হইতে পরিত্রান করা তাহাদিগের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"আমরা পাপ ও অধার্ম্মিকতার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়ায়াছি" এ কথা বেদান্তধর্ম্ম শিক্ষা দেন না। উহাতে এরূপ শিক্ষাও নাই যে আমাদিগের কোন পূর্ব্ব পুরুষ শয়তান কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হইয়াছি। বেদান্ত বিপরীত কথাই বলেন। ইহাতে দেখা যায় যে সমুদয় নর-নারীই বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে চির সুখের অধিকারী। বেদান্ত বলেন যে আমাদিগকে পিতৃপাপ ভোগ করিতে হইবে না আমাদিগের বর্ত্তমান জীবন আমাদের গত জীবনের কর্ম্মফল মাত্র এবং আমাদের ভবিষ্যত জীবন আমাদিগের বর্ত্তমান জীবনের ফল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা-মাতা সন্তানের জীবাত্মার সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা যেন প্রনালী; সেই প্রনালীর ভিতর দিয়া জীবাত্মা ভূর্লোকে আসিয়া ব্যক্তাকারে প্রকট হন। সাধারণতঃ ইহাকেই কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রবৃত্তি অনুসারে মৃত্যুর পর আবার জন্ম গ্রহণ করে ও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে তাহার নূতন জন্ম নিয়মিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

—০—

আগমনী।

(১)

সুনীল শারদাকাশে চন্দ্রমা হাসিছে।
হাসিমুখে জগন্মাতা বঙ্গেতে আসিছে॥
আকাশে নাহি গো মেঘ, নাহি ভীম গরজন,
চপলা চমক নাহি, নাহি শিলা বরিষণ;
অশনি নিনাদ নাহি, না বহে ঝটিকা আর,
প্রকৃতি পরেছে আজ নববেশ সুষমার;

(২)

নীলাকাশে ছায়া-পথ কি সুন্দর দেখা যায়,
ভুলায়েছে জগমন তারি স্নিগ্ধ সুষমায়,
অসংখ্য তারকারাজি জ্বলিছে হীরক প্রায়,
সুনীল চাঁদোয়া খানি ধরা শিরে শোভা পায়;

(৩)

ফুটেছে টগর, বেলী, যুথী, জবা, সেফালিকা,
ফুল্ল স্থল-কমলিনী, আর মালতী মল্লিকা;
সাজায়ে বরণ-ডালা, কাহারে বরণ আশে,
সহাস্যে প্রকৃতি দেবী পথ পানে চেয়ে আছে;

(৪)

কুলু কুলু ধ্বনী ছলে, আগমনী গান গেয়ে,
চলেছে তটিনী ধনী সাগরের পানে ধেয়ে;
প্রাণের আনন্দ সে যে লুকাতে পারে না আর,
দু'কুল ছাপায়ে গেছে আনন্দ উচ্ছ্বাস তার;

(৫)

উত্তরে হিমাদ্রি হ'তে দক্ষিণে জলধিপার,
উঠিয়াছে একতানে জগন্মাতার জয়-কার;
"জয় মা আনন্দময়ী" গাইছে সকলে সুখে
আনন্দের স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিছে সবার মুখে;

(৬)

সারদার আগমনে হিন্দুকুল-বধু যত,
সচন্দন জবাদলে পুজায় হয়েছে রত;
নববস্ত্রে সাজিয়াছে বালক বালিকা সবে,
দিগন্ত কাঁপিছে আজ "জয় মা" "জয় মা" রবে;

(৭)

একটী বরষ পরে তুমি আসিয়াছ তারা,
কত না আনন্দ পাবে তোমার সন্তান যা'রা;
অকৃতী অধম আমি আমার যে কিছু নাই,
সন্তান বলিয়া মাগো কাছে যেতে ভয় পাই;

(৮)

কি আছে আমার মাগো কি দিব তোমায় বল
ধুয়াতে চরণ তব, আছে তপ্ত অশ্রুজল;
তুমি মা করুনাময়ী করুনা করিয়ে মোরে,
তুলিয়া লও গো বুকে ঠেলিয়া ফেল না দূরে;
সুনীল শারদাকাশে চন্দ্রমা হাসিছে,
হাসিমুখে জগন্মাতা বঙ্গেতে আসিছে॥

দীন—স্বরূপানন্দ।

—0—

শারদীয়া ।*

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ॥
মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান যাঁ'র ।
বাঁরবার তাঁর পদে করি নমস্কার ॥

যিনি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমানা, যোগী ঋষিগণ ধ্যানে যাঁহার সন্ধান পায় না, যাঁহার জন্ত স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সোনার কৈলাস ত্যাগ করিয়া শ্মশানে বৈরাগী—গলে হাড়মালা, কটিতে বাঘছাল পরিয়া যাঁহার তত্ত্বান্বেষণে নিরত, সেই জগদারাধ্যা জগদীশ্বরী জগ-জন-মন-মোহিনী-জগন্মাতা দুর্গার তত্ত্ববিষয়ে আমার আলোচনার প্রয়াস পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন প্রয়াসবৎ নিষ্ফল । আমার ন্যায় বিষয়-বিষ-পান-নিরত সাধন-ভজন-হীন ব্যক্তির সেই ত্রিলোকারাধ্যা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ান্ত-কারিণী জগদ্ধাত্রীর লীলা-গুণ-কীর্ত্তন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নয়; সে যে বিচার-বিবেচনা- আলোচনায় লভ্য নয়; সে তত্ত্ব যে "যোগী ঋষির সাধনের ধন ভক্তি মূলে বিকিয়ে থাকে, 'সর্ব্বং সমর্পিত-মস্ত' বলিয়ে যে জন ডাকে" তা'রি ।

মা, বরিষা ঋতুর অবসানে শরতের আগমনে প্রকৃতি দেবী নব শোভায় সুশোভিতা হইয়াছেন, যেন বরিষার বারিবর্ষণ শ্রান্তি দূর করিতেছেন । এই বিশ্রামের অবসরে শারদীয় সুনীল গগণে মেঘ মুক্ত চাঁদের আলো ধরার বুকে হাসিরাশী ছড়াইয়া দিয়াছে । এই শুভ দিনে, মা, তোর আবাহন আগমনে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মঙ্গল আরতি বাজিয়া উঠিতেছে, ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে । দীন দুঃখীও আজ তোর আগমনের মাঙ্গলিক উৎসব-সূচক এক খানি নব বস্ত্রে দেহ যষ্টি আবরিত করিতেছে । মা, আনন্দময়ী তোর এ দীন সন্তানের আঁধার গৃহে কি তোর একবার শুভাগমন হবে না মা ? আসিলে যে কি বসিতে দিব, তাহা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি । মা, তো'রি আসন অপহরণ করিয়া লইয়া ছয় চোরে তাহার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে; মা আমার শক্তিতে কুলাইল না, তোর আসন তুই উদ্ধার করে তোর এ দুস্থ সন্তানের মনোবাসনা পূর্ণ কর ।

দুর্গা, কালী, তারা ইত্যাদি নাম এবং রূপ একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপে সগুণাবস্থার স্থূল বিকাশ । ঈশ্বর সগুণ ও নিগুর্ণ উভয়ই । যখন নিগুর্ণ তখন তিনি ব্রহ্ম, আর যখন সগুণ তখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ান্তকারিণী কালকামিনী কালী মহাশক্তি, আদ্যাশক্তি জগৎপ্রসবিনী-জগদ্ধাত্রী তিনি প্রকৃতি রূপা সগুণা, সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মাহেশ্বরে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালিনী শক্তি রূপে বিকাশমানা । এই প্রাপঞ্চিক জগৎ তাঁর স্থূল বিকাশ—ইহা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং সূক্ষ্ম বিকাশে তিনি পঞ্চ তন্মাত্র—ইহা অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, এবং তৃতীয় অবস্থায় তুরীয় বা অব্যক্ত । তিনিই ভক্তের ষড়ৈশ্বর্য্যশা-

* বগুড়া হিন্দুধর্ম্মসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

লিনী মতা-ভগবতী বা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পিতা ভগবান। তিনি আমাদের কাতর ক্রন্দন, করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করেন; ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু তিনিই "ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছা-ময়ীর ইচ্ছা যেমন।" তিনি ভিন্ন জগৎ-জীবের অন্য গতি নাই। বিপদে অভয়-দাত্রী, শোকে সান্ত্বনাপ্রদায়িনী, বেদনায় শান্তিবিধায়িনী, পাপ পঙ্কেনিমজ্জিত বিষয়-বিষ পানে হতচেতন, কাম-কামনা-কলুষিত চিত্তে দুঃস্থ সন্তানগণের রক্ষাকর্ত্রী "মা"। তাঁরই স্নেহ-অঞ্চল-ছায়ায় সন্তপ্ত জীবগণ সুখে নিদ্রিত রহিয়াছে এবং তাঁ'রি বলে বলীয়ান হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। ব্রহ্মের এই নির্গুণ ও সগুণ ভাব সাংখ্য-প্রতিপাদ্য পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ নিষ্ক্রিয় আর প্রকৃতি ক্রীয়াশীলা। তাই নিষ্ক্রিয় শিব-পুরুষ বক্ষে বরাভয়করা করালবদনা কালী-প্রকৃতি। এই নির্গুণ সগুণ-তত্ত্ব ও পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব অভেদ। কোনটী পরিত্যাগ করিয়া অপরটীকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই ঐ তত্ত্ব, অগ্নি ও তা'র দাহিকা-শক্তির ন্যায় চির-বিচ্ছেদ শূন্য। অগ্নি চিন্তা করিলে যেমন তাহার দাহিকা-শক্তি চিন্তা করিতে হয়, এবং দাহিকা-শক্তি চিন্তা করিলে, অগ্নিকে চিন্তা করিতে হয়, তদ্রূপ নির্গুণ পরিত্যাগ করিয়া সগুণ বা পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি বিষয়ে ধারণা অসম্ভব। একের অভাব দুইয়েরই অভাব এবং একের অস্তিত্বে দুইয়েরই আস্তিত্ব মানিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সগুণ অবস্থা—মহাশক্তি। ইহা হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বের আরম্ভ। এই মহাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বিস্তার করিয়া এই দৃশ্যমান জগতরূপে একাংশে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত তাঁহার মায়ার রাজ্যের অন্তর্গত। তিনিই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়া বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং শিবরূপে সংহার করেন।

দুর্গানাম শুনিলেই মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজা মাতৃমূর্ত্তির কথা মনে হয়। জীব যখন তাহার পাপ-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাতনায় জর্জ্জরিত প্রাণে মায়ের করুণা প্রার্থনা করে, তখন মা দুর্গতি-নাশিনী দুর্গারূপে সেই সন্তানের দেহস্থিত পাপরূপী মহিষাসুরকে বধ করেন এবং দেহস্থিত সৎ-প্রবৃত্তির শক্তি—দেবশক্তি আশ্রয় করিয়া আবির্ভূ'তা হয়েন। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যথাঃ—

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপানার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি (ভগবান) সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, অসাধুগণের নাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

যখন যেখানে যে ভাবে আবশ্যক তখন সেখানে সেইভাবে সেইরূপে তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মহিষাসুর-ভয় হইতে দেব-গণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিই মায়ায় দুর্গতি নাশিনী দুর্গারূপে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন আবার ভূভার হরণ জন্য তিনিই কংস-কারাগারে দেবকীর অঙ্কোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পশ্চিম এসিয়ায় প্রভু যিশুখৃষ্ট এবং আরব দেশে হজরত মহম্মদও তাঁ'রি প্রকাশ।

এদিকে আবার তাঁ'রি প্রেম-প্রবাহ বক্ষে ধরিয়া নদীয়ায় শচীগর্ত্ত-সিন্ধু মাঝে প্রেমাবতার গোরাচাঁদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মহিষাসুরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেবগণ তাঁহাদের স্বাধিকার স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। বিষ্ণু আদি সকল দেবতায় সম্মিলিত হইয়া মহিষাসুর-নাশ ও ভ্রষ্ট রাজ্য স্বর্গ উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন; সেই সময়, মহামায়া তাঁর প্রিয় সন্তান দেবগণের দুঃখাপনোদন জন্য তাঁহাদের অত্যুৎকট একাগ্রতা আশ্রয় করিয়া ভুবন-মন-মোহিনী সাজে দশভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। দেবগণ, যাঁহার যে দিব্য অস্ত্র ছিল তাহা মায়ের করে প্রদান করিলেন। মা সন্তানগণকে রক্ষার নিমিত্ত রণসাজে সজ্জিতা হইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন এবং দেবদ্বেষী পাপরূপী মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া দেবতাগণের ভয় দূর করিলেন।

মহিষাসুর ব্যতিত দেবদ্বেষী শুম্ভ নিশুম্ভ আদি অসুরগণ বর্ত্তমান ছিল। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে শত্রুশূন্য করিবার জন্য সন্তানবৎসলা মা জগজ্জনমন-মোহিনী রূপে হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরে কাঞ্চন গিরিতে রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিয়া বসিলেন। দূতমুখে রূপবতীর রূপের সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্থানীয় অধিপতি অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের মাথা ঘুরিয়া গেল এবং রূপসীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতে আসিয়া তাহারা একে একে সদলবলে মায়ের ইচ্ছায় বিনাশপ্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধকালে কালরূপিনী করালবদনা অসম্ভবা এক নারী মায়ের ললাটভ্রূভঙ্গি হইতে উদ্ভবা হইল। ইহাঁর নাম কালী। চণ্ড মুণ্ড নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি দেবী চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হন। ইহাঁর মুখে অট্ট অট্ট হাঁসি, করে উন্মুক্ত অসি, গলে শব মালা, চর্ম্মবস্ত্র পরিধানা, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক এবং লেলিহান জিহ্বা, সতত দৈত্যগণ-ভোজনে নিযুক্তা এবং গণ্ড বহিয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির পূজা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে।

মহিষাসুর বধকালীন মায়ের যে দশভুজামূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছিল সেই মূর্ত্তিতে মাতৃপূজা এ দেশে ঘরে ঘরে এখনও হয়। এই মূর্ত্তিতে মাতৃপূজা, মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য কর্ত্তৃক মহর্ষি মেধসের উপদেশানুসারে হৃত সর্ব্বস্ব পুনরুদ্ধার কামনায় নর্ম্মদা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজার সময় বসন্তকাল এবং এক্ষণে এদেশে ইহা বাসন্তিপূজা নামে অভিহিত হইতেছে। এই পূজায় মহারাজ সুরথ ও সমাধিবৈশ্য মায়ের পূজা সুনির্ব্বাহ এবং কামনা সিদ্ধির জন্য নিজদেহ হইতে রক্তদান করেন। আজকাল সেই রক্তদান অনুকরণ করিয়াই নিরীহ ছাগ-শিশুর রক্তদানের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ ছাগবলির মূলে কি তত্ত্ব নিহিত তাহা না বুঝিলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে সৃষ্ট জীব মাত্রেই জনন্মাতার সন্তান, তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন আর ছাগ শিশুর রক্তপান করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, ইহা কখনই সম্ভবে না। এরূপ ভাব মনে করিতে গেলে মায়ের ভালবাসা একদেশদর্শী বলিয়া বোধ হয়। আবার ইহাও সম্ভব যে এরূপ

বলিদান নিম্নাধিকারী তমোগুণী মানবর্গণকে ধর্ম্ম-কার্য্যে, মাতৃ-পূজায় নিয়োজিত করিবার একটী কৌশল বিশেষ, যাহারা মাংসভোজী, কিম্বা কারণে কতশত ছাগশিশু ত দূরের কথা তা'র বড়ও অনেক উদরসাৎ করিতেছে তাহারা ত আর মাংসাহার ত্যাগ করিবে না। যখন খাওয়া ছাড়িতে পারিবে না তখন মায়ের নাম করিয়া খাও। মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়া খাও, মাংসাহারও হ'বে মায়ের নাম লওয়াও হ'বে। নামের গুণে ক্রমে প্রাণের তম দূর হইবে। তখন আর তাহার ছাগ-শিশুর দিকে মন থাকিবেনা। মায়ের নামে, মায়ের ভাবে প্রাণ মন মাতিয়া উঠিবে; তখন প্রাণীবধ করিয়া মাংস ভক্ষণ ত দূরের কথা, নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও জগতের জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য ইচ্ছা হইবে।

এই বলি-প্রথা বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এদেশে প্রচলিত। বৈদিক যুগে যখন কর্ম্মকাণ্ড লোকের একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল, তখন অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এই সকল যজ্ঞে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এবং যাজকের মনোভিলাষ পূরণের জন্য, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবার সময় অশ্ব গো বা মানুষ বলি দেওয়া হইত এবং উহার মাংস দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত। এরূপও শ্রুত হওয়া যায় যে যজ্ঞ অন্তে যাজ্ঞিক ঋষিগণ নিহত প্রাণিগণের প্রাণদান করিতেন। আধুনিক ক্রিয়াকাণ্ডে সেইকালের বলিদান প্রথা অনুসরণ করিয়াই এইরূপ ছাগ ও মহিষাদি বলি প্রচলিত রহিয়াছে।

"বলি" শব্দে আমরা সাধারণতঃ যেরূপ জীবদেহ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা বুঝি কিন্তু উহার অন্য অর্থও আছে। বলি শব্দ ইংরাজিতে 'Sacrifice' ও বাঙ্গলায় 'উৎসর্গ' অর্থে গ্রহণ করা যায়। এই উৎসর্গ অর্থে দানও বুঝায়। পূজায় ভগবৎ প্রীতির জন্য এই দানকার্য্য সম্পাদিত হয়। জগন্মাতার পূজায় এই বলি জীবের পশু (বিবেকবিহীন) আত্মা (দেহে আত্মবুদ্ধি) এবং দৃঢ়তা ইহার যূপ। জ্ঞান-খড়্গে মায়ের দুয়ারে এই পশুর বলি হয়। জীব বলিপ্রদান করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইহাই বলির তাৎপর্য্য।

জগন্মাতা দুর্গার দ্বিতীয় পূজা লঙ্কায়। শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারার্থ রাবণ বধের কামনা করিয়া শরৎ কালে মায়ের বোধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রচলিত পূজাকালের পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া ইহাকে অকালবোধন বলে। আজ কাল এদেশে এই শারদীয়া পূজাই সমধিক প্রচলিত।

এই দুর্গোৎসবের সহিত আগমনী ও বিজয়া যুক্ত আছে। আগমনী অর্থাৎ হর-পত্নী উমার পিত্রালয় আগমন এবং বিজয়া তাঁহার পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া কৈলাসে স্বামী-ভবনে গমন। মায়ের যে মূর্ত্তির পূজা করা হয়, উমার সহিত উহার মূলতঃ মিল থাকিলেও স্থূলতঃ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আগমনী এইরূপে আরম্ভ হয়। গিরিরাজ-মহিষী মেনকা স্বপনে দেখিলেন, উমা তাঁর স্বামীর গৃহে কতকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছেন, তাই গিরিরাজকে কন্যা গৃহে আনিতে অনুরোধ করিলেন। গিরিরাজ লোক প্রেরণ করিয়া কৈলাসেশ্বর মহাদেব-গৃহিণী উমাকে গৃহে

আনয়ন করিলেন। এইটী আগমনী উৎসব*।

উমা জগদীশ্বরী জগন্মাতার সাকার-মূর্ত্তি। পুরাণে কথিত আছে প্রথমে তিনি দক্ষরাজ গৃহে সতীরূপে জন্মগ্রহন করেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সতী তাঁহার পিতা দক্ষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্ষেত্রে পিতা কর্ত্তৃক পতির নিন্দা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। পত্নি-শোক-মুগ্ধ মহাদেব তাঁহার শব স্কন্ধে ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান বিষ্ণু, সতীদেহ সম্পূর্ণ পরি নাম না হওয়া পর্য্যন্ত মহাদেব প্রকৃতিস্থ হইবেন না বুঝিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা শবদেহ ৫২ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ৫২ স্থানে পাতিত করেন। যে যে স্থানে এইরূপে বিষ্ণু কর্ত্তৃক কর্ত্তিত সতীদেহ-খণ্ড পতিত হয় তাহা এক একটী পীঠ নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সতীদেহ খণ্ডিত হইবার পর তাঁহাকে পুনর্ব্বার পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য মহাদেব ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে গিরি-রাজ হিমালয় ও তৎপত্নী মেনকা আদ্যাশক্তি-কে কন্যারূপে লাভ মানসে উগ্র তপস্যা করেন। ভগবতীগীতায় গল্পছলে মহাদেব নারদকে বলিয়াছিলেন যথাঃ—

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনকায়াপিচ॥
মহোগ্রতপসা পুত্রী ভাবেন মুনিপুঙ্গব।
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহদুঃখিনা॥
প্রযযৌ মেনকা গর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ম॥

মহাদেব বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, গিরি-রাজ হিমালয় এবং তৎপত্নী মেনকা তাঁহাকে (আদ্যাশক্তিকে) কন্যারূপে পাইবার নিমিত্ত অতি কঠোর তপস্যা করেন এবং আমিও সতী বিরহে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাইবার জন্য প্রার্থনা করি। আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সেই পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ং মেনকাগর্ভে আবির্ভূতা হন।

মাতা জগদম্বা ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। সময় ও সুবিধা মত গিরিরাজ তনয়া উমার বিবাহ মহাদেবের সহিত সুসম্পন্ন হইল। উমা প্রতি বৎসর স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিয়া সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন অবস্থান করেন এবং দশমীর দিনে পতিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব, ষষ্ঠির দিন বোধন এবং দশমীর দিন বিসর্জ্জন লইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মায়ের পূজা—আবাহন, আরাধনা এবং বিসর্জ্জন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অন্তরে বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানীর জ্ঞান নয়নে এই শক্তি আরাধনা সাধকের সাধনার স্তরবিশেষ, তিনি দেখিবেন—বোধন কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মূলাধারে জাগরণ তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিনের পূজায় শক্তিদেবী মনিপুরাদি চক্রভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হন। এই স্থানেই

* কোন কোন মতে ৫১ পীঠ লিখিত আছে। আঃ সঃ

বিজয়ার আরম্ভ। সহস্রারে পরম শিবের সহিত এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মিলনই বিসর্জ্জন। * জীব যখন অহংজ্ঞান ভুলিয়া ভগবানে ডুবিয়া যায় তখনই তাহার প্রকৃত বিসর্জ্জন। এই বিসর্জ্জনই মহামিলনের ফল। বিসর্জ্জন যদি বাস্তবিক বিসর্জ্জন হইত—চির দিনের মত বিদায় কি অবসান হইত, তাহা হইলে মানব এই উৎসব উপলক্ষে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইতে পারিত না; যেহেতু যাহা ত্যাগ অভাবের পরিচায়ক, এরূপ কোন বস্তু কখন বিমল আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

উমার চরিত্রগুণে হিমালয়ের রাজ্যস্থ প্রজা বৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। তিনি প্রত্যেকের ঘরে যাইতেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়া আর্ত্তের সেবা করিয়া অন্ধের চক্ষু দান করিয়া, পঙ্গুকে চলৎ-শক্তি দান করিয়া তিনি ঘরে ঘরে ফিরিতেন। যখন উমা স্বামীগৃহে প্রস্থান করিতেন তখন দেশময় হাহাকার পড়িয়া যাইত। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইত; আবার কবে উমার মুখ দেখবে এই চিন্তায় কালাতিপাত করিত। উমামায়ের এইরূপে স্বামী গৃহে গমন বিজয়া। এখন আর কৈলাসে শিবপার্শ্বে মায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিজয়ার আনন্দ উপ-ভোগের সৌভাগ্য নাই। তাই হিমালয়-রাজ্যবাসীর ন্যায় বিজয়াকে আমরা নিরানন্দেই বরণ করিয়া লইয়া থাকি।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত।

* কেহ যেন মনে না করেন যে এই ব্যাখ্যাই শেষ; স্থূলে কোন লীলা বিলাস হয় নাই। অবতার বা সূক্ষ্ম কারণ শক্তির স্থূলে বিকাসের বিশেষত্ব বা উদ্দেশ্য এই যে তাহাতে (লীলাতে) সৃষ্টিতত্ত্বের একটী অতি বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং দেহ-তত্ত্বেও তাহার সম্যক মিলন দেখা যায়। ইহাই অব-তারের বিশেষত্ব। সকল ভাবের একত্র সমাবেশ।

—0—

সাধক সঙ্গীত।

মল্লার— (৬) কওয়ালী।

এমন অপরূপ রূপ নাজানি কে গড়িয়াছে।
মূরতি দেখে অনুমানি হে—
মাখি সপ্তসাগর সুধা বুঝিবা রূপে ঢালিয়াছে।
তোমারি করুণা পেয়ে, সুন্দর সাগর খেলে
দেখাতে রূপের ঐশ্বর্য্য কৃপা করি রেখেছ ঢেলে,
সুন্দর সাগর বেলা, সুন্দর সাগর তলা
সুন্দর তরঙ্গমালা তোমারই রূপে উছলিছে।

তোমারই রূপকণা ল'য়ে, সুন্দরী প্রকৃতি হাসে
তোমারই রূপ-ভাতি পেয়ে, গর্ব্বেতে ভাস্কর ভাসে,
পেয়েছে তব রূপ-আভা, তাই কুসুমে এত শোভা
তোমারই রূপ কণা ল'য়ে পাখী পালকে মাখিয়াছে।
ভুবন আলো করে রূপে সুধামাখা শারদ-শশী,
তব রূপ-লাবণ্য গায়ে মেখে গগণে উঠে হাসি,
(আবার) তারই লাবণ্য লয়ে সাজি, অগণ্য তারকারাজি
বিচিত্র করিয়ে চিত্র আকাশ-পটে শোভিয়াছে ॥
এবিশ্বে যা হেরি' দৃশ্য সব তোমারিরূপে ঢালা,
নীলাকাশে নবনীরদে তব লাবণ্য করে খেলা,
দেখি ইন্দ্র-ধনু মাঝে, তোমারি রূপ-আভা সাজে
অনিল লয়ে অনল দেখি তোমারি রূপ উগারিছে।
মেঘ মাঝারে দেখি পুনঃ ঘন চপলা চমকিছে
হাসিয়ে নবনীরদ যেন তব মাধুরী প্রকাশিছে,
বৃক্ষপত্র মাঝে হেরি, ঢালা তব রূপ-মাধুরী
শিখিপুচ্ছ মাঝে তোমার রূপ-লাবণ্য খেলিতেছে ॥
এমন রূপ-মুরতি যদি নাহলো চির সম্বল,
বিফল জনম মম জীবনে কি ফল বল,
তাই বলি হে নীলকায় একবার দেখা দেও আমায়
হেরিতে তব রূপ-মাধুরী আনন্দে প্রাণ নাচিতেছে।
দ্বিজ রামকমল বলে যদি না দেখা দিবে তুমি
হরে রামকৃষ্ণ বলে জীবন ত্যজিব আমি,
নামে কলঙ্ক হবে হরি, তাই বলি হে বংশীধারী
ভুবন মোহন রূপে এস মম হৃদয় মাঝে ॥

———0———

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। পরম প্রেমিক কবিকুল চূড়ামণি শ্রীজয়দেব ভগবানের কেবল দশ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া যে শ্রীভগবানের অবতার কেবল দশটীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে অবতার বর্ণন কালে একবিংশ কি দ্বাবিংশটী অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্যুঃ সহস্রশঃ॥

সত্ত্বনিধি শ্রীহরির অবতার অসংখ্য। উপক্ষয়শূন্য মহাহ্রদ হইতে যেমন অসংখ্য নদী বহির্গত হইলেও মহা হ্রদ কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না, শ্রীভগবান হইতেও সেইরূপ অসংখ্য অবতার বহির্গত হইতেছে। ফলতঃ সৃষ্টি-প্রবাহের রক্ষণাদির জন্য যখন যেরূপ অবতারের আবশ্যক, তখন সেইরূপ অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তৎকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। দশ-অবতারের উল্লেখ কেবল সৃষ্টি প্রবাহের ক্রমবিকাশবাদের পথ-প্রদর্শক। বিষ্ণুধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবান্ ত্রিযুগ আখ্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন শ্রীভগবান্ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই তিন যুগেই অবতীর্ণ হইয়াছেন; কলিতে তাঁহার অবতার নাই, এই জন্য ভগবানের নাম "ত্রিযুগ"। শাস্ত্রকারগণের বাক্য কোনটাই অপ্রামাণ্য নহে। ফলতঃ কলিকালে প্রকাশ্য অবতার নাই। শ্রীভগবান কলিকালে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া কলিমল-কলুষিত জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, একথা ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদের স্তোত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব ঝসাবতারৈর্লোকান বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতিপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রি-যুগোঽথসত্বং॥

হে মহাপুরুষ! তুমি নৃ, তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা এবং মৎস্য প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎ প্রতিপালন, ধর্ম্ম সংরক্ষণ এবং অসুর সংহারাদি কার্য্য করিতেছ; তুমি কলিকালে ছন্নরূপী, সেই জন্য তুমি "ত্রিযুগ" আখ্যায় কথিত হইয়া থাক। কলির প্রথম সন্ধ্যায় বুদ্ধরূপে এবং শেষ সন্ধ্যায় কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন ও করিবেন। কিন্তু কলির মধ্যভাগে তাঁহার অবতরণের আবশ্যক হইলে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবতীর্ণ হইবেন ইহাই সূচিত হইতেছে; এই জন্যই কি এবারে স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধার রূপে নিজমূর্ত্তি আচ্ছাদিত করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর সংহারাদি করিয়া থাকেন কিন্তু এবারে ত তিনি কোনও অসুর সংহার করেন নাই। ভূভার হরণেরও কোনও কার্য্য এবারে দেখা যাইতেছেনা, তবে এরূপ অসময়ে তাঁহার অবতার কেন হইল? অসময়ে তাঁহার অবতার হয় নাই, অধিকন্তু এবার তাহার অবতার নহে।

এবারে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, ভূভার হরণ, অথবা অসুর সংহারাদি কার্য্য এমন কি বিশ্ব সৃষ্টিস্থিতি বা লয়াদি ব্যাপারই কি সেই কেবল সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় শ্রীভগবানের কার্য্য? তিনিপ্রেমময়, প্রেম-রসাস্বাদনই তাঁহার লীলা! অসুর-সংহার তাঁহার কার্য্য নহে, তাহাদিগকে সদ্‌গতি দান—প্রেমদানই তাঁহার কার্য্য। অংশ বা কলাবতারে তাঁহার প্রেমলীলা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না। জীব তাঁহার প্রেম কিপ্রকার বস্তু তাহা অনুভব করিতে পারে না; পূর্ণাবতারে প্রেমপ্রদানই প্রয়োজন। তবে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহার অংশ ও কলাসমূহ সেই সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারাই অসুর সংহারাদি হইয়া থাকে। পরম দার্শনিক রসিকভক্তাগ্রগণ্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন-

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥

তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমলীলা করেন। কিন্তু সেই লীলার যে অংশ অস্ফুট ছিল, এবারে তাহা প্রস্ফুট করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, শ্রীমতী গোপীবৃন্দতত্ত্ব, শ্রীধাম বৃন্দাবনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত তথ্য লোকের জ্ঞান গোচর হয় নাই, মূঢ় জীবদিগকে তাহাই শিক্ষাদিবার জন্য এবারে তিনি আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত ভগবৎ তত্ত্ব আর কে বুঝাইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমনের পূর্ব্বেও পণ্ডিত ছিল—মূর্খ ছিল; ধনী দরিদ্র; রসিক বৈষয়িক; ইতর ভদ্র—সকলই ছিল। সকলে একত্রও হইতেন—কিন্তু মিশিতেন না। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া, মূর্খ শূন্যগর্ভ গর্ব্ব লইয়া নিজ নিজ অহংকার-গণ্ডীর ভিতর গুটীপোকা হইয়া থাকিতেন। করুণার বরুণালয় শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান, মূর্খের শূন্যগর্ভ গর্ব্ব; ধনীর আত্মম্ভরিতা, দরিদ্রের সঙ্কোচ; রসিকের একদেশদর্শিতা; বৈষয়িকের বিষয়রাগ—সমস্তই অপনোদিত হইল। সকলে দ্রবীভূত হইয়া মিশ্রিত হইল। তাঁহার রাসলীলার অর্থ—প্রকৃততত্ত্ব কলিমলকলুষিত বিষয়-বিষ-বিদূষিত জীবগণ বুঝিল না। কদর্থ করিল দেখিয়া তিনি শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে রাসলীলাতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।
সেবারে কুরুক্ষেত্র সমরে একদিকে মহাবিক্রমশালী দুর্য্যোধন, অপরদিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জগৎকে দেখাইয়াছিলেন প্রকৃত সুখ অহঙ্কারে নাই—দম্ভ গর্ব্বে নাই, প্রবঞ্চনায় নাই, প্রকৃত সুখ পরোপকারও নিঃস্বার্থ কর্ম্মাচরণ ভগবদ্ ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এবারে পুরীধামে রথযাত্রাকালে যখন রথ চলিল না, লক্ষ লক্ষ লোকের শত

শত চেষ্টাতেও যখন রথের একচক্রও নড়িল না, সহস্র সহস্র হস্তী সংযোজিত করিয়াও যখন রথ একটুও নাড়িতে পারা গেল না—তখন তিনি রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে থাকিলে রথ যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই চলিল—বাধা মানিল না—মেঘগম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে তাঁহার কীর্ত্তনের অনুগমন করিল। কি আশ্চর্য্য! অথবা আশ্চর্য্যই বা কি? যিনি বংশীবাদন করিয়া যমুনা স্রোতের গতি উজান বহাইয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিয়া তিনি অচল রথকে সচল করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। ফলতঃ যখন জন সমাজের গতি রুদ্ধ হয়—অথবা বিপথ-গামী—হয়, জীবে মনোরথ গতি ক্রমশঃ উন্নতির দিকে না যাইয়া যখন পৃথিবী—রথ-চক্র গ্রাস করে—গতি স্থির হয়, তখন সেই জড়বৎ জীব জগৎকে আকর্ষণ করিয়া সুপথে আনিবার জন্য—তাহাদিগকে চৈতন্য প্রদান জন্য তিনি আসিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের আগমনের কারণ দুই প্রকার স্বীকার করা হইয়া থাকে, একটী অন্তরঙ্গ কারণ, আর একটী বহিরঙ্গ কারণ। ভক্তগণের নিকট এই কারণ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দৃষ্টি ভেদে দ্বিধা কথিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা স্বাদ্যো
যে নাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশংবেতিলোভাৎ তদ্ভাবাঢ্য
সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দু॥

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেম-সহকারে যে মাধুর্য্য আস্বাদান করেন সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমতী কিরূপ সুখ অনুভব করেন, এই তিনটী বিষয় জানিবার নিমিত্তই শ্রীমতীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শচীমাতার গর্ভ-সিন্ধুতে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইটীই অন্তরঙ্গ কারণ।

এখানে তিনটী মাত্র কথা বলা আছে; শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যই বা কীদৃশ, এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কথা তিনটী হইলেও উহারা সম্পূর্ণ পৃথক নহে, প্রত্যুত ভাবগুলি পরস্পর অনুস্যূত। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা জানিতে হইলেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য কিরূপ জানিতেই হইবে, কারণ শ্রীরাধার প্রণয় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেই পর্য্য-বসিত। ফলতঃ জগতে এই তিনটী পার-মার্থিক সত্য। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, এই তিনটী জগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞাতা—যিনি জানিতে চাহেন। জ্ঞেয়—যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় এবং জ্ঞান—তদ্বিষয়ক অববোধ, এই জ্ঞানই আনন্দ। কোন বিষয়ের সম্যক উপলব্ধি হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞানজনিত আনন্দ হইয়া থাকে। কোনও ব্যাধ পত্নী কান্তারে হত করীন্দ্রগণ্ড সংলগ্ন রক্তাক্ত মুক্তাফল দেখিয়া প্রথমতঃ বদরী ভ্রমে তাহাকে আদর করিয়াছিল, কিন্তু উহা নীরস ও কঠিন দেখিয়া দূরে পরিত্যাগ করিল। সে তাহা চিনিল না। তাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান কিছুই নাই, সে উহার আদর করিবে কেন? উহাই বা তাহার হৃদয়ে আনন্দ দিবে কি প্রকারে? যদি কোনও জহরী ঐ মুক্তাফল পাইত—তাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকায় সে আনন্দে অধীর হইত। এই প্রকারের জাগতিক

জ্ঞান ও আনন্দ—সেই শ্রীভগবানের আনন্দাংশের কণামাত্র। জগতের জীবের মনে যে সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয় ভগবদিচ্ছাই তাহার মূলকারণ। জীব যাহাকে বলে আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি, আমি দেখিতেছি, ইত্যাদি উহা পরামার্থিক সত্য নহে। জীবের সত্বা বা অস্তিত্ব যখন ভগবৎ সত্বা-সাপেক্ষ তখন তাহার গমন, ভোজন, দর্শন প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ জীবের গমন নিরপেক্ষ সত্য নহে—উহা জীবের গমন সফল করিয়া শ্রীভগবানেরই গমন,—জীবের ভোজন সফল করিয়া শ্রীভগবানেরই ভোজন এবং জীবের দর্শন সফল করিয়া শ্রীভগবানেরই দর্শন।

জীবের মনে নিত্যই কত ইচ্ছার উদয় হইতেছে, তদ্বশবর্ত্তী হইয়া জীব নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাহার সুখ হইতেছে না। মনোরথে আরোহণ করিয়া জীব নানাবিধ বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে কিন্তু সুখ পাইবে কি প্রকারে? জীবের ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার অনুকূল না হইলে সুখ হইতে পারে না। যতদিন জীবের স্বাতন্ত্র্য বোধ থাকিবে—যতদিন ভগবদিচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হইতে না পারিবে—যতদিন শ্রীরাধা-প্রণয়মহিমা কিরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র না হইবে—ততদিন সুখ প্রাপ্তির আশা দুরাশা; জীবগণকে প্রকৃত সুখী করিবার জন্য—মনোরথের গতি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্য—জড় ছাড়িয়া চৈতন্য ভজন শিক্ষা দিবার জন্য এবার তিনি হরি হইয়া হরি বলিতেছেন—কাতরকণ্ঠে উপদেশ দিতেছেন—

ভজ চৈতন্য কহ চৈতন্য নামরে।
যে জন চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণরে।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—0—

তুলিয়া লইও কোলে।

(১)

যবে, করমের অবসানে, শ্রান্ত দেহলতা মোর
অবশে পড়িবে ঢলে;
মিটি মিটি করি হায়, জীবন প্রদীপ মোর
সহসা নিভিতে যাবে,
যবে, রসনা জড়িত হবে, বাক্ না ফুটিবে মুখে,
নারিব ডাকিতে তোমা,
সে ঘোর শঙ্কট কালে, হে দয়িতপতি,
তুলিয়া লইও কোলে।

(২)

যবে আমার বলিতে যারা, সরিয়া যাইবে দূরে
ছুবেনা গো অপবিত্র বলে,
ছিঁড়িয়া-হৃদয়তার, জীবন-সঙ্গীত মোর,
অনন্তে মিশিতে যাবে,
যবে শ্রবণ বধির হবে, দৃষ্টি পাইবে লোপ,
নারিব চিনিতে তোমা,
সে ঘোর শঙ্কট কালে, হে চির-বাঞ্ছিত।
তুলিয়া লইও কোলে।

দীন—স্বরূপানন্দ।

—0—

রাজরাণী তুই।

আসি নাই আমি শুধু যাচিতে
কাঙালের মত
তুচ্ছ এক মুঠো। চাহ মিটাতে
সাধ যদি মোর—
দাও তবে দাও, দ্বার খুলিয়া—
পশিব তোমার

অমৃত ভাণ্ডারে——নিব লুটিয়া
হারানিধি সেই
পরশ পাথর যার পরশে,
মিটিত পিয়াসা;
ফুটিত কমল চিত সরসে।

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র।

——0——

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(৫)

আত্যন্তিক মঙ্গল কাহাকে বলে ?

যাহা দ্বারা সচ্চিদানন্দ ভগবানে নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই জীবের আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক মঙ্গল স্বরূপ। অর্থাৎ যে বস্তুর আনুকূল্যে নিষ্কাম ভক্তির আবির্ভাব হয়, যাহাতে কোনরূপ অনিষ্টাপত্তি নাই অথচ আত্মানন্দ সংসাধিত হয়; সেই বস্তুই আত্যন্তিক মঙ্গল স্বরূপ. ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সেই বস্তুর অনুসন্ধানে মনোনিবেশই জীবের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যেহেতু তাহা দ্বারা অজ্ঞানদূষিত দৃষ্টির উপশম হয়, কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া অনন্ত ভবযাতনার অন্ত হয় ? এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে সেই বস্তুটী কি ? এবং তাহার অবস্থিতি কোথায় ?

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন :—

"যাবন্নয়াতি শরণং ত্বাম শেষাঘ মোচনম্"।

যে পর্য্যন্ত জীব ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত সর্ব্বাঘ বিনাশী ভগবানের শরণাপন্ন না হয়, তাবৎ সাংসারিক মোহে মোহিত হইয়া দুঃখভোগই তাহাদের পরিণাম হয়।

নৃসিংহপুরাণে বলিয়াছেন যেঃ—

"ভক্তৈক লভ্যে পুরুষে পুরাণে"।

ভক্তি দ্বারাই পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মকে লাভ করা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া সংসার যাতনার অবসান হয়।

শ্রীভগবদ্গীতা বলিয়াছেন যে :—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"

দেবযাজী ব্যক্তিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা আমার, (ঈশ্বরের) একান্ত ভক্ত, তাহারা অনাদি অনন্ত পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরকে) লাভ করিয়াথাকে।

পতঞ্জলী বলিয়াছেন :—

"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।"

ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পরম পুরুষের কৃপা লাভ হয়, তদ্বারা সমাধি অবস্থা লাভ হয়।

ভগবতী গীতাতে পার্ব্বতী বলিয়াছেন :—

"তস্মাদ্ভক্তিঃ পরাকার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ"

যদ্যপি ক্ষণভঙ্গুর বিষয় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত আমাকে "ব্রহ্মরূপে" চিন্তা করতঃ সর্ব্বদা উপাসনা করিবে। মুক্তেচ্ছুগণ আত্যন্তিক যত্ন সহকারে ভগবানের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরে শরণাপন্ন না হইলে কদাচ ভববন্ধন-মোচন সম্ভব পর নহে।

শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"।

পরাৎপর পরমেশ্বরে পুরুষের অচলা ভক্তি থাকে, এবং দেবতার প্রতি যেরূপ ভক্তি গুরুতেও তদ্রূপ অভিন্না ভক্তি যাহার আছে, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী হইয়া পরমপদের আশ্রয়ে চির শান্তি লাভ করেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অবিদ্যাকৃত বন্ধন নাশ করিতে হইলে, চিত্তের অকর্ম্মন্যতা নিবন্ধন স্ত্যান, প্রতিকূল জ্ঞান জনিত সংশয়, পরমপদ পরিজ্ঞানের বিঘ্নপ্রদায়িনী প্রমাদ, ধর্ম্ম বিষয়ে অপ্রবৃত্তিপ্রযুক্ত আলস্য, বিষয়াভিলাষজনিত অবিরতি, অসদ্বস্তুতে বস্তুবুদ্ধি জনিত ভ্রান্তি, তজ্জন্য সমাধি-ভূমির অপ্রাপ্তিতে অলব্ধ ভূমিকত্ব, ভূমিলাভ হইলেও তাহাতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা নিবন্ধন অনবস্থিতত্ব প্রভৃতি অন্তরায় অপসারণ করিতে হইলে, ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ভগবানে দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি না জন্মে তাবৎ জীবের সংসার রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না, সম্বন্ধে ব্যাকুলতাও বিষয়বাসনা ঘুচে নাই। অতএব "ঐকান্তিকী ভক্তিই পুরুষের" একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

এই ভক্তিপ্রতিপাদক একই রহস্য পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত কতকগুলি শব্দের ব্যবহার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথা অনুরাগ, আনুরক্তি, রস, ভাব ইত্যাদি। এই শব্দগুলিও ভক্তি বোধক হইতেছে। অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে অন্তঃকরণের যে একান্ত অনুরাগ তাহার নামও ভক্তি; আরাধ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধির নিমিত্ত অন্তঃকরণের যে "আনুরক্তি" তাহার নামও ভক্তি; আরাধ্য বিষয়ের আবির্ভাব জনিত অন্তরে যে আনন্দ রসের আস্বাদ হয় তাহার নামও ভক্তি; আরাধ্য বিষয় প্রণিধান নিমিত্ত অন্তরে যে "ভাবের-স্রোত" প্রবাহিত হয় তাহার নামও ভক্তি। সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, মাহাত্ম্যখ্যাতি, ইতর বিচিকিৎসা, তদর্থ প্রাণস্থাপন, তদীয় ভাব, সর্ব্বময়তা জ্ঞান ও অপ্রাতিকূল্যাদি এইগুলি ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ। অসূয়া, দ্বেষ, ঈর্ষা বা "শাস্ত্রের নিন্দা" ভক্তির চিহ্ন জ্ঞাপক নহে। যেহেতু আতপ ও ছায়ার ন্যায় ভক্তি ও দ্বেষের সমানাধিকরণ্য নাই। যদিও শাস্ত্রা-

স্কন্ধে "দ্বেষবুদ্ধিতে" শিশুপালের মুক্তির বিষয় কথিত আছে, তাহা দ্বেষবুদ্ধিজনিত মুক্তি নহে। শিশুপালের দ্বেষই পুনঃ পুনঃ ভগবান স্মরণের কারণ হওয়ায়, সেই পৌনঃপুনিক ঈশ্বর স্মরণই পরিণামে দ্বেষের স্থলে ভক্তিরূপা হইয়া—ভক্তির দৃঢ়তায় অর্থাৎ পরাভক্তির বিকাশে মুক্তির কারণ হইয়াছিল। অন্যথায় দ্বেষবুদ্ধি কদাচ মুক্তির প্রতিকারণ নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা পুরুষোত্তম পরব্রহ্মে একান্ত অনুরক্ত, যাঁহারা বেদবিহিত বিশুদ্ধতায় নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য রক্ষা করেন; তাঁহাদের নিকটে দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ প্রভৃতি সন্তাপদায়িনী অশুভা বুদ্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি লোপ পায়।

আবার ভক্তি পরিপক্কাবস্থায় প্রেম নামে অভিহিতা হয়। প্রেমের আবির্ভাবে জীব সর্ব্বভূতে প্রেমবান হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন, জগত প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়। তখন অন্তঃকরণ ঘৃণাশূন্য হয়, আত্মপর ভেদ দূরে যায়, অনর্থদায়িনী বিষয় বাসনাও অপনীত হয়। আমি আমার জ্ঞান লোপ পাইয়া তদীয়তা লাভ হয়, সারা জীবনের সমস্ত সাধনা পূর্ণ হইয়া যায়, কাজেই জীব আদ্যন্তবিহীন পরম পদে অবস্থিতি করে। এবম্ভূত ভক্তি বা প্রেম মানব ইচ্ছার অধীন নহে, বা কোন কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। ইহাকে ক্রিয়াত্মিকা বা কোন করিলে কারণান্তরের অপেক্ষায় রাখিলে, ইহা "স্বয়ংসিদ্ধশক্তিসম্পন্নার" অভাব হেতু বিনশ্বর হইয়া পড়ে। এবং ভক্তিজনিত মুক্তির প্রমাণ যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহারও নশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু শ্রুতি বলেন "ননু ভক্তিঃ ক্রিয়াত্মিকা সাচ নিঃশ্রেয়সায় ন ক্ষমতে" ক্রিয়াত্মিকা ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী নহে। যাহা নিরপেক্ষ বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, যাহাতে অপেক্ষাবুদ্ধিজনিত সংশয় থাকে, তাহা মুখ্যে অবান্তর দ্বিধায়ে বিনশ্বর হইয়া থাকে। মহর্ষি জৈমিনী মতে তাহা স্বতঃ প্রমাণ না হইয়া—"সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবৎ"। অতএব ভক্তির ফল অনন্ত ও অবিনশ্বর রাখিতে হইলে, উহাকে ক্রিয়ার জন্য দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। এমন কোন নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুর সহিত অভেদ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা ভক্তিও স্বয়ংসিদ্ধা মধ্যে পরিগণিতা হইতে পারে, সেই বস্তুই জ্ঞান। জ্ঞানের সহিত ভক্তি অভেদ হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন পৃথক হেতু ভক্তিতে নাই। ভক্তিই ভক্তির হেতু, ভক্তিই ভক্তির কারণ ও প্রয়োজন, ভক্তিই সাধ্য ও সাধন স্বরূপা, মনের অবিচ্ছিন্না গতি মাত্র। দেবীভাগবত মতে "চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারা সমং সদা"। এইরূপ ভক্তিই পরমা শান্তিদায়িনী; এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যেঃ—

> অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
> বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্ম প্রসাদনীং ॥

সংসার অরণ্যের বাসনারূপ মহীরুহের উচ্ছেদ করিতে হইলে "ভক্তি কুঠারই" একমাত্র অবলম্বনীয়। এই হেতু "কবয়ঃ" অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্ষু মানবগণ বা মনীষিগণ পরম প্রীতি সহকারে ভগবান বাসুদেবে নিরন্তর ভক্তি সাধনা করিয়া থাকেন। ভক্তি দ্বারাই চিত্ত-কলুষ অপনোদিত হইলে আত্ম-

প্রসাদ লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব এই ভক্তি ও জ্ঞান পরিণামে চরম লক্ষ্যে একই সত্ত্বায় সম্মিলিত হইয়া অভেদ হইবে। নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভক্তি ও জ্ঞানকে পৃথক বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ বিভিন্ন ভাবায় উঁহাদের স্বাতন্ত্র্যতা প্রদর্শন করিলেও, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া নানাস্থানে নানা জনের সংশয় জন্মাইয়া নূতন ধরণের শাস্ত্র প্রকাশ করিলেও; পরিণামে ভক্তি ও জ্ঞান একাকার হইবেই হইবে। কাহারও অনুরোধ শুনিবে না, উপরোধও শুনিবে না।

এই ভক্তি সাধারণতঃ দ্বিবিধা; নিষ্কাম ও সকাম. বা মুখ্য ও গৌণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা বা যে বস্তুর অনুকূলে ভগবানে নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল স্বরূপ। অতএব নিষ্কাম ভক্তি থাকিলেই, সকাম ভক্তির অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হইতেছে। যেহেতু নিষ্কাম ও সকাম অখণ্ডাকার বস্তু; একটীর অভাবে অপরটীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। অর্থাৎ "নিষ্কাম", নিরাকার অদৃশ্য, কাজেই নামরূপাদি বর্জ্জিত; আর "সকাম" বা কামনা বাসনাই জগৎ রূপে প্রতিভাত হওয়ায়, সাকার দৃশ্যমান ও নামরূপাদি যুক্ত। অতএব আদিতে "নিরাকার নিষ্কামের" অভাব হইলে "সকাম সাকারের" বা "সকাম সাকারের" অভাব হইলে "নিরাকার নিষ্কামের" আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বৃথা হয়। এই জন্যই সাধারণতঃ ভক্তি দ্বিবিধা, নিষ্কাম ও সকাম বা মুখ্য ও গৌণ।

বেদবাক্যের "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" উপনিষদ বাক্যের "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়," বেদান্তবাক্যের "স্বমায়য়া" "নামরূপ ব্যবহার গোচরত্বাৎ", পঞ্চদশী বাক্যের "স্বয়মেব জগদ্ ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ দ্বারাও ভক্তি দ্বিবিধা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ত্রিদেবাত্মক আমি জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপাদির বিকাশ করিব, বা আমি বহু হইব ও জন্মিব, ব্রহ্মের এই আলোচনা বা ইচ্ছাই; কামনা, বাসনা, মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ভ্রম, বিকার, বিকল্প, সংকল্প কল্পনা, শক্তি, প্রকৃতি, মূলা, সম্বিৎ প্রজ্ঞা, মহিমা, বিকাশ, প্রাবৃত্তি, সাঞ্জন, কষায়, আস্রব, মোহ, মল, স্বপ্ন, আবরণ, স্পন্দন, ঈক্ষণবৃত্তি, বিশেষ, স্বভাব, ধর্ম্ম, প্রভাব, তরঙ্গ, লীলা, প্রকটচৈতন্য, মহত্তত্ত্ব, সত্ত্ব রজঃ, তমাত্রিগুণ, নিয়তি, হ্লাদিনী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, অ, উ, ম, ব্রহ্মা; বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও রাম রহিম, গড, (God) ইত্যাদি. স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শব্দসমষ্টিপ্রসূত নানাবিধ নামে অভিহিতা হয়। কিন্তু যিনি পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম, তিনি বাগিন্দ্রিয় বর্জ্জিত, মনোবাণীর অতীত, জগতের বাহিরের বস্তু; সেখানে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের খেলা নাই। এইজন্য উল্লিখিত "ইচ্ছা বা কামনা বাসনার" আর একটী নামকে "জ্ঞানের শক্তি চমৎকারিতাও" বলা যায়; অর্থাৎ নিরাকার পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বিধায়ে

(বেদান্তমতে সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ) কার্য্য-কারণ ভাব দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্বকীয় স্বভাবে অথবা স্বয়ং যে উপায়ে বা কৌশল হইতে সাকার বিশ্বের আকার ধারণ করিয়া স্বীয় পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন; তাঁহার সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বা দুর্ব্বুদ্ধি রহস্য-বলই ইচ্ছা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি (উপ-রোক্ত) নামের আখ্যায় আখ্যায়িতা হইয়া থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, জগৎ কামনা বাসনারই বিজৃম্ভন বা কামনা বাস-নাই জগৎ রূপে পরিণতা হয়। সুতরাং কামনা বাসনা পাইবার জন্য বা সকাম হইবার জন্য কোনরূপ যত্ন ও চেষ্টা, আশা ও অধ্যবসায়-অথবা সাধ্যসাধনার প্রয়োজন করে না।

কারণ জীব মাত্রেরই কামনা বাসনা আছে জগৎ অতিক্রম করিতে হইলে, নিরন্তর সমুৎপন্ন ও নিরন্তর বিনশ্বর সংসার রাজ্য ছাড়িতে হইলে, কামনাবাসনাশূন্য হইয়া নিষ্কামী হইতে হইবে; তুচ্ছ বিষয় বাসনায় জলাঞ্জলী দিতে হইবে। এইজন্যই ভক্তি দ্বিবিধা, নিষ্কাম ও সকাম বা মুখ্য ও গৌণ। অর্থাৎ যে ভক্তি পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমন নিবারণ করিয়া নিত্যানন্দময় পরমপদ লাভের কারণ হয়, তাহাই নিষ্কাম ভক্তি বা পরা-ভক্তি। ইহাকেই "ঐকান্তিকী ভক্তি" বলা যায়, যাহা পুরুষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন সকাম ভক্তি পরমপদ প্রদায়িনী নহে বলিয়াই গৌণ। এই জন্যই শাণ্ডিল্যসূত্রে বলিয়াছেন যেঃ—

"পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথা হ্যাহ"।

নিষ্কামভক্তি বা পরাভক্তিই মুক্তির উপযোগিনী, "গৌণ" সকাম ভক্তির মুক্তি প্রদান শক্তি নাই।

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যেঃ—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।

যাঁহারা আমাকেই (ঈশ্বরকে) একমাত্র আশ্রয়ণীয় বোধে আপন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি সমুদয় আমাতে (ঈশ্বরে) সমর্পণ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত নিষ্কাম-ভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; অনন্য-চিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আমারই (ঈশ্বরের) ভক্ত হয়েন; আমারই পূজক হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আমারই শরণাপন্ন হন; তাঁহারা আমার প্রসাদে অনাদি অব্যয় শাশ্বতপদ লাভ করেন। অন্যথা সকামভাবে কর্ম্ম করিলে, তাহা গৌণ ভক্তির কারণ হইয়া পরমপদ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে;—

আত্মরাজ্যং ধনং চৈবাদিনা
পরমেশ্বরানুরক্তি রূপায়া ভক্তেলিঙ্গং।

ভগবদ্ ভক্তগণ, ভগবানকেই পরম ব্রহ্ম; পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র বস্তু, এবং অজ ও নিত্য পুরুষ জ্ঞান করতঃ আত্মা, রাজ্য, ধন ইত্যাদি ভক্তির সহিত তাঁহাতে ঢালিয়া দিলেই অর্থাৎ কামাদি ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হই-লেই তাহাকে নিষ্কাম ভক্তি বা পরাভক্তির চিহ্ন বলা যায়। ইহাই পরমেশ্বরানুরক্তিরূপ পরমভক্তি নামে অভিহিতা হয়। ইহা দ্বারাই অব্যয় পদ লাভের অধিকারী হওয়া যায়।

অন্যথায় সকাম ভক্তি, পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসের কারণ হয়।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সংসার সমুদ্রের "কামনা বাসনা রূপ" সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্যানন্দ অনুভব করিতে হইলে, "নিষ্কাম ভক্তি নাম্নী" মহা নৌকার অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এই নিষ্কাম ভক্তিই জীবের পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিধায়ে মঙ্গল স্বরূপ। আর যে বস্তুর সাহায্যে নিষ্কাম-ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই আত্যন্তিক মঙ্গল স্বরূপ"। (ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—o—

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

৬৬। উপাসনায় সারূপ্য লাভ হয়। যে যাহার উপাসনা করিবে ক্রমশঃ তাহার মন তদাকারকারিত হইতে থাকিবে, পরিশেষে তৎসারূপ্য প্রাপ্তি হইবে।

৬৭। ভগবান কখনও স্তুতি বা খোসামুদে ভুলেন না। তাঁহার পক্ষে "বাবা" বলা আর গালি দেওয়া বিশেষ পার্থক্য নাই; কারণ তিনি বাক্‌চাতুর্য্য দেখেন না—মনটাই দেখিয়া থাকেন। তিনি যে ভাবগ্রাহী।

৬৮। স্তুতি দ্বারা ভগবানের গুণাবলী আলোচনা হয়, তাহাতে জীবের চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য স্তুতিরও দরকার।

৬৯। পশুত্ব ত্যাগে প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব লাভ তৎপর দেবত্ব লাভ; ক্রমে ঈশ্বরত্ব লাভ এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব লাভই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

৭০। ফুলকে আদর্শ কর, ফুলের স্বভাব পরকে আনন্দ দেওয়া, নিজের কিছুই নাই, নীরবে ফুটিতেছে, আবার নীরবেই ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবসেবায় দিলেও আপত্তি নাই, আবার বিলাসীর কক্ষেও অসন্তোষ নাই—সেবাই তার ধর্ম্ম।

৭১। বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য সাধন পথের একমাত্র সহায়।

৭২। সংসারীই হউক আর সন্ন্যাসীই হউক জীবনের লক্ষ্য স্থির না হইলে কোন কার্য্যই সফল হইবে না।

৭৩। সত্যকে যে আশ্রয় করিয়াছে তাহার কোন বিষয়ে ভুল হইলেও ক্রমে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।

৭৪। যে যে পথই ধরুক না কেন, সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ থাকিলে নিশ্চয়ই সত্য লাভ হইবে।

৭৫। বাক্‌সংযম না হইলে চিত্ত সংযম হওয়া কঠিন, বাক্‌সংযম চিত্তসংযমের পূর্ব্বাবস্থা।

৭৬। মন প্রবৃত্তি পথে স্বাভাবিকই ধাবিত হয়, সাধনা দ্বারা ইহাকে নিবৃত্তির দিকে ক্রমশঃ ফিরাইয়া আনিতে হয়। তবেই চিত্ত স্থির হয়।

৭৭। সাধন ভজন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় করিতে হয়; তাহা হইলে সেই স্থানে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার হইবে, ক্রমে এরূপ হইবে যে ঐ স্থানে বসিলেই চিত্ত আপনি স্থির হইয়া আসিবে।

৭৮। নিম্ন স্তরেই যত ভেদ, যতই উচ্চে উঠিবে ততই ভেদাভেদ দূর হইবে এবং চিত্ত প্রশান্ত হইবে।

৭৯। কামনাগুলি দুঃখমূলক এবং দুঃখ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং এগুলিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিলে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারা যায় না। যাহার যত কামনা, সে তত দুঃখী।

৮০। বিচারের অর্থ তর্ক করা নহে—, সংশয় দূর করা। বিচার দ্বারা ক্রমশঃ ডাল-পালা পরিত্যাগ করিয়া মূলে পৌছিলে তখন সব চুপ হইয়া যাইবে—কোন উদ্বেগ থাকিবে না—একেবারে নিশ্চিন্ত অবস্থা আসিবে।

৮১। যখন যে বৃত্তির প্রাবল্য হয় মন এবং দেহ তদাকারকারিত হইয়া যায়। ক্রোধ হইলে দেহেতে যেন মূর্ত্তিমান ক্রোধের আবির্ভাব দেখা যায়; আবার আনন্দ হইলেও দেহেতে বাহ্যিকভাবে তাহা প্রকাশ পায়।

৮২। যাহার সন্তোষ আসিয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই যে তৃপ্ত সেই সুখী—সেই প্রকৃত লক্ষীমন্ত।

৮৩। মাটীতে বসিয়া যোগসাধন করা উচিত নহে; কেন না সে সময় শরীরে যে তাড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহা মাটীতে মিশিয়া যাইতে পারে, এজন্য হিন্দুগণ কুশাসন কিম্বা কম্বল আসন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮৪। ভালবাসাতেই সুখ, আর ভালবাসার প্রতিদান আশাকরাই দুঃখ; সুতরাং ভাল-বাসাই যাহার স্বভাব সেই প্রকৃত সুখী।

৮৫। ভগবান জীবকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু তিনি জীবের নিকট হইতে কোন প্রতি-দান চাহেন না।

৮৬। জীব জগতের সঙ্গে নিজকে জড়াইয়া ফেলে তাই দুঃখ পায়। ইহা বুঝে না যে অনিত্যের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না—নিত্যের সঙ্গেই আমাদের চির সম্বন্ধ।

৮৭। ভয়ের কারণ মৃত্যু, যে যাহা হইতেই ভয় পায় না কেন, মূলে মৃত্যুভয়।

৮৮। বাঘ কিম্বা সাপকে ভয় হয় কেন? কেন না তাহারা কামড়াইলে মৃত্যু হইতে পারে। মৃত্যুকে যে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে তাহারই ভয় দূর হইয়াছে।

৮৯। যা হবার তা হবেই। ভগ-বান পূর্ব্বেই তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। সীতাহরণ পূর্ব্বেই ঠিক করা ছিল।

৯০। শুধু বিভূতি দর্শন অপেক্ষা জীবনে উচ্চ সংস্কার লাভ করার মূল্য অনেক বেশী।

(ক্রমশঃ।)

স্বরূপানন্দ।

—০—

তীর্থভ্রমনের উদ্দেশ্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ভারত-ভূমে তীর্থভ্রমন ধর্ম্মের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কত যোগী, ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী যে প্রতি-নিয়ত তীর্থস্থানে যাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কত নরনারী যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদির জন্য কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি পুণ্যভূমির দিকে অনবরত ছুটিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। ভগবদেচ্ছায় যাহারই মনে ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহারই যেন স্বতঃই তীর্থাদি স্থান দর্শন করিবার জন্য প্রবল অভিলাষ জন্মে। ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশাধিকার পাইবার পূর্ব্বেই যেন এ বাসনাটা স্বাভাবিক এবং অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এখনও লোকে শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে উপেক্ষা করিয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া তীর্থাভিমুখে যাইতেছে। বাস্তবিক চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে তীর্থভ্রমন অতীব হৃদয়-গ্রাহী এবং বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় এবং তীর্থাদি ভ্রমন ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে কদাচ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে সকলেরই ধারণা যে দেশ পর্য্যটন ব্যতিরেকে শিক্ষার পূর্ণতা সম্যকরূপে সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই বিদ্যামন্দিরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই পাশ্চাত্য যুবকগণ দেশ ভ্রমনের জন্য বহির্গত হয়েন। এইরূপে তাহারা যে সমস্ত ভূমি সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত জায়গা তাঁহারা ক্রমান্বয়ে পরিদর্শন করে না। এইরূপে তাঁহারা ঐ সমস্ত দেশের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ চরিত্র, লোক-চরিত্র ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পান। এই সময়ে নানা প্রকার মনোরম দৃশ্যাবলীও তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি, সংস্কৃত রাজপথ, বিচিত্র চিত্রভবন, সুসজ্জিত পাঠাগার, সুশোভিত প্রমোদ উদ্যান ইত্যাদি তাহাদের জড় শিক্ষার সহায়তা করে। এইরূপে নানা প্রকার পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির চিত্র দেখিয়া তাহাদের প্রলুব্ধ মন ঐ দিকেই ধাবিত হয়। মানবগণ নিজ বিদ্যাবলে এবং জড়শক্তির সহায়তায় কিরূপে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য করায়ত্ত করিয়া লইয়াছেন ও ফল, মান প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় তাহা-দিগের মনকে আলোড়িত করিতে থাকে; এবং অবশেষে ঐ সমস্ত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য জড়জগতে নিজের অস্তিত্ব সম্যকরূপে বজায় রাখিয়া মানব সমাজে স্বপ্রধান্য ও আত্মসুখ লাভ করাই এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য এবং আপনাদের অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, এবং আত্মশক্তির উপর একান্ত বিশ্বাস ইত্যাদি গুণে তাঁহারা তাহাতে কৃত-কার্য্যও হইয়া থাকেন। এইরূপে তাহারা

পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু জগৎ সমক্ষে প্রকাণ্ড একটা সাহিত্যবিৎ, কিম্বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ, অথবা ভূতত্ত্ববিৎ হইয়া অর্থ, যশ, মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইলেও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সতত উত্থিত হইতেছে, তাহার পরিতৃপ্তি এরূপ ভাবে হইতে পারে না।

আমরাও জীবনটাকে সংগ্রাম বিশেষ বলিয়া মনে করি। কিন্তু জন সমাজে নিজের প্রাধান্য লাভের জন্য নহে, কিম্বা অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য নহে। মানবত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব লাভের জন্যই এই জীবনরূপ মহাসংগ্রাম। ইহাই আমাদের সাধনা, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অন্তরকম হওয়াতে এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সম্পূর্ণ বিপরীত। আর্য্যঋষিগণ পূর্ব্বাপরই দুইটি জগতের কথা সম্যকরূপে অবগত আছেন; স্থুল জগতে বাস করিলেও তাহাদের মন সদা সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করিত। এই দুই জগতের সমন্বয় করিয়া অবশেষে যাহাতে আমরা আধ্যাত্মিক জগতের রাজা হইতে পারি ইহারই জন্য আমাদের দীক্ষা এবং এই দীক্ষারই অনুকূল আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জগতে যেমন জড়শিক্ষার আনুসঙ্গিক দেশ ভ্রমনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেইপ্রকার আমাদের দেশেও তীর্থভ্রমন আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়, তীর্থাদি ভ্রমন করিয়া যে আমরা আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ ও তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারি তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের দেশেও শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের জন্য তীর্থপর্য্যটনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই ব্যবস্থা যে পূর্ব্বাপরই বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাও আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। শিক্ষা দীক্ষার অঙ্গ এবং তীর্থভ্রমন এই শিক্ষারই উপযোগী। আমাদের দেশে রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া দেশ পর্য্যটনের ব্যবস্থা কোন কালে ছিলও না এবং এখনও থাকিতে পারে না। আপাতমধুর নয়নাভিরাম দৃশ্য সমূহ আমাদের মনশ্চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। আমাদের দেশে যাহারা পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাহাদের দেশে শিক্ষার উপর ভ্রমনের কার্য্যকারিতা কেহ কখনও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পাশ্চাত্যজগতের শিক্ষার আদর্শ হইতে আর্য্যভূমির শিক্ষার আদর্শ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা আমরা সকলেই সহজেই অনুমান করিতে পারি। শিক্ষার কথা মনে হইলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে আধ্যাত্মিক শিক্ষার কথাই মনে করিয়া থাকি এবং তীর্থভ্রমন এই শিক্ষারই সহায়ক; প্রত্যেক তীর্থস্থানেই অন্তর্জগতের কোন না কোন ভাব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত পূণ্যস্থানে গমন করিয়া ঐভাবগুলি গ্রহণকরাই আমাদের এই ভ্রমনের উদ্দেশ্য। তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয় এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই তীর্থস্থানে ঐ ত্রিরাত্রি কাল বাস করিলে ঐ ভাবসমূহের কার্য্যকারিতা সম্যকরূপে না হইলেও আমরা

কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। এইপ্রকার তীর্থে তীর্থে ভ্রমন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ ও তাহার ক্রমশঃ পরিপুষ্টি সাধন হইয়া পরিশেষে অন্তর্জ্জগতের উপর আমাদের সম্যকরূপে দৃষ্টি পতিত হয়; এবং ক্রমশঃ বহির্জ্জগত হইতে মন অপসারিত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে সন্নিবেশিত হয়। এতদ্দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের তীর্থভ্রমনকাহিনী, সম্যকরূপে আলোচনা করিলে উপরোক্ত কথাগুলির সারবত্তা উপলব্ধি হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক তীর্থস্থানে একটি মহান ভাব সদা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। তীর্থস্থানে পদার্পণ করা মাত্রই ঐ ভাবের কার্য্যকারিতা শক্তি উপলব্ধি না হইলেও যে সমস্ত ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা আছে তাহা সম্পাদন করিতে করিতে ঐ ভাবের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঐ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অধিকারী ভেদেই ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের উপরে উঠিয়াছেন তাহাদের পক্ষে ঐ গুলির কোন উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং বিধিমার্গানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইলে ফলও অবশ্যম্ভাবী। ভারতে এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থভ্রমন করেন, সমস্ত ক্রিয়া কলাপ জীবনের কোন না কোন সময়ে সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রধানতঃ আত্মসংস্কারের জন্যই যে তাঁহারা ঐ সমস্ত করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তন্মধ্যে কেহ কেহ কোন বিশেষ ভাবে প্রণোদিত হইয়া ও ঐ সমস্ত ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের ঐ ভাব সাধারণ মানবের অগোচর। তাঁহারা যেন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমন করিয়া ঐ সমস্ত স্থানের সম্মান আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সমাগমে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য যেন আরও বর্দ্ধিত হয়। তাঁহাদের পদরেণু সংযোগে তীর্থভূমিগুলি যেন আরও পবিত্র হয়। তাঁহারাই যেন তীর্থস্থানগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার করিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহারাই যেন তীর্থ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল সম্যকরূপে বজায় রাখিতেছেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের সহায়তা করিতেছেন।

এই প্রবন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা বলিলাম তাহা সম্যক আলোচনা করিলে তীর্থভ্রমনের উদ্দেশ্য আমরা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কিন্তু আজকাল তীর্থভ্রমনের উদ্দেশ্য আমরা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। লোক পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি গয়ায় যাইয়া পিতৃমাতৃ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, কাশীধামে যাইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে হয়। পুরীতে যাইয়া জগন্নাথদেব দর্শন করিতে হয়, এবং রথে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারিলে নাকি পুনর্জ্জন্ম আর হয় না। পঞ্চক্রোশী কাশীধামের মধ্যে দেহত্যাগ ঘটিলে বিশ্বেশ্বর লাভ হয়, ইত্যাদি কথা আমাদের সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে অনেক মানবেরই সমস্ত প্রচলিত কথার উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু এই সমস্ত কথাগুলির সারবত্তা কোথায় যে নিহিত আছে তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া

দেখেন না। কাশীধামে যাইয়া তো কত লোকে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনের দিব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, কয়জন বলিতে পারেন যে দেহত্যাগের পর তাহাদের বিশ্বেশ্বরের সান্নিধ্যলাভ হইবে। এ প্রকার যদি কেহ থাকেন তবে তিনিই একমাত্র জীবনমুক্ত পুরুষ! তদ্ব্যতীরেকে যাহারা কাশীধামে যাইয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধের পরিবর্ত্তে কেবল অহংভাব লইয়া বাস করিতেছেন তাঁহাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সুদূরপরাহত। অনেকেই তো জগন্নাথদেব দর্শন করিতে পুরীতে যাইয়া থাকেন কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে প্রকৃত জগন্নাথ দর্শন ঘটে। যিনি জগতের নাথ, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন এবং সর্ব্বতশ্চক্ষু তাঁহাকে কি কেহ জগন্নাথের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত দেখিতে পান? রথে তো অনেকেই বামনকে দেখিয়া আসিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন আপনার দেহ রূপ রথে জগন্নাথদেবকে অধিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ই তাঁহার রূপ দর্শন করিয়াছেন? এই প্রকার যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহারই প্রকৃত জগন্নাথদেব দর্শন হইয়াছে। এই প্রকার গয়াতে যাইয়া যাহার পিতৃপুরুষদিগেরউদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন যে তাঁহারা প্রকৃত সফলতা লাভ করিয়াছেন। কয়জন বলিতে পারেন যে পিতৃপুরুষের উদ্ধার কামনায় যে পিণ্ড গদাধরের পদে সমর্পিত হইল তাহা বাস্তবিক জগতের স্থিতিবিধায়ক বিষ্ণু দেবতার শ্রীচরণে সমর্পিত হইল। গয়াতে যে ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে তাহা সম্পাদনান্তে কয়জন বলিতে পারেন যে প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার পিতৃপুরুষের আত্মার সদ্‌গতি কিম্বা উদ্ধার সাধন হইল। এই প্রকার যিনি বলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গয়ার কাজ করিয়াছেন।

আমরা উপরোক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে এখন আর গয়া, কাশী, পুরী ইত্যাদি স্থান ভ্রমনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করি না। আমরা এখন ঐ সমস্ত স্থানে যাইয়া আধ্যাত্মিক ভাবের হয় তো কোনই খোজ খবর পাই না। তীর্থস্থানে যাওয়া এখন কেবল মাত্র বিগ্রহসমষ্টি দর্শন, বিদেশ ভ্রমন ইত্যাদিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানে যাইয়া লোকে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতো, আজকাল সেই সমস্ত যায়গায় যাইয়া কেবল মাত্র বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভাবের বিকাশ দেখা যাইত, এখন সেই সমস্ত যায়গায় ভাবের অভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। Annie Besant তাঁহার ভারতীয় তীর্থভ্রমন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, তথাকথিত ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে তীর্থস্থানগুলি হইতে আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ অপসারিত হইয়াছে; কিন্তু একথা তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ভাব সমূহ তীর্থস্থানগুলি হইতে অপসারিত হইলেও একেবারে অন্তর্ধান হয় নাই। এখনও তীর্থবিশেষে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকৃত উপলব্ধি হইতে পারে। একজন পাশ্চাত্যদেশীয় রমণী যদি হিন্দুধর্ম্মের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্মভাব সকল উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন আর্য্যসন্তানগণ সনাতন

হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী সাধনমার্গে নিরত থাকিলে তীর্থাদির মহান্ ভাবগুলি যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

যাহাহউক তীর্থস্থানসমূহে কিরূপে ভ্রমন করিলে আমাদের ঐসমস্ত ভাব উপলব্ধি হইতে পারে তদসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যাহারা আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন দেখিয়া আকুল হইয়াছেন এবং উহা পুনর্গঠনের জন্য নিস্বার্থভাবে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা বাস্তবিকই স্বদেশভক্ত এবং তাহারা আমাদের প্রণম্য। কিন্তু যিনি আমাদের ধর্ম্মজীবনের অধঃপতন দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাকে ভগবান ব্যতীত আর কি বলিব? যাহাহউক এই বর্ত্তমান জীবনের অধঃপতনের জন্যই আমরা এখন আর আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক ভাব সমূহ গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা এক্ষণে বৈশ্যত্বে এবং শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছি; সুতরাং তীর্থস্থানে যাইয়া যে আমাদের কোনই ভাব উপলব্ধি হয় না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আধ্যাত্মিক জগতে অধিকারী হইতে হইলে চিত্তসংযম, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তীর্থাদি স্থানে বাসনা-কলুষিত, পাপজর্জ্জরিত দেহ লইয়া গেলে কি আর আধ্যাত্মিক ভাবের স্বাদ গ্রহণ হইতে পারে? প্রবৃত্তিমার্গে সদাসর্ব্বদা প্রলুব্ধভাবে ধাবিত হইয়া তীর্থভ্রমন করিলে কি আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের উপর তীর্থভ্রমনের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিব? এস ভ্রাতৃগণ, আমরা একই পিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদের শূদ্রত্ব ও বৈশ্যত্ব দূরীভূত করি। এস আমরা পুনরায় জীবনকে সংযত করিয়া প্রকৃতি (Nature) জয় করি। এস আমরা পুনরায় নিবৃত্তিমার্গে চলিয়া যাই এবং আমাদের স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হই। এস আমরা পুনরায় ব্রাহ্মণ হই এবং ব্রহ্মচর্য্য সাধন করতঃ ব্রহ্মেতে মন স্থাপন করি। তাহা হইলেই পুনরায় আমরা আধ্যাত্মিক জগতের অধিকারী হইতে পারিব। আবার বুঝিতে পাইব ভারতের কোন স্থানে কি ভাবে আধ্যাত্মিক ভাব সকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং কিরূপেই বা সে গুলি গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্নরায় বি·এ।

———0———

সংবাদ মন্তব্য।

গ্রাহকগণের প্রতিঃ—

"কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ" সংখ্যা একত্রে ছাপা হইবে, সুতরাং "আর্য্য-দর্পণ" সময় মত না পাইলে কেহ উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমরা যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে যত্নের ক্রটী করিব না, তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইব তাহা মা জগদম্বাই জানেন।

———0———

আশ্রম সংবাদ।

প্রত্যাগমন—পরমারাধ্য শ্রীমৎ গুরুজী মহারাজ সশিষ্যে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পূজার বন্ধে আশ্রমেই অবস্থান করিবেন, যাহারা তাঁহার শ্রীচরণদর্শনেচ্ছায় সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা এসময়ে আশ্রমে আসিলে তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

জন্মোৎসব—গত ২০শে শ্রাবণ ঝুলন পূর্ণিমার দিন অত্র আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব মহারাজের জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

আমরা অবগত হইয়াছি বগুড়াস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের শিষ্য ও ভক্তগণ ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুপূজা, ভোগ, আরতি ও কীর্ত্তনাদি ক্রিয়া খুব ধূমধাম ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষেও তথায় শ্রীশ্রীভাগবৎ পাঠ, কীর্ত্তনাদি ব্যাপার যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

—0—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ইউরোপস্থিত বিপন্ন ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের সাহায্যার্থ এক সমিতি খুলিয়াছেন, (কেন না ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় তাহারা বড়ই অসুবিধায় পতিত হইয়াছেন) এতদ্ সম্বন্ধে আসামের মহামান্য চীফ-কমিশনর বাহাদুর হইতে আমরা যে চিঠি পাইয়াছি নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

To

The Editor AryaDarpan, Jorhat.

With the compliments of the Chief Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

The following press communique is issued:—

Steps have been taken by Government to assist Indian students in Great Britain and Europe who may have fallen into difficulties owing to the outbreak of war. The Distressed Indian students' Aid Committee has been strengthened by the addition of Indian visitors of standing, and will take steps to relieve Indians in the United Kingdom who may require assistance owing to the derangement of facilities for remittances of money from India. Indians who are stranded in neutral or friendly countries will receive such assistance as may be required from the nearest British consul. Lists of Indians in Germany are being perpared by the Foreign office with the object of obtainign their return to England.

ওঁ তৎসৎ

আৰ্য্য-দর্পণ।

ধৰ্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। { ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

বিজয়া।

বাঙ্গালায় মহাসমারোহে শারদীয়া মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। কত অর্থব্যয় করিয়া হিন্দু আনন্দময়ীর অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রোগ-শোক-দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গবাসীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে ক্ষণিক বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় আনন্দময়ীর আগমনে কয়েকদিন আনন্দের বিকাশ হইয়াছিল; কিন্তু বিজয়ার পর হৃদয়ে নিরানন্দের ঘোরান্ধকার আরও জমাট বাধিয়া গেল। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া একটী আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল সত্য, কিন্তু সে আনন্দ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল কৈ? হইবে কেন?—হিন্দুর কি আর মাতৃপূজার উপযোগী শক্তি ভক্তি আছে—না সে দেহ, মন, হৃদয় আছে! দাসত্ব উপজীবী হিন্দু কি মাতৃপূজার অধিকারী হইতে পারে? আমরা যে মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যে জ্ঞানে আর্য্যসন্তান মায়ের পূজা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভুলিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়া পড়িয়াছি। তাই মায়ের নামে কামনার পূজা করি—কয়দিন বাহ্য আমোদ আহ্লাদ পাইয়া উৎসাহিত হই; কিন্তু দশমীর দিন সবই বিসর্জ্জিত হয়, বিজয়ার আনন্দ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। ভাই! শরতের সুখস্তিমিত সৌন্দর্য্য মায়ের স্বরূপ চিনিতে হইল। দূর প্রবাসে জননীর কথা মনে পড়িলে সন্তানের যেরূপ আকুলতা জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আকুল ভাবে ব্যাকুলপ্রাণে মা-মা রবে সুপ্তা মাতাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মা যে তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বাধারে নিদ্রিতা। সুপ্তা মাতাকে জাগাইবার জন্য বোধন কর। তবে বিজয়ার প্রতিষ্ঠা হইবে।

দুর্গোৎসবের দুইটী প্রধান অঙ্গ;—একটী আগমনী, অন্যটী বিজয়া। আগমনীতে

কৈলাসধাম হইতে মায়ের হিমালয় গৃহে আগমন,—এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন দিন পিতৃগৃহে মায়ের অবস্থিতি; দশমীতে বিজয়া বা বিসর্জ্জন অথবা মায়ের স্বামীগৃহে গমন। আমরা অতি শৈশবকাল হইতে মায়ের এই আগমন, অবস্থিতি এবং গমন বা বিসর্জ্জন দেখিয়া আসিতেছি। ধনী ধনের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া,—বিলাসী বিলাস ব্যসনের,—রূপসী রূপসজ্জার পারিপাট্য বিধান করতঃ পূজার এই কয়টী দিন খুব আমোদ আহ্লাদের সহিত ধূমাধামে কাটাইয়া তাহারা মনে করেন, মায়ের পূজা বেশ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে, সময়ের ও অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর এই দুর্গোৎসবের উদ্দেশ্য কি শুধু বাহ্যিক আমোদ আহ্লাদ? ইহার মূলে কি কোন সত্য নাই? যে আর্য্য ঋষিগণ, একদিন জ্ঞান-গরিমায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক কি এতই অনুর্ব্বর ছিল যে, শুধু ছেলে খেলার ন্যায় একটা বাহ্যিক আমোদ আহ্লাদের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ রত্নাকর; তাহার রত্নগর্ভে আবহমান কাল হইতে প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন মহা মহা মনীষিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের আবিষ্কৃত ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি ভিত্তিহীন বা নিরর্থক নহে। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রতি কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যুক্ত ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপের মূলে সত্য নিহিত। তাঁহারা সত্যস্বরূপ ভগবানকে জানিয়াছিলেন, তাঁহার বিমল সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন,—তাই তাঁহাদের অযোগ্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য বাহ্যিক আমোদ আহ্লাদের ভিতর সত্য লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, ভারতে এমন দিন আসিবে, যখন তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ সত্যের অমল ধবল বিমল জ্যোতি হারাইয়া তামসিক ও রাজসিক ভাবে আত্মসংমিশ্রণ করতঃ রূপজ মোহে ডুবিয়া যাইবেন,—তাঁহারা আপন সত্তা হারাইবে, আপনাকে ভুলিয়া যাইবে। তাঁহারা উদার ছিলেন, তাই কৃপা পরবশ হইয়া আমোদ আহ্লাদের ভিতর সেই অমূল্য রত্ন লুকায়িত রাখিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে—ছাই নাড়াচাড়া করিতে করিতে হয়তঃ একদিন স্বর্ণ প্রাপ্তির ন্যায় কাহারও প্রাণে সত্যের পিপাসা জাগিতে পারে—কেহ সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে।

আগমনী অর্থে—মায়ের পিতৃগৃহে আগমন, অর্থাৎ যখন জীব ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে,—যখন তাহার হৃদয় পাপ তাপের অসহ্য তাড়নায় অধীর হইয়া উঠিবে,—যখন জীব দেখিবে ভোগসুখে তৃপ্তি নাই,—সন্তোষ নাই,—শান্তি নাই, তখনই তাহার প্রাণে সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিবে,—সে হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যাকুল হইবে। ইহাই আগমনী বা সত্যের আবাহন। ইহাই কৈলাসে গৌরী আনিতে হিমালয়ের গমন এবং মেনকা কর্ত্তৃক বোধন।

তার পর সপ্তমী পূজা অর্থাৎ এইদিন

মায়ের প্রথম পূজা বা সত্যের ঈষৎ আভাষ; যেমন উষার আগমনে পূর্ব্বদিক ঈষৎ আলোকিত হইয়া উঠে, অন্ধকার ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হইতে থাকে, সপ্তমী পূজায়ও সেরূপ সাধকের চিদাকাশে জ্ঞান রবির ঈষৎ উন্মেষ হয় এবং তামসিক ভাবগুলি দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে।

অষ্টমী—অর্থাৎ পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, অন্ধকারও প্রায় কাটিয়া গিয়াছে; এখানে সাধকও সাধন জগতের এক স্তর উর্দ্ধে উঠিয়াছেন; তামসিক ভাব প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, রাজসিক ভাব প্রায় পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধকের অজ্ঞানতার আঁধার নাই বলিলেই হয়। এস্থান হইতে সাধকের পতন হইবার খুব সম্ভাবনা—এস্থান রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভাবের সংযোগস্থল—ইহা সাধকের ভীষণ পরীক্ষার স্থান,—তাই অষ্টমী ও নবমীর সংযোগস্থল সন্ধিপূজা নামে আখ্যাত।

নবমী—সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, অন্ধকার দূরে চলিয়া গিয়াছে; সমগ্র জগৎ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়াছে; সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়া গিয়াছে; এখন আর কোন বিষয়ে দ্বিধা নাই, তাই নবমী পূজায় এত সমারোহ !! এত ঘটা !! সাধকও এই অবস্থায় আরও একস্তর উর্দ্ধে উঠিয়াছেন; সাধকের আর পতনের আশঙ্কা নাই; কেননা তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে; সাধক এখন সত্যের বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন,, সাধক মাকে মনোময়ী মূর্ত্তিতে হৃদয় মন্দির আলো করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছেন, সাধকের আনন্দের আর সীমা নাই—তাই নবমীতে পূজার এত আড়ম্বর ! এত আয়োজন !! এত সমারোহ !!!

আর দশমী—বিজয়া বা বিসর্জ্জন অর্থাৎ এই অবস্থায় সাধক সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্ব প্রকারে সফলতা লাভ করিয়াছেন—সাধক আপন অভীষ্ট সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অথবা সাধক ছেলেখেলা বা বাহ্যিক আমোদ আহ্লাদ বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করতঃ সত্যলাভ করিয়াছেন,—হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নিজে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে বিজয়া বা বিসর্জ্জন অর্থে মাকে ত্যাগ—সত্যকে ত্যাগ নয়; এখানে বিসর্জ্জন অর্থে তামসিক, রাজসিক ভাবগুলির মূলোচ্ছেদ সাধন, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অসত্যের উচ্ছেদ সাধন করতঃ সাধক সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেন, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন,—মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিলেন বা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলেন। * যখন সাধক আত্মার ভিতরে মাকে পাইলেন—সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন তখন বাহ্যপূজা বা অনুষ্ঠানের আর প্রয়োজন নাই, তাই দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন করতঃ বিজয়া বা প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান; সুতরাং বিজয়া অর্থে বিসর্জ্জন নয়—প্রতিষ্ঠা; আবার বিসর্জ্জন না হইলে প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না। কেননা একই সময়ে, একই স্থানে দুইটী বস্তু থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কাজে কাজেই অসত্যের বিসর্জ্জন না হইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা

* এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না বলিয়াই বাহ্য আমোদ আহ্লাদ হারাইয়া সাধারণে বিজয়ার দিনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। লেখক

কিরূপে হইবে? বিজয়ত্ব লাভই বা কিরূপে হইবে? অতএব প্রতিষ্ঠাই বিসর্জ্জন বা বিজয়া, আবার বিসর্জ্জনই প্রতিষ্ঠা বা বিজয়া।

তাই আর্য্যঋষিগণ বিজয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,—বিজয়ায় আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইব,—বিজয়ায় আমরা ভেদাভেদ,—শত্রুমিত্র আপন পর ভুলিয়া যাইব,—সমগ্র জগৎ মায়েরই বিকাশ,—মায়েরই স্বরূপের অভিব্যক্তি বুঝিতে পারিয়া জগতের কোলে আপনাকে লুটাইয়া দিব। বিজয়ায় ভাই ভাই বলিয়া একে অন্যের গলা জড়াইয়া ধরিব, আমরা কাম ক্রোধ, হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া প্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইব,—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইব, তাই বিজয়ার আলিঙ্গন,—বিজয়ার কোলাকোলি,—বিজয়ার প্রণাম,—বিজয়ার প্রেম-সম্ভাষণ,—বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।

বিজয়ার দিন আমাদের বড় শুভদিন। বড় আনন্দের দিন! এই দিন ধনী দরিদ্র,—ইতর ভদ্র,—রাজা প্রজা,—পণ্ডিত মুর্খ,—উচ্চ নীচ বিচার নাই। আজ ধনী আপন ধনৈশ্বর্য্যের গরিমা ভুলিয়া গিয়া অম্লানবদনে দরিদ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছেন,—পণ্ডিত মুর্খকে,—উচ্চ নীচকে,—রাজা প্রজাকে সহাস্য মুখে আলিঙ্গন করিতেছেন? আজ যেন সমস্ত জগৎ কি এক আনন্দোচ্ছাসে মাতিয়া কি এক আবেশে আবিষ্ট হইয়া,—মান, দর্প, অহঙ্কার সব ভুলিয়া কি এক আনন্দ রাজ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে; সকলেরই মুখে হাসি,—সকলের হৃদয়েই আনন্দ! কেন? আজ বিজয়া—আজ সকলেই শুদ্ধচিত্ত হইয়া তুচ্ছ পাশবিক বৃত্তিগুলিকে জয় করতঃ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন,—তাই আজিকার দিনের নাম বিজয়া!! আজ এই দিনে,—ভারতের অতীত গৌরবের দিনে [illegible] সন্তানগণ বিজয়াকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে পরিয়াছিলেন,—তাই আজিকার দিন বিজয়া নামে অভিহিত। আজিকার দিন আর্য্যঋষিগণের সেই অতীত পুণ্যকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদিগকে নবজীবন লাভের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছে, প্রবুদ্ধ করিতেছে, তাই আজ বিজয়া!!!

এস ভ্রাতৃগণ, আজ বিজয়ার শুভ সম্মিলনে, আমরা ভাই ভাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরি—ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি,—একে অন্যের অপরাধ ভুলিয়া যাই—ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা, কুটিলতা, কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি পাশবিক বৃত্তিগুলি চিরতরে দূরে ফেলিয়া দিয়া, "জয় মা বিজয়ার" নামে বিজয় ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে হৃদয়ে বিজয়ার প্রতিষ্ঠা করি,—সত্যের প্রতিষ্ঠা করি,—আমরা বিজয়ার ছেলে বিজয়ত্ব লাভ করি।

জয় মা বিজয়ার জয়!!!

দীন স্বরূপানন্দ।

—০—

প্রেমময়।

(১)

তোমারি প্রেমের পবিত্র কিরণ
বরষিছে রবি জগত মাঝ,
তোমারি প্রেমের স্নিগ্ধ মাধুরী—
ছড়াইছে শশী ভুবনে আজ।

(২)

তোমারি প্রেমের সুশীতল শ্বাস
বহিতেছে সদা মলয় বায়,
তোমারি প্রেমের মধুময় গীতি
পঞ্চমেতে সদা কোকিল গায়।

(৩)

তোমারি প্রেমের সুবাস বিলাতে
ফুটে উঠে ফুল কিবা শোভাময়,
তোমারি প্রেমের মাধুরি লুটিতে,
অলিকুল সদা গুঞ্জরি ধায়।

(৪)

তোমারি প্রেমের মধুর আহ্বানে,
তরঙ্গিনী সদা ছুটিয়া যায়,
তোমারি প্রেমের মাধুরিমা লয়ে
যোগী ঋষি বসে তীরে ধেয়ায় ;

(৫)

প্রেমময়, আমি তোমারি প্রেমেতে—
হয়েছি পাগল পারা,
তুলে লও কোলে "প্রাণাধিক" বলে,
হয়ে, যাই আত্মহারা।

দীন সুরেন্দ্রমোহন।

———0———

হিন্দুধর্ম্ম।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বেদান্ত ধর্ম্মকে "আত্মিক বিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান কোন ধর্ম্মমতের আলোচনা করেন না, বা কোন ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা পুস্তক বিশেষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবারও উপদেশ দেন না। নৈসর্গিক ঘটনা যথার্থরূপে দর্শন করিয়া বিজ্ঞান এমন সকল নিয়মের আবিষ্কার করেন, যাহাতে ব্যবহারিক জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তদ্রূপ, বেদান্ত কিম্বা আত্মিক বিজ্ঞানে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আলোচনা

*স্বামী অভেদানন্দের ইংরেজী বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত—লেখক।

নাই! ইহা ন্যায় ও যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি অর্থাৎ জীবাত্মার যথার্থ তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা জীবাত্মার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্রমিক বিবর্ত্তন প্রণালী বুঝাইয়াছেন। কিরূপে জীবাত্মা একটী জীবাত্ম হইতে খৃষ্ট, বুদ্ধ, রাম বা কৃষ্ণের ন্যায় মহামহিমশালী আধ্যাত্মিক নরপুঙ্গব হইতে পারে এবং সেই বিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যই বা কি ও উহার চরম লক্ষ্যই বা কোথায়, ইত্যাদি বিষয় আত্মিকবিজ্ঞানে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্ন-লিখিত প্রশ্নের ও আলোচনা দেখা যায়— দেহাশ্রয় না করিয়া জীবাত্মা অবস্থান করিতে পারেন কিনা? বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে জীবাত্মা বিদ্যমান ছিলেন কিনা? ইহা আদৌ সৃষ্ট কিনা? মৃত্যুর পর আত্মা থাকেন কিনা, যে বিষয়ে বেদান্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন। মৃত্যুর পর ইহাঁর স্বাতন্ত্র্য থাকে কিনা? ইহা মুক্ত না বদ্ধ? যদি বদ্ধ হন, তবে ইনি কখন মুক্ত হইতে পারেন কিনা? ইত্যাদি। এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৈদান্তিকগণ গ্রীক ও জর্ম্মান দার্শনিকদিগের ন্যায় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যে দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে আধ্যাত্মিক নিয়মপুঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই ন্যায় ও বিজ্ঞানসঙ্গতভাবে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐ আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহই তাঁহাদের ধর্ম্মমতের মূলভিত্তি। ঐ নিয়মগুলি সনাতন বলিয়া উহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও "সনাতন ধর্ম্ম" নামে প্রখ্যাত।

ভারতে ধর্ম্ম ও দর্শন অভিন্ন। ধর্ম্ম দর্শনের কার্য্যোপযোগী দিক্ এবং দর্শন ধর্ম্মের জ্ঞান সম্বন্ধীয় অংশ। তাহারা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ। অতএব, বেদান্ত দর্শনের কথা বলিলে আমরা যুগপৎ ধর্ম্ম ও দর্শন বুঝিয়া থাকি। ভারতে অন্যান্য আরও অনেক দর্শন থাকিলেও সে সমুদয়ের মূল তথ্যগুলি বেদান্তের মধ্যে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতের প্রাচীন কালীন মনীষিগণ ব্যবহারিক জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মত আবিষ্কার করেন। কণাদের পরমাণুবাদ এবং কপিলের বিবর্ত্তনবাদ আজও জগতে অতুলনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আলোচনাও উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। প্রায় চারি সহস্র বৎসর হইল হিন্দু-দার্শনিকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আদৌ কিছু ছিল না, অকস্মাৎ জগৎ সৃষ্ট হইল, তাহা হইতে পারে না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সনাতনী শক্তির ক্রম-বিকাশের ফলেই জগৎ 'উৎপন্ন' হইয়াছে। এই শক্তিকে সংস্কৃতে 'প্রকৃতি' ও লাটীনে 'প্রক্রয়ে ত্রিকস্' বলে। একখানি উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, একজন ঋষি তাঁহার পুত্রকে সৃষ্টি-রহস্য বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বৎস! কেহ কেহ বলেন যে কিছুই ছিলনা, হটাৎ এই পৃথিবী উৎপন্ন হইল; কিন্তু অভাব হইতে কিরূপে জীবের উৎপত্তি হইতে পারে? যেখানে সেখানে শুনা যায় যে বিবর্ত্তনবাদ বর্ত্তমান যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার, ইহা পূর্ব্বকালে অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন যে, হিন্দুরা উহা

উত্তমরূপে জানিতেন এবং গ্রীকগণও যে উহা অবগত ছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তর মনিয়র উইলিয়মস্ ঠিকই বলিয়াছেন যে—"স্পিনোজা জন্মগ্রহণ করিবার দ্বিসহস্র বৎসরেরও অধিকাল পূর্ব্বে হিন্দুগণ স্পিনোজার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন; ডারউইনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই তাঁহারা ডারউইনের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্ত্তনবাদ বুঝিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই তাঁহারা বিবর্ত্তনবাদী ছিলেন। যে সময় তাঁহারা বিবর্ত্তনবাদ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তখন বিবর্ত্তন বলিয়া কোন শব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতেই ছিল না।"—(হিন্দু ধর্ম্মও ব্রাহ্মণধর্ম্ম)। বিবর্ত্তনবাদের সুদৃঢ় শৈলোপরি দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুগণ জাগতিক রহস্য ব্যাখ্যা করিতেন, জীবনের কঠিন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিতেন এবং তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেখানে ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণ আজও যাইতে পারেন নাই। অধুনা বিস্তর পাশ্চাত্য বিবর্ত্তনবাদী অদৃষ্টবাদ সংসৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিবর্ত্তনবাদীগণের সিদ্ধান্ত সেরূপ নহে। বরং তাঁহারা বলিয়াছেন যে কোন জাগতিক শক্তিবলে বা কোন জগৎ স্বতন্ত্র প্রাণীর প্রভাবে জীবাত্মার বিবর্ত্তন ঘটে নাই, কিন্তু আপন আপন বাসনা, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মানুসারে জীবাত্মা নিজেই নিজের ভাগ্য গঠন ও আকারিত করিয়া লয়। জীবাত্মা স্বাধীনভাবে বাসনা ও কর্ম্ম করিতে পারে। প্রত্যেক জীবাত্মা অসীম শক্তির আধার; উহা অসীম কার্য্য করিতে সক্ষম। কিছুই ছিলনা, অকস্মাৎ জীবাত্মা সৃষ্ট হইল, তাহা নহে; উহা কাহারও ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে উৎপন্ন হইল তাহাও নহে। উহা সনাতন, অনাদি অনন্ত। বর্ত্তমানাবস্থায় উহাকে কার্য্য কারণের অধীন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুরা মনুষ্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই কার্য্য-কারণবিধি প্রযুক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতে উহাকে 'কর্ম্মফল' বলে। ইহাদ্বারাই তাঁহারা মনুষ্যের সৎ অসৎ প্রবৃত্তির হেতু ব্যাখ্যা করেন।

হিন্দুগণ এরূপ বিশ্বাস করেন না যে, ঈশ্বর কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলেন না যে তিনি পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার দেন ও পাপীকে শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তি বা পুরস্কার আমাদিগের পূর্ব্বকর্ম্মেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রত্যেক জীবাত্মাই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। সে ভোগ এখানেও হইতে পারে বা অন্য কোন স্থানেও হইতে পারে।

বেদান্তধর্ম্ম বহু ঈশ্বর মানিতে বলেন না। ইহাঁর মতে ঈশ্বর এক, কেবল নাম অনেকগুলি। বেদান্ত বলেন ঈশ্বর এক হইলেও ভক্তের বাসনানুসারে যে কোন আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিতে পারেন। হিন্দুদিগের ঈশ্বরের বিশেষ কোন 'নাম' বা বিশেষ কোন 'রূপ' নাই। সেই নিরাকার ও নিরুপাধিক পরাৎপরকে সহস্র সহস্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তিনি জগতের বাহিরে নহেন, তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তিনি ভিতরেও আছেন, আবার বাহিরেও আছেন। তিনি দ্বৈতবাদীর নিকট সাকার, অদ্বৈতবাদীর নিকট নিরাকার। তিনি এক,

কিন্তু তাঁহার বিভাব বহু। তিনি সগুণ, নির্গুণ এবং গুণাতীত। যিনি দ্বৈতবাদী বা একেশ্বরবাদী, তাঁহার নিকট তিনি সগুণ; যিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কিম্বা যিনি ঈশ্বরের স্বয়ম্ভুত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসবান তাঁহার নিকট তিনি নির্গুণ। আবার, যিনি খাঁটী অদ্বৈতবাদী, তাঁহার নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ ও প্রেমের অসীম অর্ণব স্বরূপ।

হিন্দুধর্ম্ম জীবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের হ্রাস বৃদ্ধি স্বীকার করেন। কিরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমান্বয়ে উন্মেষ হয়, সে বিষয়ের বর্ণনা হিন্দুধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ উন্নতির প্রথমে ঈশ্বরকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়; যেন তিনি বিশ্বের পিতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা; যেন পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র স্থানে তিনি বসবাস করেন। দ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বরবিষয়িণী ধারণা এইরূপ।

কেহ বলেন হিন্দুগণ ঈশ্বরের পিতৃভাবটী খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বৈদিক সাহিত্য বা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে ঐ সকল স্থানে এমন বিস্তর বাক্য আছে যাহাতে ঈশ্বরকে বিশ্বের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। "হে পরমেশ্বর! তুমি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বিশ্বের পিতা। তুমি সকলের পূজ্য। ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই। তোমার শক্তি অতুলনীয়, তোমার অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?"—(ভগবদ্গীতা, ১১।৫।৪৩)

আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় ক্রমে ঈশ্বরকে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বোধহয়। তখন বোধ হয় তিনি যেন একটী বিরাট অখণ্ড বস্তু। আমরা তাঁহার অংশমাত্র। সে অবস্থায় তিনি বিশ্বের পিতামাতা উভয়ই; অর্থাৎ, তখন তিনি যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরের পিতৃভাবটী হিন্দুর নিকট শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া বিবেচিত হয় না; কেননা, এই ভাবে তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি যেন জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এবং জগতের মাত্র নিমিত্ত কারণ। এইরূপ ধারণা করিলে প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সমসাময়িক ও জগতের উপাদান কারণ বলিলে চলে না। কিন্তু যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐশী শক্তিকে প্রকৃতি বলে এবং উহা পরাৎপর হইতে অভিন্ন, তখনই প্রতীত হইবে যে তিনি বিশ্বের পিতা ও মাতা উভয়ই। ইহাকেই বিশিষ্টাদ্বৈত ধারণা বলে।

তৃতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা আরও একটী উচ্চ অঙ্গের ধারণা আছে। সে ধারণাটী এই—মনুষ্যের সার প্রকৃতিটী আর জগতের সদ্বস্তু কিনা পরমাত্মা উভয়ই এক। এই ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াই খৃষ্ট বলিয়াছিলেন:—"আমি ও আমার পিতা উভয়ই এক।" হিন্দু বলেন—"সোঽহং" আমিই সেই অদ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্ম।" আধ্যাত্মিক ভূমির এই একত্বভাব সমুদয় ধর্ম্মেরই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

হিন্দুরা বলেন যে ভগবানের দ্বৈতভাবের ধারণা অর্থাৎ তিনি যেন একজন মানুষ,-মানুষের গুণাবলী যেন তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, এই প্রকার ভাব জীবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির বাল্যাবস্থা। এই দ্বৈতভাব হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতভাব আইসে, তার পর সর্ব্বশেষে

অদ্বৈতভাব প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। স্থূল দেহে যেরূপ বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার আবশ্যক, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিরও ঐ ক্রমগুলির প্রত্যেকটীরই প্রয়োজন। উপাসনা মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে দ্বৈতবাদী হইয়া জন্মগ্রহণ করা ভাল বটে, কিন্তু চিরদিনই ঐ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করা বাঞ্ছনীয় নহে। যিনি চিরদিনই ঐরূপ দ্বৈতবাদী হইয়া থাকিয়া যান, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের বাল্যাবস্থাটী অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন না। বৃদ্ধির নামই জীবন, বিরতির নামই মৃত্যু। এই কারণে, বেদান্ত ধর্ম্ম বিষয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

আমরা আজ যে বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, কাল উহা আমাদিগের আবশ্যক না হইতে পারে। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহা আবশ্যক হইবে তাহার জন্য আমাদিগকে সতত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আমাদিগকে পেছন দিকে যাইতে হইবে না, যতদিন আমরা আমাদিগের লক্ষ্যে পহুঁছিতে না পারিব ততদিন আমরা কেবল সম্মুখদিকেই অগ্রসর হইব। "উঠ, জাগ, জ্ঞানীর সঙ্গ খুঁজিয়া লও এবং যতদিন লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে না পার ততদিন ক্ষান্ত হইও না।" যতদিন না তুমি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দেখিতে পাও এবং যতদিন না তাঁহার সহিত একীভূত হও, ততদিন ক্রমশ সম্মুখেই অগ্রসর হও, ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপদেশ এইরূপ।

হিন্দুদিগের বেদান্তধর্ম্ম ইহজীবনেই দিব্যভাব লাভ করিবার জন্য যতটা আগ্রহের সহিত উপদেশ দিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম সেরূপ দেন নাই।

উহাই সমুদয় ধর্ম্মের লক্ষ্যস্থল। ঐ স্থলে যাইবার জন্য অনেকগুলি পথ আছে। প্রবৃত্তি, ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। এই কারণেই বেদান্ত কোন একটী পথ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কতকগুলি পথের নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার যেমন রুচি, সে সেইরূপ পথ বাছিয়া লয়। যেটী প্রকৃত জ্ঞানের পথ, তাহাকে 'জ্ঞানযোগ' বলে; যেটী ধ্যান ধারণার পথ, তাহাকে "রাজযোগ বলে; যেটী নিষ্কাম ধর্ম্মের পথ তাহাকে "কর্ম্মযোগ" বলে; এবং যেটী আনুরক্তি ও পূজার্চ্চনার পথ, তাহাকে ভক্তিযোগ বলে। এই পথগুলির প্রথাগুলির প্রত্যেকটীর আবার অনেকগুলি করিয়া শাখা আছে। একটী জামা যেমন সকলের গায়ে হয় না, সেইরূপ একটী পথ সকলের রুচিকর হয় না।

হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রভাবে শান্তিপ্রিয় ও দয়ালু হইয়াছেন। এবং এই ধর্ম্মপ্রভাব বশতঃই তাঁহারা অন্য কোন দেশ আক্রমন করেন নাই। খৃষ্টানজাতিগণ যেমন ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, রাজ্যাধিকার প্রভৃতির জন্য তীব্র, অতৃপ্ত বাসনানলে দগ্ধ হইয়া যাতনা পাইয়া থাকেন, হিন্দুগণ সেরূপ পান না।

হিন্দুগণ কোন কিছুর বিরোধী নহেন। ইহাঁরা প্রথম হইতেই মৈত্রী অভ্যাস করেন। বেদান্ত, বুদ্ধ ও পরে খৃষ্টের অনেক শিষ্যই আজ পর্য্যন্তও ইহা হৃদয়ঙ্গম ও অভ্যাস করিতে পারেন নাই। বেদান্তপ্রভাবে হিন্দুগণ বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন যে পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান থাকিলেও তাহাদের অন্তরালে একই ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত

হইতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগুলি একই সাধারণ ধর্ম্মের আংশিক বিকাশ মাত্র। এই সাধারণ ধর্ম্মের বিশেষ কোন নাম নাই, ইহা জগদ্-ব্যাপী। ইহার কোন বিশেষ পরিচয়, নাম, আচরণ, মন্দির আবশ্যই নাই। সত্যের পালনই ইহার আচরণ ও পরিচয় এবং মানবদেহই ইহার পবিত্র মন্দির; এই মন্দিরে অক্ষর বস্তু বিরাজ করেন। এই মহীয়সী ধারণার ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের সমগ্র ধর্ম্ম ইতিহাস আলোচনা করিলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎপীড়ন বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমরা যে ধর্ম্ম বা যে সম্প্রদায়ভুক্ত হই না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি, কতটুকু দিব্যভাব আমাদের করায়ত্ব হইয়াছে এবং আমরা পাশবিক প্রকৃতির উপর কতটুকু অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে। এইগুলিই প্রকৃত ধর্ম্মের সার জানিয়া একজন বৈদান্তিক ধর্ম্ম লইয়া বাক্-বিতণ্ডা করেন না; অন্য ধর্ম্মের নিন্দাও করেন না; কখন বলেন না যে "আমরা ঈশ্বরই একমাত্র সত্য আর সকলের ভুল"; কোন বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে কখনই উৎপীড়ন করেন না। এই বৈদান্তিক সকল ধর্ম্মও সকল সম্প্রদায়ের লোককেই পারমার্থিক জ্ঞান দান করিয়া সাহায্য করেন, সকলেরই শুভ কামনা করেন এবং মনে ২ বুঝেন যে সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক।

"হে ঈশ্বর! নদী সমূহ ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতে উদ্ভূত হইয়া কেহ সোজা পথ, কেহ বাঁকা পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া শেষে সকলেই সমুদ্রে যাইয়া পড়ে; তদ্রূপ, নানা প্রকার ধর্ম্ম, নানা প্রকার সম্প্রদায়, নানা প্রকার মতে উৎপন্ন হইয়া সোজা ভাবে হউক, বাঁকা ভাবে হউক শেষে তোমাতেই যাইয়া মিশিয়াছে। তুমি সচ্চিদানন্দ ও প্রেমের অসীম সমুদ্র স্বরূপ।"

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ।

—o—

নিবেদন।

যা করাচ্ছ তুমি, তাই করি আমি,
আমি কভু কর্ত্তা নহি;
তোমারই ইচ্ছায়, হয় সমুদয়,
আমি তোমা ছাড়া নহি;
একথা নিশ্চয়, তবে কেন হায়,
আমি, আমি করে মরি,
করণ হইয়ে, কর্ত্তা রূপ লয়ে,
বল অন্ধকারে কেন ঘুরি?
কর্ম্মের বন্ধন, না করি মোচন,
আরো কর্ম্মপাকে মজি;
সুকর্ম্ম অকর্ম্ম, করিয়ে কুকর্ম্ম,
আমি তার প্রভু সাজি।

তুমি যে রয়েছ, তুমি যে করাচ্ছ,
সে কথা ত ভুলে থাকি;
কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ক্ষোভ
হৃদয় ভরিয়ে রাখি;
দয়াময় হরি, এ মিনতি করি
ভুলাও আমারে তুমি;
তোমারি ইচ্ছায়, ইচ্ছার উদয়
যেন নাহি ভুলি আমি।

পাপ কিম্বা পুণ্য, দুয়ে ভাবি শূন্য
তোমারে ধরিতে পারি;
সংসার যাতনা, না করি বাসনা
তোমাতে সপিতে পারি।

শ্রীবনবিহারী আচার্য্য।

——0——

সোঽহং তত্ত্ব।

ধর্ম্ম জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় মানবের স্বভাবগত ভাবের পুষ্টি বিধানই ধর্ম্মের ভিত্তি। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-জগতে বহুশাখাসমন্বিত বহুধাবিভক্ত ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মমত শ্রীভগবানের অবতারগণ ও তাঁহার আদিষ্ট মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদিসমন্বিত তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল আদিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমর্থন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের বিকাশের চেষ্টা হইয়াছে এবং পরিশেষে প্রত্যেক চেষ্টাই ফলবতী হইয়া এক বিশাল বিরাট ঊর্দ্ধমূল, অধঃশাখ মহীরুহের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক শাখারই এই মূল তত্ত্বে অর্থাৎ স্বভাবের অনুসরণে ধর্ম্মবীজ সংস্থাপিত করা হইয়াছে। কাজেই ভারতে হিন্দু, আরবে মুসলমান এবং ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। মূল লক্ষ্যস্থলে অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে রাখিয়া এই ধর্ম্মবৃক্ষ সম্প্রদায় বিভাগে ও মতবাদে বহুশাখা প্রশাখায় দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। মানবের অনন্ত স্বভাব, ভগবানের অনন্ত ভাব। কাজেই মানুষ যে ভাবেই পরিচালিত হউক না কেন তাহাই সুনিয়মে শৃঙ্খলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভগবদ্ভাবে পঁহুছিতে পারিবে।

এই স্বভাবের অনুসরণে ভারতীয় ধর্ম্ম-গগনে দুইটী বিশেষ মতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই দুইটী মত বিশেষরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। একটী জ্ঞানভাব অপরটী ভক্তিভাব। জ্ঞানভাবের তত্ত্ব "সোঽহং"— ভক্তিভাবের তত্ত্ব "দাসোঽহং"।

মানবের "হাম্‌বড়া" আমি বড়, এই ভাবটী খুব স্বভাবগত ও মজ্জাগত। শত বিষয়েও যদি একজন ব্যর্থমনোরথ হয়— আশার দুয়ারে প্রতিহত হয়, তবুও সে যে বড়, সে যে কর্ত্তা একথা ছাড়িতে পারে না। একথা ভুলিতে পারে না। সে তার জুতার কর্ত্তা, মোজার কর্ত্তা, ভাঙ্গা কলসীটীর

পর্য্যন্ত সেই কর্ত্তা। কঠিন আঘাতে তা'র কর্ত্তৃত্বজ্ঞান শতধা বিভিন্ন হইলেও সে আবার সেইগুলি ধীরে ধীরে কুড়াইয়া লয়,—ধীরে ধীরে আবার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান গড়িয়া লয়। এই যে স্বভাবগত কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান—ইহাকে সুনিয়মে পরিবর্দ্ধিত করাই জ্ঞানযোগ। তুমি যখন কর্ত্তা হওয়ার অভিমান ছাড়িতে পার না, তখন শুধু নিজ গৃহের কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া থাক কেন? তুমি কেন ভুলিয়া যাও যে, তুমি দেশের কর্ত্তা, দশের কর্ত্তা, পৃথিবীর কর্ত্তা তুমি; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির কর্ত্তাও তুমি; তোমারি ইচ্ছায় দিন যায়, রাত্রি আসে, ষড় ঋতুর আবির্ভাব হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘে বৃষ্টি হয়; তোমারি ইচ্ছায় অত্যুচ্চ ভূধর গভীর খাতে পরিণত হয়; আবার ভীমনিনাদি সাগরগহ্বর শুষ্ক হইয়া পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়; তোমারি ইচ্ছাই সব। দিন তোমার, দুনিয়া তোমার; এইরূপে যখন তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে তখন দেখিলে জগতের প্রত্যেক অনু পরমাণুর পর্য্যন্ত তুমিই কর্ত্তা। তখন তুমি বুঝিবে যে প্রত্যেকের কর্ত্তা হইয়া তুমিই প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজিত। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তুমি অজর, অমর, নিত্য। তোমাকে অস্ত্র কাটিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল তোমাকে মগ্ন করিতে পারে না বা বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। তুমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য সর্ব্বব্যাপী, স্থিরভাব এবং সদা একরূপ। এই জ্ঞানের চরম অবস্থা। স্বভাবগত অহংজ্ঞানের আমি—কর্ত্তা এই জ্ঞানের বৃদ্ধিতে ক্রমে সোহং অবস্থায় পূর্ণত্ব লাভ। এই জ্ঞানের অবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভারতে আত্মতত্বের বিজয় দুন্দুভি ধ্বনি করিয়া তুষারশুভ্র হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানের অমৃত পান করাইয়া সকাম-কর্ম্মনিষ্ঠ নিরীশ্বর-বাদরত কুতন্ত্র-মুগ্ধ বৌদ্ধ-ভারতবর্ষকে আত্মজ্ঞানের মোহন তানে জাগরিত করিয়াছিলেন।

আবার মানবের আকাঙ্ক্ষা অতীব দুষ্পূরণীয়, সে যতই চায় ততই পায়, আবার যতই পায়, ততই চায়। কাজেই দৈনন্দিন তা'র অদম্য আশা বাড়িতে থাকে। এ বৃদ্ধির সীমা নাই; অসীম অনন্তের কোলে এই আশার পশ্চাতে হাহাকার ধ্বনি ছুটিতেছে। দীন কুটীরবাসী সে আশার তাড়নে উৎপীড়িত, সেই একই আশাকুহেলিকার আবরণে মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী আত্মহারা। কুটীরবাসী কাঙ্গাল এক পয়সার ভিখারী আর রাজা রাজ্যের ভিখারী। ভিখারী উভয়েই। উভয়েই আশারাণীর দুয়ারে হাত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান। ভক্তিযোগে ভক্তের ভাবে এই এক আশারই ক্রমবিকাশ দেখা যায়; কেবল ভিন্ন পথে চালিত হয় মাত্র।

ভক্ত ভগবানের কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার চরণ পানে তাকাইয়া থাকেন। ভগবান্ প্রথম তাহাকে দাস্যভক্তি বা দাসভাব প্রদান করেন। ভক্ত দাস রূপে ভগবানের সেবা করিয়া তৃপ্ত হন না। তখন অন্যভাবে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য লালায়িত হন। ভগবৎকৃপায় ক্রমে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভক্ত বিভোর হইয়া যান। মধুরভাবে ভক্ত—ভগবানের জন্য পাগল হইয়া

উঠেন। প্রেমময়ের জন্ম প্রেমেরকাঙ্গাল ভক্ত তখন পাগল হইয়া অহর্নিশি অনাহার, অনিদ্রায়, কাটাইতে থাকেন। এই আশার মোহে—প্রেমময় ভগবানের প্রেমের মোহন-মন্ত্রে ভক্ত তখন আত্মহারা হইয়া থাকেন। যে আশা তাঁহাকে ক্ষুদ্র বিষয় মোহে ডুবাইতেছিল, অনিত্য সংসার মায়ায় মজাইতেছিল, সেই আশা ক্রমে তৃপ্তি ও অতৃপ্তির মধ্য দিয়া অনন্ত মুখে প্রবাহিত হইয়া সেই বিশ্বতোমুখ ভগবানের সহিত ভক্তকে মিলাইয়া দেয় এবং তখনই কেবল মাত্র আশার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। ইহাই ভক্তিযোগে ভক্তের চরম অবস্থা। প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই প্রেম-পিপাসায় অনন্ত হাহাকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার সমস্ত জীবন একটী হাহাকারের সমষ্টি। তাঁহার জীবনে তিনি জীবগণকে কেবল ভগবানের কৃপার জন্যই আশা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন এবং লীলার শেষ পর্য্যন্ত প্রেমময়ের জন্ম হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন।

এই প্রেমের ফলও সেই পরম প্রেমস্বরূপের সহিত সম্মিলন—একাত্মবোধ—অভিন্নভাবের সৃষ্টি। সেই অণুতে অণুতে, পরমাণুতে পরমাণুতে, বৃক্ষে বৃক্ষে, নদী সৈকতে, পর্ব্বত শিখরে, নীলিম গগনে প্রেমময়ের প্রেমবৈচিত্র দর্শন, প্রেমময়ের প্রেমস্পন্দনের অনুভূতিতে ভক্ত আত্মহারা, পাগল। সেময় জগত, জগতময় সে।

জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই ক্রমে ক্রমে একই তত্ত্বে উপনীত হন। কেবলমাত্র প্রথম অবস্থায় ভাবের বিভিন্নতা হেতু কখন পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত ভক্তে কোন পার্থক্য নাই। যেহেতু জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি অগ্রসর হইতে পারে না; এবং ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞানবিচারে—যে "আমি, আমি" করিয়া জীব পাগল, সে 'আমি' কি? আমি কি দেহ? না, দেহ নই। যেহেতু, দেখা যায়, মৃত্যুর পর দেহ অসাড় নিস্পন্দ পড়িয়া থাকে। কাজেই আমি দেহাতিরিক্ত কোন বস্তু। তবে কি আমি মন, না বুদ্ধি? এইরূপে ক্রমে বিচার করিয়া যখন জ্ঞানযোগী তাঁহার নিজের সত্তার সন্ধান প্রাপ্ত হন, তখন দেখেন যে তাঁর যে আমি, সে আমি জগৎময়—অণু হইতে শিব পর্য্যন্ত সেই একই বস্তু যাহা আমাতে অবস্থান করিয়া আমি, আমির ভান ধরিয়াছে।

আবার, ভক্ত প্রথম দীনদয়াল, অনাথশরণ, পতিতপাবন শ্রীভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে আরম্ভ করেন, তার গুণানুকীর্ত্তন করেন—তাঁর সেবায় রত থাকেন। দাস ভাবে তার সেবা, তার ভক্তের সেবা, করিতে থাকেন। ক্রমে সাধনগুণে দয়াল প্রভুর দয়া হয়, ভক্ত তখন ভগবানের সখা হন, কাঁধে চড়েন, কাঁধে চড়ান,—একত্রে খেলা করেন। পরে মাতা হন, মাতা হইয়া—মাতৃভাবে বিভোর হইয়া ভগবানকে সন্তানভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁর সেবা করেন, শয়ন ভোজন করান এবং তৎপর মধুরভাবে তাঁর সঙ্গিনী, রঙ্গিনী রূপে পরিণত হন। তখন ভগবান প্রেমিক রসিক নটবর। ভক্ত তখন প্রেমিকা, রসিকা, প্রেমলোলুপা। ক্রমে ভক্ত দেখেন,—তিনিও যা, তাঁর প্রেমিকও তাহাই। কখনও নিজকেই

প্রেমিক মনে করিয়া নিজেরই পূজা করেন। জগৎময় তাঁর প্রেমময়কেই দেখেন। দেখিয়া প্রেমপাগলিনী সাজেন। এইরূপে ভক্ত আপনা ভুলিয়া যান, অহং ছাড়িয়া—সোহং হন। তিনি ভিন্ন ভক্ত আন দেখেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে—যে "সোহং" সাম্প্রদায়িক গোঁড়াগণের তথাকথিত নাস্তিকতা নহে। উহা আস্তিকতা অর্থাৎ ভগবদুপলব্ধি জন্য সাধকের অবলম্বনীয় একটী ভাব বিশেষ।

যখন বৌদ্ধগণের নিরীশ্বর কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়া তান্ত্রিক সাধনার খোলস পড়িয়া ঘোর পাশবিক অত্যাচার সাধনার স্থলে ইন্দ্রিয়-সুখলালসাপরিতৃপ্তি এতদ্দেশবাসীগণকে অনন্ত পাপপঙ্কিলখাদে নিমজ্জিত করিতেছিল, তখন একবার শ্রীভগবানের আসন, তাঁহার অতি আদরের ভারতীয় সন্তানগণের দুর্দ্দশা দর্শনে, কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাই শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিনাত্যে আবির্ভূত হইয়া "সোহং" "তত্ত্বমসি" আদি প্রতিপাদ্য জ্ঞানঘন প্রেমময় সনাতন সত্য বস্তুর অনাদি অনন্ত অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবদ্-বিমুখী ধ্বংসমুখী ভারতবাসীগণের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

সোহং অর্থাৎ আমি সেই (পূর্ণ ব্রহ্ম); ইহা বিশ্বপ্রেমাত্মক। সঃ অহং—সঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কি? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ অহং খলু ইদং সর্ব্বং—এই পরিদৃশ্যমান জীব ও জগৎপ্রপঞ্চ স্থূল সূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষে আমারই বিকাশ—এতদ্ সমুদয়ই আমি। এ আমি কাম-কামনাপরিপুষ্ট মন নহে, এ আমি বিষয়ভোগপরিপুষ্ট মন নহে। এ আমি কি তাহা ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিজ মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা;—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং।
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন চপঞ্চবায়ু
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদৌ ন চোপস্থপায়ু
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।২
ন মে দ্বেষ রাগৌ ন মে লোভ মোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্ম ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং।৩
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।৪
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্য
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং।৫
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভু র্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম্।
ন বা বন্ধন নৈব মুক্তি র্ন ভীতি
চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং।৬

শ্রীমৎস্বামী স্বরূপানন্দ কৃত ভগবান শঙ্করা-চার্য্যের নির্ব্বাণষটকের পদ্যানুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য দেওয়া গেল—

(১)

নহি আমি অহংকার, চিত্ত, বুদ্ধি মন,
না হই নাসিকা, জিহ্বা অথবা শ্রবণ।

তেজাকাশ ভূমি নহি বায়ু বা নয়ন,
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন ॥

(২)

প্রাণসংজ্ঞা নহি আমি কিংবা পঞ্চ বায়ু,
সপ্তধাতু নহি আমি পাদোপস্থ পায়ু।
নহি আমি পঞ্চকোষ শব্দ বা বচন,
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন।

(৩)

পাপ পুণ্য নহি আমি, কিংবা নহি সুখ,
মন্ত্র, তীর্থ, বেদ নহি, নহি আমি দুঃখ,
যজ্ঞ, ভোজ্য, ভোক্তা নহি অথবা ভোজন
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন ॥

(৪)

দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ না আছে আমার.
মাৎসর্য্য ভাব নাই মদের বিকার,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, নহি কদাচন,
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন ॥

(৫)

জন্ম, মৃত্যু, শঙ্কা, নাই, নাই মোর পিতা,
জাতিভেদ নাই মোর, নাহি মোর মাতা,
গুরু, শিষ্য, বন্ধু, মিত্র নাই কোন জন,
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন ॥

(৬)

নির্ব্বিকল্প রূপী আমি, আমি নিরাকার,
আমি সর্ব্বব্যাপী, বিভু ইন্দ্রিয় সবার,
ভীতি, মুক্তি নাহি মোর, অথবা বন্ধন,
চিদানন্দ রূপী আমি শিব সনাতন ॥

দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমি এই দেহ এই জ্ঞান থাকিতে এহেন "আমি"র দেখা পাওয়া যায় না। এই দেহকে আমি জ্ঞান করিয়া, এই দুদিনের জন্য এ ভবসংসারে ধুলিখেলা খেলিতে আসিয়া আমরা এই দেহ রূপ "আমি"কে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য, কত যে চেষ্টা দিন রাত করিতেছি তাহার সীমা নাই, সংখ্যা নাই। সুকাজ কুকাজ কিছুই বাকি রাখিতেছি না; কিন্তু যদি বুঝিতে—পারি, যদি জানতে পারি—দেখতে পারি যে এ জগৎপ্রপঞ্চ "আমারি' বিকাশ "আমি"ই এ জগৎ জুড়িয়া রহিয়াছি তাহা হইলে "আমি" ক্ষুদ্র গণ্ডি-পাঞ্চভৌতিক দেহে আবদ্ধ আমি কাটিয়া অনন্তে মিশিয়া যায়। তখন আমি পরম প্রেমের চরম আদর্শে উপনীত হয়। তখন আমার প্রাণের ঐকান্তিক ভোগ লালসা সদা সুখে থাকিবার জন্য অবিরাম আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের অণুতে অণুতে প্রসারিত হইয়া যায় তখন হিংসা থাকে না, দ্বেষ শুকাইয়া যায়, কাম থাকে না, ক্রোধ থাকে না, তখন আমার প্রেম অনন্তের প্রেমে ডুবিয়া যায়। তখন আর হিংসা করিবেই বা কাকে? সবই যে আমি। কাজেই রিপুগণ—নিজ নিজ স্থানে পলায়ন করে। জীব তখন সকল জ্বালা মুক্ত হইয়া সকল বেদনা ঘুচাইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। যথা—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। গীতা। ২।৭০

এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলি বহির্ম্মুখী না হইয়া যখন অন্তর্মুখী হয়, তখন তাহার সকল সাধ পূর্ণ হয় এবং পরমপদ লাভ হয়—যথা

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহু পরমাগতিম, ॥
কঠোপনিষৎ

তখন জগতের প্রাণে প্রাণে তাহার প্রাণ—জগতের স্থানে স্থানে তার স্থান—জগৎময় সে, সেময় জগৎ হইয়া যায়। এই বিশ্বপ্রেম নয় কি; জগৎময় আমি, আমাময় জগৎ—এ জ্ঞান—এ উপলব্ধি ভিন্ন বিশ্বপ্রেম কোথায়? যখন জীব এইভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হয় তখনই সে প্রেমস্বরূপের প্রেম প্রবাহে ডুবিয়া প্রেমের হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্ত প্রেমগাথা গাইয়া গাইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে পাপ করিয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। জীব তখন বিশ্বের টানে টানে উপলব্ধি করিয়া—"আমি"কে চিনিয়া ফেলে এবং জাগিয়া উঠে। তখন সে (এক কথায় বলিতে গেলে) জীবত্ব ছাড়িয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ সে যে এ মর্ত্ত্যজগতের নয়, সে যে বিশ্ববিধানকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের সন্তান, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে। এই-রূপে জীব শিব হয়; অহং ছাড়িয়া সোহং হয়। আমি, আমি ছাড়িয়া তুমি, তুমি হয়। তখন আমিকে হারাইয়া জগৎময় তুমিকেই দেখে আর তোমার তোমার করিয়া পাগল হয়। ইহা কি ভক্তিভাব নয়? ভক্তিযোগে ভগবানকে সাধন করিলেও কি এই অবস্থা লাভ হয় না?

এতদ্ব্যতীত ভগবান যে সর্ব্বভূতে বিরাজ-মান আছেন একথা কোন সম্প্রদায়ই অস্বী-কার করেন না। "যত্র জীব তত্র শিব" "ঘট ঘটমে বিরাজে, রাম", "ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন" ইত্যাদি সদা প্রচলিত সাধকমুখবিনিঃসৃত বাক্যাদি দ্বারা খুব স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই সোহংভাব সর্ব্ব সম্প্রদায়েই কোন না কোন প্রকারে অবস্থান করিতেছে। একমাত্র ভগবানই—সর্ব্ব জীবের—হৃদয়কন্দরে অব-স্থান করিতেছেন—যথা—

এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলে চন্দ্রবৎ।
ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ।

একই চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থিত জলে বহু প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এক আত্মাই প্রত্যেক ভূতে অবস্থিত থাকিলেও উপাধিভেদে নানা রূপে দৃষ্ট হয়েন। —একই আত্মা বা ভগবান সর্ব্ব জীবে অর্থাৎ ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন।

সোহং বলিলে আমি জড় দেহে অবস্থিত ভগবান বুঝাইলেও নাস্তিকতার কোনরূপ আভাষ পাওয়া যায় না। তাঁহাকে উপলব্ধি করা সে যেমন করিয়া পারে করিলেই হইল। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "মিছরির রুটী উহা সোজা করিয়াই খাও, আর আড় অর্থাৎ বাঁকা করিয়াই খাও, মিষ্ট লাগিবেই। কাজেই ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া এরূপ বিদ্বেষ ভাব পরিপোষণ দ্বারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষা বা ঘৃণার সঞ্চার হওয়া মুক্তি-বিরোধী; কাজেই সর্ব্বথা হেয়।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য "তত্ত্বমসি" দ্বারাও ঐ একইভাব প্রকাশিত হয়। তৎ ত্বং অসি—তুমিই সেই পরমাত্মা—ভগবান। কিন্তু অপূর্ণ, যেহেতু মায়াবরণে আচ্ছা-দিত—। তিনি পূর্ণ,—তুমি অংশ। একই বস্তু তিনিও তুমি, কিন্তু তিনি তোমাতে

অব্যক্ত। যেহেতু তুমি জান না তুমি কি বা কে? জানিতে পারিলে আর এ ভাব থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় তুমিই সেই কণাও নও, অংশও নও—পূর্ণ—অভেদ। যেহেতু অনন্ত অসীম বস্তুর আবার অংশ,-সীমাবদ্ধ ভাগ কি?

তুমি যে সেই প্রেমময়ের সন্তান, তুমি যে সেই অনন্ত প্রেমাধারের এক কণা—তা, তোমার মনে নাই। জন্ম জন্মান্তরে বিষয় বাসনা, কাম কামনার দাসত্ব করিয়া তুমি যে সেই জগৎ প্রভুর দাস—তুমি যে ইন্দ্রিয়াদির দাস নও তা' ভুলিয়া গিয়াছ। যাহারা—তাঁহাকে জানিয়াছেন—সময় থাকিতে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হও, নৈলে এই মোহ-ভাব ঘুচিবে না। এ সম্বন্ধে বেশ একটী গল্প আছে; যাহা হইতে আমাদের এই ভগবত্ত্ব ভুলিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার ভ্রম সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

একদা কোনও প্রান্তরে একদল মেষ চড়িতেছিল। নিকটবর্ত্তী বনান্তরাল হইতে একটী বাঘিনী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ মেষপালের মধ্যে আপতিত হইল। ঐ বাঘিনী গর্ভবতী ছিল। সে মেষদলের মধ্যে পতিত হইবা-মাত্রই তাহার একটী সন্তান প্রসব হইল। বাঘিনী এরূপে হঠাৎ প্রসব হওয়ায় অধীর হইয়া শীকার ত্যাগ করতঃ বনে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নবপ্রসূত শাবকটী মেষপালকের যত্নে মেষগণের সহিত ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে সে মেষশাবকের সহিত ঘাস খাইতে ও মেষশাবকের ন্যায় ভ্যা ভ্যা রব করিতে শিখিল। ব্যবহারে ঠিক মেষশাবকের মত হইলেও তাহার একটু বিশেষ পার্থক্য ছিল। সে একটু দ্রুত ছুটীতে পারিত—আর খুব বড় লম্ফও দিতে পারিত। ক্রমে ক্রমে সেই বাঘিনী-নন্দন বড় হইয়া পূর্ণায়তন একটী মেষের সমান হইয়া উঠিল। একদিন মেষগণ পূর্ব্ববৎ বনপ্রান্তে ঘাস খাইতেছিল। এমন সময় কিছু দূরে একটী ব্যাঘ্র দেখা দিল। মেষপাল ব্যাঘ্র দর্শনে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটীয়া পলায়ন করিল; কিন্তু সেই মেষভাবপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র-শাবক পলাইতে পারিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ আক্রমন-কারী ব্যাঘ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার প্রাণে কি যে এক অনুপ্রাণনা ছুটীতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না—সুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া ব্যাঘ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল। ব্যাঘ্র ভাবিল, সবগুলি মেষই'ত পলায়ন করিল, কিন্তু ওদের দল হইতে একটী দাঁড়াইয়া রহিল কেন? সে ক্রমে নিকটে আসিয়া দেখিল যে ওটী মেষ নয়, একটী ব্যাঘ্রশাবক। দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? শাবকটী তখন ভীতি-বিহ্বলচিত্তে বলিল "ও ব্যাঘ্রমশাই, আমায় খাবেন না, আমি অতি ক্ষুদ্র মেষ"। তখন ব্যাঘ্র উহার ভয়ের কারণ বুঝিল এবং তাহাকে জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া বলিল "তুমি ঐ জলের দিকে তাকাইয়া তোমার মুখখানি একবার দেখ দেখি, তুমি দেখিতে ঠিক মেষের মত কি না"। ব্যাঘ্রশাবকটী তখন জলে আপন ছায়া ও ব্যাঘ্রের ছায়া দেখিয়া বুঝিল তার মুখ মেষের মুখের মত

লম্বা নয় বরং ব্যাঘ্রের মুখের মত গোল। তখন ব্যাঘ্র বলিল "দেখেছ তুমি মেষ নও, তুমিও যা 'আমিও তা" চল এখন আমার সঙ্গে। বাঘে ত আর বাঘ খায় না, তোমার ভয় কি?"

তখন সেই মেষ-ভাবপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রশাবক নিজে কি (আত্ম-স্বরূপ) তা জানিতে পারিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল; আর মেষের দলে ফিরিল না। পরমানন্দে ব্যাঘ্রের সহিত বনে চলিয়া গেল।

আমাদের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায়। আমরা যে চিদানন্দ রূপ শিব, আমরা যে তৎপদবাচ্য অনাদি, অনন্ত সর্ব্বশক্তিমানের অংশ—সন্তান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞানীসিদ্ধমহাপুরুষ-গণ আমাদের মেষত্ব ঘুচাইয়া দিবার জন্য স্নেহবাহু উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে সদা ডাকিতেছেন। তাঁহাদের করুণাকণা লাভ করিলেই আমাদের মেষত্ব ঘুচিয়া যায়, আমরা যে কি তাহা বুঝিতে পারি, আর আমাদের, এ "আমার, আমার" হাহাকারেরও শান্তি হয়। যাহারা প্রকৃত মেষ তাহারাই এরূপ সাধু মহাপুরুষ দেখিয়া দূরে পলায়ন করেন; কিন্তু প্রকৃত মানুষ স্থির থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে আর আত্মস্বরূপ অবগত হয়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরভাবেরও চরম ফল সোহং। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী গোপাঙ্গনা-গণকে যখন রাস-রস-রসিক নটবর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণিমা নিশিথিনীর পূর্ণালোকে পূর্ণ-প্রেম বিকাশের অবসর বুঝিয়া, ফেলিয়া চলিয়া, গেলেন, তখন, কৃষ্ণ-প্রেম-বিধুরা পাগলিনী গোপীগণ কি করিয়াছিলেন? তাঁহারা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন "আমি কৃষ্ণ, তুই রাধা, আমার বামে দাঁড়া, আমি বাঁশী বাজাই "ইত্যাদি। তখন আর কৃষ্ণ-প্রেম-ভিখারিণী গোপিনী তাঁহারা নয়; তখন "সোহং"—আমি কৃষ্ণ।

ভালবাসা ওজন করিয়া ভাগ হইয়া স্ত্রী হইল স্বামীর—অর্দ্ধাঙ্গিনী। মানবীয় ভাবে ভালবাসার চরম আদর্শ স্ত্রী—স্বামীর অর্দ্ধেক। আর সেই ভালবাসা যখন প্রেম ও ভক্তি রূপে ভগবৎচরণে অর্পিত হইল, তখন হইল পূর্ণ। যদি আধ ভালবাসার পাত্রে আমার দেহের অর্দ্ধেক হয়, তবে পূর্ণ ভালবাসার বস্তু আমার সর্ব্বাঙ্গ—আমি পূর্ণ হইব না কেন? কাজেই সোহংই বল, আর তুমি প্রভু, আমি দাসই বল, ফল একই। মত পথ। মত ত আর ভগবান নয়?

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের চরণের দাস হইতে হইলে,—তাহার সন্তান হইতে হইলে প্রথমেই এই আমিত্বের বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং তাঁহারি প্রতিষ্ঠা হৃদয়মন্দিরে করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠা প্রভুরূপে করিলে আমিত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যেখানে আমির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যেখানে আমির কোন দরকারও নাই তাই সে "আমি" আমি নাই "নাহং নাহং" সে আমি—তুমি, তুঁহু, তুহু; সোহং তাঁর ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি যে ভাবে তাঁহার জীবগণকে দেখেন, ঠিক সেই

ভাবে দেখিতে হইবে। এখানে আমাদের "সোহং" আর "তুমি প্রভু আমি "দাস ভাব লইয়া কলহ করিবার কিছুই নাই; যেহেতু, ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

শ্রীগীতা।

ওঁ শান্তি ওঁম।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস।

সাধক-সঙ্গীত।

(১)

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি নিরাকার, তুমি তো সাকার
তুমি সর্ব্বরূপে আছ এ ভুবনে।
যে দিকে নেহারি, তোমাকেই হেরি,
তোমা বিনে কিছু না দেখি নয়নে॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকল,
অতি সুবিস্তার আকাশ মণ্ডল,
সাগর ভূধর, অনিল অনল,
বিভূতি তোমার হেন লয় মনে॥
যক্ষ রক্ষ সুর অসুর সঙ্গমে,
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গমে,
নর, পশু, পাখী, সবে তোমায় দেখি,
কিছু নাই যে তোমা বিনে॥
জলদ গম্ভীরে মেঘে ডেকে কয়,
বিশ্ব চরাচরে তুমি সর্ব্বময়,
তবে কৃপা করে বল দয়াময়,
আমা ছাড়া তুমি রহিবে কেমনে?
তুমি আছ মোর অন্তরে বাহিরে,
প্রত্যক্ষ দেবতা নিখিল সংসারে,

তবে কেমন ক'রে আমি তোমায় ছেড়ে,
রহিব তোমার ভুবনে ?
এ জগৎ, প্রভু, মূরতি তোমার,
তুমি আমার, আমি যে তোমার
দ্বিজ রামকমল কোথা পাবে আর,
তুমি যে সম্বল জীবনে মরণে।

—0—

গৃহস্থযোগী।

পদ্মানদীর উত্তর পারে পাবনা জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রজিৎপুর গ্রাম। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমভাগে গঙ্গাপ্রসাদ দাস নামক এক বৈদ্য এই গ্রামে বাস করিতেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রটীর মোহনলাল নাম রাখা হয়; মোহনলালের পিতা তখন রঙ্গপুরে থাকিতেন। বাঙ্গালাদেশে তখন অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। অলঙ্কারের ব্যবহার বেশ ছিল। মোহনলাল ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পায়ে, নুপুর হাতে বালা বাজু, গলায় চাঁদকলি, মোহনমালা ও তক্তি, কাণে কুণ্ডল ও মোচা এবং এবং কোমরে চাঁদকুরি দিয়া সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত খেলা করি বেড়াইয়াছেন। তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে মোহনলালের ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে; এই সময়ে রঙ্গপুরেতাঁহার পিতা—গঙ্গাপ্রসাদ দাসের মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মোহনলাল মাতার সহিত মাতামহের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতামহ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সিরাজগঞ্জের অধীন কুসকোঁচা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এখনও তাঁহাদের রংপুর ও পাবনা জেলায় অনেক ভূসম্পত্তি আছে। গৌরবর্ণ, সুগঠিত, বলিষ্ঠ মোহনলালকে দেখিয়া তাঁহার মাতামহ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বিধবা কন্যার একমাত্র পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন' "দাদা! তুমি কি পড় ?" মোহনলাল বলিলেন, "আমাকে কেহ লেখাপড়া শিখায় নাই। "তাঁহার মাতামহ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে রঙ্গপুরে লইয়া গিয়া বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলেন

রঙ্গপুর লালবাগ রেলওয়ে ষ্টেশনের দুই মাইল পূর্ব্বে তামকাট নামে একটী স্থান আছে। তামকাট সেকালে সমৃদ্ধ মুসলমানদিগের বাসস্থান ছিল। ইহাঁরা সম্ভ্রান্ত মোগলজাতীয়; ইহাঁদের উপাধি মীরজা অর্থাৎ—আমীরের পুত্র। তাঁহাদিগের কোন হিন্দু কর্ম্মচারীর বাসায় থাকিয়া মোহনলাল

পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত মীরজা কাশিম আলির নিকট লেখাপড়া শিখিতেন। মীরজাদিগের সহিত সতত বাস করিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ মুসলমানের মতই হইয়া গিয়াছিল। সতত শিক্ষকের সংসর্গে থাকায় তাঁহার শিক্ষার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও যত্নের গুণে পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। তিনি পারস্য ভাষায় আইনও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মোহনলালের শিক্ষা শেষ হইলে তিনি তামকাটের মীরজাদিগের সুপ্রীমকোর্টে কোন মোকদ্দমা তদ্বির করিবার জন্য কলিকাতায় গমন করেন। এই মোকদ্দমায় মীরজাদিগের জয় হয়, এজন্য তাঁহারা মোহনলালকে অনেকগুলি জিনিস পারিতোষিক দিয়াছিলেন। সচ্চরিত্র বলিয়াও মোহনলালের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই সময় হইতে তিনি মুন্সী মোহনলাল নামে পরিচিত হন।

রাজা রামমোহন রায় দেওয়ান হইয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঙ্গপুরে ছিলেন। মোহনলাল এই সময়ে জজের আফিসে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন। রামমোহন তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের নিকট এরূপ প্রশংসা পাওয়া সামান্য কথা নহে এবং বড় সামান্য গুণেও লাভ হয় না। কিছুদিন পরে মোহনলাল জজের সেরেস্তাদার হন। রঙ্গপুরের জজ এবং উত্তর ভারতের গভর্ণরজেনেরেলের এজেণ্ট ডেভিড্ স্কট্ সাহেব মোহনলালকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার জ্ঞান, ধর্ম্মভাব ও সাধুতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ছিলেন। সেকালে যাহারা চাকরি করিত তাহাদের মধ্য দুটী দোষ অত্যন্ত প্রবল ছিল; একটী উৎকোচগ্রহণ আর একটী দুশ্চরিত্রতা। মোহনলাল এই দুই দোষ হইতে সম্পুর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি যে কার্য্য করিতেন, ঐ পদে থাকিয়া কতজন লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিয়াছে,—কত ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছে। কিন্তু মোহনলাল সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি জানিতেন—(মনু না পড়িয়াও জানিতেন)—ত্রিবর্গ ইতিতুষ্টিতিঃ, পরস্পর অবিরুদ্ধ ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গই শ্রেয়; কারণ, তাহাই পুরুষার্থ। দেখি, সাধারণ মনুষ্য শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও মূর্খ আত্মহিত করে না। আবার মহাপুরুষেরা শাস্ত্র না পড়িয়াও পণ্ডিত—আত্মহিতানুষ্ঠান করেন। মোহনলালের একরূপ ধনলালসা ছিলই না; তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া আসিলে একদা তাঁহার কোন হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "তুমি এতকাল চাকরি করিয়া কি করিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, হাতী বোঝাই করিয়া আমার নিকট টাকা আনিয়াছিল; তাহাতে লোভ হয় নাই; গাড়ী বোঝাই করিয়া আমার নিকট টাকা আনিয়াছিল, তাহাতেও আমার লোভ হইল না। তবে নৌকা বোঝাই করিয়া টাকা আনিলে আমার লোভ হইত কিনা পরীক্ষা হয় নাই।" তিনি যে কেবল নিজে ঘুষ লইতেন না, তাহা নহে। তাঁহার আত্মীয়

স্বজনের মধ্যেও দোষ দেখিলে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইতেন। মোহনলাল যখন গোয়ালপাড়ায় সদর-আমিন ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার মোহরের ছিলেন। পুত্রের নামে এক ঘুষের মোকদ্দমা হয়—পিতা পুত্রকে জেলে দিলেন। পুত্র পরিশেষে আপিলে খালাস হন।

একবার তাঁহার মাতুলপুত্র চাকরীর উমেদার হইয়া তাঁহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হন। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে ভ্রাতার একটী চাকরির জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, "আমি কাহারও জন্ত কাহাকেও অনু· করিতে পারিব না, আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া কাজ করিতে পারে করুক।" যাহা হউক মুন্সী মোহনলালের মাতুলপুত্র কেবলমাত্র এই পরিচয় দেওয়াতেই সাহেবেরা তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলেন, এই সব লোকের জন্তই হয়ত আমাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত হইতে হইবে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকালে দুশ্চরিত্রতা চাকুরী-জীবিদিগের একটী প্রধান দোষ ছিল। কাজেই মোহনলালের সংযতচরিত্রে কেহ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। একবার তাহার বয়স্যগণ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার বিছানায় এক বেশ্যা শুয়াইয়া রাখিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিয়া অন্য ঘরে শয়ন করিলেন এবং প্রাতঃকালে চাকরের দ্বারা বিছনাপত্র ফেলিয়া দিলেন। আর একবার তাহারা তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে কোন বেশ্যাপ্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া বহির্দ্বারে শিকল দেন। বলবান মোহনলাল বাড়ীর বেড়ার নিকটবর্ত্তী একটা পেয়ারা গাছে উঠিয়া লম্ফ দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। একদা কোন অসচ্চরিত্রা ব্রাহ্মণী মোহনলালকে প্রলোভিত করিতে নানা চেষ্টা করেন, তিনি বুঝিয়া দুইটি টাকা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ মাতৃসম্বোধন করিলেন; ব্রাহ্মণকন্যা আপন ভ্রম বুঝিয়া নিরস্ত হইলেন। মোহনলালের দেবচরিত্র অনেক উশৃঙ্খল ব্যক্তিকে সংযত করিয়াছে।

কিছুদিন পরে মোহনলালের চক্ষুর পীড়া হয়; কাজেই পেন্সন লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যাত্রাপুর গ্রামে একটী বাড়ী করিয়াছিলেন; রঙ্গপুর হইতে আসিয়া তিনি এই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর ইংরাজের আসাম দখল হয়। এই সময় ডেভিডস্কট্ সাহেব যাত্রাপুর যান এবং আসামের বন্দোবস্তের জন্য মোহনলালকে গোয়ালপাড়া যাইতে অনুরোধ করেন। নিজের অন্ধত্ব জানাইয়া তিনি অসম্মত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া চক্ষুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অস্ত্রচিকিৎসায় চক্ষু আরাম হইলে তিনি গোয়ালপাড়া যান।

মোহনলাল গোয়ালপাড়ার সদর আমীন হইয়াছিলেন। এখানেও সাহেবেরা তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। আপন চরিত্রগুণে তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি বাসায় গিয়া বিচারের রায় লিখিতেন, কিন্তু নথী বাসায় লইয়া যাইতেন না। তিনি বলিতেন, "মানুষ যাহা

একবার দেখে বা শুনে, তাহা কি করিয়া ভুলে আমি তাহা বুঝি না।" আসামে কেবল গোয়ালপাড়া জেলাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। ঐ বন্দোবস্তের সময় স্কট্ সাহেবে মোহনলালকে একটী প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি বন্দোবস্ত লইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় পেন্সন লইয়া বাড়ী চলিয়া আইসেন।

মোহনলাল বাড়ী আসিলে তাহার স্বগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে যে সকল বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তাহারা প্রতিদিন বৈকালে তাহার বাড়ী আসিতেন। প্রত্যহ রামায়ণ, মহাভারত, কাশীখণ্ড প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত এবং পাঠান্তে সেই সব বিষয়ের আলোচনা হইত। তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইত। তিনি দুঃখীর দুঃখমোচন, রোগীর সেবা ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তিনি অনেককে টাকা দিয়া ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। সকলকেই তিনি নিজ পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। একদিন একটী কুষ্ঠরোগী তাঁহার বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়ায়, তিনি ভৃত্যকে এক সের চাউল আনিয়া দিতে বলিলেন। একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মুন্সী মহাশয়! ও ব্যক্তি মহাপাপী—উহাকে দান করিলে পুণ্য হয় না, বরং পাপ হয়।" মোহনলাল ইহাতে বলিলেন,—"যদি পুণ্যের জন্য কেহ দান করে, তবে আমার বিশ্বাস, ইহাকে দিলে আপনাকে দেওয়া অপেক্ষা অধিক ফল হয়।"

বাড়ী আসিয়া বৃদ্ধ বয়সেও তিনি লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেন। কেহ লেখাপড়া শিখিতে আসিলে (সে সময় স্কুল কলেজে শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।) তাহাকে যত্ন করিয়া শিখাইতেন। তাঁহার চাকরদিগকেও লেখাপড়া শিখাইয়া চাকরী করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারে এরূপ করিয়া দিয়াছিলেন। সকলে চেষ্টা করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, সকল ব্যক্তিকে এইরূপ পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার দয়ায় অনেকে উন্নত হইয়া বলিয়াছে,—"আমার শরীরের চামড়া দিয়া কর্ত্তার জুতা বানাইয়া দিলেও তাঁহার ঋণ শোধ যায় না।"

মোহনলাল বিদ্যার অত্যন্ত গৌরব করিতেন এবং বলিতেন,—আমার বাড়ীর রাখালও যেন রাখালের রাজা হয় এবং মূর্খ না হয়। তাঁহার গ্রামবাসী চণ্ডীপ্রসাদ সেনকে তিনি শেষ বয়সে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া পার্শী পড়াইতেন। তাঁহার শিক্ষার বয়স প্রায় গিয়াছিল; কেবল মোহনলালের যত্নেই কার্য্যোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া রঙ্গপুরের জজের সেরেস্তাদার হন এবং বিস্তর অর্থোপার্জ্জন ও অন্নদান করিয়া ছিলেন। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় যখনই মোহনলালের নাম করিতেন, তখনই চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতেন। এরূপ ভক্তি কৃতজ্ঞতা আজকাল বিরল। তিনি যাহাদের পড়াইতেন, শিক্ষা সহজ হইবে ভাবিয়া তাহাদের সহিত পার্শীতে কথোপকথন করিতেন। তিনি কখনও কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। নিয়মিত কার্য্য কখন পরিত্যাগ করিতেন না। যথাসময়ে সমস্ত

কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এমন কি স্নানাহারের পর্য্যন্ত অনিয়ম করিতেন না।

মোহনলাল পাপের উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিনী একবার একটী মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন বলিয়া একমাস কাল তাঁহাকে তাঁহার নিকটে আসিতে দেন নাই। দাসদাসীগণ মিথ্যাকথা না বলে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। দোষ করিয়া স্বীকার করিলে তিনি উপদেশ দিতেন, কিন্তু দণ্ড প্রদান করিতেন না। আবার বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মোহনলাল ছেলেদের সহিত আমোদ কৌতুকও করিতেন; তখন প্রহেলিকার অর্থ বলা বড় বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল, তিনি ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের জন্য প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিতেন; ছেলেরা উত্তর দিত।

মোহন লালের দুই পত্নী। প্রথম পুত্রের জন্মকালেই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাঁহার আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁহার মাতা অন্ধ ছিলেন,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতার বয়স তাঁহার বয়স অপেক্ষা ১২ বৎসর মাত্র অধিক ছিল। তিনি মায়ের একমাত্র সন্তান, সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার অন্ধ মাতা নিজের সেবা-শুশ্রূষা হইবেনা বলিয়া পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। কন্যা শিবসুন্দরী অল্প বয়সেই মারা যান। পুত্র কৃষ্ণলাল মুন্সী ৮০৲ টাকা বেতনে গোয়ালপাড়া সেরেস্তাদার ছিলেন।*

মোহনলালের মাতৃভক্তি অসামান্য ছিল। মায়ের আদেশ লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। প্রাতঃকালে বাহির বাড়ী আসিবার সময় প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া আসিতেন না। মাতা অন্ধ হইলেও পুত্রের আহারের সময় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন।

মোহনলাল শাক্ত ছিলেন। তাঁহার কুলগুরু মৃত্যুঞ্জয় তপস্বীর নিকট তিনি দীক্ষিত হ'ন। সিংহস্থা জগদম্বিকা তাঁহার ইষ্টদেবী। তিনি উপাসনাকালে লাল চেলীর ধুতি ও উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন এবং উপবীতের ন্যায় রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিতেন। যতদিন দৃষ্টিশক্তি ছিল, ততদিন শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা পৃথকভাবে করিতেন; অন্ধ হইলে শিবের উপরই অঞ্জলি দিয়া বিষ্ণু পূজা সমাধা করিতেন। যথাসময়ে সন্ধ্যা উপাসনা নিত্যকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার রক্ত প্রবালের মালা ছিল, উপাসনাকালে তাহা জপ করিতেন; অন্য সময়ে কেবল কর-জপ করিতেন, কিন্তু সংখ্যা রাখিতেন না। এক দিবস সন্ধ্যাকালে নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া নিজের শয়নশয্যায় গিয়া বসেন। (দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনি রাত্রিতে শয়ন ঘরেই আহার করিতেন।) খাদ্য প্রস্তুত হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিনী গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিলেন; কিন্তু অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন তিনি উঠিলেন না। মশারি ফেলা ছিল; তিনি তখন মশারি উঠাইয়া দেখেন যে, মাথার উপর একটা চোগা দিয়া শরীর ঢাকিয়া বসিয়া আছেন।

* কৃষ্ণলালের পুত্র কুঞ্জলাল; ইনি শেষ বয়সে রাজসাহী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। আমরা ইহাঁর নিকট তাঁহার পিতামহের জীবনী শুনিয়াছি। মোহনলালের পুত্রপৌত্রাদি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সাধক ছিলেন। লেখক—

[illegible] আসিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন। মোহনলাল চমকিয়া উঠিয়া বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে তিনি নির্জ্জনে ধ্যান করিতেন। উপাসনায় তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। সেকালে সন্ধ্যাহ্নিকের আড়ম্বরটা খুব বেশী ছিল। যাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকে যত দীর্ঘ সময় লাগিত, সমাজে তিনি তত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। মোহনলাল সর্ব্বদা কর-জপ করিতেন; কিন্তু কোন দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেন না। ইহাতে বুঝা যায় তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

একদিন তাহাদিগের বাহির বাড়ী ভানুমতী বাজি হইতে [illegible] বাজিকর পায়ে শিং বাঁধিয়া মাথায় কলসী রাখিয়া ও গলায় বাঁশ ঝুলাইয়া দড়ির উপর দিয়া যাইতেছিল; ইহা দেখিয়া মোহনলাল বলিয়া উঠিলেন,—"অহো, [illegible] যদি [illegible] সংসারী [illegible], তবে কি [illegible]।" অর্থাৎ ঈশ্বরে সতত মন রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ফল অর্পণ করিয়া যদি তাঁহার জন্য সংসার করে, তবে আর কোন দুঃখ পাইতে হয় না।

১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে দিবা দুই প্রহরের সময় মোহনলালের মৃত্যু হয়। সময়ে সময়ে শ্লেষ্মার জন্য তাঁহার পার্শ্ববেদনা হইত, মৃত্যুর পূর্ব্বেও এইরূপ বেদনায় তিন চারি দিন অসুস্থ হই। বাড়ীর ভিতরে ছিলেন। পরে আরাম হইয়া তৈল দ্বারা (তখন সাবানাদির প্রচলন ছিল না।) মাথা ও শরীর পরিষ্কার করিলেন। স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধানান্তে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক ও জপাদি করিলেন। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগায় আবার বেদনা উপস্থিত হইল, কাজেই তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। কিছুকাল পরে ঘরের মেজেতে বিছানা পাতিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার পত্নী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন; মোহনলাল খাট হইতে নামিবার সময় পত্নীকে বলিলেন,—"তোমার শয্যা এই ত্যাগ করিলাম।" তিনি নিম্নের বিছানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া ডান হাত চিবুকের নীচে রাখিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে শৌচে গেলেন। শৌচ হইতে আসিয়া তাকিয়া শিয়রে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ডান হাত খানি কুবজপ আকারে বুকের উপর রাখিয়া ছিলেন। একটু পরই শ্বাস উপস্থিত হইল। তখনই বাহির করা হইল। তাহার মুখ প্রশান্ত; কোন যন্ত্রনাদি অনুভবের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না। সুনির্ম্মল আকাশতলে মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণের সহিত তাহার প্রাণের উৎক্রমণ হইল। [illegible] রীতি অনুসারে তাহার মাথায় [illegible] টিকি ছিল। মাথায় চুল [illegible]। তাহার মৃত দেহের [illegible] পুতিয়া দেওয়া [illegible], তা [illegible] মস্তকে মঞ্জরী [illegible]। একটী দুই বৎসরের শিশু [illegible] তুলিতে ছিল, [illegible] হইতে [illegible] পাশ্বীয় [illegible] দেখেন, তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। গ্রামে রোল পড়িয়া গেল মুন্সী মোহনলালের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ নির্গত হইয়াছে। বহু লোক দেখিতে আসিল,—সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জ্ঞানী গৃহস্থের এরূপ

মুক্তির কথা হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে এবং অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যাঁহাদের প্রাণ মূর্দ্ধণ্য নাড়ী সুষুম্না ভেদ করিয়া উৎক্রান্ত হয়, তাঁহারা দেবযান পথে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাঁহারা প্রথমতঃ উত্তরায়ণ দিবাভাগ শুক্লপক্ষ সম্বৎসরাভিমানিনী দেবতার উপলক্ষিত পথে তড়িল্লোক পর্য্যন্ত গমন করেন, পরে অমানব মহাপুরুষ কর্ত্তৃক হিরণ্য-গর্ভের লোকে নীত হন; তৎপরে প্রলয় পর্য্যন্ত তথায় পরম সুখে বাস করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পাঠক! যদি হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মোহনলাল সমগ্র জীবন সংসারের মধ্যে থাকিয়া মুনিজন-সাধ্য কি কঠোর সাধনই করিয়াছিলেন। একদিনের তরেও তিনি সংসারের ভার ত্যাগ করেন নাই।' কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও যিনি এমন ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনি কত বড় বীর। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, নিত্যসত্য—অনুষ্ঠান করিলেই ফল হয়। সাধন যতই গোপনে হউক না কেন, একদিন না একদিন তাহার ফল নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে।

গৃহস্থযোগী মুন্সী মোহনলাল নশ্বর দেহ ছাড়িয়া যেদিন অমৃতলোকে গমন করেন, সেই দিন গ্রামে একটী বিবাহ উপলক্ষে অন্যান্য স্থান হইতে অনেক বৈদ্য আসিয়াছিলেন। বিশেষ সমারোহের সহিত পদ্মার তীরে তাঁহার পূতদেহের সৎকার করা হয়; পুত্র কুঞ্জলাল কর্ত্তৃক বিরাট্ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা আর কি লিখিব। পাঠক! এরূপ মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হও এবং রামপ্রসাদের ভাবে সুর বাঁধিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা কর—

রামপ্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরী দে মা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই কর মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র,
যায় গো কেটে॥

দীন—চিদানন্দ।

—o—

কীর্ত্তন।

(৮)

ওহে নীরদবরণ পীতবসন,
মদনমোহন হরি,
আমার হৃদকমলে দাঁড়াও
বামে লয়ে রাইকিশোরী,
আমার জীর্ণ তরী, তাহে পাপে ভারী
আমায় পার কর হে ভবসিন্ধু
ভবের কাণ্ডারী।

আমি দীন অতি, তাহে পাপে মতি
আমার অন্তিমেতে দাও হে দেখা
নয়ন ভরে হেরি।
আমার অন্তিম কালে একবার
(দেখাও, দেখাও)
তোমার যে রূপেতে ভুবন ভুলে
(সেরূপ দেখাও, দেখাও)।

ভুবন মোহন, কৌস্তুভ ভুষণ
শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি
তোমার অপরূপ রূপ,
ওহে বিশ্বরূপ
(দেখাও নয়ন ভরি)
জিনি কোকনদ, রাঙ্গা দুটি পদ,
পদ নখে পূর্ণ শশী।
বুঝি অনুভবে মকরন্দ লোভে
পড়িছে ভূতলে খসি।
চরণে নুপুর আহা কি মধুর,
রুনু রুনু রুনু বাজে।

কিবা পীতধরা, গোপী মনোহরা
কটিতটে ভাল সাজে।
বনমালা গলে মৃদু মৃদু দোলে,
মোহন বাশরী করে।
অলকা তিলকা কপালেতে আঁকা
বিমোহন চূড়া শিরে।
প্রেম ডুরে বাঁধা তব অঙ্গ আধা
শ্রীরাধারে ক'রে বামে।
পদে পদ দিয়ে, গায়ে গা মিশায়ে
দাড়াও হে বঙ্কিম ঠামে।
একবার যুগল রূপে দাড়াও
দেখে জনম সফল করি।

———()———

ভক্তি-তত্ত্ব।

১। ভক্তিঃ পূর্ণানুরক্তিঃ পরে, অর্থাৎ চিৎ, অচিৎ উভয়বিধ পদার্থের পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবানে অখণ্ডিতা অনুরাগকে ভক্তি বলা যায়।

২। মদগুণ শ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথগঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
ভাগবত—(৩।২৯।৯-১০।)

অর্থাৎ যেমন গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া একবারে সমুদ্রে পতিতা হন, কোন স্থানে তাঁহার গতি রোধ হয় না, তেমনি সকল দেহস্থিত পরমাত্মার দিকে যাহার মনের গতি হয়; অন্য কিছুতেই অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা গতিচ্ছেদ করিতে পারে না,—তাহাকেই নির্গুণা ভক্তি বলে। এই অর্থ দ্বারা বোধ হইতেছে যে ভক্তি সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধা।

অহৈতুকী ভক্তি নির্গুণ বটে, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে জড়ীভূত ভক্তিকেও নানা প্রকার ধারণ করায়; যথা জল। যখন আকাশ হইতে বৃষ্টিজল পতিত হয়, তখন তাহার বর্ণ এক, ধর্ম্ম এক, এবং আস্বাদ এক। কিন্তু যখন পৃথিবীতে পতিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয়, তখন কোন স্থানে সাদা, কোন স্থানে কাল, কোন স্থানে লাল, কোন স্থানে নীল এইরূপ অনেক প্রকার বর্ণগত ভেদ দৃষ্ট হয়। আবার কোথায় তিক্ত, কোথায় লবণাক্ত, কোথায় কষায়, কোথায় দুর্গন্ধযুক্ত, কোথায় সুগন্ধযুক্ত, ইত্যাদি স্বাদগত ভেদও

দৃষ্ট হয়। আবার সেই জল কোথায় উষ্ণ কোথায় শীতল, কোথায় কঠিন, কোথায় বা বাষ্পাকার, এইরূপ ধর্ম্মগত ভেদ দৃষ্ট হয়। একই নির্ম্মল জল পৃথিবীতে পতিত হইয়া মৃত্তিকাংশযোগে বিবিধ প্রকারে দৃষ্ট হয়।

তদ্রূপ রাগরূপা নির্গুণা ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিতা অনুরাগ হইলেও মায়াবদ্ধ জীবে ভিন্নভাবে লক্ষিত হয়।

জীব মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণের বশীভূত হওয়ায় ভক্তিকেও নানা আকার ধারণ করায়।

মায়াবদ্ধ জীব মায়ার রজস্তমগুণে বশীভূত হইলে তাহাদের প্রবৃত্তিরও তারতম্য হয়, এবং প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানকেও নানা-প্রকার রজস্তম ভাব ধারণ করায়। কেহ চিচ্ছক্তির পূজা না করিয়া ভগবানের শক্তির অসুরঘাতিনী, সিংহবাহিনী মূর্ত্তির পূজা করে; কেহ বা করালবদনা, লোলরসনা, মুণ্ডমালিনী কালী মূর্ত্তির পূজা করে, এবং অনিত্য বর প্রার্থনা করে; যথা,—"ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" ইত্যাদি। কেহ কেহ বিদ্যা, কবিত্ব শক্তি, সুন্দরী ভার্য্যা ইত্যাদি কামনা করিয়া সগুণ দেবতার পূজা করে। এইরূপে তেত্রিশ কোটী দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। কাম্যকর্ম্ম ফলপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া সেই সেই দেবতা পূজা করিয়া থাকে এবং আপন আপন অভীষ্ট বর প্রার্থনা করে।

আবার বৈষ্ণবধারীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—আউল, বাউল, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, সহজীয়া, আখড়াধারী বাবাজী ইত্যাদি। ইহারা সকলেই ভক্তির-বিরোধী স্ত্রীসঙ্গী বৈষ্ণব এবং লোক-প্রতারক। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা করে এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করতঃ বেড়াইয়া বেড়ায়। অনেক সময় সরলচিত্ত গৃহী বৈষ্ণব ইহাদিগ-দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মত—

"মর্কট বৈরাগী সব বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

অনেক গোস্বামী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সগুণ ভক্তির নেতা, এবং তাঁহারা গুরু আখ্যা ধারণ করতঃ সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

৩। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।

অর্থাৎ

সমস্ত উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া (জড়শক্তি রহিত হইয়া) ভগবানে মন আসক্ত করিলে, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর যে ভগবান তাঁহার সেবা করাই উত্তমা-ভক্তি; যথা,—পরমেশ্বরে অনুরাগ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহার মঙ্গল হয়। পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ ঘুচিয়া যখন মায়িক পদার্থের প্রতি অনুরাগ হয়, তখনই তাহার অমঙ্গল হয়। যেমন জল মাটীতে পতিত হইলে নানা প্রকার বর্ণ ধারণ করে, তেমনি মায়িক বিষয়ে অনুরাগ হইলেই নানা প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়; যথা,—অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ, স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে অনুরাগ হইলে লাম্পট্য, ভাই ভগ্নীর প্রতি অনুরাগ হইলে স্নেহ,

গুরুজনের প্রতি অনুরাগ হইলে ভক্তি; আনুকুল্যে অনুরাগ হইলে প্রীতি, প্রাতিকুল্যে অনুরাগ হইলে দ্বেষ, এইরূপ মায়িক জগতে অনুরাগেরও বিচিত্রতা দেখা যায়। উপাধি জন্যই এই বৈচিত্র্য। সংসারাশ্রমে এই অনুরাগগুলিকে ধর্ম্ম বলা যায়। ভগবান বলিয়াছেন, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগন্ন হও। ইহার অর্থ এই যে সমস্ত উপাধি মুক্ত হইয়া ঈশ্বরে রাগ অর্পণ কর।

ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করাই ভক্তি। রাজা অম্বরীষ সমস্ত ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(ভাগবত ৯।৪।১৫-১৭)

তাহার মন কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তায় নিযুক্ত ছিল, বাক্য কেবল কৃষ্ণ গুণ বর্ণনা করিত; হস্ত শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিত, কর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিত, চক্ষু মুকুন্দের আলয় ও শ্রীমুর্ত্তি দর্শন করিত, তাহার অঙ্গ ভক্তের অঙ্গ কিম্বা শ্রীমুর্ত্তি স্পর্শ করিত; নাসিকা তাহার পাদপদ্মে অর্পিত তুলসী চন্দনাদির সৌরভ গ্রহণ করিত, রসনা কেবল প্রসাদ আস্বাদ করিত; পদ তীর্থভ্রমনে, মস্তক প্রণামে, কামনা কৃষ্ণদাস্যে ভিন্ন অন্য কামনা, ছিল না। ভগবৎ-পাদপদ্মে যাহার রতি হইয়াছে, তাহার এই-রূপ ব্যবহার দেখা যায়। ব্রজগোপীরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন তাহা নহে, তাহাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কৃষ্ণসেবা করিত।

কৃষ্ণসেবাই ভক্তি, তদ্‌ভিন্ন অন্য সেবাই মায়ার সেবা। জীব স্বাধীন নহে। হয় কৃষ্ণদাস না হয় মায়ার দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বাধীনতা। মায়ার দাস্যই জীবের দুর্গতি বা ভববন্ধন।

১। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

অর্থাৎ অন্য অভিলাষশূন্য হইয়া আনুকুল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি; সেই কৃষ্ণানু-শীলনের জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ব্যাঘাৎ না জন্মিলে, তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলে।

প্রশ্ন—আনুকুল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন কাহাকে বলে?

উত্তর—আমরা এই সংসারে স্ত্রী পুত্র পরিবারকে নিজ আত্মীয় মনে করিয়া যেরূপ প্রীতির অনুশীলন করি; সেইরূপ কৃষ্ণকে নিজ জন মনে করিয়া যদি প্রীতি করি, তাহাকে আনুকুল্য-প্রীতি কহে। কৃষ্ণ আত্মার আত্মা, প্রিয়ের প্রিয়, অতএব তাঁহাতেই প্রীতি করিবে (ভাগবত ৩।৯।৪১)

প্র। আনুকুল্য ভিন্ন অন্য প্রকারে কৃষ্ণা-নুশীলন হয় কি?

উ। প্রাতিকুল্যভাবেও কৃষ্ণানুশীলন হয়।

যথা—কংস, শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা, জাগরণে, কেবল কৃষ্ণানুশীলনই করিত; কিন্তু ঐ অনুশীলন বিদ্বেষভাবমূলক ছিল, কিরূপে কৃষ্ণকে বধ করিবেন সর্ব্বদাই ঐ চিন্তা করিতেন, শিশু-পালও দ্বেষভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেন, এইরূপ প্রাতিকুল্যভাবের অনুশীলন ভক্তি বলা যায় না।

প্রঃ। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাত হয়?

উঃ—যাহারা এই সংসারে কেবল ইন্দ্রিয়

সুখ লাভের ইচ্ছায় কার্য্য করে, কিম্বা পরকালে স্বর্গসুখ লাভের জন্য যজ্ঞ, দান, ধর্ম্মাদি কার্য্য করে, তাহাদের সেই কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন আবৃত থাকে।

এই সংসারে যে কোন কার্য্য করা যায়, সেই কার্য্যে যদি কৃষ্ণকে স্মরণ রাখা যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণের আজ্ঞাপালন করিতেছি, ইহা নিজের সুখের জন্য করিতেছি, এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা না থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাত হয় না।

প্রঃ। এইরূপ কৃষ্ণানুশীলন কি সংসারে হইতে পারে?

উঃ। এই সংসারকে যদি কৃষ্ণের সংসার করা যায়, তবে তাহাতেও কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। মনে কর কৃষ্ণকে কুলদেবতা জানিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি বাটীতে প্রতিষ্ঠা করতঃ তাঁহার সেবায় সপরিবারে আত্মনিয়োগ করিল; প্রাতঃকাল শয্যাত্যাগ অবধি সমস্ত পরিবার কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রহিল। কেহ গৃহমার্জ্জন, কেহ বাসন-পত্রাদি ধৌতকরণ, কেহ বা পুষ্প, তুলসীচয়ন, কেহ ভোগরন্ধন, কেহ পূজা ও নৈবেদ্যাদি অর্পণ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। আবার সন্ধ্যায় আরতি, শীতলভোগ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনান্তর তাঁহার গুণকীর্ত্তন, চরিত্রপাঠ ও চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে দিবা রাত্রি অতিবাহিত হইল। এইরূপে বারমাস সেবা করিলে কৃষ্ণানুশীলন ভিন্ন অন্যানুশীলন হইল না। ইহাতে, অর্থের প্রয়োজন হইলে, সেই অর্থের জন্য চাকুরী, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, বা ভিক্ষা দ্বারা সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও কৃষ্ণসেবা হইল, ইহাকেই কৃষ্ণের সংসার বলে। গৃহস্থমাত্রেই আপনাকে কৃষ্ণের কিঙ্কর মনে করিয়া কার্য্য করিবেন। কিন্তু চাকুরী, কৃষি, বাণিজ্য বা ভিক্ষা কার্য্যগুলি ন্যায্য উপায়ে নির্ব্বাহ করিবেন; প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা যেন স্থান না পায়। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণানুশীল আবৃত হয় না।

প্রঃ। জ্ঞানানুশীলনে কিরূপে কৃষ্ণানুশীলন আবৃত হয়?

উঃ— সমস্ত জ্ঞানের মূলে কৃষ্ণশক্তি আছে। চিৎ, অচিৎ, জগৎ সমস্তই কৃষ্ণশক্তির পরিণতি, ইহা ভুলিয়া, যদি সমস্ত জ্ঞানে প্রাকৃতিক শক্তির আলোচনা কর এবং অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্যই যদি ঐ জ্ঞানের প্রয়োজন, এইরূপ বিবেচনা কর, তবে সেই জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণস্মৃতি আবৃত হইল।

প্রঃ। কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তি, অন্য দেবতার অনুশীলন কি উত্তমাভক্তি নয়?

উ। ভক্তির পাঁচটী মুখ্য রস এবং সাতটী গৌণ রস। এই বারটী রসই কৃষ্ণানুশীলনে আছে, অন্য দেবতার তাহা নাই; এমন কি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ নারায়ণ মূর্ত্তিতে ঐ সমস্ত রসগুলি নাই। কেবল শান্তরস, দাস্যরস, ও সখ্যরসের অর্দ্ধগৌরব অংশ আছে। নারায়ণের এমন কোন সখ্যরসের ভক্ত নাই যে, তাহার হাত ধরিয়া বলিতে পারেন যে, চল ভাই খেলা করিগে। এমন কি, নারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবীও নারায়ণের পদসেবা করিয়া থাকেন; নারায়ণ কখন তাহার চরণসেবা করিয়াছেন এরূপ শুনা যায় নাই।

কিন্তু রসিকশেখর কৃষ্ণ তাহার সখাগণের কান্ধে চাপিয়াছেন এবং সখাগণকে নিজ স্কন্ধে করিয়াছেন। নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছেন, এবং তাহার প্রেয়সী রাধিকার চরণ ধরিয়া মানভঞ্জন করিয়াছেন। এরূপ রসিকতা ও ভক্তিবশ্যতা অন্য দেবতায় দেখা যায় না। এইজন্য কৃষ্ণ মুশীলনে উত্তমাভক্তি আছে, এরূপ বলা হইয়াছে, দেবতা প্রেমবশ্য ও প্রেমের কিঙ্কর না হইলে হৃদয়গ্রাহী হইতে পারেন না। যথা ভাগবতে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়; আমি ভিন্ন সাধুগণ আর কিছু জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ভিন্ন আর কিছুই জানি না। ক্রমশঃ

বৈষ্ণবদাসানুদাস।

শ্রীললিতলাল ঘোষ।

—০—

সর্ব্বময়।

সবারে ভুলেছি একে, একে, একে,
তোমার ভুলিতে পারি নাই;
সব দূরে গেছে মোর কাছ হ'তে,
তুমি আছ জেগে সব ঠাই।
সকল কথায় শ্রবণ বধির,
তোমার কথা সদাই কাণে;—
সকলের স্মৃতি মন হ'তে গেছে,
তোমার স্মৃতি জাগিছে প্রাণে;
সকলে চলেছে যে যাহার পথে,
মোর পথ তোমা পানে রয়;
কুসুমে, কাননে, ধরা, ধূলি পরে,
তুমি আজ মোর সর্ব্বময়।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—০—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য সখ্যতা ও আত্মনিবেদন এই নয়বিধ—উপায়ে ভক্তিলাভ সাধিত হয়।

শিবপুরাণে বলিয়াছেন:—

জাতি বিদ্যা মহত্তঞ্চ রূপং যৌবনমেবচ।
যত্নে পরিবর্জ্জ্যেত পঞ্চৈতে ভক্তিনিষ্কয়া॥

অভিমান, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, রূপ ও যৌবন এই পাঁচটী যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন

করিলে, ভক্তি লাভের অধিকারী হওয়া যায়।

কাশীখণ্ডে বলিয়াছেন:—

"গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দ স্মরণং কীর্ত্তনাৎ"।

প্রত্যহ যত্ন সহকারে গীতার শ্লোক পঠ ও ভগবান গোবিন্দের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে সহজেই ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

পাণ্ডবগীতায় বলিয়াছেন:—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি হোমং স্মরতি নিত্যশঃ"।

নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ দ্বারাও ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন:—

যঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ স্বধং ধর্ম্মানাচরেন্মৎ সমাশ্রয়।
স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ॥

যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, যিনি ভগবানকে আশ্রয়নীয়বোধে বেদবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ভক্তি স্বতঃই তাঁহার করতলগত হয়। পরন্তু তিনি পরম ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন।

অত্রি বলিয়াছেন:—

প্রশস্তচরণং নিত্যমপ্রশস্ত বিবর্জ্জনম্।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভি ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥

বেদবিহিত প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের বিবর্জ্জনকেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ জীবের মঙ্গল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তির উদ্রেক হয়।

মনু বলিয়াছেন:—

শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারং যতন্ত্রিতঃ॥

বেদ ও স্মৃতিকথিত স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত, সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল স্বরূপ সাধু-জনানুমোদিত আচার সকল নিরন্তর যত্নের সহিত পালন করিলে, তদ্দ্বারা ভক্তি ও দীর্ঘায়ু লাভ হইয়া থাকে।

(এস্থলে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম বলিতে কি বুঝিতে হইবে, উল্লেখ করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছয়টী, ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী, বৈশ্যের সাতটী, শূদ্রের দুইটী কর্ম্ম ধর্ম্মের অনুগামী। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের যজন, দান, অধ্যয়ন তিনটী তপস্যা, আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, যাজন তিনটী জীবিকা (বৃত্তয়ঃ), ক্ষত্রিয়ের যজন, দান, অধ্যয়ন, তিনটী তপস্যা; অস্ত্রব্যবহার, প্রাণিরক্ষা, দুইটী জীবিকা, বৈশ্যের যজন, দান, অধ্যয়ন, তিনটী তপস্যা, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদ এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের ব্রাহ্মণসেবাই তপস্যা; এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা। এই গুলিই স্মৃত্যুক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম। "অধ্যয়ন" শব্দে বেদ অধ্যয়ন বুঝিতে হইবে।)

শাকল্যসংহিতায় বলিয়াছেন:—

"তত্রাঙ্কনং নারায়ণায়ুধাদীনাং তদ্রূপ স্মরণার্থ মপেক্ষিতার্থ—সিদ্ধ্যর্থঞ্চ"।

অভীপ্সিত বিষয়ের সিদ্ধি সংসাধনার্থ ভগবান নারায়ণের রূপ স্মরণ ও চক্রাদি আয়ুধ সকলের চিহ্ন দ্বারা শরীর চিহ্নিত করিলে, সহজেই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

নারায়ণ শ্রুতিতে বলিয়াছেন:—

যস্য প্রসাদাৎ পরমা যৎ স্বরূপাৎ তস্মাৎ সংসারান্মুচ্যন্তে
নাররে সুরানারাধয়ন্তাইসৌ পরম বিচিন্ত্যো মুমুক্ষুভিঃ।

যাঁহার প্রসাদে জীবের মুক্তিলাভ হয়, যাঁহার দয়াতে সংসার নিবৃত্তি ঘটে; তাঁহাকে

সর্ব্বদা স্মরণ করিলেই ভক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য পরমপদাভিলাষী ব্যক্তিগণ—কর্ম্মপাশ ছিন্নের নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণুর চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন।

শ্রীরামানুজ বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন:—

"তল্লব্ধির্বিবেক বিমোকাভ্যাস
ক্রিয়াকল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ"।—

বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, অঙ্কুর, কল্যাণ, অনবসাদ, ও অনুদ্ধর্ষ এই আট প্রকার উপায়ে ভক্তিলাভ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এখানে বিবেক অর্থে রামানুজ বলেন "খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার"। অর্থাৎ "নামাত্মাদৃষ্টাদন্নাৎ"। আত্মাদৃষ্ট অন্ন হইতে সত্ত্বশুদ্ধির নাম বিবেক। এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "আহার শুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" আহারশুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইতেই ধ্রুবাস্মৃতির (বিবেকের) উদয় হয়। মহাত্মা রামানুজ শ্রুতির এই বাক্যানুসারেই বিবেক অর্থে খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার উল্লেখ করিয়াছেন জানা যাইতেছে। এই শ্রুতি বচনের সহিত কণাদ বচনের "অসতি চাভাবাৎ" (শুচি) অর্থের একতা হইয়া থাকে। অর্থাৎ মহর্ষি কণাদ বলেন যে, শুচিভোজন (শুদ্ধাহার) না থাকিলে বিবেক অভ্যুদয়ের অভাব ঘটিয়া থাকে। এইজন্য শুদ্ধ-আহারকে "বিবেকের" হেতু বলা যায়। এই হেতু "বৈশেষিক দর্শনে" মহর্ষি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, "যদিষ্টরূপরসগন্ধস্পর্শং প্রোক্ষিত মভ্যুক্ষিতঞ্চ তচ্ছুচি', শাস্ত্রোক্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শবিশিষ্ট যে বস্তু, যাহা প্রোক্ষিত, অভ্যুক্ষিত এবং ন্যায়ার্জ্জিত তাহাই শুদ্ধ পদবাচ্য হয়।

এ স্থলে দেখিতে হইবে, শাস্ত্রকথিত শুদ্ধ বস্তুগুলি কি? শাস্ত্রে হবিষ্যপ্রকরণবিধিতে শুক্ল বর্ণের হৈমন্তিক ধান্যকে শুদ্ধ বলিয়াছেন, অতএব এখানে "রূপ" অর্থে সাদা বর্ণবিশিষ্ট ধান্যই বুঝাইতেছে। রস অর্থে "স্বাদুনিমধুরাণিচ" এই শাস্ত্রোক্ত বচনে, যে বস্তু স্বভাবতঃ মধুর রসযুক্ত অর্থাৎ নারিকেলাদি ফলকেই বুঝায়; যেহেতু নারিকেল ফল সাত্ত্বিক আহারের অন্তর্ভূত। গন্ধ অর্থে "মৃদু সৌগন্ধযুক্ত" পুষ্পকে বুঝায় (যাহা বিষ্ণুপূজায় বিহিত আছে)। স্পর্শ অর্থে 'কোমল' শয্যাকে বুঝায়; যেহেতু 'কোমল স্পর্শ' শয্যাই দানার্থে শাস্ত্রে বিহিত আছে। প্রোক্ষিত অর্থে মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ও মন্ত্রপূত জল বিন্দু দ্বারা সিক্ত। অভ্যুক্ষিত অর্থে অনুত্তান হস্তে জল বিন্দু দ্বারা সিক্ত। ন্যায়ার্জ্জিত অর্থে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা 'যাহা' সংগৃহীত নহে। এই সকল দ্রব্যই শাস্ত্রের বিধান মতে শুদ্ধিকর, তদ্ভিন্ন অশুচি; অর্থাৎ "অশুচীতি শুচি প্রতিষেধঃ"।

মহর্ষি কণাদ আরও বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ আহার ব্যতীত কেবল সংযমে অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপ্রতিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা বিবেকর উদয় হয় না। সংযম দ্বারা বিবেকের আংশিক অভ্যুদয় হইয়া থাকে। অতএব যম, নিয়ম প্রভৃতি সংযমের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিবে, শুদ্ধ অন্ন ও শুদ্ধিকর বস্তুর বিষয়েও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অন্তথায় প্রকৃত বিবেক অর্থাৎ "ধ্রুবা স্মৃতির" উদয় হইবে না। অশুচি দ্রব্য ভোজন করিলে, দেহের বিকারে মনের বিকার ঘটিবে; আলস্য, প্রমাদ, ভ্রান্তি (ভ্রমভাব) আসিবে; শেষে পরমপদের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইবে, ইহাই কণাদের মত।

শ্রুতি ও কণাদ বাক্যের আলোচনায়, শুচি আহার, বিবেকের হেতু বা কারণ বলিয়া জানা যাইতেছে। আবার যে বস্তু, হেতু, জন্য, বা কারণ হয়, তাহা সাধ্য ও জনকের অতিরিক্ত না হইয়া উৎপন্নার্থক হওয়ায়, "জৈমিনী মতে" গৌণ পদ বাচ্য হয়। অতএব রামানুজমতে বিবেক অর্থে খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার (যাহা শ্রুতি ও কণাদ-বচনের সহিত ঐক্য হইল) 'বিবেকের হেতু হওয়ায়, গৌণের অন্তর্ভূত হইল।

• ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপরোক্ত "আহার শুদ্ধেঃ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ" সম্বন্ধে উপনিষদভাষ্যে, বলিয়াছেন যে, "আহ্রিয়তে ইত্যাহার শব্দাদি-বিষয় বিজ্ঞানম্ ভোক্ত র্ভোগায়াহ্রিয়তে তস্য বিষয়োপলব্ধি লক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহার শুদ্ধীরাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্ট বিষয় বিজ্ঞান-মিত্যর্থঃ-তস্যামাহারশুদ্ধৌ সতং তদ্বতোরন্তঃ-করণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধি নৈর্ম্মল্যং ভবতি।" অর্থাৎ যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। আত্মার উপভোগের জন্য শব্দ-বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ানুরাগজনিত যে জ্ঞান তাহার বিশুদ্ধতাই শুচি বা শুদ্ধ আহার বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি অর্থে দ্বেষ, মোহ, আসক্তি পরিবর্জ্জনতায় (কামনাবাসনাশূন্যতায়) বিষয় জ্ঞানকেই বুঝায়। এইরূপ আহার দ্বারা জীবের সত্ত্ব গুণের আধিক্যে, অন্তঃকরণ "সত্ত্বশুদ্ধ" হইয়া প্রশান্ত ও নির্ম্মল হয়। এবং পরিণামে ইহার দ্বারাই "অবিচ্ছিন্না ধ্রুবা স্মৃতির" উদয় হইয়া পরাৎপর পর-ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে।

("আহার শুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ এই শ্রুতি বাক্যের অর্থানুসারে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই মুখ্যার্থবোধক বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। এক্ষণে পাঠকগণের অভিরুচির তার-তম্যানুসারে বর্ত্তমান "বিবেকের অর্থ" গৃহীত হইবে।)

বিমোক অর্থে "কামানভিষঙ্গঃ শান্ত-উপাসীতেতি" কামসঙ্গশূন্যতায় শান্ত হইয়া উপাসনা করা। অভ্যাস অর্থে "পুনঃ পুনঃ সংশীলনমভ্যাস" সর্ব্বদা তত্ত্বাবভাবিত হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হওয়া। ক্রিয়া অর্থে "শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া" শ্রুতি ও স্মৃতিকথিত কর্ম্মানুষ্ঠান যাহা শক্তি অনু-সারে করা হয়, তাহার নাম ক্রিয়া। অর্থাৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞ কর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধানে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে ক্রিয়া বলা যায়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলিতে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ও মনুষ্যযজ্ঞকে বুঝায়। ইহাদের ভাবার্থ এই, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলি-কর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ, তর্পণ শ্রাদ্ধ কিম্বা পৈত্র্য-বলির নাম পিতৃযজ্ঞ, বেদ, জপ ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিসৎকারের নাম মনুষ্য-যজ্ঞ; এইগুলি স্মৃতিকথিত মনুষ্যগণের মহা-যজ্ঞ জানিতে হইবে। ইহলোকে এই সকল হইতে উৎকৃষ্টতর যজ্ঞ নাই; এইজন্য ক্রিয়া বলিতে ইহাদিগকেই বুঝায়। কল্যাণ অর্থে "সত্যার্জ্জবদয়াদানাদীনি" সত্য, ঋজুতা

দয়া ও দানাদিকে বুঝায়। অনবসাদ "দৈন্ত-বিপর্য্যয়োহনবসাদ" দৈন্ত বিপর্য্যয়ের নাম। যাহা শ্রুতি মতে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো" ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মপ্রার্থনার সহায়ভূত বলকে অনবসাদ বলে। অনুদ্ধর্ষ অর্থে "তদ্বিপর্য্যয়জাতুষ্টিরনুদ্ধর্ষ" তদ-বিপর্য্যয়জনিত যে তুষ্টি—অর্থাৎ উপহাসাদি হাস্যকৌতুক পরিশূন্যতায় মানসিক শক্তিকে দৃঢ় করা। আর "অঙ্কন" অর্থে শরীর মধ্যে সুদর্শন চক্রাদির চিহ্ন ধারণ করা। এই বিষয়ে "পূর্ণপ্রজ্ঞ-বেদান্ত ভাষ্যে" বলিয়াছেন যে:—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেন গচ্ছন্তি বাঞ্ছিতাঃ।
উরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবাম।

যাহারা পরমপদের অভিলাষী, তাহারা ভগবান বিষ্ণুর চক্রে স্বীয় শরীর চিহ্নিত করিয়া ইহসংসারে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন।

উপরোক্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা, ভক্তি-লাভের উপায় বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গৌণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানা যাইতেছে। গৌণভক্তি সংসার পরিত্রাণিকা না হইলেও, গৌণ করিয়াই মুখ্য সাধিত হয়। অন্যথায় গৌণ ত্যাগ দিয়া একেবারেই "মুখ্যসাধন" অসাধ্য হইয়া থাকে। যেমন বাল্যকালের ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া প্রবীণোচিত কার্য্যের চেষ্টা বৃথা হয়—শাখা প্রশাখায় আরোহণ না করিয়া গগনস্পর্শী মহা মহীরুহের মস্তক স্পর্শের চেষ্টা বিফল হয়; তদ্রূপ গৌণ ত্যাগ করিয়া একেবারেই মুখ্য সাধনের চেষ্টায় অকৃতকার্য্যতাই প্রকাশ পায়। আন্তরিক যত্নসহকারে উল্লিখিত সাধনায় রত হইলে, ক্রমশঃ উহা দ্বারাই শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অনসূয়া, অস্পৃহা, দান, দয়া, দম, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুসেবা, অকুটিলতা, মধুরতা, অস্তেয়, স্বাধ্যায়, উপস্থ-সংযম, অক্রোধ, অপ্রমাদ, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিকতার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বল, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, যশ, সাহস, তেজ, সৌভাগ্য, কুলজ্যেষ্ঠতা, সুকর্তৃত্ব, বেদজ্ঞান ও কর্ম্মসিদ্ধির দ্বারা "কোন এক সময়ে" পরা-ভক্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। অতএব গৌণ-সাধন কদাচ উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু নিষ্কাম বা পরাভক্তি লাভ করিয়া, বিভূ-পাদপদ্মের সৌরভ উপলব্ধি করতঃ জগৎ অতিক্রম করিতে হইলে,—সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া চির শান্তিভোগ করিতে হইলে, কামনাবাসনা পরিশূন্যতায় সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে। "সুখং বৈষয়িকং শোক সহস্রেণাবৃতত্বতঃ" জ্ঞানে অনর্থকারিণী বিষয়বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে; আত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত ভোগ্যবিষয় ছাড়িতে হইবে। দেহে পৌনঃপুনিক গন্ধ অনুলেপনের জন্য ব্যাকুলতা, কোমলাঙ্গী রমণীর রমণীয়তা, সুধাধবলিত সৌধরাজির কারুকার্য্যতা একবারে ভুলিতে হইবে। যেহেতু অনন্ত দুঃখ-সঙ্কুলা বাসনাই জ্ঞানশক্তি শূন্য করতঃ মানবকে সত্যবর্জ্জিত করে,—জগতকে অন্ধ করিয়া তুলে; ধন, দারাদির লোভে ভুলাইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার-পরিণতি ঘটায়। এই জন্যই ঋগ্বেদে বলিয়াছেন যে—

রাজংতমধ্বরাণাম গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে॥
স নঃ পিতেব সুনবেহগ্নে সুপায়নোভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥
(প্রথম মণ্ডল ঋগ্বেদ।)

হে সত্যাত্মক আগ্নরূপী পরব্রহ্ম! তুমি গোপামৃতস্য, ঋতস্য, যজ্ঞস্য, গোপাং রক্ষকং। স্বে দমে, যজ্ঞশালায়াম্। অর্থাৎ তুমি দীপ্তিমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞফল দাতা, এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল। তুমি সর্ব্বমঙ্গলময় পরমাত্মা। তুমিই মানবের কর্ম্ম-পাশমোচক। আমরা সংসার-দাবাগ্নির জলন্ত স্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হইয়া, তোমার চরণ-সরোবরে আশ্রয় লইলাম। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ 'অনায়াসে বোধ-গম্য' হন, তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও। আমাদের মঙ্গলার্থে হৃদয় গুহাতে "গুহাহিতং নামে যেরূপে বিদ্যমান আছ, সেইরূপেই অবস্থান কর। আমরা তোমার অনুগ্রহে, নানা বর্ণে বিলাসিনী "কামনাবাসনাকে" অবাস্তব জ্ঞানে, "বিষলিপ্ত মধুবৎ" দূরে নিক্ষেপ করিয়া তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ—'যেন' সংসার-দাবানলের শান্তি করিতে পারি।

মনু বলিয়াছেন:—

অর্থকামেষসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞান বিধীয়তে"

বিষয়াভিলাষজনিত অর্থকামে আসক্তি-শূন্য ব্যক্তিরাই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করতঃ—পরম পদে অসীম শান্তি লাভের অধিকারী হয়।

দক্ষ বলিয়াছেন:—

"যত্নেন বিষয়াসক্তিং তস্মাদভক্ত বিবর্জ্জয়েৎ"

ভগবদ্ভক্তগণ বিষয়বাসনাকে যত্ন করিয়া পরিহার করিবে। ইহাই সংসার অতিক্রম করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন:—

বাসনাবলিতং চিত্তমিহস্থিতিমুপাগতম্।
তদেবতদ্বিনির্ম্মুক্তং বিমুক্তমিতি কথ্যতে॥

চিত্ত বাসনাবদ্ধ থাকিলেই উহার সংসার অবস্থিতি ঘটে, আর বাসনা বিমুক্ত হইলেই মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ সত্যাবলোকন দ্বারা পরমা-শান্তি লাভ করে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—

যস্য চিত্তং নির্ব্বিষয়ং হৃদয়ং যস্য শীতলম্।
তস্য মিত্রং জগৎ সর্ব্বং তস্য মুক্তিঃ করস্থিতা॥

যাহার মন বিষয়বাসনা পরিশূন্য, অন্তঃকরণ শীতল অর্থাৎ রজঃতমোগুণ-বিহীনতায় সত্ত্বগুণে পূর্ণ, তাঁহার নিকট এই সমস্ত জগৎ মিত্রের ন্যায় সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মুক্তি বা মোক্ষ এইরূপ লোকের করতলগত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন:—

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মোনৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহ॥

কামনাবাসনার নিবৃত্তিই জীবের বন্ধন-মোচনের একমাত্র উপায় বলিয়া এই ধর্ম্মই শুভফলদাতা এবং ইহা দ্বারাই শোক, মোহ ও ভয় অপসারিত হয়।

গীতাতে বলিয়াছেন:—

এতান্যপি তু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানিচ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ, নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।

আসক্তি (কামনা বাসনা) ও ফলাভিলাষ পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা

সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ইহা আমার (ঈশ্বরের) নিশ্চিত মত জানিবে।

পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন:—

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়ধ্যানে রত থাকে, তাহার তাহাতেই আসক্তি জন্মে। পরে প্রবলা কামনার উদ্রেক হয়। আবার কামনার অনুরূপ বিষয়প্রাপ্তির অভাব হইলেই ক্রোধ উপস্থিত হয়; ক্রমশঃ ক্রোধ দ্বারাই মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ ও পরিণামে প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। অতএব কামনা-বাসনা অপেক্ষা জীবের অনিষ্ট ও অমঙ্গল-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে?

সাংখ্যদর্শনে বলিয়াছেন:—

"যাবদ্বন্ধ নিবৃত্তি ন স্যাত্তাবন্মোক্ষো ন ভবেদিতি"।

জীবের বন্ধন নিবৃত্তি না হইলে, অর্থাৎ কামনাবাসনার দাস হইয়া যাহারা সংসারাসক্ত, কামনাযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যাহাদের পরমার্থজ্ঞান, বিষয়ানুরাগে যাহারা বিমুগ্ধ-চিত্ত, তাহারা যত্নের সহিত নিষ্কামধর্ম্মের সাধনা দ্বারা কামনা বাসনা পরিশূন্য না হইলে কদাচ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় না। পরন্তু পুনঃ পুনঃ সংসারভ্রমনই তাহাদের পরিণাম হয়। ইহারই নাম 'দাক্ষিণকবন্ধ" অর্থাৎ—"প্রতিনিয়ত জন্মমরণানুরাগত্বাৎ'।

ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন:—

"তন্নান্নিবর্ত্তক ধর্ম্মানুষ্ঠানবশাদীশ্বর প্রসাদসিদ্ধাবভি-মতেষ্ট সিদ্ধিরিতি"।

নিবর্ত্তক (নিষ্কাম) ধর্ম্মানুষ্ঠান-বশে ঈশ্বর-প্রসন্নতায় অভিমত ইষ্টসিদ্ধি সংসাধিত হয়। অর্থাৎ "সংসারোহস্তমিয়াৎ" দগ্ধসংসার অস্তমিত হইয়া যায়।

বৈশেষিক দর্শনে বলিয়াছেন:—

"আত্মেন্দ্রিয় মনোহর্থ সন্নিকর্ষাৎ সুখ দুঃখে"।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন বিষয়সম্পর্কশূন্য হইয়া আত্মনিষ্ঠ হইলেই ক্রমশঃ "মনের স্পন্দন রহিত হইয়া" ইষ্টসাক্ষাৎকারে নিত্যসুখের উপলব্ধি হয়। অন্যথায় বিষয়ের সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা হইলে, কামনা বাসনার আধিক্যে "মনের স্পন্দন বর্দ্ধিত হইয়া" অনিষ্ট সাক্ষাতকারে পৌনঃপুনিক সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হয়। যেহেতু মনের স্পন্দনেই সংসারভাবের বিকাশ হয়, স্পন্দনবশেই অহংজ্ঞানের উদয়ে দুঃখজাল আসিয়া বিড়ম্বিত করে। স্পন্দনরহিত হইলেই মনের উচ্ছেদে সংসার-ভাব বিদূরিত হয়।

পাতঞ্জলদর্শনে বলিয়াছেন:—

"বীতরাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।"

নানারূপে তরঙ্গায়িত মন সমস্ত বাহ্য-বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলেই অর্থাৎ অন্তঃ-করণের মধ্যে যত প্রকার আশা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা বা অভিলাষ আছে, তৎসমুদয় এককালে পরিত্যাগ করিলে, সহজেই ধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইয়া গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যবস্তুতে অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্যবস্তুতে একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অনাময় পদলাভের অধিকারী হয়।

মীমাংসাদর্শনে বলিয়াছেন:—

'নিখিল-বাসনা নিবৃত্তৌপর নির্ব্বাণং'।

মোহময়ী বাসনাই জীবকে সংসার-সঙ্কটে নিপোতিত করে। অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে অর্থাৎ নিখিল বাসনার নিবৃত্তি হইলে পরম নির্ব্বাণপদ লাভ হয়। বৌদ্ধদর্শনে বলিয়াছেন :—

"জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ"।

কামনা বাসনা পরিবর্জ্জন করতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তাহার নাম "জ্ঞানপ্রসাদ। এই জ্ঞানপ্রসাদেই জীবের বন্ধন মোচন হইয়া দিব্য পরাৎপর পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। সমস্ত মলিনতা বিমুক্ত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, অনুপমেয় শান্তি সহজেই অধিগত হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়শাখাতে বলিয়াছেন :—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
(কঠশ্রুতি।)

পরমপদ অভিলাষী ব্যক্তির অন্তঃকরণস্থিত সমস্ত কামনা বাসনা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই মৃত্যু অতিক্রম করতঃ "অমৃতত্ব" লাভ করে, এবং বন্ধনবিষয়িনী সমস্ত কামনা বাসনার উপশান্তি হওয়ায় ব্রহ্মরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। "অমৃত" বলিতে "বিশ্বস্যায়তনং মহদিতি—অর্থাৎ বিশ্বের আধার স্বরূপ মহান স্থানকে বুঝায়। মতান্তরে অমৃত অর্থে—জ্ঞানকেই বুঝাইয়া থাকে। উভয় মতের মীমাংসায় অমৃত বলিতে বিশ্বব্যাপক "পূর্ণ পরব্রহ্মই" প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়শাখাতে বলিয়াছেন :—

বাসনা বিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ।
বাসনাং সং পরিত্যজ্য ময়ি চিন্মাত্র বিগ্রহে।
যন্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ সোঽহং সচ্চিৎ সুখাত্মকঃ॥
(মুক্তিক শ্রুতি)

বায়ু শূন্য স্থানে প্রদীপ যেরূপ নিস্পন্দ ও স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কামনা বাসনার পরিশূন্যতায় চিত্ত স্বতঃই চিরশান্তি লাভ করে। অর্থাৎ চিত্তের স্পন্দনরহিতাবস্থায় "ব্রাহ্মীস্থিতি" প্রাপ্ত হয়। অতএব যে ব্যক্তি কামনা বাসনা পরিত্যাগ করতঃ চিন্মাত্র স্বরূপ আমাতে (ঈশ্বরেতে) চিত্তসমাধানি (চিত্তের একাগ্রতা) করিতে পারে, তাহর আশা-পাশ বিধায়িনী সংসারের প্রতি ব্যগ্রতা বা মমতা থাকে না। সেই পুরুষই সচ্চিৎসুখের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানবলে ঈশ্বরের সহিত—অভিন্নতা লাভ করে।

অথর্ব্ববেদীয়শাখায় বলিয়াছেন :—

"অতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে"।
ব্রহ্মবিন্দু শ্রুতি।

মন কামনাবাসনা শূন্য হইয়া নির্ব্বিষয় হইলেই মুক্তিরূপ পরম অবস্থা লাভ করে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরী শাখায় বলিয়াছেন :—

স এক প্রজাপতেরানন্দঃ
শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য—
তে যে শতং প্রজাপতেবানন্দাঃ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ আনন্দ ভোগ করেন, বিষয়বাসনাশূন্য ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ (অকামহত শ্রোত্রিয়) তাহা হইতে শত গুণ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা সহজেই জানা যাইতেছে যে, কামনাবাসনা ত্যাগই

নিষ্কাম বা পরা ভক্তি লাভের প্রধান লক্ষণ। এইজন্যই আত্মসংযম বা আত্মশুদ্ধি লাভের উপায়-বিষয়ে যত প্রকার সাধন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কামনাবাসনা ত্যাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন; আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র অবলম্বন এবং পরম পদ পরিজ্ঞানের সন্নিকর্ষ উপায় বলিয়া নানাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

অতএব যতদিন কামনাবাসনা নিবৃত্তি না হইবে, ততকাল সংসার বাসনাও থাকিবে, জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণাও ভোগ হইবে, নানাবিধ দৈন্য দুর্দ্দশাও দেখা দিবে। কিন্তু বাসনার বিলাসিনীবৃত্তি ক্ষয় পাইলে সংসারের অসারতা উপলব্ধি হইবে, অনর্থদায়িনী বাসনাই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানে পরিণত হইবে; তখন বাসনার বিলীন অবস্থায় (অভাবে) সংসারও লোপ পাইবে। যেহেতু বাসনাই সংসার রূপে পরিণতা হয়, এবং বিষয় স্পৃহা জন্মাইয়া মানবকে অন্ধ করতঃ হিতাহিত বিবেক শক্তি শূন্য করে। সেই বাসনাই যদি বিনষ্ট হয়, তবে আর সংসার থাকিবে কেন? বিশেষতঃ মন বা চিত্ত বাসনাবিহীন হইলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; অর্থাৎ অগ্নির-আশ্রয় কাষ্ঠরাশি দগ্ধ হইলে যেমন অগ্নিশিখার বিকাশ থাকে না, তদ্রূপমনোবৃত্তিরূপী বাসনার বিনাশ হইলে মনের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়। মতান্তরে এই স্পন্দনই চিত্ত নামে অভিহিতা হয়। অতএব স্পন্দন রহিত হইলেই চিত্তের চিত্তত্ব বা মনের অস্তিত্ব লোপ পায়। মন লোপ পাইলেই জীবকে আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, বৈষয়িক-সুখে আর আনুরক্তিও থাকে না। তখন রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ প্রভৃতি বৃত্তি ও ধন, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, কলত্র প্রভৃতির মমতা বিলীন হইয়া দুঃখের চিরাবসানে পরা-শান্তির উদয় হয়; কাজেই জরামরণরূপী সংসারও অস্তমিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যাঁহারা কারণবাদী, অর্থাৎ কামনাবাসনাকে সংসার বা জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও "কামনাবাসনারূপ" কারণের বিনাশ (অভাব) হইলেই সংসার বা জগৎরূপ কার্য্য লোপ পাইয়া থাকে। যেহেতু বৈশেষিক (কণাদ) মতে "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ"। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

---:0:---

সন্ন্যাসী।

হে সন্ন্যাসী! জগতের গুরুরূপী পুরুষরতন!
ভারতের সরবস্ব—যুগব্যাপী সাধনার ধন,
ধরমের কীর্ত্তিধ্বজা,—বৈরাগ্যের বিজয়-কেতন!
জাগিয়া জাগাও বিশ্ব—কতকাল রবে অচেতন?
অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, জড়তায় আবরি ত্রিলোক!
জাগাও তাদের পুনঃ বিতরিয়া জ্ঞানের আলোক,
ঘুচায়ে তন্দ্রার ঘোর দাও সবে জ্ঞান-নেত্র খুলি,
মিটাও পিপাসা, দিয়া শান্তি-বারি, পুরিয়া অঞ্জলি!

নামিয়াছে স্বরগ হইতে যেই প্রেম-মন্দাকিনী,
অবর স্থানেতে যার বিন্দুমাত্র—অমৃত রূপিনী!
জীবেরে শিবত্ব দিতে আন তাহা জগতের তরে-
কি ফল রাখিয়া তাহা রুদ্ধ করি পর্ব্বত-কন্দরে?
দাও পথ মুক্ত করি—ছুটুক সে প্রবল প্রবাহে,
মদমত্ত কামনা বাসনা যত ভেসে যাক তাহে।
উদ্ধার জীবেরে সখা, কতকাল আছে অচেতন,
অন্ধতম ময়ামোহ ঘুচে গিয়া লভুক চেতন!
ভাতুক পুরবে রবি উদ্ভাসিত করি জল-স্থল,
ফুটুক কাননে ফুল সুষমায় করি ঢল ঢল,
গাহুক কোকিল গাছে, পাপিয়া ধরুক তান,
ভ্রমরের গুঞ্জনে মাতুক জগত-জনের প্রাণ।
বহুক অমিয়ানিল সুবাসিত মলয়-চন্দনে,
সঞ্চারুক বিশ্বে প্রাণ প্রতিজনে হৃদয়-স্পন্দনে।
জগতের এ মসি-লিপ্ত দৃশ্যপট করি উন্মোচন
ফুটিয়া উঠুক দৃশ্য, তুলনায় হীন হোক নন্দন
কানন!
কোটীকণ্ঠে বাজি উঠি পূতধ্বনি প্রণব-ঝঙ্কার
অনন্তে মিশুক সব—ভেদাভেদ করি একাকার!!!

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

—:0:—

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন-লিপি।

বদরিকাশ্রম।

আমি সস্ত্রীক এবং আরও ৫ জন আত্মীয় সমভিব্যাহারে ১৩২০ সালের ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার সময় ৺বদরীনারায়ণ দর্শন মানসে বাটী হইতে রওনা হইলাম। বেলা ৬-৪৫ মিনিটের সময় সিরাজগঞ্জ ষ্টীমার ঘাটে পৌছছিলাম; তখনও ষ্টীমার আসে নাই, দেখিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য ভজনাদি সমাধান্তে কিছু জলযোগ করা হইল। ৭॥টার সময় ষ্টীমার আসিলে আমরা টিকিট করিয়া গোয়ালন্দ রওনা হইলাম। বেলা ৩টার সময় গোয়ালন্দ পহুছিয়া তথায় বাজারে একটী দোকানে আশ্রয় লইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। রাত্রি ১১টার সময় প্রত্যেকের জন্ত ১॥৶০ আনা দিয়া নৈহাটীর টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। ভোর ৬॥০টার সময় নৈহাটী পৌছছিয়া পূর্ব্বপরিচিত একটী বাসায় উঠিলাম। তথায় ১২।১৩ দিবস অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

১৪ই বৈশাখ রবিবার—অদ্য ভোরে শয্যা-ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া গঙ্গাস্নান করিলাম এবং ৮টার মধ্যে আহা-রাদি শেষ করতঃ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ৮॥টার সময় রওনা হইয়া ব্যাণ্ডেল পহুছিলাম। তথা হইতে হরিদ্বারের ভাড়া ৮॥৶আনা। আমরা যথাসময়ে টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; ১০টার সময় কলিকাতা হইতে যে ট্রেন আসে, তাহাতে আরোহীর আধিক্যহেতু স্থান পাইলাম না, সুতরাং সে ট্রেনে যাওয়া ঘটিল না। অগত্যা ৩॥ টার ট্রেনের অপেক্ষায় রহিলাম। গাড়ি আসিয়া পহুছিলে দেখি তাহাও

পূর্ব্ববৎ আরোহীগণে পরিপূর্ণ। এ গাড়ী সে গাড়ী স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়া ঘুরিতেছি, এমন সময়ে একজন পশ্চিম-দেশীয় ব্রাহ্মণ-রেলওয়েকর্ম্মচারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে একখানি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন, ও ঐ গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী বলিয়া একখানি রসিদ আঁটিয়া দিলেন। আমরা এইরূপ সময়ে আশাতিরিক্ত সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঐ বাবু-টীকে দুইটী টাকা প্রদান করিয়া অভিবাদন করিলাম। বাণ্ডেল হইতে ৪টার সময় গাড়ি ছাড়িয়া চলিতে লাগিল। সেই রাত্রি গাড়িতেই কাটিয়া গেল।

১৫ই বৈশাখ, সোমবার—অদ্য বেলা ৮ টার সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌছিলাম, তথায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মুসাফির-খানায় গিয়া জলযোগ করিয়া লইলাম; পরে বেলা ১০॥ টার সময় গাড়ীতে উঠিলাম। সে দিন এবং রাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া রাত্রি ৩॥ টার সময় হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌছিলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মুসাফিরখানায় আশ্রয় লইলাম।

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—অদ্য প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া সাড়েতিন ভায়া পাণ্ডার সহিত সহরে রওনা হইলাম। ৭॥ টার সময় সহরে পৌছিয়া গঙ্গার ধারে হরেরপেরির ঘাটের নিকট উক্ত পাণ্ডার ভাড়াটীয়া বাসার দুতালায় আশ্রয় লই-লাম। তৎপর গঙ্গাস্নানান্তে আহারাদির বন্দোবস্ত করাগেল। আহারান্তে যাঁহারা আমার সহিত নূতন আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে গেলেন, আমি বাসাতেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

হরিদ্বার।

ষ্টেশন হইতে সহর অনুমান দেড় মাইল দূরে হইবে। আমাদের মালপত্র ঠেলাগাড়ীতে দিয়া আমরা পদব্রজেই রওনা হইলাম। রাস্তার ধারেই পোষ্ট-অফিস্, টেলিগ্রাম-অফিস, হাঁসপাতাল ইত্যাদি দেখা গেল। তাহার কিছুদূরেই ঐ রাস্তার ধারে রায় সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুরের সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা। আমরা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়া ছিলাম।

১৭ই বুধবার—অদ্য রজনী প্রভাতে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সম্'ধা করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। বাসার নিকটেই হরকি-পেড়ির ঘাট ব্রহ্মকুণ্ড। হরিদ্বারে মহাতীর্থে গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ভারতের কত দেশের কত গঙ্গাস্নানার্থী নরনারী আগমন করিয়াছেন এবং স্নান করিতেছেন। আমরাও ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বসিয়া সংকল্প করতঃ ভাগীরথীর নিত্য-শীতল পবিত্র সলিলে একে একে অবগাহন করিলাম। আমাদের বাহ্যাভ্যান্তরীন পাপপঙ্ক যেন বিধৌত হইয়া গেল, এরূপ প্রতীয়মান হইল। এ তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে কত শত, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, পরমহংস, পাপী, তাপী, সংসারী স্নাত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়া যাইতেছেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর ভাগে প্রবাহ-নিমগ্ন হরকিপেড়ি বা হরের যোগপীঠ বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে মহাদেব যোগাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজর্ষি ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রসন্না হইয়া ভাগীরথী যখন হিমালয়

ভেদ করিয়া ভগীরথের সহিত এইস্থানে উপস্থিত হয়েন, মহাদেব তখন নিজের বিশাল জটাজুট বিস্তারকরতঃ গঙ্গাদেবীকে জটাপাশে আবদ্ধ করেন। গঙ্গাদেবী তখন কাতর হইয়া কহিলেন, হে দেব, আপনিই প্রসন্ন হইয়া আমার অবতরণকালে নিজ মস্তকে আমার প্রবাহবেগ ধারণ করিয়াছিলেন। আপনার অভিপ্রায়ানুসারেই আমি নিম্নে অবতরণ করিতেছি। এক্ষণে আবার আমায় আবদ্ধ করিয়া আমাকে ও এই শরণাগত ভক্তকে নিরস্ত করিতেছেন কেন? আশুতোষ তখন হাস্য সহকারে জটাজুট-গ্রন্থি হইতে অবিলম্বে গঙ্গার গতিপথ প্রদান করিলেন। তখন গঙ্গা উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজির মূল পর্য্যন্ত প্রবাহ বিস্তার করিয়া সানন্দে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। এক্ষণে সেই বিস্তৃত প্রবাহের সঙ্কোচ হইয়াছে। মধ্যে যে চর পড়িয়াছিল, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাতে আরও মাটি ভরাট করিয়া দিয়া হরিদ্বারের দিকে যে যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকে আরও দূরবিস্তৃত করিয়া খাল (canal) রূপে পরিণত করিয়াছেন। উহা সাহারাণপুর, মজফরনগর, মীরাট্ প্রভৃতি প্রদেশ হইয়া কাণপুর পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গার সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখভাগে গঙ্গার প্রবাহের মধ্যে অনেকটা স্থান সুন্দররূপে বাঁধান আছে, এবং তট হইতে ঐ স্থানে যাইবার জন্য একটী সুন্দর সেতু আছে। আমি একবার পূর্ণকুম্ভের স্নানে গিয়াছিলাম, ঐ সময় স্নানের দিন দেখিতে পাইলাম যে, হরিদ্বারের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও পুলিশসাহেব বাহাদুরদ্বয় তাঁহাদের মেমসহ ঐ পুলের উপর চেয়ারে বসিয়া আছেন এবং স্নানার্থীদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। এক্ষণে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ সেতুর উপর দাড়াইয়া নিম্নস্থ নির্ম্মলজলে স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল মৎস্যগণের ক্রীড়া দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করেন। বস্তুতঃ দলবদ্ধভাবে নির্ভয়ে বিচরণশীল ছোটবড় মৎস্যসমুহের ক্রীড়াভঙ্গি দেখিতে অতি সুন্দর। এ পবিত্র তীর্থে প্রাণিহিংসা না থাকায় মৎস্যেরাও ঐ রূপ হিংসা ও ভয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ নহে; বরং কৌতুকদর্শী যাত্রিগণের নিক্ষিপ্ত খই, মুড়ি, ছোলাভাজা, ময়দার গুটী প্রভৃতি অনেক সময় ভোজন করিয়া থাকে। মৎস্যের ঝাঁকে ঐ সকল বস্তু নিক্ষেপ কালে অতীব আগ্রহের সহিত তাহাদের ছুটাছুটী ও নিক্ষিপ্ত বস্তুর ভোজন ব্যাপার দেখিয়া এবং নির্ম্মল জলে উহাদের গতিবিধি দর্শন করতঃ দর্শকগণ অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

হরিদ্বারের প্রাচীন দেবমূর্ত্তির মধ্যে ভৈরব নামক মূর্ত্তি অন্যতম। উহা সিন্দুরবিমণ্ডিত এবং কপালে অর্দ্ধ চন্দ্ররেখায় রঞ্জিত। এই ভৈরবের নামে কিছু দেবোত্তর জমী ছিল শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঐ দেবোত্তর জমীর উপর করধার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঐ জমী ভিন্ন ভৈরবের নামে আর একখানি ভূ সম্পত্তি আছে। ভৈরবের মন্দিরের অদূরে মায়াদেবীর প্রস্তরনির্ম্মিত বহু প্রাচীন মন্দির আছে। মায়াদেবী চতুর্ভুজা এবং ত্রিমস্তকবিশিষ্টা। ভূজচতুষ্টয়ে চক্র, ত্রিশূল, অভয় ও নরকপাল শোভা পাইতেছে ইহার নিকটেই (সর্ব্বনাথ) মহাদেবের মন্দির,

অতি সুন্দর ও বিস্তৃত প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। দেবদেবীর লিঙ্গমূর্ত্তিগুলিও অতি রমণীয়। ইন্দোরের রাণী গঙ্গাতীরে কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দিরে কতকগুলি সুন্দর দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, মোহান্ত প্রভৃতির স্থাপিত আরও কয়েকটী দেবমন্দির আছে। বিল্ব-কেশ্বর স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলিয়া বোধ হইল। রাজপথ ছাড়িয়া রেল রাস্তার নীচ-দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই উক্ত বিল্বকেশ্বর মহাদেবের দর্শন পাওয়া যায়। বিল্বকেশ্বরের অঙ্গনে নিম্ববৃক্ষমূলে কোনও ভক্ত কুণ্ডলিনী বেষ্টিত আর একটী শিবমন্দির স্থাপন করিয়া-ছেন। আর একটী ভক্ত পুজারী, আগন্তুক প্রভৃতির বাসের জন্য এক প্রকাণ্ড পাকা দালান ও একটী ইন্দারা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। স্থানটী কি পবিত্র ও সুন্দর! দেবভূমি ও তপোভূমি এইরূপ নিভৃত ও পবিত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার পার্শ্বেই ললিতা নামক গর্ত্তনিবদ্ধ শুষ্ক পার্ব্বত্য নদীর উপর ললিতাদেবীর মন্দির। এইরূপ হরিদ্বারে দর্শনীয় স্থান অনেক রহিয়াছে। দূরস্থিত ও সঙ্কটাকীর্ণ স্থান সমূহের দৃশ্যাবলী দেখিবার জন্য আমাদের চিত্ত অধিকতর সমুৎসুখ থাকায় আমরা এবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানকার সকল দৃশ্য দর্শন করিতে পারি নাই। মোটা-মুটী যাহা নিতান্ত দর্শনযোগ্য তাহাই দর্শন করিয়াছি। বর্ণিত স্থানগুলি ভিন্ন হরিদ্বার হইতে এক মাইল উত্তরে ভীমগোড়া নামকস্থানে ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড, পর্ব্বতকন্দরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি, নারায়ণের দশাবতারের মূর্ত্তি ও কালিকামাতার মূর্ত্তি আছে। হরিদ্বারের অপর পারে নীলধারা ও তাহা পার হইয়া চণ্ডীর পাহাড়; উক্ত পাহাড়ের উচ্চ শিখরদেশে মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত চণ্ডীদেবী আছেন। এ সকল স্থানও দর্শনীয়। হরিদ্বারে যে কুশাবর্ত্তঘাট আছে, তথায় সকলে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন।

হরিদ্বার হইতে প্রায় দুইমাইল দূরে কনখল; এই স্থানে দক্ষরাজ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং তদীয় কন্যা জগন্মাতা 'সতী' ঐ যজ্ঞে অনিমন্ত্রিতরূপে উপস্থিত হইয়া বিশাল যজ্ঞ-সভা মধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে পিতৃকৃত পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মান্তিক অভিমান ও অপমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।* ঐ পবিত্র স্থান-

---

* সতীদাহের হেতুভূত একপুরাবৃত্ত। পূর্ব্বে একদা মুনিবর দুর্ব্বাসা, জম্বুনদতীরে গমন পূর্ব্বক তত্রস্থা দেবী জম্বুনদেশ্বরীকে দর্শন করিয়া সেই স্থানে মায়াবীজ জপ করিতে আরম্ভ করেন। অন-ন্তর সেই দেবী তদীয় জপে প্রসন্না হইয়া যাহার মকরন্দগন্ধে আনন্দিত অলিকুল আকুল চিত্তে চতুর্দ্দিক ভ্রমন করতঃ অভ্যন্তরে বিলীন হইতেছে, ঈদৃশ নিজ দিব্য কণ্ঠমালা সেই দুর্ব্বাসাকে দান করেন। মুনি-বর দুর্ব্বাসাও দেবীর প্রসাদস্বরূপ তাহা মস্তকে ধারণ করেন। পরে সেই তাপস, জগদম্বা দাক্ষায়নীর দর্শনাভিলাষে তথা হইতে নির্গত হইয়া আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সতীপিতা দক্ষের আলয়ে ত্বরায় আগমন করিয়া সতীর চরণ কমলে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দক্ষ সেই মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, ভূতলে মানবগণের দুর্ল্লভ এই অলৌকিকী মালা আপনি কাহার নিকট হইতে কি প্রকারে প্রাপ্ত হই-লেন? তদ্বাক্যশ্রবণে দুর্ব্বাসা প্রেমাপ্লুতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিলেন, ইহাদেবী জম্বুনদেশ্বরীর প্রসাদ-লব্ধ। তখন সতীপিতা দক্ষ মুনিবরের নিকট সেই মালা প্রার্থনা করায় মুনিবর বলিলেন যে, ত্রৈলোক্যমধ্যে শক্তিভক্তকে অদেয় কিছুই নাই। এইরূপ বলিয়া সেই মালা দক্ষকে দিলেন। প্রজাপতি দক্ষও ঐ মালা

সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব অবশ্য দর্শনীয়।

হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি প্রভৃতি মোক্ষপ্রদ সপ্ত পুরীর অন্যতম।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
(পদ্ম পুরাণ।)

কেচিদুচুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেহপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥
(কাশীখণ্ড।)

হরিদ্বার, গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী প্রভৃতি নানা নামে অতি প্রাচীন কালাবধি বিখ্যাত। এক্ষণে ইহার হরিদ্বার নামই সমধিক প্রচলিত। অনেকে আবার ইহাকে হরদ্বারও বলিয়া থাকেন। হিন্দীতে হরদোয়ার, তাহারই অপভ্রংশ ইহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সর্ব্বনাথ, ভৈরবনাথ, বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি শিবমূর্ত্তির অধিষ্ঠান স্থান বলিয়া বোধহয় হরদোয়ার নাম হইয়াছে।

যাহাহউক, সপ্ত পুরীর মধ্যে শিবের ৩½ ধাম এবং বিষ্ণুর ৩½ ধাম, অর্থাৎ কাশীপুরী, মায়াপুরী, অবন্তী ও কাঞ্চীপুরীর অর্দ্ধাংশ শিবের, এবং অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারাবতী ও কাঞ্চীপুরীর অপরার্দ্ধ বিষ্ণুর। এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে।

আমরা স্নানান্তে বাসায় পৌছিয়া নিজেদের আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। আহার ও বিশ্রাম করিয়া বেলা ৩ টার সময় অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

১৮ ই বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাহার সমাধাকরিয়া পাণ্ডার নিকট "সাঁকল" লইয়া হৃষীকেশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই হরিদ্বারেই ৺বদরিকাশ্রম ও ৺কেদারনাথের পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা দুই জনে দুই জন চাকর আমাদের সঙ্গে দিলেন ও বলিয়া দিলেন যেন তাহারা আমাদের গন্তব্য স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দেয়। মালপত্র বহন করিবার জন্য তিনজন লোক আমাদের সঙ্গে লওয়া হইল।

হরিদ্বার হইতেই উত্তরাখণ্ডে যাত্রা আরম্ভ। যিনি সমস্ত উত্তরাখণ্ডে যাত্রা ও পরিক্রম ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী, পরে কেদারনাথ ও বদরীনাথ গমন করেন। কেদারনাথ ও বদরীনাথযাত্রাই সাধারণতঃ প্রচলিত। এই উভয় যাত্রার মধ্যে অগ্রে কেদারনাথ দর্শন ও পরে বদরীনারায়ণ দর্শনের বিধি আছে। হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্তরী ১৬২ মাইল দূরে অবস্থিত। দেরাদুন ও টিহরী হইয়া ঐ স্থানে যাইতে হয়। অনেকে হরিদ্বার হইতে বরাবর ট্রেনে দেরাদুন না যাইয়া গোগাড়ী বা একাযোগে হৃষীকেশ গমন করেন। পদব্রজে যাইবার সোজা রাস্তা আছে। হৃষীকেশ দর্শনান্তে ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হৃষীকেশ ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনে দেরাদুন যাইতে হয়। হৃষীকেশ হইতেই গঙ্গোত্তরী ও কেদারনাথ যাইতে

সপ্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়া নিজ শয়নগৃহে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে সেই মালার দিব্যগন্ধে আনন্দোন্মত্ত হইয়া রতিক্রীড়া করেন। সেই পাপে সর্ব্বকল্যাণকর মহেশ্বর ও দেবী সতীর প্রতি দক্ষের দ্বেষবুদ্ধি জন্মে। রাজন, সতী দেবী সেই অপরাধেই সতীধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যোগাগ্নিদ্বারা স্বকলত্র নিজ দেহ দগ্ধ করেন।—দেবীভাগবত।

হয়। আমরা বেলা ৪টার সময় হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া হইয়া ৭ মাইল দূরবর্ত্তী ৺সত্যনারায়ণ পৌছিলাম। এই রাস্তা আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে ১॥ ঘণ্টায় অতিক্রম করি। তৎপর আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ৺সত্যনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সিংহদ্বার অতিক্রম করতঃ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ৺সত্য-নারায়ণের মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর! কি পবিত্র স্থান, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তিই বা কি চমৎকার! দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। এ স্থানে যাত্রিগণের অবস্থানের পক্ষে বিশেষ আরামপ্রদ। এখানে ধর্ম্মশালায় ও সত্যনারায়ণের মন্দিরের চতুস্পার্শ্বস্থ প্রশস্ত বারান্দায় অনেক যাত্রী সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। পাকের জন্য পৃথক কতগুলি ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে; স্নানেরও সুন্দর ব্যবস্থা। সত্যনারায়ণের মন্দির প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে এক উত্তম কুণ্ড আছে। স্নানের জন্য ঝরণার জল একটী প্রণালী দিয়া পরিপূর্ণ করা হইতেছে, অন্য পথ দিয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এই কুণ্ডের পরই যাত্রীনিবাসের জন্য গৃহশ্রেণী। তাহারই প্রান্তে পাকশালা, পাক ও পানীয় জল উঠাইয়া দিবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। ঐ জল সংগ্রহের জন্য জলসত্রের পার্শ্বেই একটী উৎকৃষ্ট ইন্দারা আছে। স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর। আমরা সত্যনারায়ণেকে ১৲ টাকা প্রণামী দিয়া তথা হইতে রওনা হইলাম। সত্যনারায়ণ হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭ টার সময় হৃষীকেশ পৌছিয়া বাবা কালী-কমলিওয়ালার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়া রজনী যাপন করিলাম।

হৃষীকেশ।

১৯শে, শুক্রবার—রাত্রি প্রভাতে বাবা কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা হইতে দেব দর্শনে রওনা হইলাম। হৃষীকেশ অতি উত্তম স্থান। এখানে অনেকগুলি দেব-মন্দির, অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও অনেক সদাব্রত আছে। ঔষধালয়, পাঠশালা, পুস্তকাগার প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বিশেষতঃ মহাত্মা কালীকমলীওয়ালার অন্নসত্র বারমাস খোলা থাকে। উহাতে পরমহংসগণ রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত খাদ্য পাইয়া থাকেন। অন্যেরা আটা, চাউল, ঘৃত, লবণ ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। বিদ্যার্থী ও সাধুমহাত্মাগণ প্রয়োজনমত তৈল, দিয়াসালাই, গিরীমাটী, ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। রোগীর জন্য ঔষধ, পথ্য, চিকিৎ-সক এবং বিদ্যার্থীর জন্য অন্ন ও অধ্যাপকের বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটী ধর্ম্মশালাও আছে, তথায় বৎসরের মধ্যে ৫মাস অন্নদান করা হইয়া থাকে। অনেক ধর্ম্মাত্মা সম্পূর্ণ মাঘমাস কাল হৃষীকেশক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকেন। স্থানটী উত্তম এবং সমতল, বাজার খুব প্রশস্ত, রাস্তাও সুন্দর। এবং পোষ্টাফিস আছে। একটু দূরে বিস্তৃত ময়দান, এইরূপে হৃষীকেশ সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম স্থান।

আমরা বাজারের মধ্যদিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। বাজারের শেষেই গঙ্গার প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার উপর ঋষিকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে, উহাতে স্নান করিয়া

পশ্চাৎ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিতে হয়। এখানে গঙ্গার তিনটী ধারা একত্র সম্মিলিত হওয়ায় ত্রিবেণীসঙ্গম নাম হইয়াছে। গঙ্গার আকার এখানে স্বভাবতঃ প্রশস্ত। আমরা গঙ্গাস্নান ও মার্জ্জনস্নানান্তে ভরতজীর প্রকাণ্ড মন্দির দর্শন করিলাম। এখানে রামজানকীরও মন্দির আছে। তাহা ছাড়া ভদ্রকালী ও শিবের একটী সুন্দর মন্দির আছে, এই সমস্ত দেবদেবী দর্শন ও স্পর্শন করিয়া তথা হইতে রওনা হইলাম। পদব্রজে পথ চলিবা বেলা ৮॥ সময় মোহনরেতি নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থানে মহাদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। টীহরিরাজারে সরকারী লোক আছে, তাহারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট যে জিনিষপত্র থাকে তাহা ওজন করিয়া মাশুল লয়। এই মাশুলের হার প্রতি মণে ৩৫৲ টাকা। আমাদের মালপত্র ১।০ এক মণ দশসের হওয়ায় আমাদিগের মাশুল ৪৩৷৷০ আনা হইল। আমরা প্রথমতঃ ১০৲ টাকা দিলাম, আমাদের নাম ধাম ঠিকানাদি লিখিয়া লইল। মোহনরেতি হইতে প্রায় ১॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গেল। ৯টার সময় লছমন-ঝোলা চটীতে উপনীত হইলাম। ঠাকুর লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। একাদশী তিথি বলিয়া সহযাত্রী বিধবাগণের জন্ম এখানেই অদ্য বিশ্রাম করিতে হইল।

লছমনঝোলা।

প্রশস্ত গঙ্গার উপর সেই ভীতিপ্রদ ঝোলার নাম ত বরাবরই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখন আর সেইদিন নাই। এখন ইহাতে অতি সুদৃঢ় সুখগম্য লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে দুইটী ইষ্টক-নির্ম্মিত সুদৃঢ় দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে। তৎসংলগ্ন চারিটী লোহার শিকল দুই পাশে এপার ওপার রহিয়াছে; ঐ শিকলে কাষ্ঠের পুল লম্বমান রহিয়াছে। এক্ষণে নিরাপদে ঐ পুল দিয়া যাত্রীগণ এপার ওপার গমনাগমন করিয়া থাকেন।

এই সেতু নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই ঝোলা পার হওয়া যে কিরূপ ভীষণ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে।

আমরা গঙ্গার অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ঝোলা দেখিলাম। গঙ্গার উভয় তীরে দুইটী করিয়া ৪টী কাষ্ঠের খুঁটা পোঁতা রহিয়াছে। ঐ খুটার এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত শক্ত দুইগাছি মোটা রশি (রজ্জু) বাঁধা আছে। ঐ দুগাছি দড়িতে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বরাবর ছোট ছোট কোঁথা (মইয়ের আকারে) রহিয়াছে। বাঁশের মৈ সদৃশ ইহাও দড়ির মৈ বিশেষ। এইরূপ দড়ির পুলকে এদেশে ঝোলা বলে। ইহার উপরে উঠিয়া হস্ত দ্বারা ধরিয়া পার হইবার সুবিধার্থ ঐ ঝোলার রশি দুইগাছির উপরে প্রায় ২॥ হাত উচ্চে আর দুই গাছি রজ্জু রহিয়াছে। এইরূপ সেতুতে পূর্ব্বে পারাপার চলিত। ইহার দোষ এই যে, এই ঝোলার উপর উঠিয়া একটু অগ্রসর হইলেই ঝোলাটী অত্যন্ত দুলিতে থাকে। তখন সুদূর নিম্নস্থ গভীর গর্জ্জনকারিণী প্রখর-স্রোতা গঙ্গা দৃষ্টিপথে পতিতা হন। তখন একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়;

এবং অনবধানবশতঃ দোদুল্যমান ঝোলায় পদক্ষেপ করা যায় না; হয়তঃ এক একবার পদ-স্খলন হইয়া যায়। যেই পদস্খলন,—আর অমনি সমূহ বিপদ উপস্থিত! তখন মাত্র উপরের রশি ধরিয়া ঝুলিতে হয়, নিম্নস্থ দোদুল্যমান ঝোলা শীঘ্র পাওয়া যায় না। তখন হতাশায় হস্তের বল বিলুপ্ত হইয়া আইসে। বুদ্ধি বিবেচনা অন্তর্হিত হয়। তাহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতন! বহুযাত্রী ঐরূপে রজ্জুভ্রষ্ট হইয়া দূর নিম্নে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়া প্রবাহবেগে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; এবং প্রবাহ মধ্যস্থ শিলাখণ্ডে বাধা পাইয়া চূর্ণীকৃত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এইজন্যই লছমনঝোলা প্রাণসংশয়কর ভয়াবহ সেতু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এবং এইজন্যই জীবনে মমতাশূন্য নির্ভীক সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত তৎকালে বদরীনারায়ণ দর্শন সাধারণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। লছমনঝোলা পার হইতে হইবে বলিয়াই বদরীনারায়ণ দুর্গম তীর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। আর সেই ঝোলা অতিক্রম করতঃ যাঁহারা বদরীনারায়ণ তীর্থ দর্শন করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা মহাত্মা এবং সৌভাগ্যবান্ বলিয়া পরিচিত হইতেন। বাস্তবিকই তখন যাঁহারা এই তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মীয় স্বজনগণের নিকট চিরতরে বিদায় লইতেন। যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য এইরূপ ত্যাগস্বীকার ও প্রাণবিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাত্মা ও ধন্য!

সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি, যে অতি-পূর্ব্বে এইরূপ রজ্জুর ঝোলাও ছিল না। পার্ব্বত্য প্রদেশে একরূপ লতা জন্মে, তাহা মোটা রশির মত স্থূল ও শক্ত; উহা বহুদূর পর্য্যন্ত লতাকারে যায়। তখন সেইরূপ লতা একপার হইতে অপর পারে সেতুর আকারে বিস্তৃত হইত। যাহারা পার হইতেন, তাঁহারা সঙ্গে ঘৃত ও কদলী লইতেন এবং কুশের ঝোলা প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া ঐ লতা বাহিয়া পারাপার করিতেন। ঐ লতাকে অধিকতর পিচ্ছিল করিবার জন্য সঙ্গের কলা ও ঘৃত ঐ লতায় মাখাইয়া লইতেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই-প্রকারে পার হইয়া বদরীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং লছমনঝোলা পার হওয়া যে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিপজ্জনক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবৎকৃপায় রায় সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুর পুণ্য-ক্ষেত্রের এবম্প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া হিন্দুর নিকট আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তিনি বহুসহস্র টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান সেতুটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, হিন্দু এই পুণ্যতীর্থের সহিত তাঁহারও অমর নাম স্মরণ করিবে। যে ঝোলার জন্য বদরীনারায়ণ অতি দুর্গম ও ভীষণ বলিয়া, সেই দেবভূমি দর্শনে নিরাশা আনয়ন করিত, আজ তাহা অতীব সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

২০শে, শনিবার—অদ্য প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিয়া লছমনঝোলার দিব্যঘাটে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ বেলা ৯টার সময় ফুলবাড়ী চটীতে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম; তৎপর বৈকালে রওনা হইয়া বিজলী

পৌঁছিলাম। এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিলাম।

২১শে, রবিবার—বিজলী চটী হইতে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া ৯টার সময় বান্দরচটীতে পৌঁছিয়া ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে বৈকালে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় মহাদেবচটীতে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় রাত্রি কাটাইলাম।

মহাদেবচটী ভাগীরথীর অমুচ্চ তটের উপর স্থিত, সুতরাং এখানে সেরূপ জলকষ্ট নাই, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর ছড়ান থাকায় ঘাটের সেরূপ সুবিধা নাই। পাথরগুলি বড় হইলে ঘাটে উঠানামা এবং স্নান উপবেশনাদির সুবিধা হইত। এ চটীতে অনেকগুলি দোকান আছে, একটী মহাদেবের মন্দির আছে, দুইটী সুন্দর ধর্ম্মশালা ও পোষ্টাফিস আছে। এখানে প্রাতে ও সায়ংকালে দুগ্ধ পাওয়া যায়। ওজন আশি সিক্কা, এ দেশে সর্ব্বত্রই ঐ একই ওজন।

২২শে, সোমবার—রজনী প্রভাতে আমরা চটী হইতে রওনা হইয়া বেলা ৯।টার সময় কাণ্ডীচটীতে পৌঁছিলাম। এখানে মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপনা করা গেল। এই চটি সারি সারি লেবু, মহানিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত এবং স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট হওয়ায় বেশ সুন্দরও সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চটীর উভয় দিকে দুইটী স্থূলধারাবিশিষ্ট ঝরণা থাকায় এখানে জলের জন্য যাত্রীদিগকে কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। ঐ ঝরণার অনতিদূরে একটী সুন্দর পাকা নবনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা আছে। আমরা আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় ব্যাসচটীতে উপনীত হইলাম এবং তথায় রাত্রি বিশ্রাম করিলাম। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

শান্তি গীতা।

মঙ্গলাচরণ।

যিনি শান্ত এবং অব্যক্তরূপ, মায়ার আধার, স্বয়ং প্রকাশমান্ সত্যস্বরূপ সেই বিশ্বসাক্ষী পরমব্রহ্মকে নমস্কার করি।১॥

যাঁহার বাণী, অতীব গূঢ় পরমব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকটিত করে, মুক্তিকামীদিগকে পূর্ণানন্দ পদ প্রদানকরে এবং বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের ভ্রান্তিহেতুভূত ব্যাকুলচিত্তকে প্রশমিত করে এবং ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বস্বরূপ পরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করে, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।২॥

প্রথম-অধ্যায়।

পাণ্ডববংশে খ্যাতিমান্ নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের পুত্র ইন্দ্রসদৃশ প্রভাশালী মহাত্মা মহারাজ শতানিক একদা রাজমন্দিরে বন্ধু ও মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং মাগধ-সূত প্রভৃতির দ্বারা বন্দিত হইয়া পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিধ

রসালাপে আনন্দানুভব করিতেছেন, হেনকালে প্রফুল্ল চিত্ত, তেজোরাশি-সমন্বিত, তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ শান্তব্রত রাজসন্নিধানে উপনীত হইলেন (১—৪।)

রাজা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আনন্দিত হইয়া অমাত্য, বন্ধুবান্ধবসহ আসন পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে বিনয় ও নম্রতা সহকারে প্রণাম করিলেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বসিবার জন্য সিংহাসন প্রদান করিলেন।৫,৬॥ পরে ভক্তিভাবে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা মুনিবরের যথোচিত সৎকার করিয়া রাজা বিনীতভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ও তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি বলিলেন, যে সুখ সর্ব্বত্র অন্বিত সেই সুখই সুখ। মহারাজের কুশলেই আমাদের কুশল; সুতরাং রাজদেহের এবং রাজ্যের কুশল বলুন। (৭—৯)।

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেস্থানে আপনার ন্যায় তাপসপ্রবর বিরাজ করেন, সেখানে কুশল; আত্মকুশল লাভ করিবার জন্য স্বতঃই সকল সময়ে বিরাজমান থাকে। আপনার ক্ষেমমূর্ত্তি ও শুভদৃষ্টির প্রসাদে আমার শারীরিক, রাজ-পরিবারের ও রাজ্যের মঙ্গল এবং সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ-মানা ॥১১॥

অনন্তর রাজা মুনিবরকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে প্রভো! পূর্ব্বে আপনার প্রসাদে অমৃত-তুল্য তত্ত্ববার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সারতম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইতেছে; অতএব যাহা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই, কৃপা করিয়া সেই সারতত্ত্ব বর্ণনা করুন। ১৩॥

শান্তব্রত কহিলেন, পরম শান্তিপ্রদা-য়িনী শান্তিগীতা যাহা অতি গুহ্যতম সারতত্ত্ব এবং যাহা ভগবান বাসুদেব কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের শোক অপনোদনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং যাহা পূর্ব্বে আমার গুরু কৃপা করিয়া আমাকে দান করিয়াছিলেন, আমার সেই সযত্নে সুরক্ষিত গীতা এক্ষণে তোমার আগ্রহাতি-শয্যে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে স্থিরভাবে শ্রবণ কর। ১৪—১৬॥

—:0:—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলে, তাঁহার পিতা অর্জ্জুনকে শোকবিহ্বল দেখিয়া, ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়াছিলেন ॥ ১

ভগবান বলিলেন, সখে পার্থ, আমার পূর্ব্বকথিত উপদেশ বাক্য সকল বিস্মৃত হইয়া কেন শোক করিতেছ এবং মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছ ?॥২

মায়িক বস্তুতে সত্তা বলিয়া জ্ঞানই শোক মোহের কারণ; তুমি বুদ্ধিমান এবং ধীর; অত-এব বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।।৩

এই ঘোর মায়াময় সংসারকে সত্য ভাবিয়া দেহাভিমানবশতঃ মমত্বাবদ্ধচিত্ত হইয়া বিমোহিত হইয়াছ ॥৪

তুমি কে, কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পুত্র কলত্রাদিই বা কে এবং কেনই বা তাঁহাদের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহা ক্ষণকাল মাত্র বিচার করিয়া দেখ ॥৫

এই বিশ্বসংসার সমস্তই অজ্ঞানপ্রসূত এবং জীব, মায়াবশতঃ দেহাভিমানযুক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া থাকে ॥৬

(ক্রমশঃ।)

তুর্ক-সঙ্কট।

সরকারী ইস্তাহার।

ইউরোপের মধ্যে একমাত্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য তুরস্কের সহিত ব্রিটিশরাজের বিবাদ বাধিবার কারণ কি তাহা সাধারণকে জানাইবার জন্য আমরা আসামের চীফকমিসনারের দপ্তর হইতে যে সরকারী 'কমিউনিক' বা ইস্তাহার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

রুষরাজ্যের দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী ওডেসা বন্দর হইতে তত্রত্য ব্রিটিশ কনসাল-জেনারেল বিগত ২৯শে অক্টোবর তারিখে তার যোগে জানাইয়াছেন,—"অদ্য প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দু তিন খানা টর্পেডো জাহাজ এই বন্দর আক্রমণ করিয়া রুষের "ডোনেজ" নামক একখানা কামানবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে তাহাতে কতকগুলি নাবিক হত ও কতকগুলি আহত হইয়াছে। রুষপক্ষের 'ভিটিয়াজ', 'নিরাজরেক' ও 'হোয়াম্পাও' নামে আরও তিনখানা ষ্টীমজাহাজ জখম হইয়াছে। 'পর্টুগাল' নামক ফরাসী জাহাজখানাও ঘায়েল হইয়াছে—তাহার দুইজন নাবিক হত ও দুই জন আহত হইয়াছে। সহরে আরও কতকগুলি গোলা পড়িয়া একটী চিনির কারখানার কিছু ক্ষতি করিয়াছে ও সেখানে কতকগুলি লোক মরিয়াছে। ওডেসার গবর্ণর বলিতেছেন—আক্রমণকারী জাহাজগুলি তুরস্কের।"

আরও প্রকাশ, তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে রুষের ভাসমান ঘাঁটিটি জলমগ্ন হইয়াছে ও জলপথে থিওডোসিয়া বন্দর আক্রান্ত হইয়াছে। উত্তেজনার কারণ বা ছল কিছু না থাকিলেও যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই রুষরাজের ঐ সকল স্থান আক্রমণ করা হইয়াছে। ইংরেজ-বন্ধু রুষের প্রতি তুরস্ক সুলতানের উল্লিখিত আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ ও তুর্ক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সদ্ভাববন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব বিধায় ভারতের বড়লাট ভারতীয় সামন্তরাজগণকে তথা ভারতবাসী প্রকৃতিপুঞ্জকে জর্ম্মণীর প্ররোচনায় তুর্ক গবর্ণমেণ্টের উপরপড়া হইয়া শত্রুতাসাধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিবরণ অবিলম্বে জ্ঞাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

'গোবেন' ও 'ব্রেসল' নামক জর্ম্মণ যুদ্ধ-জাহাজ দুই খানির সম্বন্ধে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের হাল চাল দেখিয়া লণ্ডন, পারিস ও পর্টুগালের অনেকেই পূর্ব্ব হইতে সন্দেহ করিয়া ছিলেন। ঐ জাহাজ দুইখানি ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী

ব্রিটিশ ও ফরাসী বহরের নিকট হইতে পলাইয়া তুরস্কের অধিকৃত দার্দ্দেনেলিস প্রণালীতে আশ্রয় লইয়াছিল। তুরস্কের সন্ধিপত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের সর্ত্ত অনুসারে তুর্ক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, হয় ঐ দুইখানি রণতরীকে চব্বিশ ঘণ্টা পরে বহিঃসমুদ্রে তাড়াইয়া দেওয়া অথবা উঁহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া নাবিকগণকে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে জাহাজ দুইখানি তুরস্কের আশ্রয় লাভ করিল ও যুদ্ধকালীন নিয়ম মানিয়া চলিবার জন্য ক্যাসী জাহাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। অতঃপর সহসা প্রকাশিত হইল যে, তুর্ক গবর্ণমেণ্ট ঐ জাহাজ দুইখানি খরিদ করিয়া জর্ম্মন নাবিকগণকে বাহাল রাখিয়াছেন ও তুর্ক নৌবহরের অধ্যক্ষতা হইতে ইংরেজ এডমিরালকে অপসারিত করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে দার্দ্দেনেলিসের প্রণালী-পথেও অনেক 'মাইন' পোতা হইল। যে সকল ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত কৃষ্ণসাগর হইতে ঐ প্রণালী-পথে আসিতেছিল সেগুলি আবদ্ধ হইল। প্রথমে বলা হইল, তুরস্ক যে সৈন্য-সংগ্রহ করিতেছেন তাহাদের রসদের জন্য ঐ সকল জাহাজের মাল দরকার। পরে কারণ দেখান হইল যে ঐ প্রণালীতে অনেক 'মাইন' পোতা হেতু জাহাজের পথ বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত আটকান হইয়াছে। এইরূপে ব্রিটিশ বাণিজ্যের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা নিরপেক্ষ রাজশক্তি পক্ষে কোন প্রকারে সমর্থনযোগ্য নহে। ইহাতে জাহাজের মালিক ও ব্যবসাদার, উভয়কেই বিস্তর ক্ষতিভোগ করিতে হইয়াছে; এমন কি ইহার ফলে কৃষ্ণসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যবাহী ৬০।৭০ খানি জাহাজের গতায়াত বন্ধ হইল, কারণ ভূমধ্যসাগরে যাইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল অধিকন্তু 'গোবেন ও 'ব্রেসল' নামক জাহাজ দুখানা কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য বাণিজ্যপোতগুলিকে ধ্বংস করিতে লাগিল। এক্ষণে আন্তর্জ্জাতিক সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া দার্দ্দিনালিস প্রণালী রোধ করা হইয়াছে।

বোগদাদে বৈরিতা।

উদ্বেগের আর একটী হেতু, তুরস্কের অধিকৃত মেসোপোটেমিয়া প্রদেশ ও বোগদাদ সহরে তুর্ক রাজকর্ম্মচারিগণ তত্রত্য ব্রিটিশ-প্রজাগণের সহিত বিশেষ অসদ্ব্যবহার করিতেছে ও তাহাদের প্ররোচনায় গ্রেট-ব্রিটেন ও তৎসহযোগিগণের বিরুদ্ধে তত্রত্য নাবিকগণ ক্রমশঃ উত্তেজিত হইতেছে।

এই সকল উত্তেজনা সত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে, যদি গোবেন ও ব্রেসল জাহাজে জর্ম্মণের পরিবর্ত্তে তুর্কনাবিক নিযুক্ত হয়, যদি ব্রিটিশ বাণিজ্যপোতগুলিকে অবরোধ করা না হয়, এবং যদি তুরস্ক মানে মানে নিরপেক্ষ শক্তির কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অন্যায়াচরণ ও শত্রুতামূলক ব্যবহার ত উপেক্ষিত হইবেই, অধিকন্তু গ্রেটব্রিটেন তুর্করাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য যে বরাবর অবহিত রহিবেন তদ্বিষয়ে একখানি গ্যারাণ্টি লিখিয়া দিবেন।

তাছড়া, ইহাও জানান হইয়াছিল যে, সন্ধিকালে যাহাতে তুর্করাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যাহাতে সন্ধির

সর্ত্তে তুরস্কের অর্থগত অনুকূল বন্দোবস্ত হয় তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এতদূর অঙ্গীকার করা সত্বেও গ্রেট-ব্রিটেনের প্রতি তুরস্কের ব্যবহার ক্রমশঃই উদ্ধত রকমের বোধ হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রমাণ পাইলেন যে, সিরিয়া রাজ্যে যুদ্ধসজ্জা হইতেছে—উদ্দেশ্য, মিশর আক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও জানা গেল, মিশরের সীমান্তপ্রদেশের সন্নিকটে বেদৌন আরবগণের মধ্যে তুর্ক ও জর্ম্মন কর্ম্মচারিগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। আকাবা ও গাজা হইতে মিশরদেশে সুয়েজখাল আক্রমণের জন্য মোসুল ও দামস্কস বাহিনীর সৈন্যসংগ্রহ অবধি ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে সেনা প্রেরণ করিতেছে। এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক বেদৌন আরবকে ডাকিয়া লওয়া হইয়া ও তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রাদিও দেওয়া হইয়াছে। মালবাহীপোত সংগৃহীত ও মিশরসীমান্ত পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাতে তাহারা সমুদ্রপথে আক্রান্ত না হয় সেজন্য আকাবা উপসাগরে পুতিবার উদ্দেশ্য অনেক 'মাইন' চালান দেওয়া হইয়াছে। আর খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে উত্তেজনাকারী সেই নামজাদা বদমাস সেখ আজিজ সাউইজ, গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়া এক রাজদ্রোহকর বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছে ও তাহা মিশররাজ্যে বিলি করিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা ভারতেও পৌছিয়াছে। আরও সংবাদ আসিয়াছে যে, ডাক্তার প্রুফার নামে যে ব্যক্তি এতদিন কাইরো সহরে ব্রিটিশ অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল ও এবং এক্ষণে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে জর্ম্মণ রাজদূতের পদে বাহাল আছে, সেই ব্যক্তি সিরিয়ার অধিবাসিগণকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

অন্য একস্থানেও ঐরূপ ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং ইহাও শুনা গিয়াছিল যে ভারতীয় মুসলমানগণের হৃদয়ে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার জন্য তুরস্কের গুপ্তচর, প্রেরিত হইয়াছে। ষড়যন্ত্র কতদূর গড়াইয়াছিল তাহার একটা বিশেষ উদাহরণ এই যে, সম্প্রতি মিশরের আলেকজাণ্ড্রিয়ার-সিটি পুলীশের অনেক জর্ম্মণ কর্ম্মচারী ছুটী হইতে ফিরিবার কালে কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাহাকে সামরিক কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। জাহাজ হইতে-নামিবামাত্রই তাহাকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায়, তাহার গাত্রবস্ত্রের মধ্যে সুয়েজখালের একখানি বিশদ মানচিত্র, কতকগুলি সাঙ্কেতিক সংবাদ ও অন্যান্য মীমাংসার চিঠি পত্র রহিয়াছে ঐ ব্যক্তি উক্ত জাহাজে অনেক সহযাত্রীর। নিকট হইতে দুই বাক্স বিস্ফোরক পদার্থও রাখিয়াছিল।

অধিকন্তু, জর্ম্মণ নাবিক ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জাম লইয়া দলে দলে কনষ্টাণ্টিনোপল সহরে পৌছিয়াছে। বস্তুতঃ কনষ্টাণ্টিনোপল নগরটী এখন জর্ম্মণীর একটা আড্ডা হইয়াছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, তুরস্কের যে অধিবাসিগণকে গ্রেটব্রিটেন ও তাহার মিত্রশক্তি সমূহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য জর্ম্মণ কর্ম্মচারিগণ ঐ রাজ্যের

অভ্যন্তর প্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। তুর্ক কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ উপেক্ষার ফলেই যে এরূপ ঘটিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই এবং ইহাতে একটা সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে।

পরিশেষে তুর্ক-গবর্ণমেণ্ট যে ইচ্ছা করিয়াই গ্রেটব্রিটেনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন তাহা আকাবার সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি তুরস্কের সমরসচিবের প্রদত্ত গত ১৮ই অক্টোবর তারিখের হুকুমনামা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহাতে তিনি যুদ্ধ বাধিলে উক্ত সৈনাধ্যক্ষের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। উহাতে যে শুধু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে শত্রু বলা হইয়াছে এমত নহে অধিকন্তু ব্রিটিশ রাজদূতের পতাকাদণ্ড ভাঙ্গিয়া তাহার নিদর্শন-সমূহ অপসারিত করিবার হুকুম ছিল।

গ্রেটবিটেন পৃথিবীর মধ্যে একটী বৃহত্তম মুসলমান শক্তি ইনি তুরস্কেরও একজন পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধু। বল্কান যুদ্ধের সময় গ্রেটব্রিটেনই ইউরোপে তুরস্কের অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, শত্রুপক্ষ তুরস্ককে ভুলাইয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে টানিয়া লইয়াছে ও তাহাদের দ্বারা এমন কাজ করাইতেছে যাহা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ ও কৃতঘ্নতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, একটা বৃথা অহঙ্কার ও বৈদেশিক বিদ্বেষের বশে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তুর্করাজ্যের চিরশত্রু জর্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়ার হিতসাধন করিতেছে।"

জর্ম্মণী মনে করিয়াছেন, তুরস্কের হাত ধরিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই বাধাইতে পারিলে হয়ত ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া একটা গোলযোগ ঘটাইতে পারে। কিন্তু জর্ম্মণীর সে দুরাশায় ছাই পড়িয়াছে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামন্তরাজ নিজামবাহাদুর প্রজাবর্গের মধ্যে এই মর্ম্মে ফরমাণ জারি করিয়াছেন,—

"বর্ত্তমানে ইউরোপে যে মহাসমর বাধিয়াছে তৎসম্পর্কে সকলে ইহা জানিয়া রাখুন যে, এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত্তে প্রত্যেক ভারতবাসী মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাহার পুরাতন রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তাহারা যেরূপ ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এরূপ স্বাধীনতা পৃথিবীর মধ্যে কোন মুসলমান বা অ-মুসলমান রাজ্যের অধিবাসিগণের নাই। আর এক কথা, পূর্ব্বের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এখনও ইসলাম ধর্ম্মের বন্ধুরূপে মুসলমান প্রকৃতি-পুঞ্জের পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বর্ত্তমান সমর-সঙ্কটে ভারতবাসী মুসলমানগণ বিশেষতঃ আমার প্রজাগণ যদি নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতি ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে রাজভক্ত থাকা একান্ত বিধেয়; রাজা-প্রজার বাধ্যবাধকতা হইতে তাঁহারা যেন এক চুল বিচলিত না হন। আমি বেশ বুঝিয়াছি, ব্রিটিশ রাজশক্তি ন্যায়-ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। রাজা-প্রজার পবিত্র সম্বন্ধ কলুষিত করিও না। কোনমতেই কাহারও কুযুক্তিতে পড়িয়া ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে গুপ্ত বা প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিওনা।

পরিশেষে আমি ইহাও বলিতেছি, আমি যেরূপ আমার পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথ

অনুসরণ করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি আমার নিজকে পর্য্যন্ত, ব্রিটিশরাজের সাহায্যার্থ অর্পণ করিয়াছি সেইরূপ প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমান, বিশেষতঃ আমার প্রিয় প্রজামণ্ডলী সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদন করিবে।"

শুধু নিজাম নহেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা আগা খাঁ, 'বেঙ্গল মোসলেম লিগের' সেক্রেটারি মিঃ হক্ এবং দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, বম্বে, ঢাকা, বাঁকিপুর, কোয়েটা প্রভৃতি অনেক স্থানের বড় বড় মুসলমান জননায়ক গবর্ণমেণ্টের নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিচলিত রাজভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন; পক্ষান্তরে ২রা নবেম্বর তারিখে সিমলা হইতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' অতিরিক্ত সংস্করণে প্রকাশ, যতদিন ভারত হইতে হজযাত্রিগণের উপর অন্যায় অত্যাচার না হয়, ততদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আরবদেশের জেড্ডা, মেসোপেটেমিয়া প্রভৃতি মুসলমান তীর্থগুলি আক্রমণ করিবেন না। রেঙ্গুন হইতে ২রা নবেম্বর সংবাদ আসিয়াছে তত্রত্য অনেক তুর্ক অধিবাসী ব্রিটিশ প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে বোম্বাই সহরেও কয়েকজন তুর্ক-ইহুদীও ব্রিটিশ প্রজা হইবার জন্য তত্রত্য পুলীশকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহারা সকলেই প্রায় তুর্কটুপী বিক্রয় করে। তাহারা বলে,—এখন তুরস্কের সিভিল, মিলিটারি ও নৌ-বিভাগে সর্ব্বসমেত একলক্ষ জর্ম্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। লণ্ডন হইতে প্রেরিত ২রা নবেম্বর তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ,—তুরস্কের প্রাণ্ড উজীর অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী কৃষ্ণসাগর সংসৃষ্ট ঘটনাবলীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন।

———:0:———

ধর্ম্মযুদ্ধ নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ২রা নবেম্বর তারিখে এক অসাধারণ গেজেট প্রকাশ করিয়াছেন,—উহাতে এইরূপ ঘোষণা আছে :—গ্রেটবৃটনের সহিত তুরস্কের যুদ্ধ বাধিয়াছে। তুর্ক-গবর্ণমেণ্ট কুপরামর্শ পরিচালিত হইয়া কোনরূপ উত্তেজনার কারণ না থাকাতেও ইচ্ছাপূর্ব্বক এই যুদ্ধে নামিয়াছেন, ইহাতে গ্রেটবৃটন অত্যন্ত দুঃখিত। বড়লাট বাহাদুর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, যুদ্ধ বাধিলেও আরব ও মেসোপটেমিয়ার মুসলমান তীর্থ সমূহ এবং জেড্ডা বন্দর আক্রমণ করা হইবে না। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজভক্ত মুসলমান প্রজাগণ এইযুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব সম্বন্ধে পাছে কোনরূপ অন্যায় সন্দেহ করেন, এই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, এই যুদ্ধে ধর্ম্মের কোন কথা আসিতে পারে না। এই হেতু বৃটিশ স্থল, কি নৌ-সৈন্য এই সকল মুসলমান তীর্থ বা জেড্ডাবন্দর আক্রমণ করিবেন না; তবে ভারতের তীর্থযাত্রী মুসলমানের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে যদি কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, সে স্বতন্ত্র কথা। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ফরাসী ও রুশ গবর্ণমেণ্টও এই ভাবে কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—আশ্রম-সেবক শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী প্রচারোদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গাভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন; সম্প্রতি তাহারা তেজপুর হইতে গৌহাটী গিয়াছেন; অতঃপর গোয়ালপাড়া হইয়া উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ করতঃ আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্ব্বে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বার্ষিক-উৎসব—আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের ৭ম বার্ষিক উৎসব হইবে; আমরা এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে উৎসবে যোগদানার্থে নিমন্ত্রন করিতেছি। আশাকরি উক্ত উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা—আগামী চৈত্রমাসে হরিদ্বারে মহাকুম্ভের অধিবেশন হইবে,—প্রতি তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন চারি স্থানে এই অধিবেশন হইয়া থাকে; ইহা হিন্দুর বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহাসম্মিলন (কংগ্রেস)। ইহাতে দর্শনীয় ও শিক্ষনীয় বিষয় অনেক আছে। যাহাদের সুবিধা আছে, তাহাদের এ সুযোগ ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। অনেক দিন হইতে কুম্ভমেলার সংবাদ জানিবার জন্য নানা স্থান হইতে আমাদিগের নিকট চিঠীপত্রাদি আসিতেছে, সেজন্য এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলাম। উক্ত মেলায় আমাদিগেরও যোগদান করিবার ইচ্ছা আছে; যাহারা আমাদিগের সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, আগামী মাঘমাস মধ্যে আমাদিগকে তাহাদিগের সঙ্গীয় লোকের সংখ্যা সহ নাম ও ঠিকানা জানাইলে তথায় থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবার ভার গ্রহণ করিতে পারি।

সহমরণ—যশোহর—ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত ফুলহরি গ্রাম নিবাসী বিজয়গোপাল বাগছি বৎসরাধিক যাবৎ নানা ব্যাধিতে ভূগিয়া গত ৭ই কার্ত্তিক পরলোক গমন করেন,—তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নী শোকে অভিভূতা হইয়া মৃত স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সতী আর ইহলোকে নাই; তাঁহার পবিত্র আত্মা কায়ার অনুগামী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিয়াছে। ধন্য সতী! যাও, মা, পতিসহ পতিলোকে গমন করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করতঃ আপন বাঞ্ছিত পদ প্রাপ্ত হও!!!

স্থানীয় অবস্থা—গত পূজার সময় হইতে যোরহাট থানার অধীন বিভিন্ন গ্রামে সংক্রামকরূপে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—কত লোক যে চিকিৎসাভাবে অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলা যায় না। এমন কি অনেক বাড়ী

একবারে ধ্বংসপ্রায় গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের অবস্থা এতই শোচনীয় ও দেশবাসীগণ এতই কুসংস্কারাপন্ন যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তবু ও ঔষধ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, তাহারা বলে যে "ঔষধ গ্রহণ করিলে গোহানি (অধিষ্ঠাত্রী দেবী) রাগ করিবেন; এবং রোগী ত মরিবেই, অধিকন্তু অন্যেরাও রোগাক্রান্ত হইবে।" আমাদের আশ্রম হইতে আশ্রম ডাক্তার, আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই ঔষধ গ্রহণত করেই নাই, উপরন্তু কোন কোন স্থলে ডাক্তারকে গ্রামে প্রবেশ করিতে দেয় নাই—অভদ্রোচিত ভাষায় গ্রাম হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছে। আর যাহারা আমাদিগের হিতৈষী ও পরিচিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে নিষেধ করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন! আমরা বিংশশতাব্দীর সুসভ্য বলিয়া কতই না অভিমান করি; আর আর আমাদেরই গৃহের পাশে আমাদের ভাইগণ কুসংস্কারপন্ন এ কথা বলিতেও যে লজ্জা করে!!

গত মাসের প্রথমভাগে একটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গোয়ালা জাতীয় লোক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মিরিগায়ের নিকট "বাবুর আলী" নামক রাজপথের ধারে নর্দ্দমায় বিষ্ঠাবমি লিপ্ত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় (collapse stage) পতিত হইয়াছিল; সন্ধ্যার পর ২।৩ জন আশ্রমসেবক ঐ পথে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সযত্নে নৌকাযোগে অনাথরোগীনিবাসে লইয়া আসেন। সারারাত্র যথাসাধ্য সেবা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও পরদিন বেলা ১০ ঘটিকার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই ঘটনার ৮।১০ দিন পর মহাদেব নামক কোকিলামুখ কুলীডিপোর পুরাতন চৌকীদার গলিত কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া বিপন্নাবস্থায় অনাথরোগীনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে আসিবার পঞ্চম দিবস প্রাতে উক্ত ব্যক্তিও পরলোক গমন করিয়াছে।

———:0:———

গ্রাহকগণের প্রতি :—

"আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশ করিতে অনেক গৌণ হইয়াছে, ইহাতে গ্রাহকগণ বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা প্রত্যহই গ্রাহকগণ হইতে ২।৪ খানা চিঠী পাইতেছি, ভিন্ন ভিন্ন পত্রে উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; সেজন্য গ্রাহকগণ সমীপে সবিনয়ে জানাইতেছি যে দৈবদুর্ব্বিপাকই বিলম্ব হওয়ার একমাত্র কারণ, "স্থানীয় অবস্থা" পাঠে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রেসের কার্য্যকারকগণ মধ্যেও (compositor) অনেকে অনুপস্থিত থাকাতে এই অযথা বিলম্ব হইয়াছে; আশাকরি, অবস্থা বিবেচনা-করতঃ গ্রাহকগণ আমাদের ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। আবার কত দিনে যে পত্রিকা রীতিমত যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব তাহা মা জগদ্ধাই জানেন।

ও তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

শান্তি—গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মনঃকল্পিত এই মিথ্যা সংসারকে সত্য মনে করিয়া জীবগণ মনের অনুকূল বিষয়ে সুখ ও প্রতিকূল বিষয়ে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥৭

অনাদিকাল হইতে জীব এই ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ সংসারকে সত্যবুদ্ধিকরতঃ মমতাপাশ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥৮

মানব যেরূপ পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিব্য গৃহ অবলম্বন করে, জীবও সেইরূপ জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই উত্তম নূতন দেহ গ্রহণ করে ॥৯

অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের পূর্ব্বভাবের অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরিণামশীল দেহে পূর্ব্বভাব থাকে না ॥১০

দেহের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে আর বাল্যভাব দেখা যায় না, যেহেতু অবস্থান্তরে দেহ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি বহুকাল পরে দৃষ্ট হইলে তাহাকে চিনিতে পারা যায় না, কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা 'সেই ব্যক্তি এই' এইরূপ প্রত্যয় করা হইয়া থাকে ॥১১—১২॥

যেমন যৌবনাগমনে পুত্রের দেহের বাল্যভাব না দেখিয়া পিতা শোকগ্রস্ত হয় না এবং ক্রন্দন করে না, তদ্রূপ, হে সখে! অবস্থান্তর প্রাপ্তির ন্যায় দেহান্তরপ্রাপ্তি মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর ॥১৩॥

হে মহাবাহো! ভ্রান্তিবশতঃ যেরূপ শুক্তিতে প্রাতিভাবিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্র-স্থায়ী রজত জ্ঞান হইয়া থাকে, এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎও সেইরূপ শুক্তি-রজতের ন্যায় প্রাতিভাবিক মিথ্যা, কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট সংস্কার-

বশতঃ বুদ্ধির প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন দুষ্ট শুক্তিকে রজতভ্রমবশতঃ তাহা গ্রহণ করিবার লোভ হয় এবং গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দ্রষ্টা যদ্যপি কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করে এবং পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া যদি সেইস্থানে সেই শুক্তিই দেখে তবে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান-ত্রিকালেই শুক্তিতে রজতসত্তার সম্পূর্ণ অভাব সত্বেও, বুদ্ধিতে সত্য-রজতসংস্কার থাকায়, সে শুক্তিকে রজতই দেখে এবং হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাহাই গ্রহণ করিতে যায়; সেইরূপ দেহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র, তরুরাজি এবং গৃহ, শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রান্তির ন্যায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু এই সকলে কিছুমাত্র সত্যতা নাই ॥১৪—১৭

সুষুপ্তিকালে মনের লয় হওয়াতে মন-কল্পিত এই অনন্ত বিশ্ব কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না, জাগ্রদাবস্থায় মনে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিভাত হয়, সুতরাং এই চরাচর বিশ্ব সত্য নহে ॥১৮॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র "সৎ" বিদ্যমান ছিল, তখন তখন দেশ, কাল, ভূত, ভৌতি-কাদি কিছুই স্ফুরিতভাবে ছিল না ॥ ১৯ ॥

তাহাতে (সৎ) মায়াশক্তি বিজৃম্ভিত হওয়াতে মালা-সর্পের ন্যায় অর্থাৎ মালাতে সর্পভ্রমের ন্যায় সেই সৎই বিশ্বাকারে বিভাবিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে ভোক্তা, ভোগ, ভোগ্য, কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, করণ, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ইত্যাদি স্বপ্নক্রত বিষয়ের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥২০—২১॥

হে ধনঞ্জয়! মায়ানিদ্রাবশে স্বপ্নবৎ সংসার এবং জীবগণ প্রতিভাত হইয়া থাকে। আত্মগত অজ্ঞানতাই এই সংসারের কারণ ॥২২

সেই আত্মগত অজ্ঞান গুণভেদে এবং শক্তিভেদে চিদাভাসে আভাসপ্রাপ্ত হইয়া মায়াও অবিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥২৩॥

সেই সৎ মায়ার আভাসে জীব এবং ঈশ্বররূপে পৃথক ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মায়ার আভাসে ঈশ্বর এবং অবিদ্যার আভাসে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয় ॥২৪ ॥

মায়া এবং অবিদ্যাগত যে চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহা চৈতন্যের অধ্যাসবশতঃ চৈতন্যের ন্যায় অবভাষিত হয়। শুদ্ধ সত্বগুণপ্রধান মায়া ও তদবচ্ছিন্ন-চৈতন্য এবং তদ্‌গত প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মিলিত হইয়া অধ্যাসংযোগে কর্ত্তৃত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী, বিশ্ব-স্রষ্টা ঈশ্বররূপে উক্ত হয়েন। আর মায়া-উপহত চৈতন্য অর্থাৎ মায়ার আধার-রূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি সাক্ষী, ব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান ও অব্যয়। তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই; তাঁহাকে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ বা শুষ্ক করিতে পারা যায় না, তিনি সতত বিকাররহিত, অসঙ্গ-নিত্যমুক্ত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষশূন্য। ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়া-ছিলাম, এক্ষণে স্মরণ করিয়া আত্মার স্বরূপ নির্দ্ধারণ কর ॥ ২৭ ॥

পিতামাতার শুক্রশোণিতসংযোগে সৃষ্ট এই স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক; এই দেহ বাল্যকালে বালকরূপ আবার যৌবনকালে যুবক রূপ ধারণ করে ॥২৮

অন্যের কন্যাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া

মোহিত হইতেছে। যাহার সহিত পূর্ব্বে কোনই সম্বন্ধ ছিল না, সে এক্ষণে অর্দ্ধাঙ্গী এবং সহধর্ম্মিণী বলিয়া বিবেচিত! সেই পত্নীর গর্ভে আপনার ঔরসসম্ভূত পুত্র উৎপাদন করিয়া, সেই পুত্রে স্নেহপরায়ণ হইতেছে। মল হইতে জাত কীটের ন্যায় শুক্রশোণিত রূপ দেহমল হইতে জাত পুত্রের জন্য পিতামাতা মমতাপাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে গলে বাঁধিয়া বিমোহিত হইতেছে ।৩০।

দেহ, দারা বা পুত্রের সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই, মমতাপাশে আবদ্ধ হইয়া তুমি কেবল মোহিত হইতেছ। এই ভীষণ মমতা-পাশ দেবতা এবং মনুষ্য কেহই ছেদন করিতে পারে না। এহেন মমতাপাশে আবদ্ধ হইয়া আমার ভার্য্যা, আমার পুত্র মনে করিয়া মূঢ়ের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছ। হে মহাবাহো! যখন তুমি দেহ নহ, তখন তোমার পুত্র কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? অতএব সকল ত্যাগ করিয়া বিচারের দ্বারা নিজের স্বরূপ অবধারণ কর।২৯-৩৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে জগন্নাথ। আমি কি করিব, পুত্রের রূপ, গুণ ও কর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমার মন শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। আমার মন সদাসর্ব্বদা চিন্তা-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য্যলাভ করিতে সক্ষম হইতেছি না। হে কৃষ্ণ! যেরূপে শোক প্রশমন হইতে পারে আমার নিকট তদুপায় বর্ণন করুন ॥৩৪-৩৫

শ্রীভগবান কহিলেন,—মনে শোক, সন্তাপ উত্থিত হইয়া মনকেই দগ্ধ করে, তুমি মন হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং দ্রষ্টামাত্র। দৃশ্য পদার্থ হইতে দ্রষ্টা পৃথক এই ন্যায় অনুসারে দৃশ্য মন হইতে দ্রষ্টা স্বরূপ তুমি পৃথক এবং ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট। অবিবেকবশতঃ আমিই মন এরূপ জ্ঞানে আমি দগ্ধ হইতেছি এরূপ মনে করিতেছ ॥৩৬-৩৭

একই অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ বৃত্তিসমন্বিত যথা,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। তাহার মধ্যে মন সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, চিত্ত অনুসন্ধানাত্মিকা ও অহঙ্কার অভিমানাত্মিকা বৃত্তিসমন্বিত। ইহারা পঞ্চভূতের অংশ সম্ভূত, বিকারবিশিষ্ট এবং চঞ্চল ॥৩৮-৩৯

হে ধনঞ্জয়! যেমন অগ্নিতে কোন অঙ্গ দগ্ধ হইলে পুরুষ আপনাকে দগ্ধ জ্ঞান করে, তদ্রূপ মন শোককর্ত্তৃক তাপ প্রাপ্ত হইলে অবিবেকবশে আপনাকে শোকসন্তপ্ত মনে করিতেছ ॥৪০—৪১॥

জাগ্রদাবস্থাতে যাহা জন্মায় এবং সুষুপ্তি অবস্থায় লয় পায়, সেই শোকের আলয় স্বরূপ যে মন, তুমি সে মন নহ, তুমি বোধ-স্বরূপ এবং দ্রষ্টামাত্র; সুষুপ্তিকালে মনের লয় হওয়ায় তখন অনুমাত্রও শোক থাকে না। জাগ্রদবস্থায় পুনর্ব্বার মন সমুত্থিত হইলে শোক-দুঃখও জাগিয়া উঠে ॥৪২—৪৩॥

তুমি সাক্ষীস্বরূপে সকল বিষয়ের দ্রষ্টা, তোমার শোক কিরূপে থাকিতে পারে? শোক, দুঃখ, উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি কেবল মনোময় কোষেরই ধর্ম্ম; স্বরূপ জ্ঞানের অভাব বশতঃ মনে তাদাত্ম্য অধ্যাস হওয়ায় অবিবেকবশে মনের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপ করিয়া শোকপ্রাপ্ত হইতেছ। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোকসাগর হইতে অবহেলে উত্তীর্ণ

হইয়া থাকেন—ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। অতএব হে ফাল্গুণ! যত্নপূর্ব্বক আত্মস্বরূপ অবধান কর, তাহা হইলেই শোকমুক্ত হইবে ॥৪৪—৪৬॥

ইতি অধ্যাত্মবিদ্যা-যোগশাস্ত্র-শান্তি-গীতায় শ্রীবাসুদেব-অর্জ্জুন—সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—:0:—

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—যে আত্মা মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, হে ভগবন্! সেই আত্মা কি প্রকারে লাভ করা যায় তাহা আমাকে বলুন ॥১

ভগবান কহিলেন,—আত্মা অতি সূক্ষ্মরূপ হওয়ায় বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর। কিন্তু তাহা বেদবাক্যে ও আচর্য্যের অনুগ্রহে লাভ হইয়া থাকে ॥২

গুরূপদিষ্ট মার্গে অবস্থান করতঃ মহাবাক্যের বিচার দ্বারা বিবেকবৈরাগ্যাদি-গুণবিশিষ্ট শিষ্য শুদ্ধমানস লাভ করিয়া থাকে। বেদে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি চারিটী একার্থবোধক মহাবাক্য আছে। তাহা গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে পার্থ! গুরুসেবা ও গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্য গুরুকৃপা-বশে আত্মাকে লাভ করিয়া থাকে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥৩-৫

আত্মবাসনাযুক্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে সমুৎসুক, আত্মজিজ্ঞাসু, শুদ্ধমনা, বিষয়াসক্তি-বিহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধা দ্বারা নিজের আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া থাকে ॥৬

আত্মজ্ঞান লাভের আদি কারণ বৈরাগ্য,—যাহা শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে; তাহার বিষয় বিশেষ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥৭

নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা এবং বেদোক্ত নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারা সদাচারী ব্যক্তি ঈশ্বরের পরিতোষ উৎপাদন করিবে ॥৮

ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনার্থ কামসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্ম-পালন, ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দেবতা ও তীর্থাদি-দর্শন এবং সেবা যথাবিধি করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥৯-১০

পাপযুক্ত মলিন বুদ্ধি যখন কর্ম্মের দ্বারা শোধিত হয়, তখন মল-দোষবিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ শুদ্ধবুদ্ধিতে বিবেক জন্মিয়া থাকে, তখন সত্য কি, মিথ্যা কি ইত্যাদি আলোচনা-তৎপর হইলে "ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা" ইহা বিবেকের দ্বারা দৃঢ়নিশ্চয় হয়; তখন মিথ্যা বস্তুতে আসক্তিশূন্য হওয়ায় বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১১—১৩।

বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভোগ্য বিষয় ও তাহার সুভোগ বিষময় বোধ হয়। পত্নী তাপদায়িনী, বিত্ত চিত্তের পীড়াদায়ক, ধন

নিধনকারী, পুত্রকন্যা শত্রুবৎ, মিত্রগণ প্রচণ্ড উত্তাপদায়ী, ভবন বনতুল্য এবং বন্ধুবর্গ অন্ধকূপতুল্য ভীষণ বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং বিরাগী ব্যক্তি সকল ত্যাগ করিয়া নিজের হিতের জন্য সদাসর্ব্বদা নিরত এবং সুখলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন ॥১৪॥

আহা! মূঢ় ব্যক্তিগণ ভোগে আসক্ত, মুগ্ধ ও সতত ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সংসারচক্রে যথেচ্ছ ভ্রাম্যমান, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনুরক্ত, আত্মীয়স্বজনগণের ভরণপোষণার্থ সদা ব্যগ্র-চিত্ত ও বিষাদযুক্ত এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য অনুদিন চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সর্ব্ব প্রকার সুখরসে বঞ্চিত হইয়া কেবল দুঃখভার বহন করি-তেছে ॥ ১৫

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু কুক্কুরের বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণ্য এবং তাহার ভোগবাসনা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

বমন করিয়া তাহা ভক্ষণে যেমন ঘৃণা হয়, তদ্রূপ ভোগবাসনায় একান্ত বিরতি জন্মিলে, তখন শম, দম, মন ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তিতিক্ষা উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধাদির উদয়, এবং শ্রুতি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং সত্যনিশ্চিত হওয়ায় সংসারগ্রন্থি ছেদ হইয়া মুক্তিলাভের ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে; এই সাধনসম্পন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥১৭—১৯॥

জ্ঞানদাতা গুরু সাক্ষাৎ সংসার-সমুদ্র-ত্রাণকারী। শ্রীগুরুর কৃপায় শিষ্য দুস্তর সংসার-সাগর অবহেলে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। আচার্য্য বিনা জ্ঞান, মুক্তি বা সদ্গতি কিছুই লাভ হয় না। অতএব বিদ্বান ব্যক্তি যত্ন-পূর্ব্বক সেবা দ্বারা গুরুর পরিতোষ উৎপাদন করিবে। সেবায় প্রসন্ন গুরু শিষ্যকে এবম্প্র-কারে প্রবুদ্ধ করেন।—হে শিষ্য! তুমি দেহ নহ, ইন্দ্রিয় নহ, প্রাণ নহ, মন বা বুদ্ধি নহ। তুমি সকলের দ্রষ্টা এবং সাক্ষী; তুমি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। গুরুর নিকট ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ মাত্রে প্রতিবন্ধকশূন্য শিষ্যের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মননযোগ বা নিদিধ্যাসন অভ্যাস দ্বারা কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। গুরুকৃপায় প্রতিবন্ধক ক্ষয়ে জ্ঞান স্বয়ং জন্মিয়া থাকে।

যেমন কণ্ঠস্থিতহার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান হইলে বা বস্ত্রাবৃত হইলে সহসা তাহার অভাব প্রতীতি হয় এবং কেহ সেই ভ্রম অপনোদন করিয়া দিলে ঐ হার প্রাপ্তবৎ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ আত্মা সততই হস্তগত আছেন, যখন গুরূপদেশে শিষ্যের অবিদ্যাবরণ দূর হয়, তখন শিষ্য তৎক্ষণাৎ আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া কৃতার্থ ও মুক্ত হয় এবং পরমানন্দ লাভ করে ॥২০-২৫

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে যাদব! হে কৃষ্ণ! জীব কর্ত্তা, সদা ভোক্তা আর ব্রহ্ম অকর্ত্তা সুতরাং এতদুভয়ের ঐক্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? হে জনার্দ্দন! আমার এই সংশয় ছেদন করুন, আমি প্রপন্ন হইয়াছি। আপনি বিনা অন্য কেহ নিশ্চয়ই আমার এই সংশয় অপ-নোদন করিতে সক্ষম হইবে না ॥২৬-২৭॥

শ্রীবাসুদেব কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! "তত্ত্ব-মসি" মহাবাক্যের "ত্বং" পদের শোধন দ্বারা অগ্রে আত্মস্বরূপ অবধারণ করিবে। কি প্রকারে ত্বং পদের শোধন করিতে হইবে, তাহা আমি

বেদবাক্যানুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥২৮

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয় পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা জড় ও বিনশ্বর জানিয়া পরিত্যাগ কর। যেমন কদলিবৃক্ষের বল্কল ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া তন্মধ্যস্থ সারভাগ গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ বিচার দ্বারা কাষ্ঠাদি দৈহ এবং সমস্ত অনিত্য বস্তু অনাত্মা ও জড় ত্যাগ করিয়া যখন আর কিছুই ত্যাগ করা যায় না, তখন তাহাই বাধের সীমা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বাধের অযোগ্য স্বয়ং প্রকাশমান ত্বং শব্দকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ইহাকেই "ত্বং" পদের শোধন বলা যায়। ত্বং-পদের শোধন করিয়া পরে "তৎ" পদের শোধন করিবে। পরোক্ষত্বাদি মায়িক উপাধি সকল পরিত্যাগ করিয়া মায়ার অধিষ্ঠানভূত একমাত্র সৎ, অব্যয় ও পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মকে তৎ বলিয়া জানিবে। এক্ষণে "অসি" এই পদ দ্বারা "ত্বং" প্রতিপাদ্য মায়োপাধিক আত্মার সহিত "তৎ" প্রতিপাদ্য মায়া-উপহত নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের অখণ্ডরূপে একত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। হে অর্জ্জুন! ঘটাকাশ ও মহাকাশের কোনই পার্থক্য নাই, কেবল উপাধি মাত্র; সেইরূপ তোমার আত্মস্বরূপে ও পরমাত্মায় কিছুমাত্র ভেদ নাই, ইহা জানিয়া মৌনাবলম্বন কর ॥৩৩

যোগযুক্ত স্থির-প্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া নিরতিশয় সুখশান্তি উপভোগ করিয়া থাকেন এবং প্রারব্ধভোগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব অর্জ্জিত কর্ম্মফলের ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত—দেহাবসান পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তরূপে ভোগ বিহার করিয়া থাকেন ॥৩৪

সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পাপপুণ্য, বিধিনিষেধ কিছুই থাকে না। তিনি সততঃ সুখসাগরে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে অর্থাৎ প্রারব্ধের অনুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে ॥৩৫

ইতি অধ্যাত্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীবাসুদেবার্জ্জুন-সংবাদে শান্তিগীতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

———:0:———

চতুর্থ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! অহঙ্কার ব্যতিরেকে কাহারও ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি বোধ না থাকিলে কর্ম্ম করা অসম্ভব; সুতরাং জীবন্মুক্ত যোগী কি প্রকারে ব্যবহারিক ক্রিয়া করিয়া থাকেন? ১

শ্রীভগবান বলিলেন,—হে মহাবাহো! সেই গুহ্য হইতে গুহ্যতম তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে সমস্ত সংশয় ছেদন হওয়ায় কৃতকৃত্য হইবে। ২

এই ব্যবহারিক স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জীব অহংকারযোগে বিবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মস্বরূপ জ্ঞান না থাকায় আমি কর্ত্তা বলিয়া বিমোহিত হইতেছে। অহঙ্কারের ধর্ম্ম এই যে, সে সংঘাতকে চৈতন্যবিশিষ্টের ন্যায় করিয়া পরিচালিত করিয়া থাকে। ৩-৪

আত্মা শুদ্ধ, সদামুক্ত, সঙ্গহীন, চিৎ এবং অক্রিয়, মায়িক সংঘাতের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ॥৫

যোগীপুরুষ যে কালে আপনাকে নিষ্ক্রিয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন; সেকালে মায়িক সংঘাতসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন ॥৬

প্রারব্ধবশে দেহ বিচরণ করতঃ ব্যবহারিক কার্য্য সকল করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ, নিত্য এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার ব্যবহারিক কার্য্য সকল অসঙ্গভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তিনি অখণ্ড, অদ্বয়, পূর্ণ, সদা সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থিত। দেশ, কাল, জগৎ, জীব ইত্যাদির সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ॥৭-৮

এই সমস্ত মায়িক কার্য্যাদি ব্যবহারিক মাত্র এবং মায়া-বিজৃম্ভিত; সুতরাং ইন্দ্রজালসম মিথ্যা ॥৯

হে ভরতর্ষভ! জাগ্রদবস্থা হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়িক এবং জীবকল্পিত; সুতরাং জীব যাহা অনুভব করিয়া থাকেন স্বপ্নবৎ মিথ্যা ॥১০

তুমি, আমি বা পৃথিবী, দারা, সুতাদি কেবল কল্পনামাত্র, সুতরাং কেহই নাই। তুমি ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যা বস্তুকে সত্য মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হইতেছ। হে মহাবাহো! এই সমস্তকে মায়ার বিলাস জানিয়া শোক পরিত্যাগ কর। তুমি সদা অদ্বয়স্বরূপ, তোমাতে কিছুমাত্র দ্বৈতভাব নাই। দ্বৈতভাব মাত্রই মায়াময়, সুতরাং তাহা কখনই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥১১-১২

এক ইহা সংখ্যাবাচক উদ্দেশ্যে বলা হইল না। অনেকের সংখ্যাবদ্ধতা নির্ণয় করিতে হইলে, এক, দুই, তিন ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে; এইস্থলে কেবল স্বজাতি ভেদরহিত বলিয়া তোমাকে এক, এবং বিজাতি শূন্য বলিয়া অদ্বয় বলা হইল। সর্ব্বশূন্যহেতু অর্থাৎ তোমা ভিন্ন যখন অন্য বস্তু নাই, তখন তুমি "কেবল" এবং তোমার ক্ষয় নাই বলিয়া "সৎ" এবং অব্যয়"। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া তুমি "তুরীয়" এবং সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া "প্রত্যক"। তুমি সাক্ষ্য পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া "সাক্ষী", দৃশ্যবস্তুকে অপেক্ষা করিয়া দ্রষ্টা, লক্ষণাভাব হেতু "অলক্ষ্য" এবং বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া জ্ঞানশব্দে উক্ত হও ॥১৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! সেই অদ্ভুত মায়া কি পদার্থ? এই জীব প্রসবকারিণী অবিদ্যাই বা কি পদার্থ? তাহারা নিত্যা কি অনিত্যা এবং তাহাদের স্বভাবই বা কি তৎসমস্ত আমাকে বলুন ॥১৬॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণান্বিত মায়া অতীব অদ্ভুতা। সেই উৎপত্তিরহিতা, অনাদি এবং অনৈসর্গিক বলিয়া কথিতা হইয়া থাকে। ১৭ ॥

পরমাত্মশক্তি মায়া, যাহা জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, নামরূপে পরিণত হইয়া তাহাই জগদাকারে বিকাশিত হয়। নামরূপাত্মক জগৎ অসত্য, কেবল সবস্ত ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্য বস্তুর ন্যায় অবভাষিত হয়। পরব্রহ্মের আশ্রিত সেই মায়া তাঁহার আত্মাকে,

গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই বিষয় করে এবং তাঁহারই আভাসে আভাসবৎ হইয়া জীব-স্বরূপ কল্পনা করে। মায়ার এই চমৎকার গুণ আছে বলিয়া তাহাকে অঘটনঘটন-পটীয়সী বলা হয়। মায়ার এই উভয় ভাবের অধিষ্ঠানভূত পরমব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে মায়ার এই চমৎকারিতা আর থাকে না, তাহাকে অবস্তু মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানের দ্বারা মায়ার বিনাশ হয় বলিয়া তাহাকে অসতী বলে। আর মায়াতে নানা ভাবের উদয় হয় বলিয়া তাহাকে ভাবময়ী বলা হয় ॥১৮—১৯॥

মায়াতে বিক্ষেপ ও আবরণ নামক দুইটী শক্তি আছে; তমোগুণপ্রধানা আবরণ শক্তি, আর রজোগুণপ্রধানা বিক্ষেপ শক্তি। আবার সেই মোহিনী মায়া যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধানা বিদ্যারূপা, তখন মোহকে নাশ করিয়া জীবকে স্বরূপে অবস্থিতি করে। তমোগুণপ্রধানা আবরণবিশিষ্টা মায়াই অবিদ্যা নামে বিখ্যাত হয়। নতুবা মায়া ও অবিদ্যায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সমষ্টি ব্যষ্টিই তাহাদের ভেদ মাত্র। চৈতন্যই সেই মায়ার একমাত্র আশ্রয়; চৈতন্যেই সেই মায়া ভাসিত হইয়া থাকে; এবং সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের সত্তাকে গ্রহণ করিয়া আবরণ-শক্তির প্রভাবে তাঁহার চিৎ-স্বভাবকে আবরণ করে ও বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে তাঁহাকেই রজ্জু-সর্পের ন্যায় জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত করে ॥২০-২৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—আপনি বলিলেন ব্রহ্মের শক্তি মায়া। অতএব সৎ-ব্রহ্মের শক্তি মায়াও অবশ্য সৎ হইবে। আর সদ্বস্তুর কখনই ধ্বংস নাই, তবে মায়া কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে? আর যদি মায়া মিথ্যাই হয় তবে তাহার নাশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, যে বস্তু মিথ্যা তাহার আবার নাশ কি? এ বিষয় আমাকে বলুন ॥২৪

শ্রীভগবান বলিলেন,—বিবিধ ভাববিশিষ্ট সেই মায়ার বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় সেই অদ্ভুতকারিণী মায়া প্রকৃতি নামে আখ্যাত হয়েন ॥২৫

যখন প্রকৃতি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া উদাসীন ভাবে থাকেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি বিদ্যা দ্বারা নাশ হয় বলিয়া অবিদ্যা, এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে স্থিতা বলিয়া ব্রহ্মশক্তি নামে প্রসিদ্ধা।

চৈতন্য ব্যতিরেকে ইনি অন্যত্র উদিত হয় না বা অবস্থিতি করেন না, অতএব ব্রহ্মবাদিগণ ইহাকে ব্রহ্মশক্তি কহিয়া থাকেন ॥ ২৬-২৭

শক্তিতত্ত্ব কহিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ পরব্রহ্মের চিৎ ও জড় এই দুইটী ভিন্ন শক্তি আছে। চিৎ-শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ, ও জড়শক্তি বিকারিণী মায়া। মায়া দ্বারা জগতের যাবতীয় কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাকে কার্য্যপ্রসাধিনী বলা হয়; এবং চিৎ-শক্তি নির্ব্বিকার। যেরূপ অগ্নির দুই শক্তি, এক দাহিকা এবং অন্য প্রকাশিকা, কিন্তু দাহিকাশক্তিকে অগ্নি হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন বলা যায় না। দাহকার্য্যের পূর্ব্বে সে কি প্রকারে কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না, কেবল কার্য্যের দ্বারা তাহার অনুমান করা হয় মাত্র। অগ্নি ভিন্ন সে

অন্যত্র প্রকাশ পায় না; সুতরাং তাহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মুনিমন্ত্রাদি দ্বারা ঐ দাহিকাশক্তি রুদ্ধ হইলে, অগ্নিতে আর দাহিকাশক্তি প্রকাশিত হয় না, তখন অগ্নিতে তাহার স্থিতি দেখা যায় না; অতএব তাহাকে অগ্নি হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সেই ব্রহ্মশক্তি মায়াও এইরূপ অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়।* যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি ভিন্ন কি অভিন্ন নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও তৎশক্তি মায়া ভিন্ন কি অভিন্ন নির্ণয় করা যায় না। জগদ্রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে মায়া কিরূপে কোথায় ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কেবল কার্য্যের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে মাত্র। ব্রহ্ম ভিন্ন তাহার অন্যত্র অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আবার এই নামরূপাত্মক মায়িক জগতের অধিষ্ঠানভূত নিত্যচৈতন্য নির্ব্বিকার পরব্রহ্মকে শাস্ত্রোক্ত বিচার দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করিলে তখন আর তাহাতে বিকারী মায়ার কার্য্য দৃষ্ট হয় না; এই হেতু তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যায়। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় জড় প্রকৃতি-বিকারী মায়া ধ্বংসশীল। তত্ত্বদৃষ্টি জন্মিলে এই মায়ার কার্য্য মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। তখন আশ্চর্য্যরূপিনী মায়ার এই মোহকারিনী শক্তির বিষয় অবগত হইলে তাহা হর্ষদায়িনী হইয়া থাকে ॥২৮-৩৭॥

যিনি বিশেষ করিয়া এই মায়ার কার্য্য বুঝিয়াছেন, মায়া আর তাঁহার সহবাস বাধা করে না ॥৩৮॥

সেই মোহিনীরূপা মহামায়া মহা মোহকে উৎপাদন করেন। জীব সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, তখন বিপর্য্যস্ত রূপে স্বার্থসাধনে তৎপর হয় এবং স্বার্থে আঘাত পড়িলেই শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে। জীব তখন জন্মমৃত্যুজরাজনিত নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, বহু জন্মেও পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥৩৯

ইতি, শান্তিগীতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

—:0:—

অধিকার।

কি আছে আমার নাথ কি দিব তোমায়,
বিকায়েছি দেহ মন তব রাঙ্গা পায়,
দারা, সুত, সুতা, আদি বিষয় বিভব,
আমার বলিতে ভবে যাহা ছিল সব,
সকলি তোমার নাথ তুমি দিয়েছিলে,
তোমার ইচ্ছায় পুনঃ কোলে তুলে নিলে;
আমার বলিতে এবে কিছু নাই আর,
যাহা কিছু ছিল মোর সকলি তোমার।
দান, ধ্যান, তপ, জপ, শয়ন, ভোজন,
সবি যেন করি নাথ তোমার কারণ ॥
ফলাফলে সপি দেব চরণে তোমায়,
থাকুক (এ) দীনের শুধু কর্ম্মে অধিকার ॥

দীন—স্বরূপানন্দ।

—:0:—

পার্ব্বতীর গোপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।"

সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানবিমূঢ়া, হীনাবুদ্ধি, অবলা পার্ব্বতী তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে কিরূপে চিনিবে? তাই ভক্তবৎসল ভগবান পার্ব্বতীকে যশোদাদুলাল, মনোমোহন গোপালবেশে দেখা দিলেন। পার্ব্বতী সে ভুবনমোহন, নবনীরদবরণ গোপালকে দেখিয়া কি যেন কেমন হইয়া গেল—পার্ব্বতী আপন সত্ত্বা হারাইল—পার্ব্বতী বুঝি আর পার্ব্বতীতে নাই। যে রূপ নীরিক্ষণ করিয়া ব্রজগোপীগণ আত্মহারা হইয়াছিলেন,—কুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,—জগৎ ভুলিয়াছিলেন—সামান্যা পার্ব্বতী সে রূপে মোহিতা হইবে বিচিত্র কি? পার্ব্বতী অনিমিষলোচনে চিত্রার্পিতা পুত্তলিকার ন্যায় সেই ভুবনমোহন, অতুলনীয় রূপরাশি নীরিক্ষণ করিতে করিতে ভাবাবিষ্টচিত্তে প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিল—"বাবা, গোপাল রে, আমার রাম-লক্ষ্মণ ত নাই, আমি কাকে বুকে করিয়া প্রাণ জুড়াব? আমি কারে লইয়া ঘর করিব? কে আমায় মা ডাকিয়া দগ্ধপ্রাণ শীতল করিবে?" আজ পার্ব্বতীর হৃদয় শূন্য—সে পুত্রের অভাব অনুভব করিতেছে—আজ পুত্র-শোকে পার্ব্বতীর চিত্তের গতি একমুখী হইয়াছে। তাই অনন্ত জ্ঞানপ্রেমের আধার, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য—অনন্ত হইয়াও সান্ত,—নিরাকার হইয়াও সাকার হইলেন; কেন না তিনি যে ভক্তের,—ভক্ত যে তার অতীব প্রিয়। ভক্তের জন্য না করিতে পারেন, তাঁহার এমন কাজ নাই! তিনি ভক্তের নিকট চিরবিক্রীত; তাঁর তুল্য এমন দয়াল কে? সমুদ্রেরও কুল-কিনারা আছে, কিন্তু তাঁহার দয়ার শেষ নাই; তিনি অযাচিতভাবে আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন। আমরা অজ্ঞানান্ধ, অহংজ্ঞান-বিমূঢ়, আমাদের চিত্ত মোহকালিমায় আচ্ছন্ন,—ও বিক্ষিপ্ত; আমরা তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না,—তাঁহার ভাস্বর জ্যোতি আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে না; তরঙ্গায়িত সলিলে অথবা সমল কাচে কি কখন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়? যতদিন না আমাদের চিত্ত দমিত, শমিত হইয়া স্থিরভাবাবলম্বন করিয়াছে,—তাঁহার দিকে চিত্তের গতি একমুখী হইয়াছে,—ততদিন আমরা তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব না।—ভগবান যে কি তাহা বুঝিতে পারিব না। মোহান্ধ আমরা, যদিও মায়ামোহ কাটাইতে গিয়া কর্ম্মবশে আরও জড়াইয়া পড়িতেছি,—ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি; কিন্তু অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান নিশ্চিন্ত নহেন—তিনি আমাদিগকে তাঁহার অভয় ক্রোড়ে টানিয়া নিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ঘাতপ্রতিঘাতে যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে,—তাঁহার প্রতি চিত্তের গতি দিকদর্শন যন্ত্রের ন্যায় একমুখী হইয়াছে—তাঁহার নিকট কি তিনি আর অপ্রকাশ থাকিতে পারে না? আজ পার্ব্বতীও সেই অবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছে।

সংসারে তাহার কোন বন্ধন ছিল না—কামনা বাসনা কিছুই ছিল না, জন্ম জন্মান্তরীন পুণ্য-ফলে চিত্ত ভগবন্মুখীই ছিল; আজ ভগবান দয়া করিয়া তাঁহার মায়িক সন্তানের বন্ধন কাটিয়া দিলেন। আজ অশ্রুজলে পার্ব্বতীর চিত্তের ময়লা ধুইয়া গিয়াছে; পুত্রের অভাব জাগিয়াছে—পুত্রমুখদর্শনলালসায় চিত্তের গতি একমুখী হইয়াছে। ভগবান ত আমাদের হৃদয় রাজ্য জুড়িয়া বসিতে সর্ব্বদা ব্যাকুল; তিনি এ সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না; সচ্চিদানন্দরূপী ভগবান পার্ব্বতীর শূন্য হৃদয় জুড়িয়া বসিবার জন্য,—তাহার পুত্রের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য পুত্ররূপে দেখা দিলেন—নিরাকার সাকার হইলেন—অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও অবোধ বালক সাজিলেন। ভগবান অনন্ত রূপলাবণ্য-সম্পন্ন পঞ্চমবর্ষীয় বালক সাজিয়া গোপালবেশে পার্ব্বতীকে দেখা দিয়া অমলমুখে বিমল হাসি হাসিয়া প্রাণমাতান মধুর কণ্ঠে বলি-লেন—"মা তুই কান্দিস্ কেন? তোর রাম লক্ষ্মণ নাই, আমি ত আছি, আমায় একবার কোলে নে না মা? আমার বুকে নিলে তোর প্রাণ জুড়াবে, তুই রামলক্ষ্ম-ণের শোক ভুলিয়া যাইবি—তোর প্রাণ শীতল হবে"—এই বলিয়া গোপাল পার্ব্বতীর কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন, পার্ব্ব-তীও আবেগভরে গোপালকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। ধন্য পার্ব্বতী, আজ তুমি ধন্য হইলে; যাহাকে পাইবার জন্য কত যোগী-ঋষি যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যায় দেহপাত করিতেছেন,—যাহাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য—দ্বাপরে দৈবকীবসুদেব ও নন্দযশোদাকে কত কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল—আজ কিনা সেই সুরাসুরারাধ্য যোগীজন-দুর্ল্লভ নন্দদুলাল, ব্রজরাজ গোপালবেশে মা, মা বলিয়া পার্ব্বতীর গলা জড়াইয়া পার্ব্বতীর অঙ্ক শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন!!! আহা! ভক্ত ভগবানের এ মিলন কি মধুর! একদিকে ভগবানকে পাইয়া ভক্ত আত্মহারা, অন্য দিকে ভক্তকে পাইয়া ভগবান বিহ্বল। এ মিলনের উপমা নাই—এ মিলনের তুলনা নাই। এ মিলনে—এ আলিঙ্গনে যে কি সুখ—কত মধু, তাহা জানেন ভক্ত,—আর জানেন সেই ভক্তাধীন ভগবান। যিনি যে ভাবেই হউক ভগবানকে বুকে ধরিতে পারিয়াছেন তিনিই জানেন যে, সে আলিঙ্গন কত সুখ-কর—কত আনন্দপ্রদ, তাহা ভাবে বা ভাষায় বুঝাইবার শক্তি এ যাবৎ কাহারও হয় নাই, কিম্বা হবেও না; কেননা সে সুখ, সে আনন্দ অপ্রমেয়, জ্ঞান বিচারের অতীত।

পার্ব্বতী ভগবদঙ্গ স্পর্শে আপন অস্তিত্ব হারাইল—পার্ব্বতী আপনাকে ভুলিয়া গেল,—পার্ব্বতী শোক তাপ ভুলিল,—পার্ব্বতী রামলক্ষ্ম-ণকে ভুলিল,—পার্ব্বতী জগৎ ভুলিল—পার্ব্বতীর সকল জ্বালা দূর হইল,—পার্ব্বতী তাপিত অঙ্গ শীতল হইল; কতক্ষণ পার্ব্বতীর এইভাবে কাটিয়া গেল—পরে যখন পার্ব্বতী প্রকৃতিস্থা হইল, তখন সে ভাবিতে লাগিল,—ত ই ত এমন মধুর মা ডাক ত আমি আর কখন শুনি নাই,—এ যে প্রতি অক্ষরে অমৃতের প্রস্রবণ ছুটি-তেছে,—মন প্রাণ কাড়িয়া নিতেছে—রাম-লক্ষ্মণ ত কত দিন কতবার মা, মা, বলিয়া ডাকিয়াছে, কই সে ডাকে ত এমন প্রাণো-ন্মাদনী শক্তি ছিল না,—সে ডাকে ত আমার

এমন পাগল করে নাই! আমি কত দিন রামলক্ষ্মণকে অনিমিষলোচনে দেখিয়াছি,—কতই না সুন্দর ভাবিয়াছি, কিন্তু কই এমন ভুবনমোহন রূপ ত আমি দেখি নাই! এ রূপের যে তুলনা নাই। আহা! এ যে কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত অতুলন রূপ রাশি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে,—এ রূপে যে ভুবন আলোকিত হইয়াছে। আমরি! মরি! বাছার আমার কি রূপ গো! বাছার চাঁদমুখ দেখিয়া যেন আমার তৃপ্ত হইতেছে না। যতই দেখিতেছি ততই যেন দেখিবার জন্য প্রাণ আহলাদে নাচিয়া উঠিতেছে! এ অতুলন রূপরাশি কোথায় লুকান ছিল গো! আহা! বাছার আমার অধরে কি মধুর হাসি গো! এ প্রাণমাতান, মনভুলান হাসি কোথায় ছিল গো! রামলক্ষ্মণের মুখেও হাসি দেখিয়াছি, সে হাসিতে প্রাণ ত এমন মাতে নাই,—প্রাণে ত এত আনন্দ হয় নাই। আহা বাছার আমার কি কোমল অঙ্গ গো, যেন সুকুমার নবনীত বলিয়া বোধ হইতেছে। অগ্নির সামান্য উত্তাপেই যেন গলিয়া যায়। পার্ব্বতী আরও ভাবিতে লাগিল,—তাই ত, গোপালকে বুকে করিয়া আজ যে কি আনন্দ তাহা কেমন করে বুঝাব! কতদিন শোকেদুঃখে রামলক্ষ্মণকে বুকে করিয়াছি, কিন্তু কই এমন অঙ্গস্পর্শসুখ কভু ত অনুভব করি নাই, আমি ত এমন আত্মবিহ্বল নাই,—আজ গোপালের অঙ্গ স্পর্শে আমার দেহমনপ্রাণ যেমন শীতল হইল, রামলক্ষ্মণের অঙ্গস্পর্শে তেমন ত কোন দিন হয় নাই! এরূপভাবে পার্ব্বতী যতই রামলক্ষ্মণের সঙ্গে গোপালের তুলনা করিতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে পারিল যে গোপাল জগতে অতুলনীয়, তাঁহার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। লোকে কাঞ্চন পাইয়া,—কাঞ্চনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া যেমন কাচকে আর চায় না—আজ পার্ব্বতীও গোপালকে পাইয়া রামলক্ষ্মণকে ভুলিয়া গেল,—রামলক্ষ্মণের দাগ তাহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। গোপাল পার্ব্বতীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পার্ব্বতী আর স্থির থাকিতে পারিল না; হাসিতে হাসিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোপালকে বুকে করতঃ মার কাছে দৌড়াইয়া গেল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা মাকে জানাইয়া বলিল—'মা,' সত্য সত্যই আমি রামলক্ষ্মণের শোক ভুলিয়াছি। রামলক্ষ্মণকে বুকে করিয়া এত সুখ—এত আনন্দ কোন দিন পাই নাই। মা, গোপাল যে আমার রামলক্ষ্মণ হইতেও অধিক আদরের—অধিক যত্নের ধন। এখন হইতে পার্ব্বতীর ভিতর একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আসিল। সে সদাই গোপাল নিয়া বসিয়া থাকে; গোপালকে দেখাইবার জন্য পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া নেয়। আর যে স্বেচ্ছায় গোপালকে দেখিতে চায়, পার্ব্বতী তাহার উপর যে কত সন্তুষ্ট হয় তাহা বলিবার নহে। পার্ব্বতীর স্বভাব এখন শিশু বালিকার ন্যায় সরল হইয়াছে, তাহাতে কূট, কপটতা কিম্বা মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র নাই। তাহার ঘৃণালজ্জা, মানাপমান, আত্মপর বোধ নাই। তাহার মুখে এক অপরূপ জ্যোতি ফুটিয়াছে, তাহার সরলতামাখা মুখখানা সদাই হাসিহাসি।

সে এখন গোপাল ভিন্ন কিছু বুঝে না,—গোপাল ভিন্ন জানে না। সে গোপালের জন্ত সব করিতে প্রস্তুত। আহা! ভক্ত যে দিন ভগবানকে আত্মসমর্পণ করে, সেদিন সে বুঝি পার্ব্বতীর মত এমনি সরল,—এমনি অকপট হইয়া যায়। এমন সরল,—এমন অকপট, না হইলে বুঝি তাঁহাকে পাওয়া যায় না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিত—"পার্ব্বতি, তোর গোপাল কত বড়?"—"গোপাল কেমন?" "এ যে একটা পিতলের মূর্ত্তি' পার্ব্বতী অমনি হাসিতে হাসিতে বলিত—"সে কেন গো,—আমার গোপাল পিতলের মূর্ত্তি কেন হবে গো," আমার গোপাল যে কচি ছেলে,—পাঁচ বৎসরের শিশু! ঐ দেখ না গোপাল আমার কত সুন্দর, আমার বুকে জড়াইয়া আছে; আমার গো—পা—ল, আমর গো—পা—বলিতে বলিতে পার্ব্বতীর আর বাকস্ফূর্ত্তি হইত না,—সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত,—চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইত। সে সময়ে পার্ব্বতীর মুখের জ্যোতি কত সুন্দর,—কত হৃদয়গ্রাহী,—কত ভক্তির উদ্দীপক হইত, যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহারাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

এখন হইতে গোপাল পার্ব্বতীর সঙ্গে সাধারণ মানব শিশুর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতেবাতে আকুল হইয়া মা, মা, বলিয়া পার্ব্বতীকে অস্থির করিতেন; এটা খাব, ওটা খাব, ইত্যাদি আবদার করতঃ পার্ব্বতীকে অস্থির করিতেন। এখন গোপালকে ছাড়িয়া পার্ব্বতীর এক পা নড়িবার যো নাই; কেননা এখন পার্ব্বতীর চিত্ত একমুখী হইয়াছে; এখন পার্ব্বতী গোপালগতপ্রাণা, এখন গোপাল পার্ব্বতীর,—পার্ব্বতী গোপালের; এখন ভক্ত ভগবানের, ভগবান ভক্তের—ভক্ত ভগবানের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। প্রত্যহ পার্ব্বতী গোপালের লীলাখেলা মায়ের নিকট যাইয়া বর্ণনা করিত, মাও তদগতচিত্তে ভক্ত ভগবানের লীলাখেলা শ্রবণ করতঃ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন, আর পার্ব্বতীকে মনে মনে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।

একদিন বিকাল বেলায় উক্ত সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে সকল মেয়েরা বসিয়া নানারূপ গল্প-গুজব করিতেছেন, তন্মধ্যে একজন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, পার্ব্বতীর বাড়ীতে প্রচুর লাউশাক আছে, উক্ত শাক দ্বারা ঠাকুরভোগ দিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। সে সময়ে পার্ব্বতী তথায় উপস্থিত ছিল না, কিম্বা পরেও এ সম্বন্ধে তাহাকে কেহ কিছু বলেন নাই। পরদিন অতি প্রত্যুষে পার্ব্বতী প্রচুর পরিমাণে লাউশাকসহ উপস্থিত হইয়া মাকে বলিল—মা, ঠাকুরভোগে এই শাক দিও, এবং আমার গোপালকেও দু'টা খেতে দিও; সেও সকলের সঙ্গে একত্রে খাইবে। মা ত শুনিয়া অবাক্। মা বলিলেন,—লাউশাকের কথা তুই কি ক'রে জানলি? পার্ব্বতী,—"কেন, কাল বিকালে যে তোমরা লাউশাক দ্বারা ঠাকুরভোগ দিতে বলিয়াছিলে, গোপাল আমাকে একথা জানাইয়াছে এবং সেও এখানে খাবে বলিয়াছে।"

মা,—"আচ্ছা, তুই গোপালকে নিয়ে আয়।" পার্ব্বতী একটী তাম্রকুণ্ডে গোপালকে স্থাপন করতঃ বুকের ভিতর লুকাইয়া সান্যাল বাড়ীতে

রাখিয়াগেল। এখানে যথারীতি পূজার্চ্চনা হওয়ার পর অন্যান্য বিগ্রহের সঙ্গে গোপালকেও পৃথকভাবে ভোগ দেওয়া হইল।

পার্ব্বতী বিকালে গোপালকে নিতে আসিল, সারাদিন গোপালকে না দেখিয়া বৎসহারা গাভীর মত ছুটছুটী করিতেছিল; এক্ষণে তাহার যতনের ধন, হৃদয়রতন প্রাণের গোপালকে পাইয়া যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইল; সে আবেগভরে গোপালকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নানা প্রকার আদর সোহাগ করিতে করিতে ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যুষে পার্ব্বতী মলিনমুখে মাকে আসিয়া বলিল,—"মা, আর আমি গোপালকে তোমাদের বাড়ীতে খেতে দিব না। আহা! বাছা আমার কাল সারাদিন কিছু খায় নাই, বাছার আমার চাঁদমুখ শুকাইয়া গিয়াছে; গোপাল আমার সকলের সঙ্গে একত্রে খাইতে বলিয়াছিল, আর তোমরা কি না তাঁহাকে পৃথক খেতে দিয়েছিলে। মা, তোমরা কি জান না যে, গোপাল আমার বড় অভিমানী,—বড় আবদারে। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি দীনদুঃখিনী, ভিক্ষান্নে গোপালের সেবা করিয়া থাকি; আশ মিটাইয়া, প্রাণ পূরিয়া গোপালকে খাওয়াইতে পারি না; তোমরা বড়লোক, তোমাদের ঘরে কত কিছু খাবার আছে। বাছা আমার দুঃখিনীর ধন, তোমাদের ঘরে পেট পুরে খেয়ে গিয়েছে, আমার বড়ই আহ্লাদ হয়েছিল; কিন্তু হায়! হায়! কাল আমার দুখের গোপাল সারাদিনের উপবাসী ছিল, বাছা আমার সাধ করে সকলের সঙ্গে খেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে খেতে পেল না—এই দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, দুঃখিনীর সন্তানকে কেউ যতন করে না," এই বলিয়া পার্ব্বতী কান্না জুড়িল। মা তাহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া অপরাধ স্বীকারকরতঃ ক্ষমা চাহিলেন; এবং সেই দিন হইতে মধ্যাহ্নে সান্যাল বাড়ীতে গোপালের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তদবধি সেই নিয়মে গোপালের ভোগ দেওয়া হইতেছে।

আর একদিন মা গোপালকে ভোগ দিবার জন্য খই দুধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রে গোপাল "খই দুধ খাব"—"খই দুধ খাব" বলিয়া বায়না ধরিলেন; পার্ব্বতী বলিল, আমি দুঃখিনী, ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করি, এতরাত্রে খই দুধ কোথায় পাব রে গোপাল?

গোপাল,—"কেন, ও বাড়ীতে মা যে রেখে দিয়েছে।"

পার্ব্বতী,—আচ্ছা, কাল দিব বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহাকে সান্ত্বনা করিল। পরদিন মাকে গত রাত্রের ঘটনা জানাইয়া গোপালকে খই দুধ দ্বারা ভোগ দিতে অনুরোধ করিল, মাও স্বীকৃতা হইলেন।

এইরূপে পার্ব্বতী গোপালের লীলা-খেলার বিষয় মাকে প্রত্যহ আসিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিত; মাও সাধ্যানুসারে গোপালের আদেশ পালন করতঃ বিমল সাত্ত্বিকানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভোরে পার্ব্বতী আসিয়া মাকে বলিল—"মা, আমি মহোৎসব দিব?

মা—"তোর কি আছে যে তুই মহোৎসব দিবি ?

পার্ব্বতী—"কেন, আমার কাছে ছয় গণ্ডা পয়সা আছে, ভিক্ষা করে ছয় সের চাউল, ছয়টী মিষ্ট কুমড়ো সংগ্রহ করিয়াছি।" মা ত হাসিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "দূর ক্ষেপী, এতে কি মহোৎসব হয় ? মহোৎসবে যে অনেক টাকা পয়সার দরকার, তোর কথায় মহোৎসব জুড়ে দিয়ে কি লোকের কাছে লজ্জা পাব ?" পার্ব্বতী এখন আর সে পার্ব্বতী নাই, সে জ্ঞানবিচারের ধার ধারে না ; সে যে তার পরপারে ; ভক্ত-বৎসল ভগবান তাহার বুকজোড়া ধন। পার্ব্বতী বলিল—"আচ্ছা, আমি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি" মা বলিলেন—"তা, বেশ, গোপাল যদি বলেন, তবে আমি এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।" পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি বাড়ীতে আসিয়া গোপালকে জিজ্ঞাসা করতঃ মাকে জানাইল যে, গোপাল বলিয়াছে, মাকে কাজ আরম্ভ করিতে বল কিছুতেই আটকাবে না। মা পার্ব্বতীর কথায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; আবার কি হয় দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন, সেদিন তাহাদের বাড়ীতে ভিক্ষা দিবার দিন ছিল ; ঐ দিন অনেক দীন দুঃখী ভিক্ষা করিতে আসিত। মা ভিক্ষার্থীদিগকে পার্ব্বতীর মহোৎসবের কথা জানাইবার জন্য সকলকে বলিয়া দিলেন এবং তিনিও যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকে পার্ব্বতীর মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন, এদিকে আবার পার্ব্বতীপ্রদত্ত পয়সা, চাউল, মিষ্টি কুমড়ো কয়টী দেখাইয়া রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না। যে শুনিল, সেই হাসিল বটে, কিন্তু কেহই নিমন্ত্রন অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইল না। আহা ! ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা ! তাঁর কি অপারসীম দয়া ! যিনি ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণ করতঃ বহির্গত হইয়াছিলেন,—যিনি কুরুসভায় একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন,—তিনি যে পার্ব্বতীর এই তুচ্ছ বাসনা পূর্ণ করিবেন এ একটা বেশী কথা কি ? ভিখারীগণ যখনই পার্ব্বতীর মহোৎসবের কথা শুনিল, অমনি তাহারা তাহাদের ভিক্ষালব্ধ চাউল, তরকারী ও পয়সা পার্ব্বতীর চাউল তরকারীতে ঢালিয়া দিল। যাঁহার ইচ্ছায় পলকে প্রলয় হয়,—সাগর শুকাইয়া যায়,—বন নগর হয়, আবার নগর বনে পরিণত হয়,—তাঁহারই ইচ্ছায় পার্ব্বতীর মহোৎসবও পূর্ণ হইতে চলিল ; দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাল মধ্যে চাউল, ডাইল, তরি-তরকারীতে স্তূপ হইয়া গেল ; এমন কি, কিছু নগদ টাকা পয়সাও সংগৃহীত হইল। ধন্য লীলাময়, ধন্য তোমার লীলা ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যাহার লীলার অন্ত পান না, সামান্য মানব তাঁহার এ খেলার অর্থ কি বুঝিবে ? সন্ন্যাল বাড়ীর অধিবাসী ও অন্যান্যের ত চক্ষু স্থির ! যাঁহারা পার্ব্বতীর মহোৎসবের প্রস্তাবে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিলেন—পার্ব্বতীকে সামান্য রমণীজ্ঞানে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, পার্ব্বতী সামান্যা রমণী নয়। সত্যই সে গোপালের কৃপা লাভ করিয়াছে; কত কোটী যুগ তপস্যা করতঃ যোগীঋষিগণ যাহার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন না, আজ পার্ব্বতী সেই পরম ধনকে পুত্ররূপে বুকে ধরিয়া জীবন

ধন্ত করিয়াছে। যাহাহউক তাঁহার ইচ্ছায় মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, কোন বস্তুর অপ্রতুল হইল না; প্রায় ৩০০। ৪০০লোকে প্রসাদ পাইল।

আর একদিনের লীলার কথা শুনুন,—মাঘ মাস, রাত্রি দ্বিপ্রহর, ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, এ শীতে সহজে কেহ ঘরের বাহির হইতে চাহে না। গোপাল শিশুর মত ক্রন্দন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন 'মা, আমি হাগ্‌ব"! পার্ব্বতী তখন নিদ্রালসেবিভোরা, এবং শীতের আতিশয্যে শয্যা ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। যখন পার্ব্বতী কিছুতেই শয্যা ত্যাগ করিল না, তখন গোপাল তাহার গায়ের কাথা টানিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং নিজে শয্যা ত্যাগ করতঃ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এরূপ যন্ত্রনায় নিদ্রা যাইতে পারে কাহার সাধ্য? পার্ব্বতী ত্যক্ত হইয়া ঘুমের ঘোরে বলিল, "যা, বাড়ীর সম্মুখস্থিত ধানক্ষেতে বাহ্য কর গে, আমি আসিতেছি"। গোপাল বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি যাই, তুই আসিস্"। গোপাল চলিয়া গেলেন, পার্ব্বতী পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে হঠাৎ পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; পার্ব্বতী দেখিল শয্যায় গোপাল নাই। পার্ব্বতীর হৃদয় কাপিয়া উঠিল, আর কি পার্ব্বতী স্থির থাকিতে পারে? এখন আর পার্ব্বতীর শীতবোধ নাই; পার্ব্বতী "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বৎসহারা গাভীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ধানক্ষেতের দিকে দৌড়াইল। 'গোপাল,' "গোপাল' বলিয়া আকুলকণ্ঠে উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিল; হেলায় বুঝি গোপালকে হারাইলাম, আর বুঝি প্রাণের গোপালকে পাব না,—গোপাল বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে; ইত্যাদি কত কি ভাবিতে ভাবিতে পার্ব্বতী করুণক্রন্দনে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। পার্ব্বতীর সে আবেগপূর্ণ প্রাণস্পর্শী, আকুলক্রন্দন বিফল হইল না; ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান কি আর ভক্তের প্রাণের ডাকে স্থির থাকিতে পারেন? কেন না ভক্ত যে তাঁর প্রাণের প্রাণ। গোপাল মধুমাখা স্বরে বলিলেন,—"মা এই যে, আমি এখানে।" পার্ব্বতী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া আবেগভরে গোপালকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পার্ব্বতী কি দেখিল! সে দেখিল গোপালের সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ঠার লিপ্ত। সে তাঁহাকে কোলে করিয়া ঘরে নিয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করতঃ শয্যায় লইয়া শুইল। একে মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গ শীতল জলে ধৌত করায় গোপাল শীতে ঠক্‌ঠকি কাঁপিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে কত আদরে, কত যতনে ছিন্ন কাঁথা দ্বারা জড়াইয়া বুকে করতঃ ঘুম পাড়াইল। (পার্ব্বতী দীনাহীনা দুঃখিনী লেপতোষক কোথায় পাইবে?) পরদিন রাত্রের ঘটনা মাকে জানাইলে, তিনি সেই দিনই গোপালের শয্যার যথোপযুক্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

একবার মা জগন্নাথদর্শনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন—চল, জগন্নাথ-দর্শনে যাই।

পার্ব্বতী—"না আমি যাব না, গোপাল আমার যে আবদারে, আমার সঙ্গে সঙ্গে না

জানি তোমাকে কত ব্যতিব্যস্ত করিবে।"

মা কিছুতেই শুনিলেন না। অগত্যা পার্ব্বতী বলিল,—আমি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। গোপালকে জিজ্ঞাসা করতঃ পার্ব্বতী মাকে জানাইল যে, গোপাল বলিতেছে "পুরীতে গিয়া আমি কি পাব? আমি ছেলে মানুষ উপবাসী থাকিতে পারিব কি? তথায় সবই যে আমার প্রসাদ।" মা, একথা শুনিয়া অবাক্; কেন না পার্ব্বতী নিরক্ষরা গ্রাম্যরমণী; তার মুখ হইতে এ তত্ত্বকথা উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। মা ভক্তিগদগদচিত্তে মনে মনে গোপালকে প্রণাম করতঃ তাহাকে বলিলেন, তুমি গোপালকে জানাও যে, তাঁহার অনুমতি হইলে আমি তাঁহার ভোগের উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। গোপাল সম্মতি প্রদান করিলেন; শুভদিনে শুভক্ষণে সকলে পুরীধামাভিমুখে রওয়ানা হইয়া যথাসময়ে তথায় পহুছিলেন। যথাসময়ে সকলেই জগন্নাথ দর্শনার্থী হইয়া মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন; পার্ব্বতীও গোপাল হস্তে (পিত্তলের মূর্ত্তি) তথায় উপনীত হইল। কিছুক্ষণ পরে সে "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্ব্বতী তোর কি হইয়াছে?

পার্ব্বতী,—"তোমরা কি দেখিতেছ না আমি অন্যমনস্ক থাকা কালীন "গোপাল" আমাকে ছাড়িয়া ঐ মন্দিরে চলিয়া গিয়াছে; আর আমি যে এক গোপালের পরিবর্ত্তে অসংখ্য গোপাল দেখিতেছি।" "বাবা, গোপাল, তুই এতগুলি কেন হলি রে?" "বাবা তুই আমার এক গোপাল," "আমার কোলে আয়, আমার বুক জুড়া রে বাবা!" ইত্যাদি বলিয়া ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করতঃ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মা, তাহাকে নানাবাক্যে প্রবোধ দান করতঃ বলিলেন—"পার্ব্বতি! তুই কাঁদিস্ না, এখনি তোর গোপাল তোর বুকে আসিবে।" সরল-বিশ্বাসী পার্ব্বতী অবোধ বালিকার মত মার মুখপানে তাকাইয়া বলিল,—হাঁ মা, সত্যই কি তবে গোপালকে আবার পাব? গোপাল আবার আমার বুকে আসিয়া প্রাণ শীতল করবে?" মা বলিলেন,—হাঁ পাবে।"

কিছুক্ষণ পরে সকলে দেখিতে পাইল, পার্ব্বতী হাত বাড়াইয়া কি যেন বুকে ধরিতেছে; মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পার্ব্বতি! গোপাল আসিয়াছে কি?"

পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে বলিল হাঁ, মা, আসিয়াছে।

সেইদিন হইতে পার্ব্বতী গোপালকে হারাইবার ভয়ে আর জগন্নাথদর্শনে যাইত না। সে গোপালকে হস্তে করিয়া একাকী সহর পরিভ্রমণ করিত; যাত্রীগণ স্বেচ্ছায় গোপালকে প্রণামী দিত; পার্ব্বতী তাহাতে কোন আপত্তি করিত না; এইরূপে দেখা গেল এক সপ্তাহে প্রায় ৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মা ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি পার্ব্বতি, তুই বুঝি ভিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিস।

পার্ব্বতী—না, মা, আমি ভিক্ষা করি না; লোকে স্বেচ্ছায় গোপালকে দেয়, আমি কাহাকে কিছু বলি না, কিম্বা নিষেধও করি না। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মা ঐ টাকা দ্বারা পুনরায় মহোৎসব দিলেন।

একবার পার্ব্বতীসহ মা তাঁহার পিত্রা-

লয়ে আসিলেন; পার্ব্বতী গোপালকে একদণ্ডের জন্যও কাছছাড়া করিত না। একদিন গীতা পাঠ হইতেছিল, মেয়েরা সকলে পার্ব্বতীকে বলিলেন,—"চল গীতা শুনি গে।"

পার্ব্বতী—"গোপালকে কোথায় রাখিয়া যাইব?" সকলে—"কেন, ঠাকুর ঘরে রাখিয়া যাব, তথায় গোপাল অন্যান্য ঠাকুরের সঙ্গে খেলা ধূলা করিবে। পার্ব্বতী স্বীকার হইল। গীতা পাঠ হইতেছে, হঠাৎ পার্ব্বতী কাঁদিয়া উঠিল, সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল; জিজ্ঞাসা করায় বলিল,—আমি গোপালের জন্য কাঁদিতেছি, এতে যে গোপালের কথাই লিখিত আছে।" সকলেই শুনিয়া অবাক্।

একদিন প্রাতে মা সংবাদ পাইলেন-পার্ব্বতী নাই, ভিতর হইতে ঘরের দরজা বন্ধ; অনেক অনুসন্ধান হইল, কোথায় তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। তিনদিন পর ভোরে হঠাৎ পার্ব্বতী উপস্থিত হইল। সে প্রথমেই মার নিকট উপস্থিত হইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"পার্ব্বতি! তুই কোথায় গিয়াছিলি?" পার্ব্বতী—"মা, সে কথা আর কেন জিজ্ঞাস কর, গোপালের জ্বালায় আমি অস্থির, সে যাহা করিতে বলিবে, তাহা না করিয়া কি আমার রক্ষা আছে? সে [illegible] বায়না ধরিল, চল মা, কৈলাসে যাই, গান শুনিয়া আসি, তথায় শিব গান করিতেছে, আমি প্রথমে অস্বীকৃতা হইলাম, কিন্তু সে [illegible], কিছুতেই নিরস্ত হইবার [illegible] আমাকে স্বীকার করিতে হইল। আমি বলিলাম—তুই আগে আগে পথ দেখাইয়া যা, আমি পাছে পাছে যাব। গোপাল তাহাতেই রাজী হইল। আমি হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, ঘরের চাল দু'খানা ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং মাটী হইতে ঊর্দ্ধদিকে দিবালোকে আলোকিত একটী সুন্দর অথচ প্রশস্ত রাস্তা দেখা যাইতেছে। আমি গোপালের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম; কোথায় চলিলাম জানি না। অনেক দূর যাওয়ার পর গান শুনিতে পাইলাম। সে গান যে কি মধুর!—কি প্রাণস্পর্শী! তাহা কেমন করে বুঝাব মা? গান শুনিয়া আমি যেন কি হইলাম,—আমি সব ভুলিয়া গেলাম। মা, জীবনে এমন মধুর গান আর আমি শুনি নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড সুন্দর পুরী, তথায় এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে সভা জমিয়াছে; সে সভায় যে কত রকমের স্ত্রীপুরুষ দেখিলাম তাহার কত বর্ণনা করিব; কাহার চারিহাত, কাহারও বা দশহাত, কাহারও বা চারিমাথা, কাহারও বা হস্তীমুণ্ড, কাহারও বা ছয়মুণ্ড, কেহ কাল, কেহ শ্বেতবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের—নানারূপের মানুষ দেখিলাম, তন্মধ্যে একজন দুধের মত সাদা, তাঁহার পাঁচ মাথা, মাথায় প্রকাণ্ড জটা, পরিধানে বাঘের ছাল, গলে জীবন্ত প্রকাণ্ড সাপ ও হাড়ের মালা, সেই গান করিতেছে; তাহারই পাশে এক শ্যাম বর্ণ, অপরূপ রূপলাবণ্যবিশিষ্ট পুরুষ, তাহার অঙ্গের জ্যোতিতে সে সভা আলোকিত, আমি দেখিলাম, গোপাল যেন সেই জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছে। আমি গোপাল-হারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আমার ক্রন্দনে গোপাল সেই জ্যোতি হইতে বহির্গত হইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল,—মা আর কাঁদিস্ না, আমি আর কোথায় যাইব না, তোম

কাছে থাকিয়া গান শুনিব। গান শেষ হইলে আমরা বাড়ীতে যাব। কতদিন হইল জানি না, গান শেষ হইল, চলিয়া আসিলাম। আমার ঘরে কিছুই নাই, কতদিন হইল গোপালকে কিছু খেতে দিই নাই। তাহাকে কিছু খাবার দেও।” মা, তাড়াতাড়ি গোপালের ভোগের উপকরণ দিয়া পার্ব্বতীকে বিদায় করিলেন।* জনৈক দর্শক।

* এ আজ ৩।৫ বৎসরের কথা, ইহার পর কি হইয়াছে আখ্যায়িকালেখক অবগত নহেন; কেন না ইহার পর তিনি আর ওদিকে যান নাই। লেখক।

—:0:—

ভিখারী।

ভিক্ষা দেগো মা,
ভিখারী দুয়ারে আজি দাঁড়ায়ে;
ছিল যাহা কিছু
সঞ্চয়ের ধন— গেছে ফুরায়ে
রিক্ত হাতে নিতি
ফিরি দ্বারে দ্বারে— করি যাচনা,
এক মুঠো পাই
সহি তার তরে, কত যাতনা।
তাও কিগো রয়,
কোথা উড়ে যায়, এক নিমেষে,
ভাঙ্গা বুক খানি
দুহাতে চাপিয়া, ফিরি হতাশে।
অভাব আমার
ঘুচিল না আর সারা জীবনে,
আমারে যে তোষে
হেন জন বুঝি নাহি ভুবনে।
ভিখারীর কাছে
ভিক্ষা যদি করি, কিবা দিবে সে?
এত দিন হায়
বুঝি নাই তাই মরি পিয়াসে।
ঝুলি কাঁধে নিয়ে
তাই মাগো আজি, তোর দুয়ারে,
এসেছি সাহসে—
আঁখি তুলে ওগো, চাহ কাতরে!

ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(৭)

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, “বাসনা বাসয়েদ্ যতঃ” অর্থাৎ সকলকে বাসিত করে কিম্বা সংসারে লিপ্ত ও আসক্ত করে বলিয়া ইহার নাম বাসনা। মতান্তরে “প্রকটিতাসমুদ্রূপাঙ্ক” অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা প্রকটিত বিষয়াদিরূপ চিত্তের বৃত্তি বিশেষের বাসনা।

অতএব জানা যাইতেছে যে, সংসারবৃক্ষ কামনাবাসনারূপ বীজেরই বিকাশ মাত্র। বৃক্ষ যেরূপ বায়ু দ্বারা সর্ব্বদাই বিচলিত হয়, তদ্রূপ সংসারবৃক্ষও মোহরূপিনী বায়ু দ্বারা সর্ব্বদাই বিধূনিত হয়। আশাতৃষ্ণা, ভোগদুঃখ, রাগদ্বেষ, ভয়বিষাদ, মায়ামল, কর্ম্মবন্ধ, ও জরামৃত্যু এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা। অনাদি কাল হইতে এই সংসার বৃক্ষ 'স্বতঃসম্ভূত হইয়া বিদ্যমান আছে। যাঁহা হইতে এই সংসারবৃক্ষের বীজ প্রকাশিত হয় বা যিনি সংসার বৃক্ষের বীজের আকার ধারণ করেন, তিনিই অবিনাশীস্বভাব পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম। এই জগৎ সেই পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মের বিকাশ মাত্র, আর স্বতঃসম্ভূত' বীজই (ব্রহ্মের সূক্ষ্মাবস্থা) কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, মায়া ইত্যাদি নামের সংজ্ঞা বৈচিত্র্যস্বরূপ। মন যখন বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কামনাবাসনাপরিশূন্যতায় অবিচ্ছিন্নভাবে সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তখনই নিষ্কাম বা পরাভক্তির চিহ্ন প্রকাশিত হয়। তখন একাগ্রচিত্তে ভগবানচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই মনে স্থান পায় না, ভগবান ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই দেখে না, কিছু জানে না, কিছু ভাবে না। এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ পূর্ণকামতা, সত্তা, হৃদ্যতা, সত্যতা, তত্ত্বজ্ঞানতা, আনন্দবত্তা, উপশমবত্তা, মৃদুভাষিতা, নির্লোভতা, সর্ব্বৈকতা, (সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি) পূর্ণতা ও দ্বৈতবিকল্পহীনতা প্রভৃতি গুণাবলী উদিত হইয়া, জীব পরাৎপর পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতাত্মযাত্মা' অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মাস্বরূপ জানিয়া নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে। এবং আত্মৈকমতি হইয়া রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তির ক্ষীণতায়, বিগতমোহ, বিগতমান ও নির্ব্বিকল্পচিত্ত হইয়া পরম পদে চিরশান্তি লাভ করে। ইহারই নাম নিষ্কাম বা পরাভক্তির পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু জ্ঞানের সাহচর্য্য ব্যতীত কদাচ ঐরূপ অবস্থা লাভ হইতে পারে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু কামনাবাসনা (অজ্ঞান) নিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধশক্তিসম্পন্না নহে। অতএব জ্ঞান ব্যতীত কদাচ উহা ত্যাগ হইতে পারে না। এইজন্যই সাধু-প্রকৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বেদানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বদা রত থাকিয়া পরম জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ হইলেই ভগবানের প্রতি ভক্তি স্বতঃই উদিত হয়। তখন ভক্তি লাভের জন্য কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বা কারণান্তরের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলেই আপনা হইতে ভক্তির দৃঢ়তা সংসাধিত হয়। কোন রূপ পাপ বা অজ্ঞান দেহ স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু ভক্তির দৃঢ়তায় মন, প্রাণ সমস্তই ভগবানে সমর্পিত হয়; অর্থাৎ তখন "তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎ প্রবোধনম্" দ্বারা সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন, ঈশ্বরবিষয়ক বাক্যের বিচার, পরস্পরে তাহার অর্থ বোধ করা এবং তাহাতে একনিষ্ঠ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন দিকেই অন্তঃকরণ ধাবিত হয় না। এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ নিজ আত্মার উপরে যে প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ও প্রযত্নাদি ছিল সমস্তই ঈশ্বরের উপর বর্ত্তিয়া, নিজ আত্মার সহিত ঈশ্বরকে অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকে

বা ঈশ্বরের সহিত অভেদ হইয়া যায়। এই জন্যই গীতাতে বলিয়াছেন যে:—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, নিত্যযুক্ত এবং একভক্তিপরায়ণ, অর্থাৎ ভগবানেই যিনি আত্মসমর্পণ করেন, সেই জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর এইরূপ জ্ঞানী ভক্তের অত্যন্ত প্রিয় এবং এরূপ ভক্তেরাই ঈশ্বরের প্রীতির আস্পদ।

অতএব জ্ঞানই নিষ্কাম বা পরাভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। জ্ঞান ব্যতীত কদাচ কামনাবাসনা (অজ্ঞান) ত্যাগ হইতে পারে না! আর কামনাবাসনা ত্যাগ না হইলে নিষ্কাম বা পরাভক্তির আবির্ভাব ও কুত্রাপি সম্ভবে না। যেমন সমুদ্র মধ্যে তপ্ত অঙ্গার থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে অসদ্রূপিণী কামনাবাসনা (অজ্ঞান) থাকিতে পারে না। জ্ঞানানলে আশাকামনা, সংকল্পবাসনা, অজ্ঞানভ্রান্তি, লজ্জাভয় সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন হিংসাদ্বেষাদি বিবর্দ্ধিনী কামনাবাসনার কার্য্যকারিণী শক্তি লোপ পাইয়া মানব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতঃ ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; সংসার যন্ত্রনার অবসান হইয়া নিত্যানন্দে অনন্ত সুখ ভোগ করে। আর কখন সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এইজন্যই সামবেদে বলিয়াছেন যে:—

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে—
মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥

হে, সত্যাত্মক অগ্নিনামক পরব্রহ্ম! তুমি মিত্রের ন্যায় প্রিয়, (সখায়মিব প্রিয়ং) অতীব প্রিয়তম, (প্রেষ্ঠং-অস্মাকম্-প্রিয়তমং) অতিথির ন্যায় পূজ্য এবং "রথের ন্যায়" ধন লাভের হেতু। আমরা জ্ঞানরূপ মহাধন লাভের আশায় তোমাকে সর্ব্বদা ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত স্তুতি করিতেছি। অর্থাৎ তুমি আমাদের হৃদয়গুহাতে অন্তরাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছ, "যমবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ "অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমরা সেই আত্মতত্ত্ব লাভের আশায় 'জ্ঞান রূপ' মহাধনের জন্য তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছি। তুমি অখিল জনের বন্ধু, দেবগণের আদিদেব, বেদ সকলের মূলীভূত, শান্ত, গূঢ় ও আনন্দময়। আমরা তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা যেন "জ্ঞানরূপ তরণীর" সাহায্যে সংস্কারবারিধির পারে যাইতে পারি।

যজুর্ব্বেদে বলিয়াছেন:—

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

মহাপ্রলয়কালে সমুদায় দৃশ্য সৃষ্টির লয় হইলে যিনি একমাত্র প্রশান্তভাবে অবস্থান করেন, যিনি জলে-স্থলে, শূন্যে-অনিলে, তেজেতাপে, ফলে ফুলে, পর্ব্বতে পাতালে, উদ্যানেকাননে, সৌরভে শোভায় সর্ব্বত্রই নিত্য অবস্থিত আছেন, যিনি বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও কর্ত্তা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি পঞ্চকোষের অতীত এবং উদয়াস্তগতি-স্থিতিবিহীন নির্ব্বিকল্প; যাঁহার সংবিৎরূপ বৃক্ষে জগৎরূপ ফল ধারণ করে, প্রজ্ঞারূপ আকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ নক্ষত্রের উদয় হয়, ইচ্ছারূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ বারি বর্ষণ হইয়া থাকে; যিনি

সাংখ্যবাদীর পুরুষ, বেদান্তীর ব্রহ্ম, শূন্য-বাদীর শূন্য, বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান, আরম্ভ-বাদীর অবয়ব, কারণবাদীর কারণ, পরিণাম-বাদীর বস্তু, বিবর্ত্তবাদীর কল্পনায় 'যিনি' অবস্থান্তরিত, রসবাদীর রসসিন্ধু, প্রেমবাদীর নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, রাধাস্বামী দয়াল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ; প্রবৃত্তিরূপ অর্থভাবনার দ্বারা যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ষষ্ঠী, মনসা, জগদ্ধাত্রী, পুণ্যাপুকুর, ভোষতোষাল, এঁউতি, যমপুকুর, সেঁজোতি, কুলকুলতি, কার্ত্তিক, গণেশ, শীতলা, বীরাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জন্মাষ্টমী; সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনায় বিভিন্নরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন; তান্ত্রিক-সাধকের মানসিক চিন্তায় বা শক্তিউপাসকের সাধন-সাফল্যে যিনি শবস্থাননিবাসিনী, শিরশশুসীমন্তিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিতা সর্ব্বদানব-ঘাতিনী, চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, সর্ব্ববাহনবাহিনী, ত্রিজগদ্দীপ্তিকারিনী, মারণ, উচ্চাটন, ক্ষোভন, মোহন, দ্রাবন, জৃম্ভন, স্তম্ভন ইত্যাদি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী, সর্ব্বদুঃখপ্রশমনী ও নানাতাপবিনাশিনী ইত্যাদি বিশেষণে "মা নামে" অভিহিতা হইয়া থাকেন; যিনি হিন্দুর গৃহে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, মধুপর্ক, মাল্য, বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বুল ও পুনরাচমনীয় উপচারে প্রত্যহ, পূজিত হইতেছেন; সাধুপ্রকৃতি বিচক্ষণ মহাত্মারা যাঁহার উপাসনায় সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে,—

"সোঽহং শব্দেতে যার বেদান্তে বর্ণন।
অনন্ত আকারে যারে ভাবে সর্ব্বজন॥
মায়াবশে বহুরূপ যে জন বিহরে।
তাঁহারে প্রণমি সদা হৃদয়-মাঝারে॥
আছে কিম্বা নাই এই সংশয়ের মাঝে।
যে জন অবোধ্য ভাবে সতত বিরাজে॥
যাঁহাতে প্রকাশ পায় প্রকাণ্ড-নিচয়।
সে জনে প্রণমি যাঁর নাহি অপচয়॥
অনাদি বাসনা বশে যাদের উদ্ভব।
ছাড়ি সেই দ্রষ্টা দৃশ্য সমস্ত বিভব॥
সকল দর্শন মূলে ভাসে যে সতত।
সেই বিশ্বারাধ্য ধনে প্রণমি নিরত॥
ইন্দ্রিয় বিষয়ে যবে হয় সমাগম।
আনন্দ স্বরূপে তবে ভাসয়ে যেজন॥
অথচ যে জন সদা অবিনাশী ধন।
নমি তাঁরে ভক্তিভরে ত্রিতাপ-তারণ॥"

যিনি শিব, শান্ত, সর্ব্বগত, অজ ও বোধাত্মক; সেই দেবাদিদেব সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি অর্থাৎ পরম ধর্ম-জ্ঞান প্রদান করুন;—আমরা যেন বুদ্ধি, অনুরাগ, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, 'নবগুণ' রহিত হইয়া জগৎ অতিক্রম করতঃ নিত্যধামে চির শান্তি লাভ করিতে পারি।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনা দ্বারা বেদ, বেদান্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্র প্রমাণে সাব্যস্ত হইল যে, জ্ঞানই নিষ্কাম বা পরাভক্তিলাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ, বা যে বস্তুর আনুকূল্যে নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক হয়, সেই বস্তুই জ্ঞান। অতএব নিষ্কাম বা পরাভক্তি লাভ করতঃ বিশাল মায়াড়ম্বরপূর্ণ দগ্ধ সংসার ত্যাগ করিতে হইলে, অহঙ্কারময়ী কামনা বাসনার হাত এড়াইয়া অপক্ষয়বর্জ্জিত পরম পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, অনন্ত আত্মতত্ত্ব-শয়নে শয়িত হইয়া নির্ব্বিকার আনন্দ ভোগ করিতে হইলে,—জ্ঞানদেবতাই একমাত্র অবলম্বনীয় হইতেছে। জ্ঞান প্রসাদে প্রমাদ,

মোহ ও ভ্রান্তি, 'শারদ-বিচ্যুত শেফালিকার ন্যায় মানব হৃদয় হইতে স্খলিত হইয়া যায়। এইজন্যই বেদাদি সকল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—জ্ঞানের সূক্ষ্ম বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে নিহিত করতঃ ঐকান্তিক যত্নের সহিত বেদানুশীলনরূপ জলসেচন দ্বারা হৃদয়ভূমিকে সরস করিলে, ক্রমশঃ উক্ত বীজই অনন্ত-শাখাসমন্বিত মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া থাকে। ভক্তি ও প্রেমরূপ লতা তখন আপনা হইতেই জ্ঞান বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, জ্ঞানবৃক্ষে মুক্তিরূপ ফলও অবশ্যম্ভাবী হয়। আর জ্ঞানবৃক্ষও ভক্তি ও প্রেমরূপ লতায় জড়িত হইয়া অনুপমের সৌন্দর্য্য বিতরণ করে। নানা বেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ সেই সৌন্দর্য্যের দিকে একবার মাত্র তাকাইলে, তাহাদের উপদেশ বাক্যের "ভক্তিমার্গ কর সার, জ্ঞানমার্গ জেনো হে অসার;" "বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, হিন্দুর উপনিষদ, গীতা ও দর্শনশাস্ত্রে যে সাধন বর্ণিত আছে, তাহা বৃথা ও ভ্রমপূর্ণ" "গীতা রচয়িতা স্বীয় ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন" ইত্যাদি (বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোণারটুপী মাথায় দিয়ে) বচন, সংবাদপত্রের আকারকে কলঙ্কিত করিতে পারে না; আর ভগবদ্ভক্ত সাধুগণকেও উপনিষদাদি বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দায় ভগবদ্ নিন্দা শুনিতে হয় না। এই-জন্যই ভগবান বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে:—

যোহস্মাতস্য কূপোঽয়মিতি কৌপং পিবত্যপঃ।
ত্যক্ত্বা গাঙ্গং পুরঃস্থং তং কোঽন্মশাস্ত্যবিরাগিণম্॥

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ গঙ্গাজল "অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের অনুকূল বেদাদি শাস্ত্রের যুক্তি" পরিত্যাগ করিয়া কূপোদক পান করে, "অর্থাৎ নিজ অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত বুদ্ধির প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে," তাদৃশ অনাত্ম-জ্ঞানী, অত্যানুরাগী ব্যক্তিকে কে উপদেশ দিবে? অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানও তাহাদিগকে দয়া করেন নাই। তাহারা সাধারণের ঘৃণ্য হইয়া পুনঃ পুনঃ নানাবিধ তির্য্যগ্‌যোনিতে ভ্রমন করে।

অতএব হিন্দু ভ্রাতাগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা ভগবান বশিষ্ঠদেবের উপরোক্ত বাক্য কদাচ বিস্মৃত না হন। ঋষিবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনই পারত্রিক মঙ্গলের উত্তরসাধক, এবং জ্ঞানই নিষ্কাম বা পরাভক্তি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ। এই দুইটী উপদেশ যেন সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত থাকে! এই অমূল্য বেদবাক্যে রমমান থাকিলে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান সহজেই অভ্যুদিত হয়, অবিদ্যা-কামকর্ম্মাদি দূরে পলায়ন করে অর্থাৎ "পাপ্মান-মনন্তে, ন পুনঃ সংসারমাপদ্যত"। আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহাই স্বয়ং বেদপুরুষের উপদেশ বলিয়া সামবেদ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অতঃপর দেখিতে হইবে, উল্লিখিত জ্ঞান ও ভক্তি অভেদ কিনা, এবং ইহাদের অবস্থিতি কোথায়? যাহা জীবের "আত্যন্তিক মঙ্গল" নামে অভিহিত হইবে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

যোগানন্দ-লহরী।

(১)

(বন্দনা)

ঝিঁঝিট একতালা।

বন্দে শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু,
চিদানন্দ নিত্য ব্রহ্মসনাতন।
(সে যে) পতিতপাবন অনাথশরণ
অজ্ঞান-তামস-নাশন॥
গুরু ব্রহ্মা বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর,
সর্ব্বতত্ত্বময় গুরু পরাৎপর,
গুরু পরমব্রহ্ম জ্ঞানভাস্কর, ভবসাগরতারণ॥
স্থাবর জঙ্গম বিশ্বচরাচর,
সর্ব্ব ব্যাপ্ত সেই আছে নিরন্তর,
চিন্ময় স্বরূপ নাহি নাম রূপ, ধ্যানাতীত নিত্য নিরঞ্জন॥
বেদান্ত ভাস্কর সর্ব্ব শ্রুতিসার,
জয়, সারসম্পদজ্ঞাপক,
চৈতন্য শাশ্বত জগতের নাথ, স্মররে হৃদয়রঞ্জন॥
হৃদয় কন্দরে সে যে দিবাকর,
মঙ্গলদায়ক সর্ব্ব মূলাধার,
শুদ্ধজ্ঞানময় আনন্দ নিলয়, তত্ত্বমসি আদি বাক্যে লক্ষ্যমান
ভাবের অতীত ত্রিগুণ রহিত,
সদা সাক্ষীভূত দ্বন্দ্ব বিরহিত,
মায়ার অতীত পরম সুখদ, শমনভয়বারণ॥
আত্মবলিদাও শ্রীগুরু চরণে,
তবে সে পাইবে সে পরম ধনে,
অজ্ঞান পালাবে জ্ঞানের আলোকে, ভাতিবে তব হৃদয়মন॥
হেন গুরু পদে লইতে শরণ,
যদি রে যোগেন্দ্র আছে রে মনন,
আমিত্বের নাশে গুরুপদে মিশে, ব্রহ্মানন্দরসে হও রে মগন॥

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান ।*

সাধারণ বিজ্ঞানের অনেক শাখা ; উহাতে জগতের দৃশ্যবৈচিত্র্য বুঝা যায় । কিন্তু উচ্চতর বিজ্ঞানে অক্ষরব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে । মণ্ডুক উপনিষদ, ১।৫ ।

আমাদের এই যুগ বাস্তবিকই বিস্ময়কর । মনুষ্যজাতি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই যে উন্নতি করিয়াছেন তাহাও অতীব আশ্চর্য্যজনক । প্রত্যহই মানববুদ্ধির চক্রবালে নূতন নূতন উষালোক বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিতেছে । "চিরসত্য"-রূপ দিনমণি বহু যুগ ধরিয়া যে কুয়াসায় আচ্ছন্ন, ঐ আলোক তাহা দূর করিতেছে । চর্ম্ম চক্ষের সাহায্যে গগনমণ্ডলের যে প্রদেশ আমরা দেখিতে পাই না বা আমাদের অতি নিকটে অথচ অতিক্ষুদ্র বলিয়া যাহা আমাদের দেখিবার শক্তি হয় না, সেখানেও অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র সাহায্যে কত তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে । ঐ যন্ত্রগুলি মনুষ্য-প্রতিভায় উদ্ভাবিত । প্রকৃতির যে সকল নিয়ম আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না, এখন তাহা অবগত হইতেছি । সেইগুলির আলোচনা করিতে করিতে আমরা নূতন নূতন তথ্য ও নূতন নূতন ব্যাখ্যা জানিতে পারিতেছি । নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রাচীনকালীন বালকোচিত ব্যাখ্যা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আমরা আধুনিক জ্ঞান প্রভাবে বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি ।

এই যুগকে "বৈজ্ঞানিক যুগ" বলা যাইতে পারে । বাহ্য ও অন্তর উভয় জগতেই এক্ষণ বিজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্যের চিন্তা, যুক্তি এবং কার্য্যকলাপ পরিচালিত হইতেছে । শিল্প, সাহিত্য, রন্ধন, ভ্রমণ, সাজ-সজ্জা প্রত্যেক বিষয়ই এক্ষণে বিজ্ঞানানুযায়ী । সত্যের সুদৃঢ় শৈলোপরে অবস্থিত বলিয়াই বিজ্ঞানের আজ এই জয়োল্লাস ও মহিমা বিকাশ । বিজ্ঞানদেবীর অঙ্গপরিচ্ছদে সত্যালোকের কত শত বর্ণ প্রকাশ পাইতেছে ; তাঁহার আহার্য্যও "সত্য" এবং সত্যই তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার জীবন ও জীবাত্মা । যেখানেই তিনি গমন করেন, সেখানেই সত্যালোক সঙ্গে লইয়া যান । সেই আলোকে সেখানকার বহুযুগসঞ্চিত অন্ধকার বিনষ্ট হয় । প্রকৃতির প্রায় সকল বিভাগই পরিষ্কার করিয়া তিনি এক্ষণে সুবিরাট রহস্যপূর্ণ ধর্ম্মরাজ্যে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । আমরা এখন "ধর্ম্মবিজ্ঞান", 'বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম' প্রভৃতি পুস্তক দেখিতে পাইতেছি । নিরপেক্ষ সমালোচনা, নির্ম্মল যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে চতুর্দ্দিক এখন আলোকিত । এখন সকলেই ধর্ম্মের ভিত্তি বা ভূমি সম্বন্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে আলোচনা করিতে এবং ধর্ম্ম জিনিসটী আদৌ বৈজ্ঞানিক কি না তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে । ধর্ম্মোন্মাদ ও গোঁড়ামি ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে । যিনি একটীবার বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অনুকূল ও প্রতিকূল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া

---

* স্বামী অভেদানন্দের ইংরেজী বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত । লেখক

অন্য কোন জ্ঞান কখনই গ্রহণ করিবেন না। যিনি বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার মনের প্রথমাবস্থা বড়ই চঞ্চল; তাঁহার মনে তখন কেবলই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, সন্দেহের উপর সন্দেহ আসিয়া উদয় হয়। কোন কিছু স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ অন্বেষণ করেন। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের অপ্রমাণিত বাক্যের উপর বা কোন পুস্তকের লেখা পড়িয়া বা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন কিছু বিশ্বাস করিতেন, অতএব আমাদেরও বিশ্বাস করা উচিত এই বলিয়া, কিম্বা আমাদিগের বাল্যকাল হইতেই আমরা কোন কিছু বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, অতএব এক্ষণও ঐ বিশ্বাস আমাদিগকে স্থির রাখিতে হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত [illegible]: কোন কিছু বিশ্বাস করিও না। তিনি বলেন, প্রমাণগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা কর, অনুকূল প্রতিকূল তর্কগুলি রীতিমত ওজন করিয়া দেখ কোন্ দিকে গুরুত্ব, তারপর উহা যদি যুক্তির বিরোধী না হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবিষ্কৃত অন্য [illegible] সহিত উহার যদি সামঞ্জস্য থাকে, [illegible] যখন বিজ্ঞানের উপর [illegible] কোন কিছু স্বীকার ক[illegible] উহার কোন বৈজ্ঞানিক ভি[illegible] কি না তাহা আমাদিগের দেখান কর্ত্তব্য। কোন ধর্ম্ম বা মত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেও আমাদিগকে ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জগতে আমরা বিজ্ঞানের দুইটি প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। ঐ দুইটী পরস্পরের বিরোধী। একটী প্রবৃত্তি ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে; বলে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই এবং ইহার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও দেখা যায় না। অন্য প্রবৃত্তিটী ধর্ম্মকে ন্যায় ও বিজ্ঞানের অনুযায়ী করিয়া উহাকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। ঐ দুইটী প্রবৃত্তির ভীষণ সমর-সংঘর্ষ সত্ত্বেও আমরা এমন অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা এখনও পুরাকালীন অবৈজ্ঞানিক ধর্ম্মমত বিশ্বাস করিয়া চলে। উহারা যেসব ব্যাপার বিশ্বাস করিয়া থাকে তাহা ন্যায়ানুসারে প্রমাণিত বা দর্শনানুসারে অনুমোদিত নহে। যাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখিতে না পান, তাঁহারা যে ধর্ম্মে বিজ্ঞান-নিহিত সত্যগুলির যথাযথ মূর্ত্তি নাই, সে ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সত্য খুঁজিয়া বাহির করা এবং নৈসর্গিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে ইহার যাবতীয় চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। নিষ্ফল হইবার কারণ এই, যে ধর্ম্ম বলেন যে আদৌ কিছু ছিল না অকস্মাৎ একজন সাকার ও সোপাধি ঈশ্বর বিশ্ব রচনা করিয়া বসিলেন। অভাব হইতে ভাবের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সাকারত্ব-সোপাধিত্ব—এ দুটী কথা বৈজ্ঞানিকগণ অপ্রমাণিত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাজে কাজেই তাঁহারা বলেন ধর্ম্মপালন করিয়া লাভ কি? উপরোক্ত অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্বাস করিয়া আমাদিগের কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে? বরং, উহাতে আমাদিগের মত ও ধারণার সংকীর্ণতাই ঘটিয়া থাকে।

আমরা চরম সত্যের ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে প্রাপ্ত হই; অতএব, ধর্ম্মের সমুদয় উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বিজ্ঞান অনুসরণ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। যাহারা ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের অধিকাংশেই বলিয়া থাকেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে চরম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না; উহা অপরিজ্ঞেয় ও অননুসরণীয়। অতএব, সেই চরম সত্যের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যখন সকল চেষ্টাই নিরর্থক হইয়া পড়ে, তখন ঐরূপ চেষ্টা করিবারও আবশ্যকতা নাই। ঈশ্বরকে আমরা কখনই জানিতে পারি না, জীবাত্মার প্রকৃতিও আমাদিগের বোধগম্য নহে। কাজেকাজেই যে যে ধর্ম্ম আমাদিগকে দুর্বিজ্ঞেয় বিষয়ে শিক্ষা দান করে তাহা একেবারে অসত্য ও অপালনীয়। তাঁহারা এইরূপ বলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও বলেন যে, সকলেই নীতিমান হওয়া ও সমাজের কল্যাণ সাধন করা কর্ত্তব্য। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমাদিগকে নীতিমান হইতে হইবে কেন? আমাদিগকে সমাজের কল্যাণই বা করিতে হইবে কেন? কি অভিপ্রায়ে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর করিতে যাইয়া অনেকগুলি অভিপ্রায় দেখান হয়; যেমন, বংশাবলীর জন্য ইত্যাদি। এই অভিপ্রায়গুলি সন্তোষজনক নহে। উহা আমাদিগের যুক্তির অনুযায়ী নহে। উহাতে আমাদিগের জীবনের লক্ষ্যও ব্যাখ্যা করিয়া দেয় না। বংশাবলীর জন্য আমাদিগকে নীতিমান হইতে হইবে কেন? বংশাবলীর সহিত আমাদিগের সম্পর্ক কি? বংশাবলীর ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া আমরা আজীবন সুখ ও আমোদ-প্রমোদ উপভোগ না করি কেন? বংশাবলীও আবার আমাদিগের মত চলিলেই পারিবে? লোকের অপকার না করিয়া আমরা উপকার করিতে যাই কেন? সুখ ও আমোদ-প্রমোদ-ভোগই যদি মানবজাতির লক্ষ্য এবং আমাদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমাদের সমুদয় কার্য্যের অবসান হইয়া যায়, তবে অপরের চিন্তা না করিয়া আমরা সুখ ও আমোদ-প্রমোদ অন্বেষণ না করি কেন? কোন হেতুই দেখা যায় না। ধর্ম্মবিশ্বাস না হইলে এক কঠোর আইনের শাসন ব্যতীত আমাদিগকে পাপাচার হইতে বিরত করিবার আর কিছুই এ পৃথিবীতে থাকিত না। তাহা হইলে আমাদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবারণ করিবার জন্য কোন নীতিমার্গই স্থির থাকিত না। মাত্র বংশাবলীর উপকারের উপর যাহারা নীতিশাস্ত্রকে দাঁড় করাইতে চাহেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টাবিষয়ক তর্কভূমি বেশ সুদৃঢ় ও ন্যায়ানুমোদিত নহে। অতএব ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া যাহারা বিজ্ঞানের আদর করেন, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সে সিদ্ধান্তে চরম সত্যের প্রকৃতি তো পাওয়াই যায়ই না, তা' ছাড়া তাঁহারা নীতিমার্গে চলিবার পথও পাইয়া উঠেন না।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন; ইহারা ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাদের অনেকেই কৃতকার্য্য হয়েন না। বিজ্ঞানসম্পাদিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ করিবার জন্য ইহাদের কেহ কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটাইতে চেষ্টা করেন! এই উদ্দেশ্যে পংক্তি বিশেষের যতটা

দুর অর্থ সম্ভব, তাহা ইহাঁরা ছাড়েন না। কিন্তু এই প্রণালীটি সন্তোষজনক নহে। একটী উদাহরণ দেখ:—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বলেন যে, এই বিশ্ব ছয় দিবসে সৃষ্ট হইয়াছিল; আবার, আধুনিক বিজ্ঞান বলেন ইহা ক্রম-বিকাশের ফল। কেহ কেহ ভাবিতে লাগিলেন বিজ্ঞানের এই ক্রম-বিকাশ ব্যাপারটী যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। কি উপায়ে এই প্রমাণ করা যাইবে? তাঁহারা ভাবিলেন যে "ছয় দিবসে সৃষ্ট হইয়াছিল" এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যটীর মধ্য "দিবসে" কথাটীর অর্থ বিস্তৃতি করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বলিলেন "দিবসে" অর্থ "কল্পে"। ইহাঁরা মনে করেন যে শাস্ত্র বাক্যগুলি স্থিতিস্থাপক বস্তু—যত টানিবে, ততই লম্বা হইবে। ইহাঁদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্থিতিস্থাপক বস্তুরও টানের একটা সীমা আছে। 'দিবস' কথাটীকে টানিয়া 'কল্প' করিতে হইবে, 'দিবস' কথার এতটা স্থিতিস্থাপক গুণ নাই। ঐ কথাটী অতটা টান সহ্য করিতে পারে না। অতটা টানিলে ছিঁড়িয়া যাইবে। ধরিয়া লও যে, ছয় দিবসের অর্থ ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন কল্প। তাহা হইলে সপ্তম দিবস কিনা "স্যাবাথ" নামক বিশ্রাম দিবসের ভাগ্যে কি হইবে? ইহাকেও একটী শেষ কল্প ধরিতে হয়; সেটা নিতান্ত গাঁজাখুরী। হয় তো তোমরা অনেকেই জান যে বেশীদিনের কথা নহে, ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনৈতিক মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন বিবর্ত্তনপদ্ধতির সত্যতা স্বীকার করতঃ ওল্‌ড্‌ টেষ্টামেণ্টের উক্তির মধ্যে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানে যেমন বিবর্ত্তনের ক্রম আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিক্রম কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়া যায়। তিনি বলেন যে "দিবস" অর্থে একটা অনিশ্চিত সময় এবং "সৃষ্ট" শব্দে প্রবর্ত্তিত বুঝিতে হইবে। তারপর তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান ব্যাপার অর্থাৎ কিসের পর কি সৃষ্ট হইল, সেইগুলি বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন বিভাগের পরিমাণ দিয়া আলোচনা করেন নাই। তিনি বলেন, সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ের ৯ম ও ১০ম শ্লোকে জীবসৃষ্টির প্রাগবস্থার ভূখণ্ডের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সেইটীই প্রথম স্তর। তারপর, উদ্ভিদ জীবনের স্তর আসিল। এই স্তরে প্রাণী সৃষ্ট হয় নাই, এটী শাস্ত্রোক্ত ছয়দিবসের তৃতীয় দিবসের সৃষ্ট। তারপর জীব-সৃষ্টির স্তর; জীবের মধ্যে মৎস্য ও পক্ষীই প্রথমে সৃষ্ট হয়। ২০শ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থও তাই। তারপর, জীবের মধ্যে পশু ও সরীসৃপ দেখা দিল (২৪ ও ২৫ শ্লোক)। তারপর, মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন্ বলিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এই পর্য্যায় এরূপ-ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইহাকে প্রমাণিত সিদ্ধান্ত বা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলিলেও চলে। কিন্তু মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোনের সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া দেখি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিবর্ত্তনের স্তর সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টির সময়ের তুলনা করিয়া যদি দেখি, তবে বুঝিতে পারিব যে, মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোনের কথা ভ্রান্ত ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ।

প্রথমতঃ, শাস্ত্রে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা উভয়েরই উল্লেখ আছে, অথচ, তাঁহার ব্যাখ্যাত দিবসের সহিত তাহাদের প্রসঙ্গ নাই। তিনি বলেন, প্রাতঃ ও সন্ধ্যা বলিতে ইচ্ছামত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ কথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আমি বিবেচনা করি, 'জেনেসিস' নামক সৃষ্টিতত্ত্বের লেখক 'দিবস' শব্দের উপরোক্ত অর্থ কখনই বুঝিয়া ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, 'সৃষ্টি' শব্দে, লক্ষ লক্ষ ধার্ম্মিক ইহুদী ও খৃষ্টানগণ পঞ্চ সহস্র বৎসরের ও অধিককাল ঈশ্বরের একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বুঝিয়া আসিতেছেন কিন্তু উহাতে মিঃ গ্লাডষ্টোনের সময় হইতে অনন্তকালব্যাপী বিবর্ত্তন কি না এক জাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সূর্য্যের পূর্ব্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ উৎপত্তির একটা যুগ বহিয়া গিয়াছে, এরূপ ধারণা করা কি সমীচীন? সৃষ্টিতত্ত্বের মতে ৪র্থ দিবসে সূর্য্য সৃষ্ট হইয়াছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে মিঃ গ্লাড্-ষ্টোনের মত বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনীষীও এই অসম্ভব কথাটী ধরিতে পারেন নাই। সৃষ্টি-পর্য্যায়ের যে ব্যাখ্যাকে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অনুযায়ী বলিয়া বিবেচনা করেন, আমি তাহায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে চাহি না; ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাত-নামা বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান ও ন্যায়ানুসারে মিঃ গ্লাডষ্টোনের প্রত্যেক কথাটীর খণ্ডন করিয়াছেন। অধ্যাপক হক্স্লি বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাহার কথা অসিদ্ধ প্রমাণ করিয়াছেন। গ্লাড্ষ্টোনের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার অসারতা প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছেন:—"বলা বাহুল্য যে মিঃ গ্লাড্ষ্টোনের ইহা নিতান্তই ভুল ধারণা যে, তাঁহার সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যার সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য আছে। আমি এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত মনে করি যে, বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যতটা উন্নতি হইয়াছে তদনুসারে মিঃ গ্লাডষ্টোনের সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়িনী ব্যাখ্যার যে শুধু নিরাকরণই হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু যে ভাবটীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সে ভাবটীরও বিরোধী—(সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম প্রকৃতি) যাঁহারা এখনও জানিয়া রাখিয়াছেন যে 'দিবস' অর্থ 'যুগ' আমার ইচ্ছা তাঁহারা যেন অধ্যাপক হক্স্লির "সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম প্রকৃতি" এবং মিঃ গ্লাড্-ষ্টোন ও সৃষ্টিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এইরূপে, বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সৃষ্টি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। সামঞ্জস্য প্রমাণের প্রণালিটী পর্য্যন্ত নিরর্থক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আবার অন্য কেহ কেহ তাঁহাদের নিজের নিজের মত ধর্ম্ম গঠন করিয়া লইতেছেন। তাঁহারা বাইবেলের কোন কোন কথা গ্রহণ ও কোন কোন কথা বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা কোন কোন কোন কোন মহাত্মার কোন কোন কার্য্য স্ব স্ব খেয়াল অনুসারে বাছিয়া লইয়া সেইটীই তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন সেই-টীই তাঁহাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তি। একটী উদাহরণ দেখ:—যীশু বিনা ঔষধে অনেক পীড়া আরোগ্য করিতেন। কেহ কেহ ভাবেন এইটীই প্রকৃত ধর্ম্মলক্ষণ। অতএব যে ধর্ম্মে বিনা ঔষধে পীড়া আরোগ্য

ব্যবস্থা আছে, সেইটাই প্রকৃত ও বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। কিন্তু আমি এমন বিস্তর লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা আদৌ ধার্ম্মিক বা আধ্যাত্মিক নহেন অথচ বিনা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। যখন আমি ভারতে ছিলাম, তখন কলিকাতায় একজন মুসলমান ফকীর আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বিনা ঔষধে দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব ভাল হয় নাই; কেননা, আরোগ্য করিয়া তিনি পয়সা-কড়ি লইয়া ছিলেন না। ভারতে যাঁহারা ঐরূপ আরোগ্য করিতে পারেন, তাঁহারা অর্থাগমের জন্য তাঁহাদের শক্তি কখন নিয়োগ করেন না। সেদিন একজন বৈদ্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার খুব যশ ও প্রতিপত্তি। অকস্মাৎ তিনি জানিতে পারিলেন যে, মাত্র স্পর্শ করিয়াই পীড়া আরোগ্য করিবার শক্তি তাহার আছে। তখন হইতেই তিনি ঔষধ প্রয়োগ ত্যাগ করিলেন। এখন স্পর্শ করিয়াই তিনি পীড়া আরোগ্য করিয়া বেড়াইতেছেন। অতএব তোমরা জানিতে পারিলে যে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের নামটীও জ্ঞাত নহেন, যাঁহারা কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক নহেন, অথচ তাঁহারা পীড়া আরোগ্য করিতে সক্ষম। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই এই শক্তি অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় নিহিত আছে; যিনিই উহার অনুশীলন করেন, তাঁহারই ঐ শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই। ইহা আত্মার শক্তি। শুধু যীশুর অনুচর-বর্গেরই যে বিনা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করিবার শক্তি ছিল, তাহা নহে। যীশু জন্ম গ্রহণ করিবার শত শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে ও অন্যান্য দেশে উহা পরিজ্ঞাত ছিল। আজ পর্য্যন্তও নানা ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এমন বিস্তর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বিনা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। ঐ সকল ব্যক্তি কখন যীশুর নাম পর্য্যন্তও শুনেন নাই।

অধুনা চতুর্দ্দিকেই শত শত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখা দিতেছে। ইহাদের প্রত্যেকেই ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন; কিন্তু ইহারা ঐ সকল সিদ্ধান্তগুলি দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে জানেন না। কেহ কেহ এই সামঞ্জস্য কতক কতক করিতে পারিয়াছেন আবার কেহ কেহ বলেন যে ধর্ম্মের একটা বৈজ্ঞানিক ভূমি নির্দ্দেশ করা—ধর্ম্মকে শুধু বিজ্ঞানের উপর নহে, কিন্তু দর্শন, ন্যায় ও মনস্তত্ত্বের উপরেও দাঁড় করান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। ধর্ম্মটীকে এমন করিয়া তুলিতে হইবে যে, সমুদয় ব্যক্তির নিকটেই উহা বেশ রুচিকর হইয়া পড়িবে, সকলের ঈপ্সিত বস্তুই উহাতে থাকিবে, সকলের প্রশ্নেরই উত্তর উহাতে মিলিবে, অথচ জনসাধারণের চিরপ্রচলিত ধারণার বিপর্য্যয় ঘটিবে না এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরোধ সংঘটিত হইবে না। এই ব্যাপার-টীর সংঘটন করা বড় সহজ নহে।

যাঁহারা বিজ্ঞানের পাণ্ডা, তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্ম আমাদিগের মনের সংকীর্ণতা ঘটাইয়া

দেয়; কিম্বা যাহার প্রভাবে আমরা ভাবিতে শিক্ষা করি যে কেবল আমাদিগের ধর্ম্মই সত্য; কিম্বা যাহার প্ররোচনায় আমরা নিজের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকলের ধর্ম্মের দোষানুসন্ধান করিতে থাকি, সেরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এমন সময় আসিয়া পড়িয়াছে যখন এই সকল সংকীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায়ের অনুমোদিত প্রশস্ত ও যুক্তিযুক্ত ধারণা, হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। জন্ ফিস্‌ক্ বলেন:—"বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া আসিতেছিল, কোন কিছু ছিল না অকস্মাৎ সৃষ্ট হইয়া পড়িল; বিজ্ঞান এরূপ ব্যাপার স্বীকার করেন না।" অধ্যাপক হক্স্‌লি বলেন:—"বিজ্ঞানের বিরোধ ধর্ম্মের সঙ্গে নহে। পৌত্তলিকতা ও দর্শনের অপব্যবহারের সঙ্গেই উহার বিরোধ। কেন না উহাদের প্রভাবে ধর্ম্মের মহাক্ষতি হইয়া থাকে। প্রকৃত বিজ্ঞানে একটী মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে; ধর্ম্মের নামে যে একটী ভ্রমাত্মক বিজ্ঞানের বোঝা লোকের ঘাড়ে চাপান আছে, প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রভাবে উহা অপসারিত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন:—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সারভূত সত্য একই। ঐ সত্যে যাইয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান মিশিয়া যায়। ঐ দুইটী আপাততঃ বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহাদের একটা সামঞ্জস্য আছে। সেই সামঞ্জস্য অতীব হিতকর এবং একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে সে শ্রম ব্যর্থ হইবে না।"—(ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্)। সেই যে সার সত্য তাহা বিজ্ঞানের কোন শাখা বিশেষের আবিষ্কৃত সত্যাংশ নহে বা উহা কোন সম্প্রদায় বিশেষেরও নহে। উহা এমন একটী সত্য যেখানে বিজ্ঞানের সমুদয় শাখা ও দর্শনের সমন্বয় হইয়াছে—উহাই পৃথিবীস্থ সমুদয় ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমতের লক্ষ্যস্থল। বিজ্ঞানদৃপ্ত সত্য ও ধর্ম্মধৃত সত্য এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই; কেন না, সত্য জিনিসটী একই। ঐ একই সত্য লাভ করা বিজ্ঞান দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্ম সকলেরই উদ্দেশ্য। ঐ গুলির যে কোনটী দ্বারাই উহা লাভ করা যাইতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনদ।

---:0:---

মোক্ষধাম।

সেথা জড়, চেতনের নাহিক দ্বন্দ্ব,
নাহি দিবা, নাহি নিশি;
সেথা হাসেনা তপন, চন্দ্র, তারকা;
স্বতঃ পুলকিত দিশি।

সেথা সুখের সোহাগে দুঃখের ছায়া
জাগিয়া নাহিক রয়;
সেথা আশার তিয়াসে সংশয় শত
বহেনা বেদনা, ভয়।

সেথা বিমল মধুর হরষ, শান্তি
আপনি ফুটিয়া উঠে;
সেথা চির প্রণয়ের মিলন মন্ত্রে
নীরবে বিরহ টুটে।

সেথা আকুল বাসনা দহেনা চিত্ত,
রহেনা মোহের লেশ;
সেথা করমের পারে বিরাম নিত্য
সকল ভোগের শেষ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী

---:0:---

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ-পরমহংসদেব মহারাজ গত ১২ই অগ্রহায়ণ সশিষ্যে পরিভ্রমনে বহির্গত হইয়াছেন; ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য স্থান পর্য্যটনান্তে মাঘমাসে ৺কাশীধামে গমন করিবেন। তথা হইতে শিষ্য ও ভক্তগণ সঙ্গে আগামী হরিদ্বার-মহাকুম্ভে যোগদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

———:0:———

বার্ষিক-উৎসব—গত ২৬শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) সারস্বতমঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব যথারিতী সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূজা, হোম, কীর্ত্তন, আরতিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

———:0:———

হিন্দুসমাজের একটী সামযিক চিত্র—বর্ত্তমানে দেশের এমনই [illegible] অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমরা [illegible] শিক্ষায় এমনই মুগ্ধ হইয়াছি [illegible] যে আপনার স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছি—স্বধর্ম্মের অবমাননা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না—নিম্নের ঘটনাটী তাহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—ঢাকা—বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় টোল খুলিয়াছেন; কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও পাঠার্থী ছাত্রের অভাব ঘটিয়াছে। অন্নদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াই হিন্দু অধ্যাপকের চিরন্তন প্রথা-ছিল; কালমাহাত্ম্যে যদিও আমরা অধঃপতনের চরম সীমায় পহুঁছিয়াছি, তথাপি এখনও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এদেশের সেই চির প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য আমরা পয়সা খরচ করিয়া কাচ কিনিব, কিন্তু "সেধে দেওয়া" হীরকখণ্ডের দিকে চোখ তুলিয়াও চাহিব না;—ইহা অপেক্ষা আমাদের জাতীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

———:0:———

বৃন্দাবনে দেহত্যাগ—পাবনার সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী রায় বনমালী রায় বাহাদুর গত ২৩শে নবেম্বর ৺বৃন্দাবন ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একদিগে যেমন কার্য্যকুশল অন্যদিকে তেমনি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের গৃহদেবতার জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পাবনা কলেজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু স্কুলকলেজে, মঠমন্দিরে যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন—এবং বৈষ্ণবের বাঞ্ছিত স্থান ৺বৃন্দাবনধামেই তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

———:0:———

ও তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিজ্ঞান বলেন, জগতে সদ্বস্তু বলিতে একটীই আছে। উহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট হইতেছে। পদার্থবিজ্ঞানে প্রমাণ হইয়াছে যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির নিয়ম। বিবর্ত্তনবাদ, শক্তির বিকাশ-প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন শক্তির মধ্যে আপেক্ষিক ভাবের বিদ্যমানতা প্রভৃতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যত কিছু নৈসর্গিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা একই সনাতন শক্তির বিকাশ বই আর কিছুই নহে। ঐরূপে, মনোবিজ্ঞানে প্রমাণ হইয়াছে যে আমাদের আন্তর-প্রকৃতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাও ঐ একই সনাতনশক্তির স্ফুরণ মাত্র। বিজ্ঞান বলেন যে, আমরা প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সজীব বলিয়া বুঝি, তাহার মধ্যে একই প্রাণ-উপাদান বিদ্যমান আছে। অতি সূক্ষ্ম জীবাণু হইতে সর্ব্বোচ্চ মানব পর্য্যন্ত একই প্রাণ-উপাদান বিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট হইতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন :—"জড়, গতি, ও শক্তি এগুলি সদ্বস্তু নহে। উহারা সদ্বস্তুর বিভাব (Symbols) মাত্র।" তিনি আবার তাঁহার "মনস্তত্ত্বে" বলিয়াছেন :—"একই সদ্বস্তু প্রত্যক ভাবে (Subjectively) ও পরাক্‌ভাবে (objectively) ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। একই বস্তু স্থূল জগতে জড়রূপে ও সূক্ষ্ম জগতে মনঃরূপে ব্যক্ত হইতেছে। উহা স্থূল জগতে মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ, উত্তাপ ও গতি এবং সূক্ষ্ম জগতে বুদ্ধি, ধৃতি, উদ্বেগ, ইচ্ছা প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হইতেছে। সদ্বস্তুটী একই; কেবল অভিব্যক্ত মূর্ত্তিই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অতএব, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে এইটীই আভ্যন্তরীণ সত্য। এক

হইতেই বিবর্ত্তন-প্রথায় বহুর উদ্ভব হইয়াছে। একই—ভূমি; বহু—ঐ একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। ঐ এককে তুমি ঈশ্বর বলিতে পার, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যদি কোন ধর্ম্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐ একত্ব শিক্ষা দেন, তবেই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য হইতে পারে; অন্যথায় নহে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন এরূপ ধর্ম্ম আছে কি? পৃথিবীর ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমরা ঐ শিক্ষা পাইতে পারে কি? জেন্দ্‌অবেস্তা, বাইবেল্‌ কিম্বা কোরাণ পাঠ করিয়া আমরা ঐ শিক্ষা পাই না; কেননা উহারা দুইটী শক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করেন—একটী সৎ, অপরটী অসৎ। প্রথমোক্তটী যাবতীয় কল্যাণের ও শেষোক্তটী যাবতীয় অকল্যাণের সৃষ্টি-কারিণী; উহাদের মধ্যে নাকি নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছে। কিন্তু ভারতের পুরাকালীন ঋষিবৃন্দের গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা এমন অনেক স্থল দেখিতে পাই, যাহাতে বৈচিত্র্যান্তর্গত একত্ব অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের কোন খানি খৃষ্ট জন্মের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কোন খানি ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, কোন খানি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। আমি উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদের কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি:—"একই অগ্নি পৃথিবীতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আকার ও মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; তদ্রূপ, অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ব্যবহারিক জগতে অসংখ্য নামে ও মূর্ত্তিতে পরিব্যক্ত হইতেছেন।" "যেমন একই ব্যোম-প্রকম্পন ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকট হইতেছে, সেইরূপ একই সদ্বস্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বহুবিধ আকার ও উপাধিতে প্রকাশ পাইতেছেন।" "যেমন একই প্রজ্বলিত-অগ্নিকুণ্ড হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই সদ্বস্তু হইতে জীবন, মন, যাবতীয় ইন্দ্রিয়, উত্তাপ, ব্যোম এবং কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থাপন্ন যাবতীয় বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে।" বৈদিক ঋষিগণের প্রাচীন তথ্য গ্রন্থ হইতে এইরূপ বিস্তর বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত শিক্ষা আর উপরোক্ত মত কি এক নহে? পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ঐরূপ একটী কথাও কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি? কিন্তু উপরোদ্ধৃত কথাগুলির কেন্দ্রগত তাৎপর্য্যই—বৈচিত্র্যান্তর্গত একত্ব। ইহার কারণ কি? কারণ—ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাগণ অস্বাভাবিক কোন কিছু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শন, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভিনিবেশ সহকারে জড় বস্তুর আলোচনা দ্বারাই প্রকৃত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায় হইতে পৃথক করেন নাই। তাঁহারা যখনই কিছুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখনই ন্যায়ের পথ ধরিয়া তাহা করিয়াছেন। কোন একটী ব্যাখ্যা ন্যায়ানুসারিণী না হইলেই তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া আর একটী নূতন ব্যাখ্যার অবতারণা করিতেন। যদি সেটীও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইত, তবে তাঁহারা সেটীও ত্যাগ করিতেন। যুক্তি এবং ভূয়োদর্শনই তাঁহাদের মাপ-কাঠি ছিল। এই-জন্য, তাঁহারা সেই প্রাচীনকালেও আধুনিক

বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সত্য চিরস্থায়ী। তুমি উহা আবিষ্কার করিলে, কি আমি করিলাম, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল, ভারতীয় ঋষিগণ তাহাদিগের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা যে দর্শন ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন বৈচিত্র্যান্তর্গত একত্বই তাহাদের কেন্দ্রগত ভাব। কাজে-কাজেই বিজ্ঞানের সহিত উহার বেশ মিলন হইয়া যাইতেছে। এই সকল প্রাচীন ঋষিগণের দর্শনের নাম—বেদান্ত। ইহার কোন স্থানের অর্থবিস্তৃতি ঘটাইয়া বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহিত এক করিবার চেষ্টার প্রয়োজন হয় না; কেননা, উহা বিজ্ঞানের আদৌ বিরোধী নহে। যে সকল সত্য বিজ্ঞান প্রভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে সে সমুদয়ই ইহা স্বীকার করিয়াছে ও করিবে। ইহাতে সকল সত্যেরই স্থান সংকুলান হইবে; কেননা, ইহা অসীম। ইহা মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। মূল তত্ত্বই ইহার বিচার্য্য। বৈজ্ঞানিকগণ এই মূল তত্ত্বেরই বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহা মূলতত্ত্বনিচয় ও এক শ্রেণীভুক্তকরণ ব্যাপারই শিক্ষা দেয় মাত্র। আবার বিজ্ঞান যে সত্যকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহা বলে, সে সত্যকেও জানা যাইতে পারে। উহা (অর্থাৎ তথাকথিত দুর্জ্ঞেয় বস্তু) জ্ঞানাতীত; উহা আমাদিগের হৃদয়ের অত্যন্ত নিকটে। আমাদিগের মন, বুদ্ধি, শরীর ইন্দ্রিয় আমাদের যত নিকট, উহা তাহাদের অপেক্ষাও আমাদের অধিকতর নিকটে। আমাদিগের জীবাত্মা আমাদের যত নিকট, উহা তাঁহার চেয়েও আমাদের নিকট। কেননা উহার আমাদের যথার্থ প্রকৃতি। আমাদিগের যথার্থ প্রকৃতিই—সত্য; মিথ্যা নহে। প্রত্যেক জীবাত্মার অভ্যন্তরে ঐ যথার্থ প্রকৃতি প্রকট আছে। ঐ সত্যানু-সন্ধানে আমাদিগকে বিশ্বের বহির্দ্দেশে যাইতে হইবে না। যদি আমরা আপন আপন হৃদয়ের ভিতরে দৃষ্টিপাত করি, আমরা তথায় উহা দেখিতে পাইব। বেদান্ত স্বীকার করেন যে এই সত্য দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু স্বীকার করিবার ভঙ্গি একটু অন্যরূপ। বেদান্ত বলেন যে, উহা মনের নিকট দুর্জ্ঞেয় বটে, কিন্তু আত্মার নিকট নহে। আত্মা বলিতে এখানে কোন ছায়াময়ী মূর্ত্তি বা প্রেতযোনি বুঝিতে হইবে না; ইহার অর্থই—অবিনশ্বর সত্য আমাদিগের আভ্যন্তরীণ জ্যোতি, আমাদিগের চৈতন্যের মূল ভিত্তি। যাহাতে আমাদের বুদ্ধি, মন, জ্ঞান, দেহ এবং বিশ্বের যাবতীয় বাহ্যিক বস্তু আলোচিত হইয়া থাকে, উহাতে তাহাই বুঝিতে হইবে। বেদান্ত বিবর্ত্তন-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক হক্-স্‌লি এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন :—"ভারতে কয়েকটী দর্শন আছে; তাহাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে বিবর্ত্তনবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন :—"ভারতীয় ঋষিগণের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা পলের বহু পূর্ব্বেও বিবর্ত্তনবাদ পরিষ্কাররূপে জ্ঞাত ছিলেন।"

বেদান্তে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকভূমি পাওয়া

যায়; কেননা, উহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হইতে কারণ, বা কারণ হইতে কার্য্য এ উভয়বিধ পদ্ধতি অনুসারেই বেদান্ত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তির প্রাধান্যও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়ের নিয়ম-পালন ও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার এই দুইটী-তেই কোন একটী বিষয় বৈজ্ঞানিক হইয়া দাঁড়ায়। যদি আমরা দেখি যে, কোন বিষয়ে এই দুইটী সুন্দর রূপে পালিত হইয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই বিষয়টী বৈজ্ঞানিক। পৃথিবীতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম আছে। যদি আমরা ন্যায় ও বিজ্ঞানের নিয়ম নিচয় ঐ সকল ধর্ম্মে প্রযুক্ত করি, তবে উহাদের দশা কি হইয়া পড়ে? তাহা হইলে তাহারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমার ধর্ম্মই সত্য; কেন না উহা ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এইরূপ গোঁড়ামির সময় আর নাই, সে সময় চলিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, তথা-কথিত ঐতিহাসিক ঘটনার অধিকাংশই পৌরাণিক গল্প মাত্র। এবম্বিধ ভিত্তির উপর যে সমুদয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; সে আঘাত সামলাইবার আর যো নাই। সেই আঘাতে উহাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছে। তাই বলিয়াই যে ঐ সকল ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতে হইবে, এমত নহে। তাহা হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যাপার বাস্তবিকই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত। ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক মুল্য অতিশয় সংশয়মূলক। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উহাপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। ধর্ম্মের সেই দৃঢ় ভূমি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? কোন অবিশ্বাসী বা তথাকথিত ধর্ম্ম-বিরোধীর আক্রমণে ঐ ভূমি কম্পিত হয় না। ঐ দুরধিগম্য ভূমি খুঁজিয়া বাহির করা আমাদিগের সকলেরই উচিত। পৃথিবীতে এখন বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের প্রয়োজন। অন্ধবিশ্বাসের স্থানে এখন যুক্তির প্রাধান্য আবশ্যক হইয়াছে। যে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে এবং যাহাতে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়, পৃথিবীতে এক্ষণে সেই রূপ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, যে ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম, যাহাতে পৃথিবীস্থ সমুদয় ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে, এক্ষণে সেইরূপ ধর্ম্মের প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মের অনৈক্যবশতঃ কত বিবাদ, কত শত্রুতা, কত উৎপীড়ন, অত্যাচার যে হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা ইতিহাস পাঠেই অবগত হইতে পারি; এইরূপ অত্যাচার, উৎপীড়ন আমরা আর চাহি না। ধর্ম্ম সকল বাহ্যতঃ পৃথক পৃথক হইলেও আমা-দিগের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতিবন্ধন থাকা উচিত। যদিও আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতেছি, কিন্তু আমরা এক স্থানেই যাইতেছি। প্রত্যেকেই আপন আপন রুচি অনুসারে পথ বাছিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদিগের সকল পথই এক স্থানে মিলিত হইবে। আমাদিগের এ ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম, এ মত, ও মত অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। আমাদিগের এমন একটী ধর্ম্মের প্রয়োজন

যাহার কোন নামই নাই, যাহাতে সমুদয় ধর্ম্মেরই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সমুদয় ধর্ম্ম যাহার অন্তর্গত এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সহিত যাহার সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'আমার ধর্ম্মই ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। আবার অন্য কেহ বলিতে পারে যে, তাহার ধর্ম্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কাহার ধর্ম্ম ঐ রূপ' তাহা সকলেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করুন; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পারগ হইবেন, তাঁহারই জয়। "সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইবে; মিথ্যার হইবে না। সত্যের আরাধনা করিলে শাশ্বত সত্যের মন্দিরে পঁহুছান যায় এবং আমাদের বাসনাও পূর্ণ হইয়া থাকে।" অতএব, নীরবে সত্যের আরাধনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য; আমরা মিথ্যার অনুগমন করিব না; সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা নিরন্তর প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

:0:

প্রার্থনা।

প্রভো! নীরব মম বীণার তারে
তুলিয়া দেহ গো সুর।
দাও গো তারে তোমারি গানে
করিয়ে ভরপুর।
তন্ত্রী যদি যায় গো ছিঁড়ে,
বাঁধিয়া তারে দাও গো ফিরে,
করুণাকণা পাইলে বাজিবে সুমধুর!
গেয়েছি শুধু আশার গীতি,
তোমায় কাছে চাহিয়ে প্রীতি,
(যদি) পরাণে থাকে গরবকণা
আঘাতে কর গো চূর।
সখা হে! তব অতুল স্নেহে,
আলোক দিয়া আধার গেহে,
জীবন দেহ, এ শব দেহে,
জড়তা করি গো দূর।
নীরব মম বীণার তারে,
তুলিয়া দেহ গো সুর।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

:0:

হিন্দু পৌত্তলিক বা জড়োপাসক নহে।

বর্ত্তমান যুগে এক শ্রেণীর হিন্দু জাতীয় গৌরব উপলব্ধি করিবার উপযোগী শিক্ষা ও সংযম হারাইয়া আপনাদিগকে পৌত্তলিক জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করতঃ লজ্জিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও এই সকল কারণে হিন্দুধর্ম্মাশ্রিতজনগণকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতা শৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে,

কাজেই হিন্দু জড়োপাসক হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে; নতুবা যে সকল সম্প্রদায়ের অস্থি-মজ্জায় জড়ত্ব, তাহারাই হিন্দুকে জড়োপাসক বলে—যাহাদের ধর্ম্ম এখনও খঞ্জ বালকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রিত সংশয়ীজনগণের সন্দেহ অপনোদন করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আজ আমরা হিন্দুর সাধারণ উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হিন্দু ধর্ম্ম বেদমূলক। সেই বেদে অগ্নিপূজারূপ যজ্ঞকার্য্যাদি করিয়া অগ্নি, জল, মেঘ, আকাশ, বায়ু, দিক্ ও কাল প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধনের ব্যবস্থা আছে। তাই তাহারা মনে করে, এ সকল আমাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার; বিশেষতঃ চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির উপাসনা করিলে, জড়ের উপাসনা করা হয় না কি? অস্মদ্দেশের এই শ্রেণীর লোকগণ সুশিক্ষিত ও সজ্জন হইলেও তাহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের শাসনে স্থূলগঠিত জড় প্রাচীরের পরপারে যাইতে অনিচ্ছুক। তাহারা জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়াই, হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া থাকে। তাহারা জানেনা যে, হিন্দু চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা করিলেও উহার স্থূল বা জড়ভাগের আরাধনা করেন না। আর জড়ই বা কি? "বিস্তারঃ সর্ব্ব ভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ"—সমুদয়ই ঈশ্বর। কিন্তু তথাপি যাহা জড় ভাগ,—তাহার আরাধনা হিন্দু করেন না। হিন্দুগণ পার্থিব অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাঁহার পূজা করেন, তাহাতে হোম করেন, তাঁহার কাছে উন্নতির কামনা ও বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু বস্তুতঃই কি তাঁহারা কেবল সেই জড় অগ্নির আরাধনা করেন? তাহা নহে। আগুণের পার্থিব মূর্ত্তি যে জড়, তাহা দেখিবার ক্ষমতা অবশ্যই হিন্দুর ছিল বা আছে। অগ্নি আরাধনা দেখিয়াছ কি? প্রথমেই আগুণ জ্বলিয়া হোতা অগ্নিদেবকে আবাহন করেন,—

"ওঁ ইহেবায়মিতরো জাতবেদ দেবেভ্যো-হব্যা বহতু প্রজানন্।
ওঁ সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তঃ সর্ব্বতোহক্ষি শিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপা মহানগ্নিঃ প্রণীতং সর্ব্ব কর্ম্মঃসু॥"

তৎপরে ধ্যান * করিয়া পূজা করেন। ইহাতে পার্থিব অগ্নির যে রূপ, যে আকৃতি তাহার পূজা বা আরাধনা করা হইল কি? অগ্নি যে সত্তা লইয়া স্বীয়কার্য্য সংসাধন করিতেছেন,—অগ্নির যে অগ্নিত্ব, হিন্দু সেই সূক্ষ্ম চৈতন্যতত্ত্ব বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বেরই পূজা বা আরাধনা করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য জড় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

পরমেশ্বরের যে সর্ব্বব্যাপকতা, হিন্দুগণ তাহাকেই মহাকাশ শব্দে অভিহিত করিয়া করিয়া থাকেন। আকাশ অর্থে শূন্য,—যাহা বুঝিতে পারি না, তাহাই শূন্য। ঈশ্বরের

* অগ্নির ধ্যান যথা:—
ওঁ পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নি সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।

গুণ বুঝিতে পারি না, তাই সেই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব গুণ আকাশ বা শূন্য। আকাশ বা শব্দতন্মাত্র পুরুষেরই রূপ। যথা:—

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ

বেদান্ত দর্শন, ১।১।২২।

আকাশ সেই ব্রহ্মেরই লিঙ্গ স্বরূপ,—কিন্তু উহা ভূতাকাশ নহে। কারণ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে হয় না। শ্রুতিতে অসঙ্কুচিত সর্ব্ব শব্দ দ্বারা আকাশ সহিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতুস্বরূপে আকাশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকাশপদে ভূতাকাশকে বুঝাইলে আকাশের কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। আর আকাশপদে ব্রহ্মবোধ করাইলে কোন রূপ অসঙ্গতি হয় না, শক্তিমদ্ ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ শব্দ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও বলবতী-শ্রৌতি-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মকেই বোধ করাই-তেছে। অর্থাৎ আকাশেরও যে আকাশ,—তাহার যে প্রাণ বা চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম। হিন্দু সেই আকাশতত্ত্বকেই আরাধনা করিয়া থাকেন,—জড় আকাশের পূজা করেন না।

আকাশ হইতে বায়ু; কিন্তু বায়ু; যে আকাশে সৃজিত তাহা নহে। বায়ুও সেই অব্যক্ত সত্তায় লীন ছিল, আকাশের সঙ্গে মিশিয়া বাহিরে আসিয়া তাহা হইতে আবার ব্যক্ত হইয়াছে, লবণ যেমন পার্থিব পদার্থ,—কিন্তু জলের বা অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ আকাশ হইতে বায়ুর ব্যক্ত ভাব। যে স্থলে কার্য্য আছে, সেই স্থলেই গতি (motion) আছে। কেন না কার্য্যের শব্দ হেতু কম্পন উত্থিত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। সেই কম্পনের প্রতি-রূপকেই গতি বলা হইয়া থাকে। গতির দ্বারাই স্পর্শ জ্ঞান হয়,—বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটী সত্তাই আছে। বায়ু জগত্রয়ের প্রাণ-স্বরূপ।

বায়ু বৈ গৌতম সূত্রেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দব্ধানি ভবন্তি।

শ্রুতি।

মণিগণ যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, ভূত সমুদয় সেইরূপ বায়ু সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। বায়ু কাঁপিয়া কাঁপিয়া জগতের আধার হইয়া-ছেন। জগতের সকলই কম্পনে অবস্থিত। কম্পনের দ্বারাই আমাদের চিন্তা—আমাদের আবেদন-নিবেদন—আমাদের কামনা-প্রার্থনা সর্ব্বত্র চলিয়া যায়; জগৎ কম্পনেই অবস্থিত। কাজেই কম্পনের দেবতা বায়ু বিশ্বের প্রাণ। কিন্তু স্থূল বায়ু নহে,—বায়ুর বায়ুতত্ত্ব তাহাই কম্পন,—সেই কম্পনই বিশ্বপ্রাণ। প্রাণ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই তাহাদের লয়; প্রাণ বহির্ব্বায়ু নহে, সর্ব্বেশ্বর। সুতরাং জড় বায়ু হিন্দুর উপাস্য নহে। প্রভঞ্জনেরও যে প্রাণ,—সেই বিশ্ব-প্রাণই হিন্দুর উপাস্য।

বায়ু হইতে অগ্নির বিকাশ-বিসৃষ্টি। বায়ু হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি, তাহা পশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানেরও মত। তবে হিন্দুর মত একটু স্বতন্ত্র,—স্বতন্ত্র এইজন্য যে, হিন্দু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজ্যের সন্ধানে কৃতকার্য্য। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি বটে, কিন্তু বায়ুই অগ্নির জনক নহে—অগ্নি বায়ুর বিকাশ বা মূর্ত্তি। অগ্নি যে ছিল না, তাহা নহে। অগ্নিতত্ত্ব ব্রহ্মেই অব্যক্তভাবে বিলীন ছিল,

বায়ুর স্কন্ধে চাপিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির এইরূপই ক্রমবিবর্ত্তন। অগ্নি তেজ, এই তেজেই জগৎ পালিত, রক্ষিত ও সংহৃত। অগ্নিই সৃষ্টিব্যাপারের অমূর্ত্তির মূর্ত্তিকারক। তেজোরূপী অগ্নিই ত্রিলোক ধারণ করিয়াছেন। অগ্নিরই মূর্ত্তি আমাদের পৃথিবী—অগ্নিই ভূর্লোকের দেবতা। অগ্নির দ্বারা ভূ, ভুঁব, সঃ এই ত্রিলোক সূক্ষ্মপদার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম। জঠরাগ্নিতে আমরা ভুক্ত দ্রব্য হজম করি। তেজেই আশোষণ করি,—ভুবর্লোকবাসীগণও অগ্নির দ্বারা ভোজন করেন, স্বর্গলোকবাসীগণও তাহাই। অগ্নি ব্যতীত কাহারই বর্দ্ধন হইতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যেও তেজোরূপী অগ্নি,—সংহার কার্য্যেও অগ্নি। কিন্তু সেই অগ্নি কি যাহা আমাদের সম্মুখে জলিয়া জলিয়া নির্ব্বাণ পায়, তাহাই? না তাহা নহে। অগ্নির যে প্রাণতত্ত্ব, অগ্নির যে অগ্নিতত্ত্ব, তাহাই। বেদান্ত বলেন,—

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ বেদান্ত-দর্শন, ১।১।২৪

ঐ জ্যোতিঃ শব্দে প্রাকৃত তেজ পদার্থ, কি ব্রহ্ম? সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী তেজঃ অথবা অগ্নি ইহারাই কি জীবের ধ্যেয় তাহা নহে। বেদান্ত বলিতেছেন,—"জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে। কারণ, সমস্ত জগৎ-পুরুষের একটী অংশ বিশেষ। স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঐ পুরুষে ত্রিপদে অনন্ত অমৃত। শ্রুতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃ পদার্থেই ব্রহ্মাংশভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরুষই নিখিল তেজের আধার স্বরূপ হইতেছেন।

অগ্নিতত্ত্ব ঈশ্বরের সত্তা, অতএব অগ্নি-পূজক হিন্দু জড়োপাসক নহে, ব্রহ্মোপা-সক।

অগ্নি হইতে জলের সৃষ্টি হয়, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু ইহাতে জলের সৃষ্টি হয় না,—অগ্নিতে জল অধ্যাসিত ছিল,—অগ্নি তাহার অবজ্ঞাপক মাত্র। হিন্দু স্থল বা জলের আরাধনা করেন না,—জলের যাহা সত্তা, জলের যাহা প্রাণ, সেই রস-তত্ত্বই কারণজল। কারণজলই নারায়ণ। তাই হিন্দু জানে, "আপোনারায়ণঃ"। জল-তত্ত্বে সৃষ্টির সত্তা; কেননা, রসতত্ত্বে উদয় না হইলে সংযোগ সাধিত হয় না। অন্বাদি আকর্ষণে পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগে এক মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়। রসতত্ত্বেই ভৌতিক স্থিতি,—রসতত্ত্বেই সংহার। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা জলের জড়মূর্ত্তি নহে,—রস-তত্ত্বের স্বরূপ যে ঐশ পদার্থ তাহাই বরুণ দেবরূপে হিন্দুর নিকট পূজিত হইয়া থাকেন।

জলের আণুবিক আকুঞ্চনে আভ্যন্তর বিবর্ত্তন ঘটিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই বিবর্ত্তনে বহুর সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবানের "বহু হইব" এই বাসনার শেষ উৎকর্ষ বা সীমা এই পৃথিবী। কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীকে হিন্দু আরাধনা করে না। পৃথ্বী-তত্ত্ব,—যাহা লইয়া জগৎ ভাব, সেই ঐশসত্তাকেই বাস্তুদেবরূপে হিন্দু আরাধনা করিয়া থাকেন।

বোধ হয়, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, হিন্দু জড় চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণের আরাধনা করেন না। যে ফুলের গন্ধোপাদান বুঝে না—যে ফুলের সৌন্দর্য্য-শোভা দর্শনে অক্ষম, সে অবশ্যই বুঝিতে পারে না, কেন মানুষ জড় পদার্থের অত যত্ন করে। তাহা হইলে প্রমাণিত হইল হিন্দুগণ, জড়ের উপাসনা করেন না,—জড়ের

যাহা প্রাণ বা সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব অথবা অব্যক্ত বীজ, হিন্দুগণ তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা সম্বন্ধেও জড়োপাসনা বা পৌত্তলিকতার ধুয়া ধরিয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন বা বলিতেছেন। তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু যে আধ্যাত্মিক সাধনাবলে "ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা নহে,—উহা প্রতীকোপাসনা। ভারতের সুবর্ণযুগে যোগবলশালী আর্য্যঋষিগণ যোগবলে—সূক্ষ্মান্তর দৃষ্টিতে যে সকল আধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, প্রতিমাগুলি তাহারই স্থূলরূপ। হিন্দু জানেন তাঁহারা খড়, দড়ি, মাটি রং-রাংতার পূজা করেন না, হিন্দু-উপাসক মৃন্ময়ী বা দারুময়ী অথবা শিলাময়ী মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত দেবত্বের পূজা করেন। সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠায় মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ উড়িয়া যায়, তাহাতে জ্ঞানের সূক্ষ্মরূপের আবির্ভাব হয়। মনে যদি তাঁহাকে স্থাপনা করিয়া পূজা করা যায়, তবে অন্য বস্তুতে অর্থাৎ ঘটে বা পটে আরোপিত না হইবে কেন? যাঁহারা প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে বিসর্জ্জন ব্যাপার মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন। বিসর্জ্জন ব্যাপারেই সপ্রমাণিত হইতেছে, হিন্দুগণ প্রতিমা পূজা করেন না। বরং সভ্য সমাজের ব্যক্তিগণ আত্মমূর্ত্তি ও চিত্র গড়িয়া সর্ব্বদাই আপনাকে পূজা করেন। বড় বড় লোককে পূজা করিবার জন্য তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম্মে এরূপ স্থূল পৌত্তলিকতা নাই। তবে এক্ষণে তাঁহাদের দেখাদেখি অনেক ইংরাজীকৃতবিদ্য হিন্দু এইরূপ আত্মপূজা করিতে শিখিতেছেন।

এক্ষণে আর একটী কথা উঠিতে পারে যে, বহুরূপে—বহু আকারে—বহু জড়ে হিন্দুগণ বহু দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। সুতরাং একটী জনের প্রাণ, বহুজনে আরাধনা করিলে, আরাধনার পূর্ণতা হইতে পারে কি না, এরূপ সন্দেহ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি যে, ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু বল বা মিশ্র ভূতোৎপন্ন অন্য শক্তিই বল,—ফল, এই পরিদৃশ্যমান জগত্রয়ে চেতন, প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে,—সে সমুদয়ই ঈশ্বর। অনন্ত পদার্থের ভিতর সেই একের সত্তা-সম্ভাবিত; সকলই ব্রহ্মের বিকাশ বা ঈশ্বরের বিরাট দেহ। যথাঃ—

ঘৃতাৎপরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং; জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং, জ্ঞাত্বাদেবংমুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।।
শ্রুতি।

"যেমন ঘৃতের অন্তরেও তেজবান্ মণ্ড বিস্তৃতভাবে ও সূক্ষ্মরূপে থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতে অন্তরে অতি সূক্ষ্ম ও গোপনভাবে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় ও সর্ব্বতোব্যাপী সাক্ষী স্বরূপে জানিলে, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।"

অতএব হিন্দু বহুর ভিতরে এক ঈশ্বর

সত্তারই আরাধনা করেন; তবে বলিতে পার,—সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা, পাতা, সংহর্ত্তা ভগবান্‌কে উপাসনা করিলেই হইতে পারে, তাঁহার বিক্ষিপ্ত শক্তি সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরাধনা করা কেন? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ অনন্ত—মানুষ সান্ত। সান্ত হইয়া মানুষ অনন্তের ধারণা করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি সমুদয়ের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, সেই চরমোৎকর্ষ পুরুষসত্তা বুঝিতে পারিব কেন? মানবের বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে যত প্রকার শক্তি ও ভাব আছে,—তাহা দেবতারই সূক্ষ্মশক্তি, সেই দেবশক্তি সকলের পূর্ণ চৈতন্য সাধন করিতে না পারিলে, পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। দেবশক্তি জাগ্রত করিবার যে সাধনা, তাহাই দেবতার আরাধনা। মনেকর, কর্ণ শব্দেন্দ্রিয়'—শব্দ হয় ব্যোম হইতে, কিন্তু ব্যোমের যে প্রাণ বা সূক্ষ্ম শক্তি অথবা ব্যোমতত্ব,—সেই ব্যোমতত্বের আরাধনা করিয়া ঐ তত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এইরূপ সমস্ত তত্ব সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। আরাধনাকে শক্তির উৎকর্ষ সাধন বলা যাইতে পারে। হিন্দু জানেন, এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ জড়, কিন্তু জড়েও চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান,—জড়ও ভগবানের বিভূতি। ভগবানই সমুদয় জড়ের অন্তরে অবস্থিত আছেন। তবে একটা একটা করিয়া চৌষট্টীটা পয়সা একত্র করিয়া যেমন একটী টাকা বাঁধা যায়, তদ্রূপ সমস্ত শক্তি, সমস্ত গুণ, এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়; সুতরাং হিন্দু জড়োপাসনা করে না,—জড়ের প্রাণাত্মক পরম চৈতন্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে যে যে জড়ে তাঁহার যে শক্তির আধিক্য,—হিন্দু তাহাতেই তাঁহাকে সেই শক্তিধররূপে পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে হিন্দুকে বহুদেবতার উপাসক বলিতে পার না। এক ঈশ্বর গুণ বা কর্ম্মভেদ জন্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতিবৃহৎ প্রভৃতি বহুশক্তিসমন্বিত হইয়া বহুদেবতায় অবস্থিত রহিয়াছেন, প্রয়োজন-বোধে তাঁহার সেই সকল অদৃষ্ট শক্তির আরাধনা করিতে হয়; কিন্তু আরাধনা তাঁহারই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

> যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
> অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"হে কৌন্তেয়! যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।"

ভগবান্ সর্ব্ব ভূতপতি। সকল ভূতেই তাঁহার অধিষ্ঠান,—যে, যে প্রকারে যাঁহারই আরাধনা করুক, অবিধিপূর্ব্বক তাহা তাঁহারই আরাধনা হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা যাহা কিছু বল, সমস্তই তিনি। অতএব হিন্দু বহু দেবতার উপাসক নহেন, অধিকারী-ভেদে এক ঈশ্বরেরই আরাধনার প্রকার ভেদ মাত্র।

হিন্দু ধর্ম্মের এই সকল মহানতত্ত্ব না জানিয়া, হিন্দুকে পৌত্তলিক, জড়োপাসক বা বহু দেবতার উপাসক বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ

বিদ্রূপ করেন এবং নিজের একেশ্বর-বাদের গৌরব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের সমস্ত সাধনাপথ, একমাত্র অদ্বৈতব্রহ্মের সাধনা। হিন্দু বিশ্বপূজা করিয়া বিশ্বব্যাপী ভগবানেরই পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ জানেন—এই জগৎ চরাচর সমস্তই ব্রহ্ম! যথা:—

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপোহ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ।
আত্মজ্ঞান নির্ণয়।

"যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তু সমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হই-তেছে' তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্ব্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ পাইতে-ছেন। "যোগাভ্যাসে যাঁহার চিত্ত বশীভূত ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখেন। হিন্দুর ঈশ্বর ছাড়া সংসার নাই,—সংসার ছাড়া ঈশ্বর নাই, তাই সন্ন্যাসীও সংসারী।

অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঈশ্বর হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে বিভিন্ন—এক স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহারা মুখে ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলেন মাত্র, কিন্তু কেবল হিন্দু তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপীরূপে সর্ব্বত্র দেখেন—শালগ্রাম শীলায় দেখেন—চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, নক্ষত্রে, গগনে, মেঘে, সাগরে, নদীতে, গঙ্গা-গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে, স্থলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, বন-স্পতি অশ্বত্থে ও বটে,—সর্ব্বঘটেই বিশ্বব্যাপী-রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। কেহই জড়ের পূজা করেন না, সকলেই জড়ান্তর্গত-শক্তি-নিহিত-অভিন্ন পুরুষের পূজা করেন। সর্ব্বঘটে তিনিই বর্ত্তমান বলিয়া হিন্দুর পূজা প্রধানতঃ ঘটে ও পটে। মূর্ত্তি না গড়িয়াও হিন্দু সেই পরম পুরুষকে পূজা করেন। ধানেচালে তাঁহার লক্ষ্মী পূজা;—সেখানেও আগে অনন্তের পূজা, তবে দেবী পূজা। হিন্দুর সমস্ত দেবদেবী যুগলরূপধারী। সুতরাং এই দেবদেবী পূজায় অদ্বয় ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। হিন্দু দেখেন, ব্রহ্মেরই অনন্তরূপের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি তাঁহার তেত্রিশ কোটী দেবতা—দ্বৈত জগতের মধ্যে সেই অদ্বৈতের আভাস। পরব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ প্রকৃতি অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থূলরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড। তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ প্রকৃতি শক্তিমাত্র, যে শক্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি বিশ্ব লালন-পালন ও শাসন করিতেছেন। সেই লালন-পালনকারিণী শক্তিতে তিনি ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের কোন কর্ম্ম না থাকিলেও তিনি সেই প্রকৃতি-শক্তিতে শক্তিমান্,—সেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিধাতা, ও নিয়ন্তা—সমস্তই। হিন্দু উপাসনার্থে শক্তি ও শক্তিমান্কে মৃগমদ ও তাহার গন্ধের ন্যায় অভেদ কল্পনা করেন। জীব যোগবলে ও সাধনবলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করেন মাত্র, তখনও গুণভাব বর্ত্তমান থাকে। শেষে নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধন দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মভাবে উপনীত হয়। হিন্দুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; এজন্য সর্ব্ব বিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরো-

পাসনা করেন। সমুদয় বিশ্বকে লইয়া এমন ঈশ্বরোপাসনা বুঝি আর কোন ধর্ম্মে নাই। সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জসীভূত সংযমে ও তৃপ্তিতে মানবের ঈশ্বরোপাসনা। তাই হিন্দু সমাজ-ক্ষেত্রে সংসার-ধর্ম্ম-সাধনার সহিত ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে হিন্দু সর্ব্ববিধ সাংসারিক ও বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রবৃদ্ধি সাধন করাইয়া হিন্দুকে ধর্ম্মপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়া রাখা হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পবিত্র পুণ্যপথে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে পরম তত্ত্ব-জ্ঞানে উপনীত হয়েন; সেই তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি সাধিত হয়। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়—ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। এইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতিপথই আত্মার গতি—অনন্ত সাগরে গতি। তাই হিন্দু ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—“একমেবাদ্বিতীয়ং।”

তবে কেন বল,—হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জড়োপাসক, হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতার উপাসক? হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি দেখিবে, হিন্দুধর্ম্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ,—হিন্দুধর্ম্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। এমন উদার বিশ্বব্যাপক সর্ব্বভৌমধর্ম্ম জগতে আর নাই। ভাই! তোমরা সেদিনের সভ্য,—এখনও জড়ের সাধনা করিতেছ, হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম জানিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই বলি,—হিন্দুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা কর, হিন্দু শাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর, হিন্দুধর্ম্মের সামান্য জনগণের আচরিত ধর্ম্ম দেখিয়া অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় কর্ণে বা পদে হাত দিয়া হস্তীকে কুলা বা স্তম্ভবৎ নির্ণয় করিয়া আর অবজ্ঞাত হইও না। অধ্যাত্ম-জ্ঞানে পৌঁছিলে অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তখনই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া মানব জীবন কৃতার্থ করিতে সক্ষম হইবে এবং গললগ্নী কৃতবাসে হিন্দু-শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

শ্মশান।

(১)

মরণের পরপারে কে তুমি মহান্।
বিশাল উরস তব করিয়ে বিস্তার,
দাড়ায়েছ স্মিতমুখে তুলে নিতে বুকে,
ভব কারাগার মুক্ত তাপিত যে জন॥

(২)

কামনা বাসনা তার না মিটিতে হায়,
ত্রিতাপ জ্বালায় পুড়ে হয়ে ছারখার,
ফিরে আসে ক্ষুণ্নমনে লভিতে আরাম,
শান্তির আগার জেনে তোমার হিয়ায়॥

(৩)

লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়ে ভবের বাজারে,
হতাদর হতমান হয়ে পদে পদে,
অসহ্য জীবনভার বহিতে না পারি,
ছুটে আসে দুঃখহারী জানিয়ে তোমারে॥

(৪)

উচ্চ নীচ তব কাছে না আছে গণন,
তোমার তুলনা দিতে কিছু নাই ভবে,
তুমি যে মহান তার দেও পরিচয়,
সবারে সমান ভাবে করিয়ে গ্রহণ ॥

(৫)

চিনেছি তোমায় দেব, চিনেছি তোমারে,
অগতির গতি তুমি অনাথের নাথ,
মুছাইতে অভাগার তপ্ত অশ্রুজল,
তুমিই কেবল মাত্র এ ভব মাঝারে ॥

(৬)

সুন্দর কুরূপ বলে না আছে বিচার,
যুবক, বালক, বৃদ্ধ, নর কিম্বা নারী,
রাজা, প্রজা তব কাছে সকলি সমান,
দিয়েছ সবারে তুমি সম অধিকার ॥

(৭)

জল আর তৈলে দেখ না হয় সংহতি,
পণ্ডিত মূরখে কভু মিশে না কখন,
উচ্চে নাহি মিশে কভু নীচ জন সনে,
সমানে সমান মিশে জগতের রীতি ॥

(৮)

সমদর্শী মহাপ্রাণ বুঝিয়ে তোমারে,
মহতের সনে মহা মিলনের আশে,
সুরপুরী পরিহরি দেব শূলপাণি
করেছে আবাস তব হৃদয় মাঝারে ॥

দীন—স্বরূপানন্দ।

———:0:———

আত্মচিন্তা।

এ দৃশ্যমান সংসার কা'র ? ইহার কর্ত্তা কে ? কার সংসারে কোথা হইতে আসিয়া ক' দিনের জন্য খাটিয়া যাইতেছি ? কার আশা-কুহেলি আবরিত চিত্ত লইয়া মন্ত্র-মুগ্ধবৎ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি ? এ সকল ত দু'দিনের বই নয় ? ইহাতে তবে এত আসক্তি কেন ? আমি কি চাই ? কি আশায় কিসের পশ্চাতে হাহাকার করিয়া ছুটিতেছি ? যাহা আমার সঙ্গে এ সংসারে আইসে নাই, এবং যখন ছাড়িয়া যাইব, সঙ্গে যাইবে, না, তাহা কি আমার প্রাণের নিত্য, অতৃপ্ত, উৎকট, শতমুখী আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারিবে ? যাহা আমার, তাহা আমার সহিতই থাকিবে ; তাহা জীবনে-মরণে, জনমে জনমে আমারি আছে, আমারি থাকিবেও। সেই বস্তু কি ? আমিই বা কা'র ? কোথা' হইতে আসিয়া কা'র তানে তান মিশাইয়া, কোন অজানা রাজ্যের রাগিণী অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি ? আর, অনন্ত কাম-কামনা-বিদগ্ধ-চিত্ত লইয়া কোন অজ্ঞাত প্রদেশে প্রয়াণ করিতে প্রস্তুত হইতেছি; আমার আত্মীয়, বন্ধুগণ ভ্রাতা-ভগিনিগণ, স্নেহ-ময়ী জননী—যার পীযূষ-সিঞ্চিত-অঞ্চল-আড়াল আশ্রয় ভিন্ন আমার এক মুহূর্ত্তও উপায় ছিল না—কোথায় গেল ? সে মনোহর অট্টালিকা সুশোভন উদ্যান, সে অতিথি-শালা, দেব-মন্দির

কোথায় গেল ? কে বলিতে পারে কোথায় গেল ? কে বলিতে পারে তা'রা কেন গেল ? এই গৃহের অধিবাসীগণ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত-চিত্ত উদ্বেলিত-আশা-তাড়না-বিক্ষুব্ধ হইয়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া অজর-অমরবৎ কত বীরদর্পে ভূকম্পিত করিল; তা'রা কোথায় গেল ? সুধু আমি এত দেখিয়াও কোন্ আশায়, কার মায়ায় এখনও এই মহা-শ্মশানে বসিয়া রহিলাম ? আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণও কি আমারি মত "আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার ধন, আমার মান" বলিয়া চিরদিনের জন্য এ সংসার আঁকড়াইয়া ধরিয়া চিরদিন থাকিতে বৃথা চেষ্টা করে নাই ? তাহাদের সে আশা-কুহেলিকাও ত আমারি মত তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিল। কিন্তু কোন অজানা শক্তি প্রভাবে এত সাধের ধন-জন-যৌবন, কাম-কামনা-বিষয়, স্ত্রী-পুত্র পরিবার, পরিত্যাগ করিয়া সুধু প্রাণ-ভরা একপ্রাণ হাহাকার লইয়া দৃশ্যমান দেশ ছাড়িয়া কোন অজ্ঞাত প্রদেশে প্রয়ান করিল ? এ সংসারে সকলেই ছাড়িয়া গেল—কেউ রোগে, কেউ শোকে, কেউ জরায়, বার্দ্ধক্যে কেউ বা অকালে উদ্বন্ধনে, ক্রমে ক্রমে ইহ-সংসারের হাহাকার ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। সবাই চলিয়া গেল, রইলাম সুধু আমি, প্রাণ-ভরা হা হুতাশ আর বুক ভরা বেদনা লইয়া তীব্র, যন্ত্রাণময়ী স্মৃতির সাহায্যে সেই বেদনার আগুণ জ্বালাইয়া ! ভবনদীর কূলে একাকী বসিয়া কত ঢেউ উঠ্ছে, আর পরছে, তাই দেখিতেছি। কবে সেদিন আসিবে, যেদিন আমিও এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। ঐ পথের ধূলিকণার সহিত আমার এত সাধের, এত আদরের দুগ্ধফেণ-নিভশয্যাসেবিত, দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-ক্ষীর-সর আদি পুষ্ট, আতরগোলাপ-আদি সুগন্ধিতে আমোদিত দেহ খানি, অণু পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া মিশিয়া যাইবে। আসিলাম, চলিয়া গেলাম। কি করিলাম, কেনই বা আসিলাম, আর কেনই বা গেলাম, একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবারও অবসর পাইলাম না।

কিন্তু এই জীবনব্যাপী হাহাকারের মধ্যে কাম-কামনা-কাঞ্চন-সেবাপরায়ণ বিষয়-বিষ-রস-আস্বাদ-তৃপ্ত প্রাণে মাঝে মাঝে কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব সুখের পরমানন্দের রেখা জাগিয়া উঠিত। তখন এই আকুল প্রাণে কি যেন অবর্ণনীয় শান্তির ছায়া পড়িত। সে সুশীতল ছায়ার বিশ্রাম করিয়া প্রাণ মন কিছুক্ষণের জন্য শীতল হইত। সুধু একমাত্র এই সুখের আশাটুকু বুকে করিয়া এখনও বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইতেছি। সে সুখে, সে সুখস্বপ্নে কা'র যেন স্নেহময়ী ছায়ার আবির্ভাব বুঝিতাম; কিন্তু বিষয়-বাসনা-পুষ্ট মনে সেকথা, সেভাব স্থান পাইত না। আজ আবার দেখিতেছি, এই পর্ণ-কুটীর প্রান্তে, যেস্থানে পূর্ব্বে জনকোলাহল মুখরিত অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল—বসিয়া আজ আবার দেখিতেছি, আমার প্রাণে কোন অজানা তন্ত্রী বাজিয়া উঠিতেছে—সে সুর যেন চির পরিচিত, কিন্তু বহুদিন উপেক্ষিত। আজ আমার এই জীবনসন্ধ্যায় আবার কে যেন মধুর তানে তান লয় করিয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছে, আমার আনন্দাপ্লুত দেহযষ্ঠি শিথিল হইতেছে ! শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে ! কা'র

লাগি যেন প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিতেছে! তাই ত! এত দিন কোন প্রহেলিকায় মুগ্ধ হইয়া ছিলাম? কা'র হাতের পুতুল হইয়া খেলা করিতেছিলাম? কে সে সূত্রধর? যা'র সূত্রস্পন্দনে আমার প্রাণসূত্র স্পন্দিত হয়? কা'র আনন্দপ্রবাহ আমার প্রাণে প্রাণ স্পর্শ করিয়া আমাকে মাতাইয়া দিয়া চলিয়া যায়? কৈ, তা'র খোঁজ ত করিলাম না? তবে আমাতে আর পুতুলবাজীর পুতুলে প্রভেদ কি? ঐ যে আবার সেই আনন্দপ্রবাহ ছুটে আসছে, আমি যে ভেসে যাই, আর ত চিন্তা করতে পারি না। ক্রমে আমার চিন্তা শক্তির লোপ হইল, বাহ্যজ্ঞান চলিয়া গেল, বহিরিন্দ্রিয়গুলি একেবারে তা'দের কাজে জবাব দিল। আমি সেই পর্ণ কুটীর-তলে আপনা হারাইয়া গেলাম। কতক্ষণ তদবস্থায় ছিলাম, মনে নাই; কিন্তু যখন আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, আমি অন্তরেন্দ্রিয়যোগে স্নেহময়ী জননীর করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। সে নয়নকোণে কত স্নেহ! সে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে কত মধু! এখনও কর্ণে সেই মধুমাখান স্বর ধ্বনিত হইতেছে। সে ভুবনমনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে আত্মহারা হইয়া 'মা-মা' বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। আমার স্নেহময়ী জননী নয়নভরা করুণা লইয়া আমার পানে তাকাইয়া আছেন। সে চাহনিতে কত স্নেহ, কত করুণা! প্রতি মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মর্ম্মস্থল ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। মা! আমার সর্ব্বসন্তাপনাশিনী মা, তুমি আমার সুখে দুঃখে সুধু করুণ চাহনিতে আমাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছ; আমার দুঃখে সান্ত্বনা, পিপাসায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, ক্লান্তিতে শ্রান্তিদান করিয়া সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিয়াছ; তুমি আমার সংসারযাতনাপ্রপীড়িত-বিষয়-বাসনা-বিদগ্ধ প্রাণে শান্তির শীতল বারি কত বর্ষণ করিয়াছ; তোমার অযাচিত করুণা-ভিসিঞ্চনে আমার শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে। মা, তোমার স্নেহ চাহনিতে আমার প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। কৈ, মা, এ সুদীর্ঘ কাল তোমার করুণ নয়নের স্নেহ চাহনি ত অমন ক'রে আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তুমি নীরবে সদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিয়া আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া আসিতেছ; তোমার সে অযাচিত করুণা-প্রবাহে ত একদিনও স্নান করি নাই। তবু, তবু তুমি, অমন ক'রে আমার মুখ-পানে চেয়ে থাক কেন? কেন তুমি আমার তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, দুর্ব্বলতায় বল, নিরুদ্যমে উদ্যম, দুঃখে আনন্দ, হতাশে বহু আশা আনিয়া দাও? তোমার এ কি খেলা লীলাময়ী? কেন তুমি মা হয়ে গর্ভে ধারণ করে, শৈশবে স্তন্যদুগ্ধ-পানে পুষ্ট করে, বাল্যে খেলার সঙ্গিনী হয়ে, আর যৌবনে মোহিনী সেজে আমার মন ভুলাইয়াছ, আবার কন্যা সেজে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডেকে আমার প্রাণমন মাতায়েছ? আবার এক্ষণ মাতৃরূপে করুণাময়ী হ'য়ে আবির্ভূত হ'য়েছ! মা, কেন তুমি আমার এই সংসার-দাব-দগ্ধ-প্রাণে আশার শান্তি-হিল্লোল প্রবাহিত করিয়া দিতেছ? মা, বল একবার কবে এ সংসারের জালা যন্ত্রণা ছাড়িয়া তোমার রাজীব চরণ-

ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিব ? এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অবশ দেহে ঘুমের আবেশ হইল। দেখিলাম আবার মা আমার আসিয়াছেন "বলিলেন বৎস রে, আমি তোকে এবার আর বেশী কিছু বলিতে পারিব না। গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিব" মা চলিয়া গেলেন, আমি এক বুক আশা লইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবার জীবনের পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন।

———:0:———

যোগানন্দ-লহরী।

মিশ্র কানেড়া। (২) একতালা।

জয় শিব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর,
ভুতনাথ হর শ্মশানবিহারী।
শশাঙ্কশেখর শম্ভু জটাধর,
যোগী দিগম্বর জয় ত্রিপুরারী॥
আদি অন্তহীন তুমিহে নিগুর্ণ,
পরম কারণ সত্য সনাতন,
জগত জীবন জয় পঞ্চানন, পতিতপাবন অজ্ঞানান্ধ্যহারী॥
জয় বিশ্বেশ্বর, জয় পরাৎপর,
প্রেম পারাবার করুণা আধার,
মৌলি গঙ্গাধর হর বাঘাম্বর, জয় আশুতোষ ত্রিলোচনধারী॥
ফনীন্দ্রভূষণ বৃষভ-বাহন,
ত্রিশূলধারণ ত্রিপুরশাসন,
মদনদাহন মঙ্গলকারণ, ভীতিনিবারণ শমনান্তকারী॥
ভাঙ্গসিদ্ধিপানে তাণ্ডব নর্ত্তন,
বিষাণবাদন ডমরুনাদন,
প্রলয়কারণ নাদ ঘন ঘন, বিশ্ব বিমোহন তুমি নৃত্যকারী॥
যক্ষ রক্ষগণ পিশাচ চারণ
শ্মশানে মশানে কর বিচরণ,
চিতাভস্ম অঙ্গে করিয়ে ভূষণ বব বম্ রবে গাল-বাদ্যকারী॥

হরিগুণ গানে সতত মগন,
আত্মহারা নামে কে আছে এমন,
বিশ্বপতি হয়ে ভিখারী সাজিয়ে জীবের লাগিয়ে সদাই উদাসী ॥
গরল অধরে করিয়ে ধারণ,
জীব তরে সুধা কর বরিষণ,
জগতের জনে প্রেমমালা দানে তুমি হে বিরাগী হাড়মালাধারী ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধজ্ঞানময়,
জয় মৃত্যুঞ্জয় আনন্দ নিলয়,
পাশমুক্ত করে শিবত্ব জীবেরে দিতেছ বিতরে হে ভবকাণ্ডারী ॥
যোগেন্দ্র মনন ওহে নিরঞ্জন,
নাশহে অজ্ঞান দিয়ে সেই জ্ঞান,
(যেন) অনন্ত মিলনে মিশে তোমা সনে প্রেমানন্দে সদা বলি হরি হরি ॥

———:0:———

শ্রীভগবানের করুণা।

বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় শাস্ত্রে ও ঋষি-বাক্যে ঘোষিত হইতেছে ভগবান করুণাময়, মঙ্গলময়, তিনি যাহা কিছু করেন জীবের কল্যানের জন্য, ভ্রমান্ধ জীব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, একদেশ-দর্শী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, পুণ্যবানের কষ্টার্জ্জিত ধনরাশি তস্করে হরণ করিয়া তাহাকে পথের কাঙ্গাল করিতেছে, অপর দিকে পাপী অন্যের সর্ব্বনাশ করতঃ অর্থোপার্জ্জন করিয়া তদ্বারা কোটীপতি হইতেছে এবং মানে সম্ভ্রমে, কুলে-শীলে, সগর্ব্বে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; যখন দেখি পরম ধার্ম্মিক দম্পতিযুগল একমাত্র স্নেহের পুত্তলী পুত্রধনহারা হইয়া শিরে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, অপর দিকে পাষণ্ডের পুত্রকন্যা শূকর শাবকের ন্যায় গণ্ডায় গণ্ডায় বৃদ্ধি পাইতেছে; তখন হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে স্বতঃই একটি ক্ষীণ প্রশ্ন উত্থিত হইয়া ব্যাকুল করিয়া তোলে, ভগবন, তুমি না করুণাময়, তবে তোমার সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্য কেন দয়াময়? তোমার এ লীলারহস্যের যবনিকা কি উন্মোচন করিয়া দেখাইবে?

কিন্তু আমাদের দেবপ্রতিম আর্য্যঋষিগণ এ বিষয়ে নীরব নহেন, তাঁহারা ভগবানের লীলারহস্য উদ্ঘাটন করিয়া ঐ সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান অমঙ্গল রাশির মধ্যে হইতে তাঁহার করুণার মাধুর্য্যময় প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি বাস্তবিকই করুণাময়, আনন্দময়, রসময়; জীব একবার সে অমৃত-

কুণ্ডে ডুব দিলে অমর হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। ঋষিগণ তাহার করুণার দুই প্রকার প্রকারভেদ করিয়া গিয়াছেন (১) অনুকুল করুণা (২) প্রতিকুল করুণা। লীলাময় ভগবান জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্নেহময় পিতামাতা দিলেন, অগণিত ধন রত্নে তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিলেন, কুসুমের সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল শশধরপ্রতিম পুত্রকন্যা দিলেন, এক কথায় সংসারের যাবতীয় ভোগ বিলাসের সামগ্রী দিয়া তাহাকে ভাদ্রের নদীর মত ভরপুর করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য জীব বিশ্বের যাবতীয় ভোগৈশ্বর্য্যের ভিতর তাঁহারই অপার মহিমা প্রত্যক্ষ করিবে, জনকজননীর পবিত্র স্নেহে তাঁহারই প্রেমমন্দাকিনীর পীযূষধারা দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, পুত্রকন্যার ললিত হাস্যে তাঁহারই প্রেমোজ্জ্বল করুণাচ্ছটা দেখিয়া তাহার অনন্ত প্রেমে গলিয়া যাইবে। এগুলি তাহার অনুকুল করুণা।

কিন্তু ভ্রমান্ধ জীব ভগবানের এ অনুকুল করুণার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাই স্রষ্টাকে বিস্মৃত হইয়া সৃষ্টিতে মজিয়া যায়। পিতা মাতার স্নেহে, ধনরত্নের মোহে, পুত্রকন্যার মমতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া একবারও মনে করে না, কাহার অপার করুণায় সে আজ এই সকল পার্থিব ধনের অধিকারী? কে তাহাকে সুখী করিবার জন্য এই আনন্দ বাগান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন? জীব মানুষের নিকট হইতে সামান্য উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতায় উপকারীর পদলেহন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না; কিন্তু যাহার অপার দয়ায় এই দুর্লভ মানব দেহ, যাঁহার অযাচিত করুণায় এই পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্য, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, পাণ্ডিত্যাভিমানী অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে না! হায় রে, সেই সমস্ত অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড, সমাজে এখন জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত! কিন্তু জীব তাঁহাকে না চাহিলেও অপার করুনানিধান ভগবান্ সর্ব্বদাই জীবকে চাহিতেছেন, জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি যে দিবানিশি ব্যাকুল; পাপী তাপী মানবকেও হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তিনি যে সর্ব্বদাই আকুল প্রাণে আহ্বান করিতেছেন; কারণ তিনি যে আমাদের বড় অন্তরঙ্গ, তাঁহার মত আপনার জন তো আমাদের কেহ ত্রিসংসারে নাই। সংসারের যাহাদিগকে আমরা বড় আপনার জন মনে করিয়া, মনপ্রাণ যাহাদিগের সেবায় উৎসর্গ করিতেছি, তাহারা কেহই আমাদের আপনার জন নহে; নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা আমাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া কেবল মৌখিক মায়ায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আমাদের ঘোর শত্রু, যদি তাহা না হইবে তবে কাহারও প্রাণে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম পিপাসা জাগিলে পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র ও বন্ধু বান্ধবেরা সকলে মিলিয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দেয় কেন? তাহাদের সাধের পোষা পাখীটী শিকল কাটিয়া মুক্ত আকাশে উধাও হইল বলিয়া এত ব্যস্ততা কেন? হায় রে, ভ্রমান্ধ মানব, যাহারা তোমাদিগকে সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার মুক্তির পথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তুমি দিবানিশি তাহাদের চরণে দেহ মন ঢালিয়া দিতেছ, আর যিনি অযাচিতভাবে

তোমাকে অনন্ত মুক্তির পথে টানিয়া লইতেছেন, তাঁহার কথা দিনান্তে একবার চিন্তা করিবার অবকাশও তোমার নাই॥ ঐ শোন, তিনি তাঁহার শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় লইবার জন্য তোমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিকুঞ্জ হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন! তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন;—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি
অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয়ের মাঝে, আপনি
এসে দেখা দিয়েছ॥
ও পথে যেও না ফিরে এস বলে, কতবার
তুমি ডেকেছ।
আমি না শুনে সে মানা দূরে গেছি চলে,
তুমি পাছে পাছে ধেয়েছ॥"

আহা, কি করুণা, আমি তাঁহাকে চাই না, তবু দয়াল হরি সর্ব্বদাই আমাদের পাছে পাছে ধাইতেছেন!

যখন হরি দেখিলেন, জীব লীলাময়কে ছাড়িয়া লীলায় মজিয়া গেল, তখন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখের সহিত ত্রিবিধ দুঃখ মিশ্রিত করিয়া দিলেন, আনন্দের কোলে নিরানন্দ, আলোর পাশে অন্ধকার, হাসির সহিত কান্না, জীবনের ধারে মরণ সৃষ্টি করিলেন। ঐ যে ধনী ধনমদে মত্ত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছিল, তাহার মত্ততার মূল ধনরাশি কাড়িয়া লইলেন; ঐ ভাগ্যবান পুরুষ পত্নীপ্রেমে আত্মহারা হইয়া সুখের সংসার পাতিয়াছিল, মনে করিয়াছিল চিরদিন বুঝি প্রমদ-মদিরাপানে মত্ত হইয়াই কাটাইয়া যাইবে, ভগবান তাহার হৃদয় নিকুঞ্জের রাণীস্বরূপা প্রণয়িনীটিকে টানিয়া লইলেন;—যে মাতা কুসুমকোরকনিভ একমাত্র পুত্রাঙ্কুরটিকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া ধরাধামে নন্দনকাননের সৌন্দর্য্যসুষমায় ডুবিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এ সুখের নিশি বুঝি আর অবসান হইবে না, ভগবান একমুহূর্ত্তে তাহার স্নেহের পুত্তলীটিকে ছিনাইয়া লইলেন; নন্দনকাননের পূর্ণ সৌন্দর্য্য শ্মশানের ভীষণতায় ডুবিয়া গেল। ভ্রান্ত জীব লীলাময়ের এ লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া তিরস্কার করিল; কিন্তু বুঝিল না এ যে তাঁহার প্রতিকূল করুণা! জীব ভবের হাটে সওদা করিতে আসিয়া বিশ্বের মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাসের ঘরকেই সুদৃঢ় দুর্গ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আরাম কেদারায় নিদ্রা যাইতেছে; নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যে, সত্য ছাড়িয়া অসত্যে, স্বরূপ ত্যাগিয়া বিরূপে মজিয়াছে; কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশি ক্ষয় করিতে আসিয়া নিত্য নব নব কর্ম্মপ্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে; তাই দয়াময় হরি ভীষণ আঘাতে আমাদের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া দিলেন, সযত্নে আমাদের চক্ষের ঠুলী খুলিয়া দিলেন, ত্রিবিধ দুঃখ শোকের অগ্নিতে ঝাঁঝরাপোড়া হইয়া জীব তাহারই প্রতিকূল করুণায় আপনা স্বরূপ বুঝিতে পারিল, সংসার স্বর্গ হইল। তখন জীব রসময়ের রসে ডুবিয়া প্রেমময়ের প্রেমে মজিয়া আপনার পৃথক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। জলবিন্দু অনন্ত

সমুদ্রে মিশিয়া গেল। নিরানন্দময় সংসার তখন পূর্ণ আনন্দের সুমহান জ্যোতিতে হাসিয়া উঠিল, তখন বৃক্ষের পাতায়, চাঁদের আলোয়, নদীর কল্লোলে, পাখীর কলস্বনে সাগরের গাম্ভীর্য্যে, কুসুমের সৌন্দর্য্যে, পর্ব্বতের বিশালতায়, মেঘের গাঢ়তায়, সর্ব্বত্রই সেই লীলাময়ের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া জীব বিশ্বপ্রেমে মজিয়া গেল। বিশ্বের সর্ব্বত্র তাহার বিশ্বরূপ দর্শন হইল, সে রূপ,—সে সৌন্দর্য্য পলকের তরেও আর তাহার চক্ষের অড়াল হইল না; কারণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন; —

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ওঁ শান্তি ওম্।

গুরুপদ ভিখারী—
দীন-যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী।

———:0:———

বনফুল।

নহি আমি সরসীর প্রফুল্ল কমল,
নহি আমি বাগানের গোলাপের দল,
রূপৈশ্বর্য্যশালী নই স্থলপদ্ম ফুল,
রূপগন্ধহীনা আমি ক্ষুদ্র বনফুল,
দিক আমোদিত নয় আমার সুবাসে,
গুঞ্জরিয়া অলি নাহি আসে মম পাশে,
সমাদরে কেহ মোরে নাহি নেয় তুলে,
রূপগন্ধহীনা আমি বনফুল বলে;
না আছে সুখ্যাতি মোর অন্য ফুল সম,
কেহ নাহি জানে নাকো কিবা নাম মম,
নীরবে ফুটেছি আমি নীরবে শুকাব,
অনন্তের বিন্দু আমি অনন্তে মিশিব,
তবু মোর ভাগে ধন্য দেই শতবার,
এত ভাগ্য এ জগতে হবে না'ক কার,
সুরূপ কুরূপে যাঁর নাহি ভেদজ্ঞান,
চরণ সরোজে তাঁর পাইয়াছি স্থান,
তাই বলি ভাগ্য মোর জগতে অতুল,
জনম সফল হ'ল হয়ে বনফুল।

কুমারী শৈলবালা।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(৮)

কেবল সামবেদ কেন? হিন্দুর সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তই এই যে, জ্ঞানই পারত্রিক মঙ্গলের পরমোপায়, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এড়াইয়া জগৎ অতিক্রম করিবার একমাত্র অবলম্বন। জ্ঞানের সাধনায় "ব্রহ্মৈব সর্ব্বং" অর্থাৎ এক ব্রহ্মই

সমস্ত, ইত্যাকার জ্ঞানের বিকাশে সকল অধিষ্ঠানভূতপর ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া জন্মমরণসঙ্কুল সংসার-বাসনার চির অবসান হয়। জ্ঞানের আরাধনায় যে অকৃত্রিম সুখলাভ করা যায়, তাহা অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অনুপম ও অখণ্ড। জ্ঞানের উপাসনায় যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা অনির্ব্বচনীয় ও অতুলনীয়। জ্ঞানের প্রসাদেই অবিদ্যাসম্ভূত অহংজ্ঞান বিদূরিত হইয়া কল্যাণময় কৈবল্যধামে অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়। জ্ঞানের বিকাশে অন্তঃকরণের যেরূপ নির্ম্মলতা সংসাধিত হয়, কান্তিপূর্ণ হিমাংশু-মণ্ডলের মধ্যভাগও সেরূপ নহে। জ্ঞানের আনুকুল্যেই তৃষ্ণাশূন্যতা, নির্ভীকতা, নিত্যতা, সমজ্ঞান, সমদর্শিতা, নিশ্চেষ্টতা, নিষ্ক্রিয়ত্ব সৌম্যভাব, সর্ব্বভূতেসুহৃদ্ভাব, সন্তোষ, বিচার-বুদ্ধি, ধৈর্য্য, অনুগ্রহভাব ও মৃদুভাবিতা প্রভৃতি গুণরাশি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই মুমুক্ষু মানবগণ জ্ঞানরূপ সুদৃঢ় বল অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন। জ্ঞানরূপ বলকে আশ্রয় করিলে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ আর আপাত রমণীয় "কামনা বাসনার ফাঁদে" ফেলিতে পারে না, মোহপ্রদায়িনী অবিদ্যাও প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ পায় না। শ্রুতি বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো" অর্থাৎ জ্ঞানবল-বিহীন মানব কদাচ আত্মলাভ করিতে পারে না বা আত্মরূপী পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না। অতএব জ্ঞানবলই একমাত্র বল, জ্ঞানের উপাসনাই একমাত্র দেবার্চ্চনা, জ্ঞান-দেবতার পূজাই পরমেশ্বরের মুখ্য পূজা। নানা বেশ-ধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণের ব্যাখ্যার কুহকে ভুলিয়া যে ব্যক্তি এই পূজার নিন্দা করতঃ কৃত্রিম পূজার পূজক হয়, তাহার মন্দার-কানন ত্যাগ করিয়া কণ্টকারী কাননে প্রবেশ লাভ হয়। অতএব যিনি "সত্যস্য সত্যং", বৃহদারণ্যক শ্রুতি যাহাকে—"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যোভূতেভ্যোহন্তরো যং সর্ব্বানি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বানি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু সর্ব্বভূত যাহার স্বরূপ বুঝে না; অর্থাৎ যাহাকে সর্ব্বভূতে জানিতে পারে না,—অথচ যিনি সর্ব্বভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়া আত্ম-সম্বন্ধ-মলাপনয়ন করতঃ সংসার বিনির্ম্মুক্ত হইতে হইলে, শয়নে-স্বপনে, দর্শনে স্পর্শনে, ঘ্রাণে-ভোজনে ও গমনে-অবস্থানে সর্ব্বসময়ে জ্ঞানদেবতার উপাসনাই কর্ত্তব্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হইতেছে। এক্ষণে উল্লিখিত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত অভিন্ন দেখিলেই সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে :—

> দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে—
> বিদ্যাঽবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
> ক্ষরন্ত বিদ্যাহ্যমৃতং তু বিদ্যা
> বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥

পূর্ণ পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা নামক দুইটী তত্ত্ব নিহিত আছে। তিনি জগতের ঈশ্বর, পরমপুরুষ। আত্মজ্ঞানী বিবেকী সাধুগণ হৃদয়দেশে সেই ব্রহ্ম পদার্থকে "জ্যোতিরিবা ধুমকঃ বা "দগ্ধেন্ধন-মিবানলম্" সদৃশ অর্থাৎ নির্ধূম জ্যোতি পদার্থের ন্যায়

অথবা প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠের ন্যায় দীপ্তিমান্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্য দেশ কালাদির দ্বারা তাঁহার ইয়ত্তা বা নির্ণয় হয় না। তিনি "সর্ব্বগতং" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক বস্তু এবং অনাদি ও অনন্ত। বিদ্যা ও অবিদ্যা তাঁহারই মাহাত্ম্য (বিচিত্র দর্শয়তি)। ক্ষরন্ত বিদ্যা "অর্থাৎ অবিদ্যা" জীবকে কামনাবাসনার বশীভূত করিয়া অজ্ঞানজনিত কর্ম্মফলে আবদ্ধ করতঃ শেষে মৃত্যু প্রদান করে (সংসৃতি কারণম্)। আর বিদ্যার প্রভাবে "ধৃতিঃ, ক্ষমা, দম, মোহ, অস্তেয়ং, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সন্তোষ, ভক্তি, প্রেম, শান্তি, আর্জ্জব, দাক্ষিণ্য, উপচিকীর্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লক্ষণের পূর্ণবিকাশে ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, সংসার-মায়া-মোহিত জীবভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মভাবে পরমানন্দ উপভোগ হইয়া থাকে।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি কোন অর্থ প্রতিপাদক, এ স্থলে তাহার আলোচনা করা উচিত। "ধৃতি" যে বস্তু বা শক্তি দ্বারা ধারণা করা যায় বা স্মরণ রাখা যায় অথবা যাহা দ্বারা ধৃত থাকে; সেই বস্তুর নাম ধৃতি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেনঃ—

অর্থহানৌ চ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥

অর্থহানি, বন্ধুবিয়োগ ও সম্পদ পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইলেও, যে শক্তির দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, সেই শক্তি বা বস্তুর নাম ধৃতি। কুল্লুকভট্ট বলেন "সন্তোষোধৃতিঃ" অর্থাৎ সন্তোষের নাম ধৃতি। ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন ধৃতি শব্দের "সন্তোষ" অর্থ লইয়া অসংলগ্নবোধে অনেকে শ্রীমৎ কুল্লুকভট্টের মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে, নানাস্থলে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দার্থ লইয়া বিচার-বিতর্কে জয় পরাজয়, মানাপমানে পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করতঃ—শান্তচিত্তে অনুকূল তর্কের সহিত সারভাব গ্রহণ করিলে, "সন্তোষ" অর্থ কদাচ উপেক্ষনীয় হইতে পারে না; যেহেতু মহর্ষি পতঞ্জলী বলেন যে, "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ" অর্থাৎ সন্তোষ হইতেই পরমসুখ লাভ হয়। অতএব যে বস্তু বা শক্তি দ্বারা সন্তোষ বা পরম সুখ লাভ হয়, তাহার নাম "ধৃতি", এরূপ অর্থ অপ্রাসঙ্গিক উপাধির বিষয়ীভূত নহে। আবার কতকগুলি ধাতু বা বস্তু জগতে নাই। এক পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মই স্বতঃপ্রকাশ হইয়া বোধস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। এই জগৎ সেই ধাতু বা বস্তুর বিকাশ মাত্র। তাঁহার নিরাকার বা কারণ অবস্থা নির্গুণ ও মনোবাণীর অতীত বিধায়ে, তথায় ধাতু, প্রত্যয়, ছন্দ, পদ, দেশ, কাল, প্রকৃতি, নাম, রূপ, আখ্যা, উপসর্গ, নিপাত, স্ফোট, সাস্না, লাঙ্গুল, ককুদ, ক্ষুর, বিষাদ প্রভৃতি শব্দানুশাসন, বিমল, স্ফটিক, নীল, লোহিত ও পীতাদি বর্ণ ইত্যাদি কিছুই থাকিতে পারে না। সাকার অবস্থা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তম বা অহঙ্কার লইয়া অষ্টম, অথবা পঞ্চভূত ও কাল, দিগ, আত্মা ও মন লইয়া নবমবিধ পদার্থের মধ্যেই ধাতু-প্রত্যয়ের খেলা। এই সপ্তম, অষ্টম বা মতান্তরে নবমবিধ বস্তুই ধাতু, ইহা ভিন্ন পৃথক ধাতুর আবিষ্কার হইতে পারে না,

এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম, সাকার হইলেই ধৃ ধাতু; আর নিরাকার অবস্থায় ধাতু-প্রত্যয় বর্জ্জিত। সেই পরব্রহ্মের দ্বারা জগৎ ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত। তিনি সকলের অন্তরে বাহিরে চির বিরাজমান। অতএব সেই বস্তু (পরব্রহ্ম) দ্বারাই ধারণ বা ধারণা করা যায়, স্মরণ রাখা যায়, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় এবং দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, বাক্যকথন, গমনাগমন, গ্রহণ, রমণ ও মলমূত্রত্যাগ, তাঁহারই প্রকাশ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। তাঁহার অব্যক্ত বা অপ্রকাশ অবস্থায় জীবের বিরাট-দেহ জড়াবস্থায় পরিণত হয়। এইজন্ত ধৃ ধাতু-নিষ্পন্ন "ধৃতি" বলিতে তাঁহাকেই (পরব্রহ্মই) বুঝাইয়া থাকে। কুল্লুকভট্ট মতে যাহা দ্বারা সন্তোষ বা পরম সুখ লাভ হয়, তাহাই "ধৃতি" নামে অভিহিত হয়। আবার পরম সুখ বা নিত্য সুখ, নিত্যবস্তু, পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত লাভ হয় না। অতএব যে বস্তুর দ্বারা ধারণা করা যায়, বা যাহা দ্বারা সন্তোষ বা পরম সুখ লাভ হয়, উভয়ই এক বস্তু হইতেছে। সুতরাং কুল্লুকভট্টের মতে "ধৃতি" অর্থে "সন্তোষ" সুখের কথায় উড়াইয়া দিয়া, সমগ্র মনু, স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার উপর সন্দেহারোপ করিলে চলিবে না। যে-হেতু সারভাব গ্রহণ করিলে উভয়ই একার্থ প্রতিপাদক হইতেছে।

"ক্ষমা"— কেহ অপকার করিলে নিজের শক্তি সত্ত্বেও তাহার প্রত্যপকার না করা বা অপকারীর প্রত্যপকার করিবার প্রবৃত্তিকে যে বস্তু বা শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়, সেই বস্তু বা শক্তির নাম ক্ষমা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে "প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাঃ" অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়ে জীবগণের যে তুল্যভাব, বেদবিদ্‌গণ তাহাকেই ক্ষমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কুল্লুকভট্ট বলেন, "পরেনাপকারে কৃতেতস্য প্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা" অর্থাৎ অপকারক ব্যক্তির প্রত্যপকার না করা। নানাবেশধারীধর্ম্মপ্রচারগণ এই শ্লোকের "প্রত্যপকারানাচরণং" অর্থে প্রত্যপকার না করা অর্থাৎ প্রত্যপকার করিবার শক্তির অভাবই ক্ষমা, ইহাই ভট্ট মহাশয়ের শ্লোকের অর্থে প্রকাশ পাইতেছে উল্লেখ করতঃ বলেন যে, ক্ষমা, মনের বৃত্তি বিশেষ। উহা বৃত্তি বিশেষরূপে বিদ্যমান না থাকিয়া পদার্থের অভাব বুঝাইলে কদাচ অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। অতএব কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা অসংলগ্ন ও অসম্ভব ইত্যাদি আলোচনা করতঃ বাদানুবাদ করিয়া নানাস্থলে নানাজনের সংশয় জন্মাইয়া থাকেন। কিন্তু স্বার্থত্যাগে স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বাদানুবাদকারীদের "অভাব" শব্দ দ্বারাই প্রত্যপকার করা শক্তির বিদ্যমানতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু অভাব পদার্থ ভাব পদার্থেরই অন্তর্ভুত। অভাব পদার্থ ভাব পদার্থ হইতে পৃথক অন্য কোন নূতন বস্তুস্বরূপ কদাচ নির্ণয় করা যাইতে পারে না; অর্থাৎ আদিতে ভাব পদার্থের বিদ্যমানতা না থাকিলে, অভাব পদার্থ কখনই আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। যেমন আদিতে জ্ঞানের বিদ্যমানতা না থাকিলে অজ্ঞান, সুখের বিদ্যমানতা না থাকিলে অসুখ, আতপের বিদ্যমানতা না থাকিলে ছায়া এবং সত্তার

বিদ্যমানতা না থাকিলে অসত্তা কখনই প্রতিপাদয়িতব্য হয় নাই। এই জন্য ভাব ও অভাব অর্থাৎ বিদ্যমান ও অবিদ্যমান অখণ্ডাকার বস্তু; একটীর অভাবে অন্যটীর প্রকাশ অসম্ভব। অতএব ভাব পদার্থ দ্বারাই অভাব পদার্থ আভাসিত হয়, নতুবা কেবল অভাব কখনই অনুভবে আসিতে পারে না। আবার কতকগুলি ভাব বা শক্তি জগতে নাই। এক জ্ঞানের শক্তি-চমৎকারিতাই জগৎরূপে বিকশিত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ও সংস্কার প্রভৃতি গুণ পদার্থ, উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারন, ও গমন প্রভৃতি কর্ম্ম পদার্থ এবং উল্লিখিত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নবমবিধ পদার্থ বা মতান্তরে সপ্তম অথবা অষ্টমবিধ বস্তু বা পদার্থের উপাধি পাইয়া থাকে। সেই ভাব বা শক্তির অভাব হইলে উপাধি বা জগৎ থাকিতে পারে না। জগৎ না থাকিলে আমি, তুমি, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, জীব, জন্তু কিছুই থাকে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমৎ কুল্লুকভট্টের "প্রত্যপকারানাচরণং" শ্লোকের অর্থে "প্রত্যপকারকরা শক্তির" অভাব উল্লেখ করিয়া ভট্ট মহাশয়ের মত খণ্ডন ও পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ত প্রত্যক্ষ স্বশরীরে বিদ্যমান আছেন বিচার স্থলে বলিতে হয় যে, ভাব বা শক্তির অভাব হইলে তাঁহাদের বিদ্যমানতা সম্পন্ন হয় না। যেহেতু এক ভাব বা শক্তিই নানাবিধ গুণ, কর্ম্ম, নাম ও উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব বাদানুবাদকারীদের "শক্তির অভাব" শব্দ অভ্যুপগম হইল না। তাঁহাদের "প্রত্যপকারকরণ শক্তির অভাব" বাক্য দ্বারাই শক্তির বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইল। সুতরাং কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা অসংলগ্ন বা অসম্ভব নহে।

বৃথা বাদানুবাদ দ্বারা মনু-স্মৃতিশাস্ত্রের উপর সন্দেহ না জন্মাইয়া, স্বার্থত্যাগে অনুকূল তর্কের সহিত বিচার করতঃ শাস্ত্রের সার ভাব গ্রহণ করিলে, সকল ভ্রমের অপনোদনে শান্তিলাভ হয়। "দম"—মনের শান্তি বিধানের জন্য, যে বস্তু বা শক্তির সাহায্যে কাম ক্রোধাদি বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করা যায়, সেই শক্তিই দম নামে অভিহিত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধই চিত্ত প্রসন্নতার প্রতিকারণ। ইন্দ্রিয়গণের বাহ্যবিষয়ের প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ হইলে, চিত্তের বাহ্যবিষয় ভোগপ্রবৃত্তি স্বতঃই ত্যাগ হইয়া পরমবস্তু, পূর্ণ পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের অবস্থান ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে—"তেন স্বদোষাৎ পরিমুচ্যচিত্তং শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি" অর্থাৎ দমের দ্বারাই অন্তঃকরণ শোকতাপবিকারবিহীন হইয়া বা দুষ্টস্বভাব পরিত্যাগ করতঃ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শান্তি লাভ করিয়া থাকে। মোক্ষার্থী ব্যক্তি দম ব্যতিরেকে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না। প্রাণায়ামাদি হঠযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়া দৈবাৎ কোন কারণ বশতঃ ভোগ্য বস্তুর রমণীয়তা মনে উদয় হইলে, সমাধি অবস্থা হইতে স্খলিত হইতে হয়। এইজন্য হিন্দু-ঋষিগণ ও বেদবিদ সাধুগণ, দম সাধনাই মুক্তির প্রতি-

কারণ বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন। "অস্তেয়"—কায়মনোবাক্যে পরধন হরণের প্রবৃত্তি যে বস্তু বা শক্তির সাহায্যে নিরোধ করা যায়, মুনিগণ তাহাকেই অস্তেয় বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ "কর্ম্মনা মনসা বাচা পর-দ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা"। এই অস্তেয় বা অচৌর্য্য সাধনার দ্বারা অযাচিতভাবে ধনরত্নাদি আসিয়া থাকে। শৌচ"—চিত্তের নির্ম্মল ভাবই শৌচ, মতান্তরে দেহ ও চিত্তের বিশুদ্ধিভাবকেও শৌচ বলা যায়। এই জন্য শৌচ দ্বিবিধ; বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যে শৌচ তাহার নাম বাহ্যশৌচ, আর চিত্ত হইতে অজ্ঞান-মল দূর হইলে চিত্তের যে বিশুদ্ধিভাব, তাহাই আভ্যন্তর বা আন্তর-শৌচ। আন্তর-শৌচ অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে, পৃথকভাবে বাহ্যশৌচের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ—"অন্তঃ-শৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং নাবশ্যকং নৃণাম্।" "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ"—যে বস্তু বা শক্তির সাহায্যে বিষয় প্রধাবিত চিত্তকে প্রত্যাহরণ করা যায়, বা কু-প্রবৃত্তিতে চিত্ত যাহা দ্বারা পরিধাবিত না হয়, তাহাই "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ" অর্থে ব্যবহৃত হয়। "ধী"—ভ্রম ও সংশয়াদি নিরাকরণপূর্ব্বক সম্যক জ্ঞানলাভ; অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ এবং বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের বিজ্ঞেয় পদার্থ সমূহের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ যাহা দ্বারা হয়, সেই বস্তুর নাম ধী। "বিদ্যা"—যাহা দ্বারা আত্মনিশ্চয় করা যায় বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই বিদ্যা বলা যায়। বিদ্যার কার্য্য-সর্ব্বাত্মভাব। বিদ্যার অভ্যুদয়ে সর্ব্বাত্মভাব লাভ হইলে আমূলতঃ ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। (স্বপ্নশূন্য) সুপ্ত আত্মা যেমন কোন কাম্য বস্তু কামনা করে না, এবং উৎকর্ষ-অপকর্ষ, প্রাবল্য-দৌর্ব্বল্য, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য, সাধ্য-বিকল্প, উপলব্ধি-অনুপলব্ধি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ইত্যাদি স্বব্যাঘাতক জাতিবর্জ্জিত হইয়া অতুলনীয় অবস্থা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মভাব অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি দ্বারা আত্মার ঐরূপ পরম অবস্থা লাভ সাধিত হয়। এইজন্য শ্রুতিতে বিদ্যার কার্য্যকে "অপহত পাপ্মাহ ভয়ং রূপম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বাত্ম-ভাব ধর্ম্মটী অপহত পাপ, সংসার ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ও অভয়রূপী। "সত্য"—যথার্থাভিধানং সত্যম্-অর্থাৎ যে বস্তু বা শক্তির বিদ্যমানতায় কায়মনোবাক্যে যথার্থ আচরণ এবং সত্য-বাক্য বলা যায় তাহাই সত্য নামে অভিহিত হয়, ইহা কুল্লুকভট্টের মত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভি-ভাষণং"; অর্থাৎ কেবল যথার্থ অভিভাষণ সত্য বলিয়া গণনীয় নহে; প্রাণিবর্গের হিতকর উক্তিই সত্য বলিয়া কথিত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন "সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম" অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই প্রকার উক্তির নাম সত্য। যজুর্ব্বেদে বলিয়াছেন, "সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্যো রোচতে-দিবি সত্যং বচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ব্বংপ্রতি-ষ্ঠিতম্। সত্যং পরমং বদন্তি"। অর্থাৎ সত্য দ্বারা বায়ু নিয়মিতরূপে প্রবাহিত হইতেছে, আদিত্য সত্য দ্বারাই আকাশে শোভা পাইতেছে, সত্যই সমস্ত বাক্যের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা এবং পাঞ্চভৌতিক সমস্ত পদার্থই অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এইনিমিত্ত

সত্যকেই পরম বা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। সারভাব গ্রহণ করিলে ভট্ট মহাশয়ের "যথার্থাভিধনাং" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের "সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং", ভগবান শঙ্করাচার্য্যের "সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম", তিনটী বাক্যই একার্থ প্রতিপাদক হইয়া, বেদবাক্যের "সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" মহাবচনের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন হয়। "অক্রোধ"—যে বস্তু বা শক্তির আনুকূল্যে ক্রোধ বৃত্তির উদয় না হয়, সেই বস্তুর নাম অক্রোধ। মনু বলেন, পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ আক্রোশ এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ অত্যন্ত তাড়না (বাগদণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং) এই আট প্রকার দোষ ক্রোধজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। তন্মধ্যে প্রাণাধনে প্রবঞ্চনা করা, অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং নিষ্ঠুর-বাক্য কথন এই ত্রিবিধ দোষ নিতান্ত অনর্থজনক, এমন কি ইহাতে আসক্ত হইলে স্বীয় জীবনেরও আশঙ্কা হইয়া থাকে। অতএব ক্রোধরূপ দুরন্ত ব্যসন সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এই বিষয়ে একটী পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে যথা:—

এক সময়ে মাতা "বসুমতী" নিজ ভ্রম নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, হে জ্ঞানগম্য, অচিন্ত্য, অচ্যুত হৃষীকেশ! আপনি ফল-পুষ্পসম্পন্ন অবণ, ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ মনুষ্য, সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি-শোভিত গগনমণ্ডল, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। মানবের জীবন উদ্ধাবং চঞ্চল এবং বিদ্যুদ্বিলসিতের তুল্য অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। এইজন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ক্রোধরূপ রিপু দ্বারা জীবের কি অনিষ্ট হইতে পারে? তদুত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন যে:—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবিধ নরকের দ্বার স্বরূপ ইহারা আত্মাকে বিনষ্ট করে; অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান অন্তরায় অজ্ঞানের বৃদ্ধি করতঃ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ গর্ত্তে-ভ্রমন করাইয়া থাকে। অতএব যত্নের সহিত কাম, ক্রোধ, লোভ তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে।

"বিবেক"—অবিচ্ছিন্ন ধ্রুবাস্মৃতি বা তত্ত্ব-বিচারের ক্ষমতার নামকে বলা যায়। রামানুজ মতে "নমস্যা দৃষ্টাবয়াং" (ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে)। বেদবিদ্‌গণ বলেন যে, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ পুরুষত্ব বা ভগবদ উপাসনার ঐকান্তিক ইচ্ছা তদপেক্ষা দুর্লভ। ইহা অপেক্ষা বিবেক লাভ করা অত্যন্ত সুদুর্লভ। অতএব পার্থিব ভোগসাধনের স্পৃহায় মানবজীবন ব্যয়িত করা, মনুষ্য জন্ম গ্রহণের চরম উদ্দেশ্য নহে। আত্মনিশ্চয় করতঃ সংসার হইতে পরিত্রাণের প্রয়াসে, বিবেক-লাভের উপায়ে একান্ত মনোনিবেশই মানব জীবনের যথার্থ পরিচায়ক। "বৈরাগ্য"—যে বস্তু বা শক্তির সাহায্যে ধন-যৌবন, আত্মীয়-স্বজন, পুত্রকলত্র ও শত্রুমিত্রের উপর বিরাগ উপস্থিত হয়, সেই শক্তির নাম বৈরাগ্য অর্থাৎ আত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত ভোগ্য বস্তু অনিত্য ও অস্থির, কুহকিনী, বিষয়-

বাসনা মানবের সারবস্তু (জ্ঞান) অপহরণ করতঃ বিবিধ দুঃখ প্রদান করে, মানব-জীবন সংসারজলদজালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণস্থায়ী এইরূপ দৃঢ় ধারণা যাহার আনুকূল্যে লাভ হয়, তাহাকেই তত্ত্ববিৎ সাধুগণ বৈরাগ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

"ঔদাসীন্য"—সচ্চিদানন্দ ভগবানই সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তা, এই জগৎ তাঁহারই বিকাশ মাত্র, অতএব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম:" ইত্যাকার জ্ঞান যে বস্তু বা শক্তির সহায়তায় লাভ হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্তভাব উপস্থিত হয়, তাহাকেই ঔদাসীন্য বলা যায়। "শ্রদ্ধা"—গুরু ও বেদ-বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বা উপাসনা দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি করিতে হইলে, শ্রদ্ধাই প্রধান অবলম্বন। যেহেতু শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, আর কার্য্যের অপ্রবৃত্তিতে কার্য্যসিদ্ধিও অসম্ভব। এই-জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"শ্রদ্ধৎস্ব সৌমেতি" হে প্রিয়দর্শন! (সৌম্য)তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও। শাস্ত্রান্তরে শ্রদ্ধা ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে, যথা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। তন্মধ্যে বিবেকজ্ঞানযুক্ত সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই মোক্ষের প্রতিকারণ; রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধা মুক্তিপ্রদায়িনী নহে। অতএব শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা জানা যাইতেছে। "বিশ্বাস"—যে বস্তু বা শক্তি দ্বারা, সত্য ও যথার্থ বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণা করা যায়, সেই বস্তুর নাম বিশ্বাস। বেদ ঈশ্বর বাক্য, এই নিমিত্ত বেদের যথার্থত্ব বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব বেদবাক্যে সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। "সন্তোষ"—চিত্তপ্রসাদের নাম বা যে বস্তুর দ্বারা চিত্তপ্রসাদ সংসাধিত হয়, তাহার নাম সন্তোষ। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যেমন সহস্রকোটীবার ব্রহ্মা হইলেও "তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত" কদাচ্য মুক্তি লাভ সম্ভবে না, তদ্রূপ চিত্তপ্রসাদ ব্যতীত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি বা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। "ভক্তি"—কামনা-বাসনা পরিশূন্যতায় পরমেশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগই ভক্তি। "প্রেম"—ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেম নামে অভিহিতা হয়। "শান্তি"—সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারা অন্তরের যে পরিতৃপ্ত ভাব বা যাহা দ্বারা নিত্য ও নিরতিশয় সুখলাভ হয় তাহার নাম শান্তি। "আর্জ্জব"—যাহা দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমভাব লাভ সাধিত হয় তাহার নাম আর্জ্জব। "দাক্ষিণ্য"—যাহার সহায়তায় সর্ব্বদা অনুকূল ভাব বর্ত্তমান থাকে তাহাকেই দাক্ষিণ্য বলা যায়। "উপচীকির্ষা"—যাহা দ্বারা পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবলা হয় বা পরোপকারে ব্যগ্রতাই উপচিকির্ষা। "ব্রহ্মচর্য্য"—যে বস্তু বা শক্তির বিদ্যমানতায় কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় মৈথুন ত্যাগে সক্ষম হওয়া যায় তাহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়। অর্থাৎ সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগে ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে"। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে:—

> স্মরণং দর্শনং স্ত্রীনাং গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্।
> সমীচীনত্ব ধীস্তাসু প্রীতিঃ সম্ভাষণংমিথঃ।
> সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ।
> এতদ্ বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্।

স্মরণং, দর্শন, স্ত্রীলোকের গুণ ও কর্ম্মের প্রশংসা, রমণীয়বোধ, প্রেম বা ভালবাসা, সম্ভাষণ, একত্রে অবস্থান এবং সংসর্গ এই অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জনের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য চিত্ত প্রসন্নতার হেতু। মতান্তরে স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যকথন, মনে মনে সংকল্প, উদ্যোগ ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্টবিধ লক্ষণের উল্লেখ আছে। উভয় লক্ষণের ভাবার্থ প্রায় এক কেবল কয়েকটী শব্দের বিভিন্নত মাত্র। "অহিংসা"—কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীকেই ক্লেশ না দেওয়া বা হিংসা ও প্রাণনাশের প্রবৃত্তি না হইয়া নিজ আত্মার ন্যায় ব্যবহার যে "বস্তু বা শক্তির সাহায্যে হয়," তাহাকে অহিংসা বলা যায়। "ঐশ্বর্য্য"—অণিমা, মহিমা, লঘিমা' প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশীত্ব ও সর্ব্ব প্রকার মনোরথ সিদ্ধি এই অষ্টবিধ বিভূতির নাম ঐশ্বর্য্য বা যাহা দ্বারা উহা লাভ হয় তাহাকেই ঐশ্বর্য্য নামে অভিহিত করা হয়।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির সূক্ষ্মার্থা বা সার ভাবার্থ গ্রহণ করা হইলে, সমস্তই জ্ঞান-বাচক" হইয়া থাকে। বিদ্যা দ্বারা উল্লিখিত লক্ষণগুলির পূর্ণবিকাশে সর্ব্বপ্রকার গুণ, কর্ম্ম, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রভৃতির স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শব্দসমষ্টিপ্রসূত নানাবিধ সুখ্যাতির অধিকারী হইয়া' সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ জ্ঞানময় পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া সংসার যাতনার অন্ত হয়; ইহাই সার ভাবার্থ।

মুণ্ডকোপ শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে:—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম
যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবা পরাচ॥

পরমার্থদর্শী বেদবিদ্ সাধুগণ বা ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দুইটী বিদ্যা পরিজ্ঞেয়; একটী পরা, অপরটী অপরা; অর্থাৎ যাহা দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্ম বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম পরা বা পরমাত্মবিদ্যা, তদ্ভিন্ন অপরা বা অধর্ম্ম সমুদ্ভাসিত দুঃখময়ী মিথ্যা বাসনা উৎপাদিকা যন্ত্রবিশেষ।

কঠ শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে:—

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তে হর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি-সাধন বিষয়ে দুইটী তত্ত্ব পরিজ্ঞেয়; একটী শ্রেয়, দ্বিতীয়টী প্রেয়। তন্মধ্যে মোক্ষদায়ক তত্ত্বজ্ঞানই বিবেকের স্বরূপ বিধায়ে শ্রেয়; আর পুত্র, দারা, ধনাদি বিষয়ক কামনাই অবিবেকের স্বরূপ বিধায়ে প্রেয়। এই উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ সম্পাদিত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। আর যিনি প্রেয় অবলম্বন করেন, সেই ব্যক্তি বিত্তময়ী কুৎসিত বাসনার আশ্রয় দ্বারা পারমার্থিক পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া দগ্ধ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বৈশেষিক দর্শনে বলিয়াছে যে:—

"তদ্দুষ্ট জ্ঞানম্"—"অদুষ্টং বিদ্যা"।

যে জ্ঞান দুষ্ট অর্থাৎ দোষ জন্য, সংশয়যুক্ত বা ব্যভিচারী; তাহাই অবিদ্যা বা ভ্রম। আর যাহা ভ্রমশূন্য বা সর্ব্বাংশে প্রমা এবং স্বরূপজ্ঞাপক, তাহাই বিদ্যা পদবাচ্য। যে বস্তু যেরূপ, নহে, তাহাকে সেইরূপ মনে করাই ভ্রম বা বস্তুর বিপরীত

কল্পনাই ভ্রম। রৌপ্য শ্বেতবর্ণ, তাহাকে লোহিত নির্ণয় করাই ভ্রম; এইরূপ আত্মায় অনাত্ম ধর্ম্মের আরোপও ভ্রম বা অবিদ্যা। যাহা সংশয় বা ভ্রমশূন্য, যাহা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবধারণ হয়, তাহাই বিদ্যা। এই জন্য মহর্ষি কণাদের মতে জ্ঞানকে দ্বিবিধ বলা হয়, যথা সংশয় ও নিশ্চয়। তাঁহার মতে সংশয় ও সংশয় ও নিশ্চয়া তিরিক্ত জ্ঞান না থাকিলে নিশ্চয় জ্ঞানই দুষ্ট ও অদুষ্ট বা অবিদ্যা ও বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে

পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন যেঃ—

অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্ব্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্মুখ্য স্তত্র মূঢ়ৈ প্রযুজ্যতে॥

পরস্পরাধ্যাস দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য (জীব চৈতন্য) এই উভয়ের যে একীভাব, তাহার নাম মুখ্য অহঙ্কার। মতান্তরে ইহাই সাত্ত্বিক অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়। এই মুখ্য বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার দ্বারাই ব্রহ্মবিবেক স্ফূরিত হইয়া, জীব সংসার-সমুদ্রের পারে যাইতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বিদ্যা, পরাবিদ্যা শ্রেয়, অদুষ্ট জ্ঞান এবং মুখ্য বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার শব্দগুলি মোক্ষদায়ক একই বস্তু হইতেছে। আবার মোক্ষলাভ, জ্ঞান ব্যতীত কদাচ সম্ভবেনা। যেহেতু মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পরম পুরুষ ভগবান সদাশিব বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যাস্তিতে" অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। বেদান্তদর্শনে বলিয়াছেন "ন মোক্ষো লভ্যতে জ্ঞানমন্তরেণ" জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষ লাভের পৃথক উপায় নাই। ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয় সম্ভবতীত্যুক্তং" তত্ত্বজ্ঞান হইতেই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন "জ্ঞান খড়্গোনতন্নিকৃত্য সুখী ভব" অর্থাৎ জ্ঞান রূপ অসি দ্বারা অজ্ঞান পাশ ছেদন করতঃ নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যায়। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন "বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম" জ্ঞানই ব্রাহ্মণাদি সকলের একমাত্র মুক্তিদায়ক। যজুর্ব্বেদে বলিয়াছেন "বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই অমৃত (মোক্ষ) লাভ হয়। "অমৃত" অর্থে ধ্যানবিন্দু শ্রুতিতে বলিয়াছেন "বিশ্বস্যায়তনংমহদিতি" অর্থাৎ নাসিকার মূল দেশের ঊর্দ্ধে দুইটী ভ্রূর মেধ্য যে ললাটস্থান, তাহাই অমৃত স্থান। মতান্তরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগকে চন্দ্র-মণ্ডল বলা হইয়াছে। ঐ স্থানই বিশ্বের মহান আধার স্বরূপ। যদিও পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কাহার আধার বা আধেয় নহেন, তত্রাচ অর্থ প্রকাশ স্থলে বিশ্বের "মহান আধার স্থান" বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু তিনি ভিন্ন অন্য কতকগুলি আধার বা স্থান জগতে নাই। অতএব অমৃত লাভ হয় অর্থে সেই পরমপুরুষ পূর্ণ-ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয় বা মোক্ষ লাভ হয় বুঝিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি অমৃত অর্থে পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্ম বা জ্ঞান বস্তুই উল্লেখ করিয়াছেন; যথা "যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনো-হন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।"

অর্থাৎ যিনি মন, ত্বক, বুদ্ধি ও বীর্য্য প্রভৃতিতে অবস্থিত; অথচ তাহা হইতে পৃথক, যাঁহার মন প্রভৃতি শরীর, অথচ মন যাহাকে জানিতে পারে না, তত্রাচ যিনি মন ত্বগিন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বীর্য্যের নিয়মিতভাবে পরিচালক তিনিই অন্তর্যামী অমৃত স্বরূপ পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপরব্রহ্ম, নিত্য জ্ঞান রূপে চির বিরাজমান।

অতএব জানা যাইতেছে যে, মুক্তি বা মোক্ষদায়ক সাধক বস্তুর নাম জ্ঞান। বিদ্যা, পরাবিদ্যা, শ্রেয়, অদৃষ্ট জ্ঞান এবং মুখ্য বা সাত্বিক অহঙ্কার ইহার যে কোন একটীর অবলম্বনে বা সাধনায় মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী বিধায়ে, ইহারাও মোক্ষদায়ক এক বস্তু হইতেছে। প্রমাণ ও বিচার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মোক্ষদায়ক বস্তুই জ্ঞান। অতএব বিদ্যা, পরাবিদ্যা, শ্রেয় প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি একই রহস্য পর্য্যায় শব্দ মাত্র, সমস্তই এক জাতীয় মোক্ষকর বস্তু বিধায়ে জ্ঞানবাচক প্রতিপাদিত হইল।

গতবারে আলোচিত হইয়াছে যে, জ্ঞানই নিষ্কাম বা পরাভক্তি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ। পরাভক্তির দ্বারাই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি হইয়া অপার্থিব সুখের অভ্যুদয় হয়, অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত হইয়া কামনাবাসনাজনিত সংসারস্পৃহা চিরতরে লোপ পায়। তখন আপনা হইতে পঞ্চকোষ বিবেক ফুটিয়া উঠে, বোধস্থিতা পরমপুরুষ হৃদয়স্থ বলিয়া জ্ঞানে আসে ক্রমশঃ "বোধোহহং-সোহহমস্মি" ইত্যাদি জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে চিরশান্তিলাভ সাধিত হয়। কাজেই সাধন ভজনের সমস্ত উদ্দেশ্য সাঙ্গ হইয়া যায়।

অতএব "পরাভক্তি ধর্ম্মটীও" মোক্ষকর বস্তু হইয়া জ্ঞান বাচক হইতেছে। সুতরাং জ্ঞান, পরাভক্তি, বিদ্যা, পরাবিদ্যা, শ্রেয়, অদৃষ্টজ্ঞান, এবং মুখ্য বা সাত্বিক অহঙ্কার শব্দগুলি মোক্ষদায়ক এক বস্তু হইয় সকলের একত্ব প্রতিপাদিত হইল। অর্থপ্রকাশ বা বোধসৌকর্য্যার্থে শব্দ ও নামের বিভিন্নতা মাত্র, নতুবা সমস্তই একমাত্র "নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপায়" নিত্যবস্তু জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি অভেদ, ইহা সর্ব্বথা বিবাদশূন্য। হিন্দু ধর্ম্মের নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রণান্ত চেষ্টা করিলেও, ইহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যতার গণ্ডীতে আনিতে পারেন না; অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, পরাবিদ্যা ইত্যাদিকে 'এক' অভিন্ন বস্তু ব্যতীত, কদাচ 'দুই, দুই' বিভিন্ন করিতে পারেন না। এইজন্যই পূর্ব্ববারে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ভক্তি চরম লক্ষ্যে এক সত্তার সম্মিলিত হইয়া অভেদ হইবেই হইবে; নানাবেশধারী ধর্ম্ম প্রচারকগণের ব্যাখ্যার কুহকে ভুলিয়া দুই, দুই কদাচ হইবে না। ক্রমশঃ।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা

——:0:——

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ব্যাসচটী।

ব্যাসঘাটটী বেশ সুন্দর ও প্রশস্ত। গঙ্গায় নামিতে কোন কষ্ট নাই। এ দেশে এরূপ ঘাট সচরাচর দৃষ্ট হয় না। নিকটেই ব্যাসগঙ্গা আসিয়া গঙ্গায় মিলিতা হইয়াছেন। ব্যাসগঙ্গার জল যেন গিরিমাটীগুলা। এখানে ব্যাসদেবের মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী প্রাচীন এবং সংস্কারাভাবে অতি জীর্ণ হইয়াছে। এই ব্যাসচটীতে একটী দোতালা ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালা ছাড়া এখানে বিস্তর স্থান রহিয়াছে এবং অনেকগুলি দোকানও আছে।

২৩ শে, মঙ্গলবার—অদ্য রাত্রি প্রভাতে আমরা রওনা হইয়া বেলা ১১॥ টার সময় দেব প্রয়াগ পৌছিলাম। তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র পাণ্ডা শ্রীযুক্ত মায়ারাম তেওয়ারী আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ী ও বাজারে একটী দোতালা ঘর দেখাইলেন। বাজারের বাসাটী পছন্দমত হওয়ায় আমরা সেখানেই আশ্রয় লইলাম। তথায় আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পাণ্ডার সহিত ভগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম স্থানে যাইয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান ও তর্পণাদি সমাপন করিলাম। তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া সে দিবস বিশ্রাম করিলাম।

২৪ শে বুধবার— অদ্য প্রাতে নিজেদের আহারীয় দ্রব্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া বেলা ৮ টার মধ্যে পাণ্ডার সহিত সঙ্গম স্থানে উপস্থিত হইলাম। তথায় স্নানান্তে যথাবিধি তর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি ক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক রাম, জানকী ও লক্ষ্মণ-ঠাকুর দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইলে আমারাও আহারাদি করিয়া সেইদিন তথায় অপেক্ষা করিলাম। (ক্রমশঃ।)

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রমসং-বাদ—পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেবমহারাজ ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ পর্য্যটন করতঃ উত্তর বঙ্গাভিমুখে যাইতেছেন; তথা হইতে বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে কাশীধামে যাইবেন। কাশীধামে হরিদ্বার কুম্ভমেলা-যাত্রীগণ তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। (কাশীর ঠিকানা—৩৬।১১নং লছমনপুরা)

আশ্রমের অন্যতম সেবক শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ ও প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান সময়ে শিলিগুড়ি অঞ্চলে পরিভ্রমন করিতেছেন, তাহারাও উত্তরবঙ্গে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপরমহংসদেবমহারাজের সঙ্গে মিলিত হইবেন।

গত ১০ই মাঘ রবিবার আশ্রমের অন্যতম সেবক শ্রীমৎস্বামী বোধানন্দসরস্বতী ও যোগানন্দ প্রচারোদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন।"

প্রেরিত পত্র—বগুড়া হইতে শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র পুততুণ্ড মহাশয় লিখিয়াছেন—"মহাশয়! গত কল্য ৩রা জানুয়ারী রবিবার শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত সম্রাটের যুদ্ধজয় কামনার্থে

অত্রত্য ৺অলেশ্বরী-তলা-হরিসভায় কীর্ত্তন এবং সভার সভামণ্ডলী কর্ত্তৃক নগরকীর্ত্তন এবং সম্রাটের যুদ্ধজয় প্রার্থনা করা হয়। নগর-সংকীর্ত্তন কালে অত্রত্য সদাশয় সিভিলসার্জ্জন পত্নী মাননীয়া মিসেস্ নারায়ণ মহোদয়া ৺হরিসভায় দুইটী আলো প্রদান করতঃ সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি"।

পূণ্যকার্য্যে দান—শ্রীহট্ট জিলাবাসী মৌলবী শ্রীযুত আবদুল করিম (স্কুলসমূহের ইন্স্-পেকটর) সাহেব বাহাদুর তাহার স্বোপার্জ্জিত পঞ্চাশহাজার টাকা মুসলমান সমাজের কল্যানার্থে দান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচায়কই বটে। দেশে এরূপ দানের যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই অধঃপতিত দেশের এবং জাতির উন্নতি সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ধনিমাত্রেরই বৃথা আমোদ আহ্লাদে অর্থব্যয় না করিয়া এইরূপ ধনের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমরা মৌলবী সাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি; তিনি দিন দিন দেশের ও দশের এরূপ আরও হিতজনক কার্য্যানুষ্ঠান করতঃ ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন ও সাধারণের ধন্যবাদার্হ হউন।

সদ্দৃষ্টান্ত—পাবনা শীতলাই এর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহোদয় বর্ত্তমানে অধঃপতিত হিন্দু সমাজের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তাহার নিরাকরণ কল্পে সমাজের সম্মুখে এক অতি মহৎ সদৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন; আশাকরি-দেশের ও সমাজের প্রকৃত হিতৈষী ধনী ও কৃতী সন্তানগণ এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। আজিও সমাজে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব না হইলেও আচার-পূত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব বোধ হইতেছে; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে শাস্ত্রের বিধান আছে, তাহার ব্যতিক্রমই বর্ত্তমান অভাবানুভূতির কারণ। তিনি এই অভাবমোচনকল্পে ৺কাশীধামে তাঁহার ৺পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ৺রাজ রাজেশ্বরী দেবতার সংসৃষ্ট যে অন্নসত্র আছে, তাহারই সম্মুখবর্ত্তী নিজের একটী অট্টালিকা তাঁহার সংকল্পানুযায়ী শিক্ষার্থীগণের বাসস্থান ও পাঠাগারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন এবং উক্ত অন্নসত্রে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত সাধারণ ব্রাহ্মণ-ভোজন না করাইয়া ঐ ছাত্রাবাসের নির্দ্দিষ্ট ছাত্রদিগকে ভোজন করান হইবে, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ছাত্র নিঃস্ব ও এই ছাত্রাবাসের নিয়মাবলী পালনপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে। নিয়মাবলী শাস্ত্রানুযায়ী প্রনয়ণ করা হইয়াছে। ইহাতে ২৪ জন ছাত্রকে গ্রহণ করা হইবে; সম্প্রতি ১৮ জন গৃহীত হইয়াছে। আমরা এই সদনুষ্ঠানের জন্য অতুল আনন্দ লাভ করিতেছি এবং যোগেন্দ্র বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যোগেন্দ্র বাবু নিজে মহৎ এবং মহৎ বংশজাত, কাজেই তিনি এই মহৎ কাজে আদর্শ রূপে অগ্রসর হইয়াছেন; ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } ফাল্গুণ। { ১১শ সংখ্যা।

শান্তিগীতা।

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে যাদব! মায়া যখন অবস্তু এবং মিথ্যারূপা তখন তাহার কার্য্য কি প্রকারে সম্ভব হয়। যেমন রণনিপুণ বন্ধ্যাপুত্রের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ, অথবা আকাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের সুগন্ধে বস্ত্র সুবাসিত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ মায়ারও কার্য্যকারিতা অসম্ভব ইহাই আমার মত ১-২।

শ্রীভগবান কহিলেন,—হে ভারত! মিথ্যা বস্তুর কার্য্যবহুল দৃষ্ট হয়। রজ্জুদৃষ্টে মিথ্যা সর্প জ্ঞান হওয়ায় ভয় ও কম্পাদি হইয়া থাকে। শুক্তিতে উৎপন্ন যে মিথ্যা রজত ভ্রম, তাহাতে লোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। মিথ্যা মায়াও সেইরূপ মৃষাত্মক এই ব্যবহারিক জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞের নিকট মায়া মিথ্যা, তৎকার্য্যও মিথ্যা, আর মিথ্যা জীব এই মিথ্যা মায়ার কার্য্য অবলোকন করে। তৎসমস্তই স্বপ্নবৎ চৈতন্যে অধ-ভাষিত হয় মাত্র। অজ্ঞব্যক্তি তৎকার্য্যকে সত্য মনে করিয়া বিমোহিত হইতেছে। সম্যক তত্ত্বজ্ঞান হইলে মানব প্রবুদ্ধ হয়; তখন তাঁহার নিকট মায়া বা মায়ার কার্য্য সত্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন সূর্য্যোদয়ে মহাজ্যোতিঃ প্রকাশে তম ও তমের কার্য্য সকল দৃষ্ট হয় না॥৩-৭

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হরে! অকর্ম্ম ও কর্ম্মের ভেদ যাহা আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন॥৮

শ্রীবাসুদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে ইত্যাদি বাক্য যাহা আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, হে বিদ্বন্, তাহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে কহিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥৯

স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কার্য্য হয় শয়ান-

পুরুষের তাহাতে কিছুমাত্র কর্তৃত্ব থাকে না; জাগ্রত হইয়া ঐ পুরুষ অকর্ম্ম দেখে, কারণ স্বপ্নাবস্থার কর্ম্মের সহিত তাহার সঙ্গ বা ফল নাই। স্বপ্নব্যাপার মিথ্যা হওয়ায় তাহার কর্ম্ম বা ফলও মিথ্যা' অতএব সেই কর্ম্মকে অকর্ম্মবৎ জানিবে। এক্ষণে উদাহরণ দিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর ॥১০-১১

মায়িক-সংঘাতে লৌকিক কর্ম্ম ও ব্যবহারে যাহা কিছু হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই মায়ানিদ্রাবশে স্বপ্নবৎ মিথ্যা ॥ ১২ ॥

স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকল্পিত প্রতিভাষিক জীব যে প্রকার তৎকালোচিত ব্যবহার ও বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়, সেইরূপ মায়ানিদ্রাজনিত লৌকিক ব্যবহাররূপ স্বপ্নাবস্থায় সাভাস অহঙ্কাররূপ জীব স্বপ্নবৎ ব্যবহারিক কর্ম্ম ও বিষয়ের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্তই মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মকে অকর্ম্ম দেখেন। অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না। আর জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞলোক সকল কর্ম্মত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহারা প্রত্যবায়-ভাগী হইয়া থাকে এবং তাহার ফলভোগ করে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাহাকেই কর্ম্ম কহিয়া থাকেন। বেদ সকলের উদ্দেশ্যীভূত কর্ম্ম সমূহের যে ফল, তাহা তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞানফল যাহার উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার সকল কর্ম্মই করা হইয়াছে। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ জগৎকে সত্য বলিয়া, বিচারশীল ব্যক্তিগণ তুচ্ছ বলিয়া এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মিথ্যাবলিয়া মনে করেন; এই ত্রিবিধ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে ॥১২—১৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—এই সত্যতত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যে কৃতার্থ হইলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অন্য বিষয় যাহা প্রশ্ন করি, সবিস্তারে বর্ণনা করুন ॥১৮॥

আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, ইহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে, সুতরাং তাহা বর্ণনা করুন।১৯॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, স্বাভাবিক ও নিষিদ্ধ এই পঞ্চবিধ বেদোক্ত কর্ম্ম বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর ॥২০॥

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাহা বেদে বিধান করিয়াছেন, তাহা কেবল বিহিত কর্ম্ম। হে পরন্তপ! যাহা বেদে নিষেধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম। স্বাভাবিক কর্ম্ম সম্বন্ধে বেদ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন। যে সকল কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় তাহা নিত্য কর্ম্ম। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, নিত্যকর্ম্মের ফল নাই। যে সকল পণ্ডিত নিত্যকর্ম্মের ফল নাই বলেন তাঁহাদের বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে। হে পার্থ! নিষ্ফল কর্ম্ম কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে? ফলের অভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং প্রবৃত্তি না জন্মিলে তাহার আচরণও অসম্ভব।২১—২৩॥

নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনে দেবলোক প্রাপ্তি ও বুদ্ধি শোধিত হইয়া থাকে। অকরণে প্রত্যবায়-হেতু পাপফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলাভাববশতঃ প্রত্যবায় জন্য পাপফল উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেরূপ অভাব

হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মে শূন্যভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না ॥২৫॥

নিমিত্তের জন্য যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম কহে। সেই জন্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সদা সম্পাদন করা উচিত। যেরূপ চন্দ্র—সূর্য্যগ্রহণ সময়ে দান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ইত্যাদি করা বিহিত ॥২৬॥

স্বর্গাদি সুখভোগ, ধনাগম, কুশল, সমৃদ্ধি, জয় ইত্যাদি ঐহিক সুখের লালসায় যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম কহে ॥২৭॥

দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ ঐ সকল বিষয়ে যে দৃঢ়তা এবং সত্যবুদ্ধি তাহাই সংসার-বন্ধনের কারণ। অতএব কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে ॥২৮

অধিকারী বিশেষে আবার কাম্যকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কামনা সিদ্ধি হয়, এই লোভজনক বাক্যে বহির্ম্মুখ, দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্ররোচিত করা হইয়া থাকে ॥৩০

সৎ প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তই কাম্যকর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। যেহেতু কাম্যকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে করিতে জন্ম জন্মান্তরে ভোগলালসাক্ষয়ে বুদ্ধি শোধিত হইতে পারে ॥৩১

ঈশ্বরারাধনারূপ দুগ্ধে কামনা-জল মিশ্রিত রহিয়াছে, বৈরাগ্যরূপ অগ্নি-সন্তাপে সেই জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন জলহীন বিশুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় কেবল মাত্র ঈশ্বর-আরাধনাই অবশিষ্ট থাকে। তখন সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, ইহাই কাম্যকর্ম্মের তাৎপর্য্য ॥৩২

একটী কর্ম্মবীজ হইতে দুইটী অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। একটী অপূর্ব্ব, এবং অপরটি বাসনা নামে অভিহিত। অপূর্ব্বে কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে এবং ভোগান্তে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর বাসনা শুভাশুভভেদে বহুবিধ কর্ম্মের সৃষ্টি করে ॥৩৪-৩৫

বাসনা হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি হয়, আবার কর্ম্ম হইতে পুনরায় বাসনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে জীব কেবল সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমন করিতেছে, কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। অতএব কর্ম্ম কেবল জীবের দুঃখের নিমিত্ত এবং পায়ের শৃঙ্খল স্বরূপ। কর্ম্ম-চিন্তা বৈষম্যচিত্ত ব্যক্তিগণের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ॥৩৬—৩৭॥

সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম—সংঘাতদৃষ্টিতে আমার শরণাপন্ন হইও না, স্বরূপ দৃষ্টিতে আমার শরণাপন্ন হও ॥৩৮

আমি এক সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই স্বরূপকে আশ্রয় কর। শ্রুতিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বভূত দেখে' সেই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ॥ ৩০।

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, সন্ন্যাসযোগে সর্ব্বকর্ম্ম এবং তাহার চিন্তা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সংযতচিত্ত হইয়া একমাত্র আত্মাকে জানিবে ॥৪০

বিবেকবশতঃ বিহিত কর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক যে ত্যাগ, তাহাকেই সন্ন্যাস কহিয়া থাকে।

স্বেচ্ছায় অবিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় ॥৪১

আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কর্ম্মত্যাগ করিলে পতিত হইতে হয়। যেমন নদীর উভয় তীরের কোনটাই আশ্রয় করিতে না পারিলে নদীর মধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরাদিগ্রস্ত হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মত্যাগ করিলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অহঙ্কার-রূপ ভীষণ কুম্ভীর-কবলিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৪২

সতত উদরপূরণে অনুরক্ত এবং সঞ্চয়া-সক্ত, এইরূপ আত্মতত্ত্বে পরাঙ্মুখ সন্ন্যাসী বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। অতএব বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥৪৩-৪৪

অবিনাশী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিবে। অহংপদের লক্ষ্য অহং-আদির সাক্ষী, নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয় আমাকে জানিবে। হে অর্জ্জুন! আপনার আত্মাকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া মুক্ত হও ॥৪৫-৪৬

"আমি" ও "আমার" শব্দ প্রয়োগে দেহাত্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার দেহেতে দৃষ্টি করিয়া, আমাকে দেহরূপ জ্ঞানকরে। মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য-শুদ্ধ নির্ব্বিকার ভাব জানে না ॥৪৭

তুমি, আমি এবং সমস্ত পদার্থ চৈতন্ত স্বরূপ, অতএব বিচার দ্বারা নিজের স্বরূপ অবলোকন কর। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারতত্ত্ব তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।

শান্তিগীতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

---:0:---

ষষ্ঠ—অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের কি কর্ত্তব্য ও কি নিষিদ্ধ এবং তাঁহাদের বিশেষ লক্ষণই বা কি আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে সখে! তত্ত্ববিদ্-গণের কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই নাই। তাঁহারা বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত, অকর্ত্তা, ব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বদা আনন্দময় এবং পরমাত্মায় বিশ্রামপরায়ণ, তাঁহাদের কর্ম্মে নিয়োগ বা নিষেধ বিষয়ে বেদ প্রভুত্ব করেন না ॥২—৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষের শুভ বা অশুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই নাই। দেহাভিমানশূন্য অদেহী পুরুষের কর্ম্ম বা কর্ম্মফলভোগ কখনই হয় না ॥ ৪

দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, দৈব, বাসনা, চেষ্টা প্রভৃতির সংযোগে কর্ম্ম হইয়া থাকে ॥ জ্ঞানী বিচার দ্বারা সেই সকল জড়বোধে নিরাশ করতঃ অদ্বয় সচ্চিদা-নন্দস্বরূপে বিশ্রাম করেন ॥ ৫—৬

এই যতিবরের নির্লিপ্ত আত্মতাপ্রযুক্ত তাহাতে কর্ম্মলেশ মাত্র সম্ভবে না! যিনি কর্ম্মের কর্ত্তা, তিনিই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্ম শরীর সম্বন্ধে হয় দেখিতে পাও, সে স্থলেও সাভাস অহঙ্কার কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি

স্বয়ং, স্বপ্রকাশ, সাক্ষী, কূটস্থ চৈতন্ত স্বরূপ-ব্যাপক, তাঁহাতে সংস্পর্শ নাই। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে কর্ম্মেপ্রবৃত্ত লোকসকলের কর্ম্মফল সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥৮-৯

তিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া গৃহকার্য্যে বিচরণ করেন, লোকযাত্রানুরূপ লোক সঙ্গে বিহার করেন। আসক্তি ও সঙ্গরহিত পবনের ন্যায় বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ তত্ত্ববিৎ বাহ্যদৃষ্টিতে স্থূলদেহধারী হইয়াও নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে অবস্থিতি করেন ॥১০

যিনি স্বভাবতঃ বিলক্ষণ, তাহার লক্ষণ তোমাকে আর কি বলিব। ভাবাতীতের আবার ভাব কি, অলক্ষণের লক্ষণ কি? যতি-পুরুষ ভাবাভাব বর্জ্জিত হইয়া বিবিধ ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্ববিধ আচারের অতীত হইয়াও নানাচারে বিচরণ করেন ॥১১-১২

যেমন বায়ুদ্বারা কঞ্চুক (সর্পের ত্বক) পরিচালিত হয়, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মবশে আত্মজ্ঞের শরীর পরিচালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের যথাযথ ভোগের নিমিত্তই শরীর পরিচালিত হইয়া থাকে ॥১৩

যোগী সর্ব্বপ্রকার বেশবিমুক্ত হইয়াও নানাবেশ ধারণ করেন। কোন সময়ে ভিক্ষুবেশধারী, কখন বা নগ্নদেহ, আবার কখন বা ভোগে মগ্ন থাকেন ॥১৪

বহুরূপীর ন্যায় তিনি সর্ব্বদা নানারূপ ধরেন। কেহ ভিক্ষা করিতেছেন, কেহ বা স্বাভৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন। কেহ ভোগে রত রহিয়াছেন, কেহ কামভোগে লিপ্ত, কেহ বা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন, কেহ দিব্য বসনাদি পরিহিত, কেহ বা চীরবসনধারী, কেহ উলঙ্গ, কেহ বল্কমেখলাধারী, কেহ সুগন্ধ দ্রব্যাদিতে বিলিপ্তাঙ্গ, কেহ বা ভস্মভূষিত, কেহ ভোগবিহারী, কেহ বা যুবতী-যান-তাম্বুলাদি ভোগবিহারী, কেহ উন্মত্তবৎ বেশধারী। কেহ বা পিশাচের ন্যায় বনে বিচরণশীল, কেহ মৌনী, আবার কেহ বা অতি তার্কিক, বক্তা, কেহ বা শুভাশীষযুক্ত সৎপাত্র, কেহ বা তাহার বিপরীত আচরণশীল, কেহ গৃহী অথবা বানপ্রস্থী, কেহ বা মূঢ়বৎ, কেহ বা পণ্ডিত। পৃথিবীতে জ্ঞানীগণ এইরূপ বিবিধভাবে ভ্রমন করিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইলেও ব্যক্তরূপে ভ্রমবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমন করেন। বিগতসংশয় পুরুষ নানাভাবে ও নানা বেশে বিচরণ করেন। বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে কখন জানিতে পারা যায় না ॥১৫-২১

দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ লোক বাহ্যলক্ষণই দেখিয়া থাকে। বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া, অন্তরের ভাব কখনই জানা যায় না ॥২২

যে জানে, সেই জানে; তার্কিক লোকেরা কখনও জানিতে পারে না। তাহারা কেবল শাস্ত্ররূপ অরণ্যে নিয়ত ভ্রমন করিতেছে, তাহাদের কখনই নিষ্কৃতি নাই ॥২৩

এই তত্ত্ব অতি দুষ্প্রাপ্য। বহু সাধনে শত জন্মে যদি শুভকর্ম্মফলে ও সঞ্চিত পুণ্য বলে ভাগ্যোদয় হয়, তবে সদ্গুরুকৃপায় এই তত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ॥২৪

যদি সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাতে ভক্তিপরায়ণ হইয়া একচিত্তে আমার পুনঃ পুনঃ সাধনা করে ও আমার প্রীতি উৎপাদনার্থ

বিধিপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে সমুদায় অর্পণ করে, তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥২৫-২৬

তাহার পর বিবেক লাভ করিয়া অন্যান্য সাধন সকল আচরণ করিলে আত্মবাসনার উদয় হয়, তখন আপনাকে জানিবার জন্য উদ্বিগ্নমানস হইয়া দম্ভাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবে, এবং নিত্য গুরুসেবায় রত থাকিয়া গুরু-ঈশ্বরের পরিতোষ উৎপাদন করিবে। এইরূপে গুরুপ্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তত্ত্বাতীত হইবে ॥২৭-২৮।

গুরু প্রসন্ন হইলে পরম তত্ত্বলাভ হয়, এবং তদ্দ্বারা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ভববন্ধনমুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। এইরূপে বিমুক্তসঙ্গ পরমাত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসার-সমুদ্রে সংস্তরণ করেন না অর্থাৎ তাঁহারা জন্মমৃত্যু-রূপ সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন ॥২৯॥

কোনও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বিরক্ত, বিষয়ভোগে বিরত, এবং আশাশূন্য হয়েন। কেহ বা ভোগী, ভোগরাসে আসক্তিপ্রযুক্ত বিষয়ে বিচরণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এই প্রকার পৃথক পৃথক ভাব বিষয়ে প্রারব্ধই হেতু। এই প্রারব্ধ কর্ম্মই নানা প্রকার বাসনা সৃষ্টি করে। যাহার ভোগের প্রারব্ধ, তিনি বিভবে রমণ করেন, এবং যাহার ভোগহীন প্রারব্ধ তিনি বিরক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ॥৩০

প্রারব্ধ হইতে মনুষ্যের বাসনা, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে প্রারব্ধের সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব রহিয়াছে ॥৩১।

শরীরে ভোগ ও জ্ঞান একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে। লোকে ভোগদাতা প্রারব্ধ ভোগদান করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীর যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ভোগদাতা প্রারব্ধ ততদিন শরীরকে ভোগ দান করিয়া থাকে। যেরূপ ঘট নির্ম্মাণ জন্য ঘূর্ণামান চক্র, ঘটনির্ম্মাণ শেষ হইলেও পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগের নিমিত্ত কিছু কাল ঘুরিতে থাকে, সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধের বেগে শরীর কিছুকাল কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ।৩২-৩৩।

হে পার্থ! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের প্রারব্ধ জ্ঞানলাভের পর কেবল মিথ্যারূপ থাকে। তজ্জন্য প্রারব্ধ তাঁহাদিগের উপর তেমন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। প্রারব্ধের দেহ উৎপন্ন করিবার শক্তি জ্ঞানলাভের পর দেহীদিগের অভাবরূপ দেহ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগ প্রদান করে। প্রারব্ধবশে আভাষ শরীরে ভোগ হইয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞযুক্ত পুরুষ জ্ঞান প্রাপ্তি মাত্রই ভোগ বর্জ্জিত হন ।৩৪-৩৫॥

ইতি শান্তি গীতায় ষষ্ঠ-অধ্যায় সমাপ্ত।

—:0:—

মর্ম্ম-বেদনা।

সে দিন দুয়ারে এসেছিলে প্রভো! করুণা করিয়া মোরে,
সন্ধ্যাবেলায় কুটীর চালায় পূজা লভিবার তরে।
করুণা-হস্ত বুলাইয়া দ্বারে বলেছিলে "খোল দ্বার,
আশীষ্ শত আনিয়াছি কত, তোমায় পরাতে হার।"
বহুবার তুমি ডাকিলে আমায়, কত অনুনয় করে,
আমি ছিনু কত তন্দ্রার ঘোরে, আশার স্বপন' পরে।
কতক্ষণে মোর ভাঙ্গিল নেশা, জাগিয়া শুনিনু স্বর;
অলশে অঙ্গ আবরিয়া ছিল, উঠিতে লাগিল ডর।
এই উঠি উঠি, উঠিতে না পারি, কি যেন কেমন হল',
কতক্ষণ জানি গোঁয়াইয়া গেল, তবে ত সাহস এল।
উঠিয়া আসিয়া দেখিনু বাহিরে না, আছে সে জন আর,
যাচিয়া আসিয়া অনাদর লভি' গিয়াছে স্বস্তির পার।
অবশ হইল অঙ্গ, তখনি ঢাকিল নিরাশ মেঘে,
ইতি উতি করি' খুজিয়া না পাই, সারা হনু ডেকে ডেকে।
সেই দিন হ'তে, জীবন আমার বিষাদে ভরিয়া গেছে,
হৃদয় কন্দরে নিরাশ প্রাণটী মরমে মরিয়া আছে।

দীন—ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

———:0:———

বিষ্ণুর অবতার।

(পশুযোনি।)

যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন শ্রীভগবান দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ধরাধামে নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, এ বিষয়ে হিন্দুমাত্রেরই সন্দেহ নাই তাই আজ ভারতের সর্ব্বত্রই রাম-কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতারগণ কোন না কোন সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহরূপে পূজিত হইতেছেন; কিন্তু তত্বানভিজ্ঞ অনেক হিন্দুই জানেন না, ভগবান্ কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে পশুযোনিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য যখন পশুযোনিতে সিদ্ধ হইতেছে না, তখন মৎসাকূর্ম্মাদিকে ভগবানের অবতার বলা হয় কেন? বাস্তবিক এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, তাই আজ "আর্য্য-দর্পণের" স্বধর্ম্ম-নিরত পাঠকগণের জন্য তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত হিন্দুর দশ অবতার ভগবানের অবতার নহে, তাই ভগবান্ ব্যাসদেব এই সকলকে অংশ, কলা প্রভৃতি বলিয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে যুগে যুগে স্বয়ং ভগবানই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আর পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ভূভার হরণ করিতে পুনঃ পুনঃ অবতার হইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে এরূপ দ্বাবিংশতি প্রকার অবতারের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার হয়শীর্ষ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই কয়টী অবতার পশুযোনির অন্তর্গত। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগের বিষয়ই আলোচনা করিব।

অবতার-তত্ত্বের আলোচনার পূর্ব্বেই বিষ্ণু কি, না জানিতে পারিলে তাঁহার অবতারবাদ বুঝিতে সুগম হইবে না। তাই প্রথমতঃ আমরা বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রলয় কালে ব্রহ্মাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, ভগবান্ সমস্ত পদার্থের কর্ম্মবীজ বা জীববীজ নিজ অঙ্গে সংহৃত করিয়া, সেই কারণবারিতে শায়িত থাকেন, তখন প্রকৃতিও নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং উঁহার গুণক্ষোভও হয় না, কাজেই পরিণামও প্রাপ্ত হয় না। সেই সময়ে ঐ গুণ-স্পন্দন রহিত ও মৃতবৎ থাকে। তৎপরে সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন পুরুষের তেজ, মূলাপ্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, তখনই উঁহার গুণক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমবিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করে। "সত্ত্বংরজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা"। এই মূলা প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই মূলা প্রকৃতি অব্যক্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা। মানুষ উঁহা ধারণা করিতেই পারে না, মানুষের নিকট উঁহা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত। স্ত্রী-অণু যেমন পুং-অণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণামপ্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া স্থূলা প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড়-বিজ্ঞানের মতে জড়পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ যে প্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মূলা প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণাম বিকার এবং বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুরুষ-সংযোগে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইয়া গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়। এই তিনই গুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এক কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ঈশ্বরের তিনটী গুণ বিভাগ। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, ঐ দেবতা-ত্রয়কেই জানিতে হইবে। তিন গুণকে জানিতে না পারিলে সগুণ অর্থাৎ—পূর্ণ গুণাভিব্যক্ত ঈশ্বরকে জানিবে কি প্রকারে? পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি স্বীকার ও সাধনা করিয়া থাকেন। যদিও অন্যান্য ধর্ম্ম-দর্শন-বিজ্ঞানের নিকট যুক্তি দেখাইতে হইলেই অবনত মস্তক হয়, তথাপি এই গুণ-ত্রয়ের ত্রিমূর্ত্তি তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানগণ পিতা-পরমেশ্বর (God the Father) পুত্র-পরমেশ্বর (God the Son) এবং কপোতেশ্বর (Holy Ghost) বলিয়া, মুসলমানগণ খোদা, রসুল ও নবি বলিয়া,—বৌদ্ধগণ বোধিসত্ত্ব, গৌতমবুদ্ধ ও প্রত্যেক-

বৃদ্ধ বলিয়া, ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির আভাষ প্রকাশ করেন। ফলতঃ যিনি যে ভাবেই বলুন, মূলে ঈশ্বরের বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্রপূর্ণ ভাবময় শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ত্রিমূর্ত্তি। ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্যমিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল ও সত্ত্বের সহিত মিলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু বলা যাইতে পারে। এক ব্রহ্মই অবস্থাভেদে বস্তু ও শক্তি, এই দ্বিবিধ ব্যক্তভাবে পরিণত। শক্তি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্র চৈতন্যভাবকে মায়া বলে। ঐ মায়া দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া,—অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সহযোগে পুরুষ কার্য্যপর হইয়া জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য-জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ঈশ্বরের তিনটী গুণ তিনটী শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছেন। যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চৈতন্যপ্রবাহ-বস্তু সংগ্রহ করিয়া, জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন, তিনি চৈতন্যময় স্বভাব-পুরুষ বা ব্রহ্মা। যিনি পরম চৈতন্যাবস্থা হইতে জীব বা আত্মারূপে মায়া-মধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে অর্থাৎ-ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশে রাখিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু। আর সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণাবস্থাকে যিনি ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্যরূপী জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্য ও সৎকে প্রয়োজন মতে অংশ করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন, তিনিই হর বা মহেশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী; তাঁহা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি (ব্রহ্মা) সৃজন করিতেছি, তাঁহার বশীভূত হইয়া হর সকল বস্তু হরণ করিতেছেন এবং বি পালন করিতেছেন।"

২য়স্কন্ধ ৬ষ্ঠঅঃ ৩২ শ্লোক।

বিষ্ণু বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মবশ করণের নাম পালন। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু বা সত্ত্বগুণ এবং সেই গুণশক্তি ত্রিভুবনপালনকর্ত্রী লক্ষ্মী। এই অনন্ত সত্ত্বা, পুরাণে সহস্রশীর্ষধারী নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মের তিন প্রধান সত্ত্বা জগৎ-ক্রিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ; সৎ উপাদান কারণ, চিৎ নিমিত্ত কারণ এবং আনন্দ ভোগকর্ত্তা। ভোগাবস্থায় স্বরূপ মূর্ত্তি অর্থাৎ সকল চেষ্টা, যাহা আনন্দ নামে কীর্ত্তিত, তাহা চরিতার্থ করিতে নিমিত্ত কারণের সাহায্যে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিতেজ কাষ্ঠ খণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অন্নাদি প্রস্তুতের নিমিত্তকারণ হয়, সেইপ্রকার, এই বিশ্ব কার্য্যরূপী উপাদান সমূহে প্রকাশার্থ চেষ্টা ও নিমিত্তই একমাত্র কারণ-চৈতন্য-সত্ত্বা। সেই চিৎ-সত্ত্বাই অনন্ত শিরোধারী শেষশায়ী নারায়ণ বা বিষ্ণু। অনিশ্চিত গতি কাল-শক্তিকেই পুরাণে শেষ-নাগ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ বিষ্ণুর এই চারিহাত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাঁহার পদ। সৃষ্টির মূলীভূত জগৎকেন্দ্র

বিষ্ণুর নাভিপদ্ম। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক সর্ব্বাঙ্গ,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের আধার বলিয়া তাঁহার নাম অনন্তদেব, এবং তিনি অনন্তবীর্য্য পুরুষ; ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়াই মহাশক্তি-সাধক গাহিয়াছেন;—

"ধরেরে সহস্রবাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ;
সহস্র বদনে খায়, সহস্র লোচনে চায়,
সহস্র শ্রবণে শুনে কথারে;——
সহস্র শির না হ'লে বল্‌ কে রে অবোধ প্রাণ,
এতই গরবে করে সহস্রধারাতে স্নান,
সহস্র ভাব-বিভোরা, সহস্র ধ্যানের অগোচরা,
ঐ তো তোমার সহস্রারে অহরহ বাস-করে॥"

বিষ্ণুর সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরাল অবস্থাকে স্থিতি বলে। যথা:—

আবির্ভাব তিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে।
কৈয়ট।

ব্রহ্মার রজঃগুণ বা চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্বের আবির্ভাব এবং শিবের তমঃগুণ বা সংহরণ শক্তিতে বিশ্বের তিরোভাব ইহার অন্তরালেই স্থিতি। লক্ষ্মীদেবী এই স্থিতি বা পালন-কার্য্যের শক্তি। লক্ষ্মী মহামায়া বা আদ্যাশক্তির বিক্ষেপ-শক্তি। মহামায়ার দ্বিবিধা শক্তি; এক আবরণ শক্তি;—অপর বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তিতে আত্মা কি আমি কে, জানিতে দেয় না, তাহাই আবরণী শক্তি, আর যে শক্তিতে সৃষ্টি-সামর্থ্য বিদ্যমান তাহাই বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই প্রকার আত্মবিষয়ক অজ্ঞান-আবৃত-আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা সেইপ্রকার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এই বিক্ষেপশক্তিই নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি করিতেছে।

লক্ষ্মীই শ্রী;—জগতে ভোগৈশ্বর্য্যের যে কিছু পদার্থ আছে, তাহাই লক্ষ্মী। সেই সৌন্দর্য্য-শোভাময় পদার্থই ত আমাদিগকে মিথ্যাজ্ঞানে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান বিষ্ণুর সেই বিক্ষেপ শক্তিই ত স্থিতির হেতু। টাকাকড়ি বিষয়বিভব বাড়ীঘরদুয়ার ঐ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই ত আমাদিগকে রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় ভুলাইয়া রাখিয়াছে। তিনি স্থিতিকারিণী। লক্ষ্মীই ভগবান বিষ্ণুর সহিত বিহারে রত থাকিয়া আমাদিগকে ধনাদি দানে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই জগতে ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতেছেন, তাই ভগবন্ লক্ষ্মীবন্ত। তাই, যাহার টাকা আছে, ধন আছে, বিষয় বিভব আছে, ফল কথা যাহার বিক্ষেপ শক্তির যত অধিক বাঁধন আছে, তাহাকেই লোকে লক্ষ্মীবন্ত বলিয়া থাকে।

বিষ্ণু কি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সৃষ্টি-বিজ্ঞানের ব্রহ্মগুণ এবং তাঁহাদিগ হইতেই প্রাথমিক সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমর্থিত। এই বিষ্ণু দেব-দেহে অহংকারের অর্থাৎ জীবাত্মার আশ্রয়দাতা হইয়া পঞ্চপ্রাণরূপী সর্পের আশ্রয়ে সংকর্ষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন।

হয়শীর্ষ, মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এই গুণময় বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা পূর্ণ ভগবানের অবতার নহে,—গুণাবতার মাত্র। এই জন্য তাঁহাদিগের দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল গুণময় সৃষ্টিরই উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকেন। সুতরাং মৎস্যাদি অবতার সৃষ্ট সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ অবস্থার তত্ত্বমাত্র; বিষ্ণুর ঐ মৎস্যাদি মূর্ত্তির রূপক ভেদ আছে। সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান গুলি পুরাণের রূপক। কিন্তু এরূপ রূপক নহে; যাহা নহে বা অসম্ভব ঘটনা তাহাই বিশেষ বুঝাইবার জন্য বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে সেরূপ রূপক লিখিত হয় নাই। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যেমন বিষ্ণুর কার্য্যাবলী অজ্ঞ মানুষকে বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য বিষ্ণু সাজিয়া তাঁহার লীলা অভিনয় করে, তদ্রূপ শক্তিসকলও মহিমা জ্ঞাপনার্থ রূপ ও আকার ধারণ করেন। তবে তাহারা রূপক এই-জন্য যে, শক্তি বা চৈতন্যের রূপ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, সে যে রূপ তাহা রূপক। সেই রূপকের এমনভাব—এমন তাৎপর্য্যার্থ আছে, যাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। যাহাদের বুদ্ধিতে দর্শন-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না, গল্পে, উদাহরণে তাহাদেরই জন্য পুরাণাখ্যানের সৃষ্টি। অদূরদর্শী, অজ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পুরাণাখ্যান গল্প বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দু শাস্ত্রোপদেশ অধিকারীভেদে—সেইজন্য কিঞ্চিৎ আবৃত। যাহারা অধিকারী, তাহারাই মর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হইবে, অনধিকারী কেবল অর্থ বুঝিয়া কি করিবে—মূল বিষয় বুঝিতে পারিবে না। শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনাদিতে সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ, পুরাণাদিতে স্থূল কথার প্রসঙ্গ। ইয়ুরোপীয় বিদ্যায় যেমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিষয়সকল চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয়,* হিন্দুশাস্ত্রে সেইরূপ অগ্রে দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমুদয় শ্রুতি, স্মৃতিদর্শনে বিবৃত হইয়া, তৎপরে সেই দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্বসমুদয় পুরাণে বিস্তারিত আকারে খণ্ড-বিখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পুরাণের রূপ-আকার-বিশিষ্ট দেবদেবী সকল বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা। খণ্ডিত স্থূলরূপ ও প্রতিমা। সেই সমস্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ পারমার্থিক বিষয়—অধ্যাত্ম-জগতের প্রকৃত ঘটনা ও তত্ত্বকথা। এক্ষণে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

বিষ্ণুর ঐ হয়শীর্ষ, মৎস্য প্রভৃতি অবতার-গুলি পুরাণের,—রূপক যাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা সৃষ্টির ক্রমবিকাশাবস্থার প্রকৃত-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব। বুঝিবার চেষ্টা করে না বলিয়াই সাধারণে সে তত্ত্ব বুঝিতে পারে না,—কেবল সংশয়াকুলিত চিত্তে বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসে। থাক! এক এক করিয়া বিষ্ণুর পঞ্চমূর্ত্তিগুলি বিশ্লেষণ করা যাউক। প্রথমতঃ পুরাণের মূল-আখ্যান-গুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে হইবে।

হয়শীর্ষ-অবতার। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের

*১৩১০ সনে পৌষমাসে কলিকাতায় জাতীয় মহা-সমিতির (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে যে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে সূর্য্য হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টিপ্রণালী চিত্র সাহায্যে দেখান হইয়া-ছিল। আঃ দঃ সঃ।

২য় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের সরল অনুবাদ এই যে—"হে নারদ! আমি (ব্রহ্মা) যখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন সেই যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু হয়শীর্ষ নামে যজ্ঞপুরুষ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই হয়শীর্ষ পুরুষের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বেদছন্দ ও বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াসমূহ এবং বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাক্য সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

ভাবার্থ এই যে,—হয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়গণকে হয় বা অশ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—অন্যত্রেও আছে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বের সহিত তুলনা অনেক স্থলেই করিয়াছেন। তাহার কারণ, ইন্দ্রিয়শক্তির গতিও অশ্বের ন্যায় উদ্দাম ও দ্রুত এবং বলগাদি দ্বারা বশে রাখিলে, উভয়রা অনেক শুভকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। আর শীর্ষ অর্থে অগ্রভাগ। ব্রহ্মার যজ্ঞই সৃষ্টির বিকাশ। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই বা যজ্ঞের মন্ত্র, কার্য্য ও উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলেই বিষ্ণু প্রকাশ হয়েন। ব্রহ্মার সৃষ্টি স্থূল, তাহাতে আত্মরূপী বিষ্ণু প্রবিষ্ট না হইলে সৃষ্টি ক্রিয়াশীল হইত না—পদার্থ চৈতন্যময় হইত না। তাই ব্রহ্মার সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু আত্মারূপে সৃষ্টি মধ্যগত হইয়া মন ইন্দ্রিয়াদিকে সজীব ও প্রাণাদির কার্য্যদ্বারা সৃষ্টির সাফল্য করিয়াছিলেন।

এক্ষণে, প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্মার কারণসৃষ্টিই যজ্ঞের প্রথম অবস্থা এবং কার্য্যসৃষ্টিই পরিণামাবস্থা। ঐ কার্য্যই জীব ও জগৎ। এই অবতারের ভাবার্থ এই যে, বিষ্ণু বা স্থিতির দেবতা, ভূতাদি লইয়া ইন্দ্রিয়ধারী হইয়া জীব হইলেন।

মৎস্য অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের সরল অনুবাদ এই যে,—"হে নারদ! যুগান্ত সময়ে জগতের সকল জীবসংযুক্ত পৃথ্বীময় নৌকার সহিত মনুকে গ্রহণ করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে মমমুখনিঃসৃত বেদমার্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই জীবময় নৌকায় প্রদান করিয়া প্রলয়-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।"

এই অবতারের ভাবার্থ এই যে,—জী অর্থে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম; ইহারই বশে মনুষ পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। পৃথ্বীময় অ এখানে সর্ব্বভূত কারণময়। সকল জীবে যে স্বাভাবিকী জ্ঞান—তাহাই বেদ, প্রল হইবার সময় ভগবান্ আত্মদত্ত কাল ক স্বভাব ও মায়া সমুদয় সংহরণপূর্ব্ব আপনাতে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। জী প্রকাশক শক্তির নাম মনু। জীবাদি ক ও অদৃষ্ট, আর ভূতাদির সূক্ষ্ম কারণই মা বা কারণবারি, ইহাতে প্রলয় কালে কথা বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ—ভগবান্ প্রল কালের অন্তে সেই কারণবারি হইতে মনুকে বা জীব-প্রকাশিকা শক্তিকে (অর্থা অদৃষ্ট বীজ) গ্রহণ পূর্ব্বক বেদ বা স্বাভাবি জ্ঞান তাহাতে অর্পণপূর্ব্বক সৃষ্টির বিকা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন মৎ অবতার—কেন না, তিনি তখন মৎ অর্থাৎ সক্ষভাবাপন্ন।

কূর্ম্ম অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের

স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকের সরল অনুবাদ এই যে,—"হে নারদ ! যখন অমর ও দানবগণ অমৃত লালসায় ক্ষীরসমুদ্রকে মন্দরপর্ব্বত দ্বারা মন্থন করেন, তখন আদিদেব ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মমূর্ত্তি ধরিয়া পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্ব্বত-ঘর্ষণ যেন তাঁহার পক্ষে নিদ্রাবস্থায় গাত্রকণ্ডুয়নসদৃশ সুখময় হইয়াছিল।"

ইহার ভাবার্থ এই যে,—মৎস্য অবতারে পূর্ব্ব জীবের অব্যক্ত বীজভাবও জ্ঞানান্বিত হইয়া জড়ে অন্বিত হইল; ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু সে জীব কে?—জীবও ঈশ্বর। জড়ে অন্বিত বলিয়া জীবেশ্বর। এক্ষণে তাহার পরের অবস্থা এই অবতারে বলা হইতেছে। কূর্ম্ম অর্থে স্বকীয় ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ এবং স্বইচ্ছায় তাহার লয়। ঈশ্বর সগুণ হইয়া আপনাতে লীন কারণসমূহ হইতে সৃষ্টি করিতে আপনিই নিরত হইলেন। দেব ও দানবগণ অমৃতাশয়ে তখন উন্মত্ত। তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে,—কিন্তু অমৃত বা প্রকৃত সুখ কি? তত্ত্ব কি? তাই আদিদেব বিষ্ণুর কচ্ছপাকৃতি—সংহরণ ও বিকাশ দেখান, ইহা সৃষ্টি ও লয়ের কথা। এক্ষণে বরাহ-অবতার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

বরাহ-অবতার হইয়া কারণার্ণবনিমগ্না বসুন্ধরাকে দংষ্ট্রা দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—জীব, স্বীয় কর্ম্মফলের বীজ লইয়া প্রলয়কালে কারণবারিতে নিমজ্জমান ছিল,—বরাহ এস্থলে ক্রিয়মান কাল। দিক্, কাল প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বর। সুতরাং ইহাই বিষ্ণুর বরাহ অবতার।

নৃসিংহ-অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকের অনুবাদ এই যে;—"হে নারদ! দেবগণের ভয় নাশ করিবার জন্য সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, ভীষণ ভ্রূকুটীসংযুক্ত করালবদনসমন্বিত দৈত্যেন্দ্রকে ত্বরায় গদাঘাতে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপন উরুদেশে ধারণ করতঃ নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।"

এই অবতারের ভাবার্থ কারণজগতের বাহিরের কথা,—ইহা জৈবিক দেহতত্ত্ব। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ইহারা দুই ভাই। শাপে দৈত্যবংশে জন্ম গ্রহণ করে, এবং ইহাদিগের স্বভাবই এই যে, ইহারা ভগবানের সহিত শত্রুতা করিবে,—সেইরূপ বন্দোবস্তই ছিল। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে, অবিদ্যাগর্ভজাত যে রিপু, সে ভগবানের শত্রু, কিন্তু ভগবানের কেহ শত্রু থাকিতে পারে না, তাই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুও ভগবানের দ্বাররক্ষক দ্বারী ছিল,—ভগবান্‌কে লোকে সহজে না দেখিতে পায়, এই জন্যই দ্বারী; কিন্তু ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মজ্ঞের) ভগদ্দর্শনে দ্বারী বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল; তাই ব্রাহ্মণে শাপ দিয়াছিলেন। সেইজন্যই দুই ভ্রাতার জন্ম। প্রবৃত্তি তমোগুণা হইলে অবিদ্যা নাম ধারণ করে;—চৈতন্য যখন ঐ প্রবৃত্তি দ্বারা আরোপিত হয়, তখন তমোগুণী হইয়া থাকে। এখন, চৈতন্য তমোগুণে আকর্ষিত হইলে, একাংশে জগতের লোপ হয়, অর্থাৎ—প্রলয় প্রকাশ হয়। অপরাংশে জীবের নাশ হয়। হিরণ্যাক্ষ যে ভাগের সংজ্ঞা, সেই ভাগ প্রথম এবং

তমোগুণী যে চৈতন্যাংশ অজ্ঞানরূপে জীবের লয় সাধন করে, তাহাই হিরণ্যকশিপু। আর সাধকের যে বিশ্বাস, তাহাই প্রহ্লাদ নামে আখ্যাত। অজ্ঞান আত্মদর্শন করিতে বাধা জন্মায়, ইহাই হিরণ্যকশিপুর দেব-দ্বিজ-সাধু-ভক্ত-পীড়ন। সাধক যখন উপাসনা আরম্ভ করেন, তখন পরম চৈতন্য তাঁহাদের সন্নিহিত-আত্মদর্শন প্রদান করেন, এবং অজ্ঞানকে নাশ করেন,—এবং অজ্ঞাননাশই হিরণ্যকশিপুর বিনাশ বুঝিতে পারিবে।

পাঠক! গুণাবতার বা বিষ্ণুর পশুযোনির প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিয়াছেন কি? অতি সুন্দর কথা। সৃষ্টিতত্ত্বের এত বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্মযুক্তি অন্য কোথাও নাই। ভারতের সুবর্ণযুগে যোগবলশালী ঋষিগণের তত্ত্বজ্ঞানে এই সকল সূক্ষ্মসৃষ্টিবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রে তাহাই নানা ভাবে নানারূপে প্রচারিত হইয়াছে। অনধিকারী তাহা পাঠ করিয়া সমস্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল ও বিসংবাদী বোধ করে। শাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞান হয় না—জ্ঞান হয় সাধনায়। সাধন-বলহীন কামকলুষিত জীবের বিদ্যা কেবল পাখীর হরিনাম শিক্ষা। আগে সাধনবল সংগ্রহ কর, তখন বুঝিতে পারিবে, হিন্দুশাস্ত্র কিরূপ গভীর, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানে পূর্ণ এবং হিন্দুধর্ম্ম অলজ্ঘ্যপ্রমাণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইয়া স্বয়ং সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা-রূপে চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। উপসংহারে নিবেদন এই—অনুসন্ধান করিয়া, সাধনা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের গৌরব জাগ্রত ও পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং নিজেও দুর্লভ মানব জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

দোহেলা।

(১)

সকালে সন্ধ্যায় জাগাতে তোমারে,
ডাকিছে তোমারি দোহেলা;
তোমারি হৃদয়নিকুঞ্জে বসিয়ে,
তোমারি প্রেমেতে আপন ভোলা।

(২)

তোমারি শান্তি-সমীরণ তার,
মুছিয়ে নিয়েছে হৃদয়-ভার,
তোমারি স্নেহের অমৃত ধারায়,
সিক্ত করেছে কণ্ঠ তার।

(৩)

তোমারি আশায় তোমারি দোহেলা,
ডাকিছে বসিয়ে তোমারি ডালে,
উঠ একবার জাগো প্রাণেশ্বর,
দোহেলা তোমারি পড়িছে ঢলে।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন।

—:0:—

সন্ন্যাসী।

হে সন্ন্যাসি! মূর্ত্তিমান আদর্শ ত্যাগের,
নিজগুণে বরণীয় তুমি জগতের॥
পূত ধরা পদরেণু পরশে তোমার,
নমি তোমা হে সন্ন্যাসি! শত শত বার।

বিশ্বের বিভব তুমি চাহ না কখন,
স্বেচ্ছায় ভিখারী সাজ করেছ গ্রহণ॥
ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব তুমি তুচ্ছ করি জ্ঞান
নির্জ্জনে বিশ্বের হিত কর সদা ধ্যান॥

ভিখারীর সাজ তব কাঁধে ভিক্ষা-ঝুলি,
কত শত নরপতি হয়ে কৃতাঞ্জলি
লুণ্ঠিত চরণে তব; তুমি মহাবীর,
চঞ্চল নহ ত তাহে প্রশান্ত গম্ভীর।

যশ, মান, গৌরবের শত প্রলোভনে
দৃকপাত কর নাই, দলেছ চরণে
অসার অনিত্য ভাবি; রহি এক ধ্যানে
লভিয়াছ জ্ঞানরূপ অমূল্য রতনে॥

ত্যাগীশ্বর হে সন্ন্যাসি! এস হেথা নেমে,
ওহে তত্ত্বজ্ঞানী আছে কোন পুণ্যভূমে?
জ্ঞান-দীপ হাতে লয়ে এস এ আঁধারে
পথ প্রদর্শন কর মোহান্ধ জনেরে॥

কুমারী শৈলবালা।
শান্তি-আশ্রম।

---:0:---

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—বৈরাগ্যক্ষেত্র নহে।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র কি বৈরাগ্য-ক্ষেত্র এতদ্বিষয়ে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে মত-পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পার্থক্য দৃষ্ট করিয়া আর্য্য-বংশধরগণ ঘোর বিপদে পতিত হয়েন। প্রকৃতপক্ষে সংসারকে কিরূপ চক্ষে দেখিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়েন।

সনাতন ধর্ম্মোপদেষ্টা অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ ত্রিকালদর্শী ঋষিবৃন্দ যে কোনসময়ে এই মর্ত্তভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা ইদানীন্তন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বেরও একরূপ সাধ্যাতীত। তাঁহারা যে সর্ব্বদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লিখিত অনন্ত জ্ঞানার্ণবপ্রতিম বিপুল শাস্ত্রাদিতে প্রতিপন্ন ও প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বদর্শী হইয়াও তাঁহারা একটী বিষয়ে দৃষ্টি করেন নাই; দৃষ্টি করিলে, হয় তো আজও আমরা পৃথিবীর নিকটে গুরু বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিতাম। তাহা হইলে, তাঁহাদের পবিত্র কুলে এত কুলাঙ্গার দেখা দিত না। তাই বলিতেছি, একটী বিষয় তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই। সেটী কি? সে বিষয়টী এই যে, তাঁহারা যখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নখ-দর্পণে দেখিতে পাইতেন, তখন তাঁদের বুঝা উচিত ছিল যে, তাঁহাদের বংশধরগণ উত্তরকালে স্থূলবুদ্ধি হইয়া

জন্মগ্রহণ করিবে; তাঁহাদের ন্যায় সর্ব্বভেদিনী সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত হইবে না। এইটুকু যদি তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আজ শাস্ত্র খণ্ড এতটা দুর্ব্বোধ্য হইত না। তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা অতীব সরল করিয়া শাস্ত্রের বাক্য-বিন্যাস করিয়া যাইতেন। মূর্খ স্থূলবুদ্ধি সন্তান যেরূপ ভাবে বুঝিতে সক্ষম, তাঁহারা সেইরূপ ভাবে বুঝাইতেন। তাঁহারা যে গূঢ়ার্থের আবরণে শাস্ত্রার্থ আবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপ্রকাশেচ্ছা বা কোনরূপ খলতা বুঝিতে হইবে না। পরার্থপরায়ণ, পরমেশ্বর-প্রতিম, পরম পবিত্র সেই ঋষিগণের দেবদুর্লভ নির্ম্মল চরিত্রে তাদৃশী নীচতা থাকিতেই পারে না। তাঁহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বংশধরগণও তাঁহাদেরই ন্যায় সর্ব্বভেদিনী কুশাগ্রতীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রাদিও অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। তাঁহাদের এতদ্ধারণাটাই ভুল হইয়াছিল।*

তাই বলিতেছি, শাস্ত্রার্থ বুঝিতে আমরা অক্ষম। শাস্ত্রে আপাত-বিরুদ্ধ অনেক কথাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য আছে, সেইটুকুই বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র কি বৈরাগ্য-ক্ষেত্র এতদ্বিষয়েও দুই প্রকার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকে বুঝেন যে, সংসার কর্ম্মক্ষেত্র নহে—ইহা বৈরাগ্য-ক্ষেত্র। তাঁহাদের অনুকূলে শাস্ত্রবচন এই :—

"ঔপাধিকীতর প্রীতির স্থিরত্বান্ন তাত্ত্বিকী"—সাংখ্যসার; "দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজা মতাঃ—ভাষাপরিচ্ছেদ; 'দ্বিত্বাদয়ঃ অপেক্ষা বুদ্ধিজন্যা.—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী; "দ্বিত্বাদিকন্তু সর্ব্বত্রানিত্যম্"— তর্ক সংগ্রহ; "হেতুত্বাপেক্ষী বুদ্ধিনাশেন দ্বিত্বনাশাদিতিভাবঃ।"—নীলকণ্ঠভট্ট; "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"—বৃহদারণ্যক, কঠ; "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং' —পাতঞ্জল দর্শন; "ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে' —শ্রুতি: "ন ভোগাদ্রাগশান্তিমুনিবৎ—সাংখ্যসূত্র; ' "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—পাতঞ্জলসূত্র; "বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে—গীতা; "দুঃখ লভ্যান দুঃখমগ্নান্ পরিণামেহতী দুঃখদান। বিবয়োত্থান সুখাভাসান ধিক স্বাত্মসুখরোধকম ॥'—সাংখ্যসার; ইত্যাদি।

যাহারা সংসারকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বুঝেন যাহাদের ধারণা কর্ম্ম অপরিহার্য্য, তাহাদের অনুকূলে শাস্ত্রবিধি এই :—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"—ঈশোপনিষৎ; "তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদা সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম।—কেনোপনিষৎ; "নিয়তঃ কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্য কর্ম্মনঃ। শরীর যাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।" গীতা ৩।৮; "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ গীতা. ৩।৫; "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"—গীতা. ৩।১৫; "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ—গীতা. ৩।২০; "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ঐ দুইটী আপাতবিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য কি? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, কর্ম্ম আমাদিগের অপরিহার্য্য। কর্ম্মে

* "আর্য্য-ঋষিগণ ভুল করিয়াছেন." এ সম্বন্ধে আমাদের মতের অনৈক্য আছে।

আঃ দঃ সঃ।

বিরতি অভ্যাস—কর্ম্মে বৈরাগ্যাবলম্বনও একটী কর্ম্ম ! সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইবে ? কিন্তু সরিষাকেই যে ভূতে পাইল ! কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে ? মূঢ়, সেই বৈরাগ্য অবলম্বনই যে কর্ম্ম ; দাহিকাশক্তি বাদ দিলে যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না, আর্দ্রতাপরিশূন্য হইলে যেমন জলের জলত্ব থাকে না, শুভ্রতা বাদ দিলে যেমন দুগ্ধের ধারণা অসম্ভব হইয়া উঠে, তদ্রূপ কর্ম্ম বাদ দিলে বৈরাগ্যও বোধগম্য হয় না । কর্ম্মশূন্য বৈরাগ্য, চতুষ্কোণ গোলোক আর সোণার পাথরের বাটী একই কল্পবৃক্ষের উপাদেয় ফল । এবম্প্রকার সুস্বাদু ফলের আমদানি "ম্যাড্ডভেট" হইয়া থাকে; এবং কমলাকান্তের দলই সানন্দে উহা উপভোগ করেন ।

বৈরাগ্য অবস্থাটী একটী কল্পনাপ্রসূত আদর্শাবস্থা । মানুষ কর্ম্ম করিতে করিতে বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক চিত্তে সন্তোষ সঞ্চয় করিয়া এতদবস্থায় (বৈরাগ্যাবস্থায়) আরূঢ় হইবার চেষ্টা করিবে, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ । প্রবৃত্তির উপভোগ ব্যতীত নিবৃত্তি আসিতে পারে না; উপভোগ-বেদীর উপরে বৈরাগ্যকে স্থাপন না করিয়া যদি উহাকে উদ্দাম বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে তাদৃশবৈরাগ্য কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর সৈকত-কূলে বালকের বালুকা-পুত্তল-প্রতিষ্ঠার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে । তাদৃশ বৈরাগ্য অতীব অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণভঙ্গুর, অর্থশূন্য বর্ণ-বিন্যাস মাত্র; উহা সমাজ বা জাতি বা ধর্ম্মের ভিত্তিগঠনোপযোগী প্রস্তরের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না । প্রাগুক্ত আদর্শে বৈরাগ্যে আদৌ আরোহণ করা যায় কিনা সে বিষয়েও ঘোর সন্দেহ । এই সন্দেহও শাস্ত্রমূলক । বাসনার পরিতৃপ্তিই যে ঐ আদর্শ-সোপানের প্রথম ধাপ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে । এই পরিতৃপ্তি বিরতি-সম্ভূত হইতেই পারে না । যেখানেই বিরতি, সেখানেই প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ণ ইচ্ছার "হা, হুতাশ" প্রাণের অন্তস্তল দিয়া বহিয়া যায়, আর প্রাণের মধ্যে যেন একটা তুষশীতল বিষাদের জ্বালাময়ী অনুভূতি আসিয়া ছড়াইয়া পড়ে । তাই বলিতেছি, উপভোগশূন্য বিরতি পরিতৃপ্তির প্রসূতি নহে । পরিতৃপ্তি যদি সম্ভব হয়, তবে উপভোগেই হইতে পারে । কিন্তু শাস্ত্র বলেন বাসনা দুষ্পূরণীয়া—উহার পরিতৃপ্তি নাই ।

'কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেনচ'

গীতা ৩.৩৯।

কাম কি । কামনা যে কখন পরিতৃপ্ত হয় না তাহা শ্রীভগবানই স্বীকার করিলেন । অতএব এ হিসাবে বৈরাগ্য একরূপ ভিত্তিহীনই হইয়া পড়ে ।

বৈরাগ্যই যখন ভিত্তিহীন—বৈরাগ্যই যখন বাস্তব জগতের বস্তু নহে, তখন সংসার বৈরাগ্যক্ষেত্র কথা বলা চলে না । মাথা নাই, তার মাথা ব্যাথা—মাচা নাই তার বৃহস্পতিবার ! 'বৈরাগ্য' শব্দটী ব্যবহারিক জগতের সংপ্রবে "ফুংকার" হইয়া দাঁড়াইলেও আমরা উহার বিলোপ বিলোকন করিতে ইচ্ছা করি না ; কেননা, উহাকে আদর্শ কল্পনা করিয়া আমরা যতটুকু সংযমের দিকে অগ্রসর হইতে পারি, আত্মিক হিসাবে আমাদের ততটুকুই লাভ । শাস্ত্রও মানুষকে সংযমের পথে আনিবার জন্যই ঐ কল্পিত

আদর্শ খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন।

সংসার বৈরাগ্য-ক্ষেত্র নহে—ইহা ঘোর কর্ম্মক্ষেত্র। যাঁহারা কর্ম্মকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া সংসারকে বৈরাগ্য-ক্ষেত্ররূপে গঠন করিতে চান, তাঁহারা শাস্ত্রের অবমাননা করিতে বসেন। গীতারও প্রথমেই কর্ম্মের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান হইতে কল্পিত বৈরাগ্য যদিও আইসে, তত্রাচ তাহা কর্ম্মমূলক। কেননা, জ্ঞান কর্ম্ম-মূলক। জ্ঞান ও কর্ম্ম এ উভয়ই ঈপ্সিত; একটীকে বাদ দিলে চলে না। যদি নিতান্তই একটীকে লইতে হয়, তবে কর্ম্মকেই লওয়া উচিৎ। শাস্ত্রও তাই বলেন:—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
ঈশোপনিষদ।

শাস্ত্র ছাড়িয়া যদি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে তাহাতেও সংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র—সংগ্রাম-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত পরমাণুরূপী জীবাকারে মাতৃজঠরে প্রবেশ করতঃ সেখান হইতেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সংগ্রামে জয়ী হইয়াই আজ ভূমিষ্ঠ হইলাম।

মাতৃজঠরে আমরা কয়টী জীব প্রবেশ করিয়াছিলাম, সংগ্রামে, আমাদিগের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী সে—ই টিকিয়া গেল। পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেনসার তাই বলিয়া উঠিলেন—"Survival of the fittest", কিনা "যে উপযোগী সেই টিকিয়া যায়"। সেই জননী জঠর হইতে আরম্ভ করিয়া যত দিন সংসারে আমরা জীবিত থাকি, ততদিনই আমাদিগকে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। কত প্রকার সংগ্রাম! দৈহিক-সংগ্রাম, মানসিক-সংগ্রাম, বাচিক-সংগ্রাম! এ সংগ্রামের বিরতি, বিশ্রান্তি নাই! আবার নূতন সংগ্রামের আবিষ্কার হইয়াছে। পারিসের পাস্তর চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ জীবতত্ত্ববিদ্ মেট্‌নিকফ্ বলেন যে, আমাদিগের দেহস্থ রক্তের শ্বেত কণিকার সহিত বায়ুমণ্ডলস্থ অসংখ্য রোগ বীজাণুর ভয়ঙ্কর সমর নিরন্তর চলিতেছে। তাই বলিতেছি, এ পৃথিবী ভয়াবহ রণক্ষেত্র,—ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্র। যাহারা বৈরাগ্যের জড়ভরত তাঁহারা, এখানে অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। এ পৃথিবীতে বৈরাগ্যগ্রস্ত পঙ্গুর স্থান নাই। পৃথিবী বীরভোগ্যা; এখানে কর্ম্মীদেরই সমাদর,—সম্মান। কবিও তাই অমর ভাষায় গাহিয়াছেন:—

"সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হও না মানব।
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ

—:0:—

প্রতীক্ষা ।

উথ্‌লে উঠে হৃদয় আমার
সাম্‌লে তারে রাখতে নারি ।
ব্যাকুল হয়ে, উধাও হয়ে,
চায় সে যেতে পিঞ্জর ছাড়ি ।
চৌদিকে তাঁর আভাষ দেখে
আমার চোখে সলিল ঝরে,
শুধুই তারে পড়্‌ছে মনে
প্রাণ যে আমার কেমন করে ।
জোছনা মাখা উজল রেতে,
শিউলি-গন্ধি সোণার ভোরে,
উঁকি মেরে যায় সে আমার,
জীবন বৃথাই ব্যাকুল করে ।
আকাশ ঘেরা মেঘের বাহার,
স্নিগ্ধ, কোমল দিনের বেলা,
হিয়ায় হরণ করতে নিঠুর
আমায় নিয়ে কচ্ছে খেলা ।
সাগর বুকে ঢেউয়ের ফাঁকে
গগনভেদী গিরির কোলে,
বিশ্বভরা মোহন রূপে
নিতুই আমার নয়ন ভুলে ।
এমনি ভাবে আকুল করে,
আমায় শুধু কাঁদায় কেন ?
আপনা হারা আকুল আমি
কি কাজ ব'য়ে জীবন হেন ?
কোথায় গেলে, কেমন করে,
এ জ্বালা মোর জুড়িয়ে যাবে !
ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে হৃদয়,
কোথায় গেলে তাঁহায় পাবে ?
থেকে থেকে আছড়ে পড়ে
খাঁচার ভিতর পরাণ মম,
আর বিরহ সইতে নারি
কোথায় তুমি হৃদয়রম !

দীনা—শান্তি ।

———:0:———

ভক্তিতত্ত্ব ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াছি, এক্ষণে ভক্তির বিভাগ ও সাধনের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

জড় জগতে জড় পদার্থের একটী বিশেষ গুণ আছে যে, পরমাণু সকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরমাণু-মিলিত পিণ্ড, অল্প পরমাণুমিলিত পিণ্ডকে আকর্ষণ করে; এবং সমস্ত পরমাণু ও পরমাণুমিলিত পিণ্ড পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় । ইহার অন্যথা হয় না । এই আকর্ষণের দ্বারা সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্রাদি চালিত হইতেছে । এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ

চিজ্জগতেও সেইরূপ একটী আকর্ষণ আছে, যদ্দ্বারায় চিজ্জগৎ চালিত হয়; অর্থাৎ

অণুচৈতন্য জীব সকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং সমস্ত অণুচৈতন্যই বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বর (কৃষ্ণ) কর্তৃক আকৃষ্ট হয়; এবং এই আকর্ষণের দ্বারাই চিজ্জগৎ চালিত হইতেছে। এই আকর্ষণকে রাগ বা প্রীতি বলে। (১)

ঐ রাগের অনেক নাম আছে;—যথা—প্রণয়, ভালবাসা, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব; কবিগণ পিরীতিও বলেন। চিজ্জগতে ঐ রাগ বা প্রীতি পাঁচ প্রকার; যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহাকেই রস বলে।

এই জড় জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ। চন্দ্রের ছায়া জলে পতিত হইলে, যেমন জলের ভিতরস্থ চন্দ্র আকাশে চন্দ্রের ন্যায় অবিকল বোধ হয়; কিন্তু জলে ভিতরের চন্দ্রটী তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। ইহা স্থায়ী নয়, (অনিত্য)। সেইরূপ এই জড় জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ। অনিত্য হইলেও চিজ্জগতের সকল তত্ত্বই ইহাতে আছে। অর্থাৎ চিজ্জগতে যেমন অণুচৈতন্য মুক্ত জীব সকল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসদ্বারা চালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঐ ঐ রসের প্রীতি দ্বারা সেবা করে এবং কৃষ্ণ তাহাদিগকে অনুরূপ প্রীতি করেন। সেইরূপ এই জড়জগতেও জীব সকল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভাব দ্বারা চালিত হইয়া পরস্পর প্রীতি করিয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ জীবন ধারণ করে। শান্ত রসটী জড় জগতে বিরল।

দৃষ্টান্ত,—যথা—মাতাপিতা পুত্রকে স্নেহ অর্থাৎ বাৎসল্যরসদ্বারা, ভাইভগ্নী পরস্পর সখ্য রসদ্বারা, পুত্রকন্যা পিতামাতাকে দাস্য-রসদ্বারা, এবং স্ত্রী স্বামীকে মধুর রস বা কান্ত-ভাব দ্বারা প্রীতিরূপ সেবা করিয়া থাকে। সকল রসেই রাগ বা প্রীতির খেলাই দেখা যায়। বৈকুণ্ঠেও তাহাই; তবে সেখানে জরা মরণ নাই, এজন্য কৃষ্ণের সহিত কাহার বিচ্ছেদ নাই। সেখানে অজস্র প্রীতি নিত্য প্রবাহিত হইতেছে।

এই জড় জগৎ নশ্বর এবং অনিত্য বলিয়া কিছুই স্থায়ী নয়; অর্থাৎ,—আজ যাহাকে কোলে করতঃ মুখচুম্বন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে, কাল হয়তঃ তাহার বিয়োগে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে। এই জন্য জড়জগতের রাগ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য জগতের রাগ লাভ করিবার জন্য সাধনা করে। রাগ বা প্রীতি দুই নয়; এক বস্তু। রাগ বা প্রীতি নির্ম্মল ও নিত্য বস্তু। জড়াশ্রিত হইয়া মলিন ও অনিত্য হইয়াছে। রাগের এই মালিন্য ঘুচাইয়া প্রকৃত পথে লইয়া যাইবার জন্য যত সাধ্য-সাধনা।

চিজ্জগতের রাগের সহিত আর একটুকু বিশেষত্ব আছে। চিজ্জগতে কৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা বা সেব্য; অন্য অণুচৈতন্য জীবমাত্রই সেবক; অর্থাৎ সকলেই আপন আপন রস

---

(১) যথা জড়াত্মকে বিশ্বে সত্বর্ধ্যা গ্রহসঙ্কুলা।
ভ্রমন্তি মণ্ডলাকারা প্রভ্যাকর্ষণাৎ কিল ॥
তথা চিদ্বিষয়ে রম্যে কৃষ্ণস্যাকর্ষাৎ কল।
ভ্রমন্তি নিত্যশো জীবা শ্রীকৃষ্ণ মধ্যসেষপি ॥
ইত্যাদি
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।

বা ভাব দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকে, এই জড়জগতে প্রত্যেক পরিবারে একজন কর্ত্তা; তাহাকে সন্তানগণ দাস্যভাবে, ভাই ভগ্নীগণ সখ্যভাবে, পিতামাতা বাৎসল্যভাবে এবং স্ত্রী কান্তভাবে প্রীতি দ্বারা সেবা করিয়া থাকে; এবং পরস্পর পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করতঃ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অর্থাৎ কর্ত্তা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, এবং সকলে কর্ত্তার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এখানেও প্রীতিই চালক এবং বৈকুণ্ঠেও তাই। ঐ প্রীতিটীই রাগ বা প্রেম ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে স্থান বিশেষ নামভেদ হইয়াছে মাত্র।

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধ। এই জন্য ভক্তিও দুই প্রকার,—১। রাগরূপা ২। সাধনরূপা। অহৈতুকী বা নির্গুণা ভক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, রাগমাত্র তাহার স্বরূপ, তাহা নিত্যসিদ্ধ জীবগণের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেখানে সাধনের প্রয়োজন নাই. তাহাদের স্বভাবিক রাগ বা প্রীতি আছে। বিকৃত হয় নাই, রাগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, কৃষ্ণে প্রীতকরা, বদ্ধাবস্থায় জীবের রাগ বিকৃত হইয়া অশুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া সাধনা দ্বারা তাহাকে প্রকৃতপথে আনিতে হয়। বিকৃত রাগকে প্রকৃতস্থ করিতে হইলে জড়াসক্তি হইতে রাগকে বৈধ উপায় দ্বারা প্রকৃত পথে আনিতে হয়; অর্থাৎ জড় হইতে উদ্ধার করিয়া চিৎ পদার্থের দিকে লইয়া যাইতে হয়।

বৈধ উপায় যথা গীতা—অনুবাদ (১)—(নির্জ্জনবাস, লঘু আহার, বাক্য, কায়া ও মনের সংযম, ঈশ্বরচিন্তা, বিষয়-রাগত্যাগ, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধ, পরিগ্রহ-ত্যাগ, মমতারহিত ও শান্তভাব হইলে জড়শক্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মভূত হয় অর্থাৎ চিৎভাব ধারণ করে। যাঁহার আত্মা ব্রহ্মভূত ও প্রশস্ত তাহার শোক ও আকাঙ্ক্ষাদি থাকে না, তখন সর্ব্বপ্রাণীতে সমভাব ধারণ করে এবং, জড় পদার্থে রাগ তিরোহিত হয়; কাজেই পরমাত্মার প্রতি (কৃষ্ণের প্রতি) পরাভক্তি লাভ করে। ভক্তি হইলে কৃষ্ণ কি বস্তু এবং কৃষ্ণের সহিত কি সম্বন্ধ সব তত্ত্ব অবগত হয়। তত্ত্ব অবগত হইলে কৃষ্ণধামে গমন করিয়া কৃষ্ণ-পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়। ইহাই চরম প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাস।
শ্রীললিতলাল ঘোষ।

---

(১) বিবিক্ত সেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসা:
ধ্যানযোগ পরনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূত প্রশান্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥
ভক্ত্যামামাভিজানাতি যাবন যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিষতেত্তদনন্তরং ॥

—:০:—

অণুচৈতন্য জীব সকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং সমস্ত অণুচৈতন্যই বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বর (কৃষ্ণ) কর্তৃক আকৃষ্ট হয়; এবং এই আকর্ষণের দ্বারাই চিজ্জগৎ চালিত হইতেছে। এই আকর্ষণকে রাগ বা প্রীতি বলে। (১)

ঐ রাগের অনেক নাম আছে;—যথা—প্রণয়, ভালবাসা, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব; কবিগণ পিরীতিও বলেন। চিজ্জগতে ঐ রাগ বা প্রীতি পাঁচ প্রকার; যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহাকেই রস বলে।

এই জড় জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ। চন্দ্রের ছায়া জলে পতিত হইলে, যেমন জলের ভিতরস্থ চন্দ্র আকাশের চন্দ্রের ন্যায় অবিকল বোধ হয়; কিন্তু জলের ভিতরের চন্দ্রটী তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। ইহা স্থায়ী নয়, (অনিত্য)। সেইরূপ, এই জড় জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধাম বিশেষ। অনিত্য হইলেও চিজ্জগতের সকল তত্ত্বই ইহাতে আছে। অর্থাৎ চিজ্জগতে যেমন অণুচৈতন্য মুক্ত জীব সকল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসদ্বারা চালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঐ ঐ রসের প্রীতি দ্বারা সেবা করে এবং কৃষ্ণ তাহাদিগকে অনুরূপ প্রীতি করেন। সেইরূপ এই জড়জগতেও জীব সকল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভাব দ্বারা-চালিত হইয়া পরস্পর প্রীতি করিয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ জীবন ধারণ করে। শান্ত রসটী জড় জগতে বিরল।

দৃষ্টান্ত,—যথা—মাতাপিতা পুত্রকে স্নেহ অর্থাৎ বাৎসল্যরসদ্বারা, ভাইভগ্নী পরস্পর সখ্য রসদ্বারা, পুত্রকন্যা পিতামাতাকে দাস্য-রসদ্বারা, এবং স্ত্রী স্বামীকে মধুর রস বা কান্ত-ভাব দ্বারা প্রীতিরূপ সেবা করিয়া থাকে। সকল রসেই রাগ বা প্রীতির খেলাই দেখা যায়। বৈকুণ্ঠেও তাহাই; তবে সেখানে জরা মরণ নাই, এজন্য কৃষ্ণের সহিত কাহার বিচ্ছেদ নাই। সেখানে অজস্র প্রীতি নিত্য প্রবাহিত হইতেছে।

এই জড় জগৎ নশ্বর এবং অনিত্য বলিয়া কিছুই স্থায়ী নয়; অর্থাৎ,—আজ যাহাকে কোলে করতঃ মুখচুম্বন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে, কাল হয়তঃ তাহার বিয়োগে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে। এই জন্য জড়জগতের রাগ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য জগতের রাগ লাভ করিবার জন্য সাধনা করে। রাগ বা প্রীতি দুই নয়; এক বস্তু। রাগ বা প্রীতি নির্ম্মল ও নিত্য বস্তু। জড়াশ্রিত হইয়া মলিন ও অনিত্য হইয়াছে। রাগের এই মালিন্য ঘুচাইয়া প্রকৃত পথে লইয়া যাইবার জন্য যত সাধ্য-সাধনা।

চিজ্জগতের রাগের সহিত আর একটুকু বিশেষত্ব আছে। চিজ্জগতে কৃষ্ণই একমাত্র কর্ত্তা বা সেব্য; অন্য অণুচৈতন্য জীবসকল সেবক; অর্থাৎ সকলেই আপন আপন রস

(১) যথা জড়াত্মকে বিশ্বে সর্ব্বং গ্রহসঙ্কুলা।
ভ্রমন্তি মণ্ডলাকারা ধ্রুবস্যাকর্ষণাৎ কিল॥
তথা চিদ্বিষয়ে রম্যে কৃষ্ণস্যাকর্ষাৎ কল।
ভ্রমন্তি নিত্যশো জীবা শ্রীকৃষ্ণ মধ্যসেষপি॥
ইত্যাদি
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।

বা ভাব দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকে, এই জড়জগতে প্রত্যেক পরিবারে একজন কর্ত্তা; তাহাকে সন্তানগণ দাস্যভাবে, ভাই ভগ্নীগণ সখ্যভাবে, পিতামাতা বাৎসল্য-ভাবে এবং স্ত্রী কান্তভাবে প্রীতি দ্বারা সেবা করিয়া থাকে; এবং পরস্পর পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করতঃ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অর্থাৎ কর্ত্তা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, এবং সকলে কর্ত্তার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এখানেও প্রীতিই চালক এবং বৈকুণ্ঠেও তাই। ঐ প্রীতিটীই রাগ বা প্রেম ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে স্থান বিশেষ নামভেদ হইয়াছে মাত্র।

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধ। এই জন্য ভক্তিও দুই প্রকার,—১। রাগরূপা ২। সাধনরূপা। অহৈতুকী বা নির্গুণা ভক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, রাগমাত্র তাহার স্বরূপ, তাহা নিত্যসিদ্ধ জীবগণের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেখানে সাধনের প্রয়োজন নাই. তাহাদের স্বভাবিক রাগ বা প্রীতি আছে। বিকৃত হয় নাই, রাগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম কৃষ্ণে প্রীতিকরা, বদ্ধাবস্থায় জীবের রাগ বিকৃত হইয়া অশুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া সাধনা দ্বারা তাহাকে প্রকৃতপথে আনিতে হয়। বিকৃত রাগকে প্রকৃতস্থ করিতে হইলে জড়াসক্তি হইতে রাগকে বৈধ উপায় দ্বারা প্রকৃত পথে আনিতে হয়; অর্থাৎ জড় হইতে উদ্ধার করিয়া চিৎ পদার্থের দিকে লইয়া যাইতে হয়।

বৈধ উপায় যথা গীতা—অনুবাদ (১)—(নির্জ্জনবাস, লঘু আহার, বাক্য, কায় ও মনের সংযম, ঈশ্বরচিন্তা, বিষয়-রাগ-ত্যাগ, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ক্রোধ, পরিগ্রহ-ত্যাগ, মমতারহিত ও শান্তভাব হইলে জড়াসক্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মভূত হয় অর্থাৎ চিৎভাব ধারণ করে। যাঁহার আত্মা ব্রহ্মভূত ও প্রশান্ত তাহার শোক ও আকাঙ্ক্ষাদি থাকে না, তখন সর্ব্বপ্রাণীতে সমভাব ধারণ করে এবং, জড় পদার্থে রাগ তিরোহিত হয়; কাজেই পরমাত্মার প্রতি (কৃষ্ণের প্রতি) পরাভক্তি লাভ করে। ভক্তি হইলে কৃষ্ণ কি বস্তু এবং কৃষ্ণের সহিত কি সম্বন্ধ সব তত্ত্ব অবগত হয়। তত্ত্ব অবগত হইলে কৃষ্ণধামে গমন করিয়া কৃষ্ণ-পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়। ইহাই চরম প্রয়োজন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাস।

শ্রীললিতলাল ঘোষ।

(১) বিবিক্ত সেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবন যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতেতদনন্তরং॥

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

(৩)

মুলতান। একতালা।

এসে দোল হে নিরদ-বরণ।
মম, মানস দোলাতে কমলিনী সাথে,
এস কৃপাকরে শ্রীনন্দনন্দন॥
যড়্‌রিপু দলে কতরূপ ছলে,
পারি না হে, বলে শ্রীমধুসূদন;
তাদেরে দলিয়ে দোলহে কমলে,
কোথা দয়াময় কালীয়দমন॥
আছে মম দেহে ছয়টী কমল, তোমার বিহনে সকলি বিফল,
রয়েছি পাশরি তোমারে শ্রীহরি, এস দয়াকরি পতিতপাবন;—
আধার কমলে স্বয়ম্ভুর কোলে,
কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রায় মগন;
দোলের দোলাতে জাগায়ে তাহাকে,
দোল দলে দলে রাধিকারমণ॥
লয়ে গোপীকুলে এসহে দ্বিদলে, নটবরবেশে ভুবনমোহন,
দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গে মাতি দোলরঙ্গে, কমলিনী সনে কমললোচন;—
ভকতি আবিরে পূজিব তোমারে,
চরণ যুগলে লইব শরণ;
যোগেন্দ্র কহিছে এ দোল হেরে যে;
না রহে তাহার জনম মরণ॥

———:0:———

বৈদিক—প্রসঙ্গ।

(৯)

আরও একটু অগ্রসর হইয়া স্থির-চিত্তে প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, অগ্নির প্রকাশাবস্থায় স্বতঃই উষ্ণতা, দাহিকাশক্তি ও প্রকাশগুণ প্রকাশিত হইয়া শুক্ল, লোহিত, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণের বিকাশ হয়, আর নির্ব্বাণাবস্থায় ঐ

সকল গুণ, ক্রিয়া ও শক্তি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য বা নিরাকার হইয়া যায়। হিমের প্রকাশাবস্থায় তদীয় শুক্লতা আপনা হইতে প্রকাশিত হয়, আর হিমের তিরোধানে বা অদৃশ্যাবস্থায় শুক্লতা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া থাকে। পুষ্পের বিকাশ বা ফুটন্তাবস্থায় আপনা হইতে সৌরভ প্রকাশিত হয়, আর অবিকাশ বা অফুটন্তাবস্থায় সৌগন্ধ বা সৌরভ লুকায়িত বা অব্যক্ত থাকে; অর্থাৎ সুগন্ধের প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে আপনা হইতেই ভক্তি, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা আসক্তি, সাধন, ভজন, উপাসনা কর্ম্ম ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি উদিত হয় আর জ্ঞানের বা বিবেকের অব্যক্তাবস্থায় ভক্তি প্রেম, প্রীতি প্রভৃতির বিকাশ হয় না।

আমরা যখন স্বপ্নশূন্য গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ গুণ;—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের যথাক্রমে বাক্যকথন, বস্তু গ্রহণ, গমনাগমন, মলমূত্র ত্যাগ ও রমনক্রিয়া; এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের কোনরূপ গুণ ক্রিয়া বা শক্তি প্রকাশ পায় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের আধিপত্যও থাকে না। তখন আত্মপর ভেদ-জ্ঞান থাকে না, সংকল্প, অধ্যবসায়, কামনা বাসনা প্রভৃতির ব্যাকুলতাও আসে না, ধন, পুত্র, দারা, বিষয়-সম্পত্তিতে আমার, আমার শব্দ ধ্বনিত হয় না; স্থূল বিরাট দেহের সহিত কোন সম্বন্ধও থাকে না। সমস্ত সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের সহিত অভিন্ন ভাবে নিরাকার অবস্থায় অবস্থিত থাকে। ঘুম ভাঙ্গিলে অর্থাৎ 'জাগ্রতাবস্থায়' জ্ঞানের বিকাশ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের নানাবিধ গুণ, ক্রিয়া ও শক্তি অর্থাৎ বল, বুদ্ধি, বিবেক, বিচার, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীজ্ঞান, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা,—ভক্তি, শ্রদ্ধা, কর্ম্ম, উপাসনা ইত্যাদি আপনা হইতেই উদিত হয়। ঘুম না ভাঙ্গিলে অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ও কর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইতে পারে না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব জাগ্রতাবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলেই ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম সমস্তই আসিয়া থাকে, আর সুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মের উপলব্ধি কদাচ সম্ভবে না। এই হেতু যাঁহার জ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তাঁহার ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়ই আছে; আর যাঁহার ভক্তি আছে, অর্থাৎ যিনি ভক্ত তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই আছে। যেহেতু অগ্রে ঘুম না ভাঙ্গিলে, অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ না হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় ভক্তি আসিতে পারে না। অতএব ভক্তি লাভের অধিকারী হইতে হইলে অগ্রে জ্ঞানের বিকাশ, এবং জ্ঞানের বিকাশেই ভক্তি লাভ ও কর্ম্ম সিদ্ধি; ইহা সাধুজনানুমোদিত, তদ্বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ নাই। এইজন্যই বেদবিদ্ সপুরাণ বলিয়া থাকেন যে, পরাৎপর পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির ঐকান্তিক ইচ্ছাই ভক্তি; বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধির অনুকূল উপায় অনুসন্ধানের নাম বিচার; পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করতঃ তদাধনায় সিদ্ধি লাভের নাম জ্ঞান; আর যে পর্য্যন্ত পূর্ণ জ্ঞানের

বিকাশ না হইতেছে অর্থাৎ "ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান" দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান না জন্মাইতেছে, ততদিন তদনুকূলো অনুষ্ঠ সমস্ত অনুষ্ঠান কর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীব, মায়া-মোহরূপ নিদ্রায়, সর্ব্বদাই নিদ্রিত, কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই এবং জ্ঞান ও ভক্তিকে অভেদ-রূপে অর্থাৎ সমদৃষ্টিতে দেখিবার শক্তিও আসে নাই। কিন্তু জানা উচিত যে:—

যেমন দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত, জলের ভিতর তরঙ্গ, তিলের অভ্যন্তরে তৈল, কার্পাসে সূত্র, মৃত্তিকায় ঘট এবং চিত্তে সংসারভাব নিত্য সংশ্লিষ্ট আছে, এবং ইহাদের গুণ-সমবায়িকারণক বৃত্তি জাতি বা সর্ব্ব জাতি-ব্যাপক সত্তা (যাহাকে দার্শনিক ভাষায় সামান্য অর্থাৎ 'পর' জাতি কহে) এক-বিধায়, দুগ্ধের অভ্যন্তরস্থিত ঘৃত, দুগ্ধ হইতে, জলের অন্তর্ভূত তরঙ্গ, জল হইতে, তিলের মধ্যস্থ তৈল, তিল হইতে, কার্পাসের অন্তর্গত সূত্র, কার্পাস হইতে; মৃত্তিকার সংশ্লিষ্ট ঘট, মৃত্তিকা হইতে এবং চিত্তের বিজৃম্ভিত সংসার, চিত্ত হইতে, কদাচ পৃথক নহে; অর্থাৎ সকলগুলি এক সত্তা আশ্রয়ে অবস্থিত বিধায়ে অভিন্ন। তদ্রূপ অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, হিমে শুক্ল বর্ণ, পুষ্পে সৌরভ এবং জ্ঞানে ভক্তি নিত্য সংশ্লিষ্ট-বিধায়ে, দাহিকাশক্তিপ্রকাশক অগ্নি, দাহিকা-শক্তি হইতে, শুক্লবর্ণ জ্ঞাপক হিম, শুক্লবর্ণ হইতে, সৌরভপ্রকাশক পুষ্প, সৌরভ হইতে এবং ভক্তিবিকাশক জ্ঞান, ভক্তি হইতে কদাচ বিভিন্ন নহে। সারা জগতের লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও, অগ্নির প্রকাশে দাহিকাশক্তি, হিমের আবির্ভাবে শুক্ল বর্ণ; পুষ্পের প্রস্ফুটনে সৌরভ ও জ্ঞানের বিকাশে ভক্তি লাভ কদাচ রোধ করিতে পারে না। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি অভিন্ন ও অখণ্ডাকার বস্তু। এতদ্ভিন্ন ইহাদের যে ভেদ কল্পনা, তাহা শব্দান্তর বা অর্থসৌকর্য্যার্থে আভিধানিক শব্দ বিন্যাস মাত্র।

দার্শনিক ভাষায় উল্লিখিত দুগ্ধ, জল তিল, কার্পাস, মৃত্তিকা ও চিত্তকে সমবায়ি-কারণ বা নিরূপক (সম্বন্ধ) নির্ণয় স্থলে অনু-যোগী; আর ঘৃত, তরঙ্গ, তৈল, সূত্র, ঘট প্রভৃতিকে অসমবায়িকারণ বা প্রতিযোগী বলিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা আধার তাহাই সমবায়িকারণ বা অনুযোগী, যাহা আধেয় তাহাই অসমবায়িকারণ বা প্রতিযোগী। ইহাদের মতে 'আধার ও আধেয়' বা কারণ ও কার্য্য অভেদ। আধার বা কারণে যে যে গুণ ও ধর্ম্ম আছে, আধেয় বা কার্য্যে সেই সমস্ত থাকিবে, ইহাদের কোন রূপ ভেদ নাই; সুতরাং কারণ ও কার্য্যে একত্ব আছে। আবার কার্য্যে যে গুণ বা একত্ব আছে, সেই গুণ বা একত্ব কারণে আছে। কার্য্য লইয়াই কারণের সত্যতা, অতএব "কার্য্য ও কারণ" সৎ। হিন্দুধর্ম্মের নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে কেহ কেহ এই মতের আলোচনায় "কার্য্য ও কারণ" অভেদ হিসাবে, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, পুষ্প ও তদীয় সৌরভ ইত্যা-দির অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়া জ্ঞান ও ভক্তিকে-"কার্য্য কারণ বা" "আধার ও আধেয়" ইত্যাদির যুক্তি দ্বারা অভেদ আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। আবার অনেকে

বলেন যে, "কার্য্য ও কারণ" পৃথক বস্তু। ইহাদের এক একত্ব সংখ্যা নাই, যেহেতু যে বস্তু অন্য বস্তুর সহিত অভেদ বা এক একত্ব বিশিষ্ট হয়, তাহাদের আকারে রূপে ও প্রমাণে অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কার্য্য ও কারণে তাহা নাই,—যথা ঘটের কারণ মৃত্তিকা, জলাহরণ বা জল আনা ইহার কার্য্য বা ফল; কারণ মৃত্তিকা দ্বারা জলাহরণ হয় নাই কেন? সূত্র বা বস্ত্রে, কারণ কার্পাস, বস্ত্র অঙ্গে পরিহিত হয় এবং লজ্জা নিবারণ করে ও শোভা বিশেষের সম্পাদক হয়; কিন্তু কার্পাস দ্বারা তাহা হয় না কেন? অতএব "কার্য্য" দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয়, কারণ দ্বারা তাহা না হওয়ায় "কার্য্য ও কারণ" অভেদ নহে; ইহা দ্বি-পৃথকত্ব বিষয়ক; এক পৃথকত্ব ইহাদের নাই। অর্থাৎ "কার্য্যকারণয়োরেকত্বৈক পৃথক্ত্বা ভাবাদেক ত্বৈকপৃথক্ত্বং ন বিদ্যতে" ইত্যাদি মতের আলোচনা করিয়া অগ্নি ও তদীয় দাহিকাশক্তি, পুষ্প ও তদীয় সৌরভ, এবং জল ও তদীয় শীতলতার একত্ব প্রতিপাদনে বিরোধ উপস্থিত করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির বিভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলেও, শাস্ত্রের সারভব ও সহজ অর্থ হৃদয়ঙ্গম বিষয়ে নানারূপ সংশয় ও বাধা জন্মাইবার এক প্রকার সুযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বচনের বাহুল্য ত্যাগ করতঃ স্থির ও গম্ভীরভাবে বিচার করিলে সহজেই জানা যাইবে যে, উপরোক্ত উভয় মতের অন্যান্য মত অপেক্ষা কার্য্য বা জগতের সত্যতা, ঈশ্বরের অতিরিক্তত্ব এবং আত্মার নানাত্ব লইয়াই পরস্পর বিরোধের কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদের এই মতগুলি পরিত্যক্ত হইলে বা মত গুলির সার ভাব এবং মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে আসিলে, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদ, বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রাদির সিদ্ধান্ত এক ও অভেদ হইয়া থাকে; হেত্বন্তর অর্থান্তর, বিজিগীষু, বিতণ্ডা, অজ্ঞান, অপ্রতিভা উপেক্ষণ, পর্য্যনুযোগ্য, নিরনুযোগ্য, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস ইত্যাদির নিগ্রহ দূরে যায় এবং পাণ্ডিত্যের প্রতাপক্ষীণ হইয়া পড়ে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, উপরোক্ত উভয় মতের আলোচনায় আমাদের জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তি হয় কি না অন্যথায় মতগুলির উদ্দেশ্য কি? "কার্য্য ও কারণ" রূপে কোন বস্তু অভেদ হইলে, কার্য্যে যে যে গুণ ও ধর্ম্ম আছে তাহা কারণে, আর কারণে যাহা আছে তাহা কার্য্যে এইরূপে বস্তুর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইলে, যাহার কার্য্য বিনাশী ও বিকারী তাহার কারণও বিনাশী ও বিকারী স্বীকার করিতে হয়। "কারণ" বিনাশী ও বিকারী হইলে, তাহার সহিত অবিনাশী সর্ব্ব প্রকার বিকার বিহীন, অদ্বিতীয়, অক্ষর বস্তুর কোন রূপ তুলনা বা সমানাধিকরণতা সম্ভবে না। অবিনাশী অক্ষর বস্তু বলিতে পূর্ণজ্ঞান পরব্রহ্মই বুঝাইয়া থাকে; তিনি নিত্য ও অপরিণামী। অতএব নিত্য, অপরিণামী পরব্রহ্মের সহিত, বিনাশী ও বিকারী "কার্য্য কারণ" কদাচ অভেদ হইতে পারে না। তবে যাহার "কার্য্য ও কারণ" অবিনাশী ও অপরিণামী এরূপ বস্তুর সহিত পূর্ণ পরব্রহ্ম অভেদ হইতে পারেন; কিন্তু

একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম ব্যতীত জগতে কতকগুলি অপরিণামী ও অবিনাশী বস্তুর অবস্থিতি নাই। যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত বস্তুই পরিণামী; সুতরাং পূর্ণ পরব্রহ্ম "কার্য্য কারণ" সম্বন্ধে কোন বস্তুর সহিত অভেদ কদাচ হইতে পারে না। তবে মনোবাণীর অতীত, বাগিন্দ্রিয়বর্জ্জিত পরম পুরুষ, নিত্য বস্তু, পূর্ণ পরব্রহ্মকে যদ্যপি "ব্যবহার সৌকর্য্যার্থে" নামরূপ কল্পনায় বা আখ্যায় আনা হয়; অর্থাৎ তিনিই কার্য্য, তিনিই কারণ, তিনিই সম্বন্ধ, তিনিই আশ্রয়, তিনিই হেতু, তিনিই ফল, তিনিই আধার, তিনিই আধেয়, তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই পিতামহ, তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই বিধাতা, তিনিই শরণ, তিনিই সুহৃৎ, তিনিই প্রভব, তিনিই প্রলয়, তিনিই স্থান, তিনিই নিধান, তিনিই বীজ, তিনিই অব্যয়, তিনিই দ্রষ্টব্য, তিনিই শ্রোতব্য, তিনিই মন্তব্য এবং তিনিই নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি ইচ্ছামত কল্পনায় আনা হয়, তাহা হইতে কোনরূপ অপকৃষ্ট আশঙ্কা নাই। যেহেতু কল্পিত বস্তু অলীক মিথ্যা বা অনিত্য; কল্পিত বস্তুর [illegible] কোন কালেও সম্ভবে না। অধিকন্তু [illegible] কল্পনা বা আখ্যা ইহা বেদ বাক্যে উক্ত [illegible]। লোকাঃ, দেবা ন দেবাঃ, বেদা ন বেদাঃ, যজ্ঞা ন যজ্ঞা, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্নুষা ন স্নুষা, চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ, পৌল্কসো [illegible] পৌল্কসঃ, শ্রমণো ন শ্রমণঃ, পশবো ন পশবঃ, তাপসো ন তাপস, ইতোকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি" ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত একীভাব হইয়া থাকে; অর্থাৎ কেবল মাত্র স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং স্বর্গাদি লোক, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বেদ, যজ্ঞ, মাতা, পিতা, পুত্রবধূ, চাণ্ডাল, পুক্কস, নীচজাতি, পশু, তাপস প্রভৃতির কোনরূপ সত্তা নাই; কেবল নাম, রূপ উপাধি মাত্র। উপাধি ক্ষয় হইলেই অর্থাৎ অজ্ঞান রূপ মায়া অপসারিত হইলেই "ইতোকমেব পরংব্রহ্ম বিভাতি"। অন্যথায় নিত্য বস্তুর কখন পরিণামিত্ব, কখন অপরিণামিত্ব, কখন সক্রিয়ত্ব কখন নিষ্ক্রিয়ত্ব, বা নিত্য বস্তু কখন পরিণামী, কখন অপরিণামী, কখন সক্রিয়, কখন নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ বিকারশীল, কদাচ প্রতিপাদন করা যায় না; যেহেতু মিশ্র পদার্থ হইয়া পড়ে। আবার মিশ্র পদার্থ মাত্রেই বিকারশীল এবং বিকারশীল বস্তু মাত্রেই মিশ্র পদার্থ ও বিনাশী; সুতরাং এইরূপ তুলনায় নিত্য বস্তু পূর্ণপরব্রহ্ম বিকারী ও বিনাশশীল বস্তুর মত হইয়া পড়েন। অতএব বিনাশী কারণ, কারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে কারণ সংযোজনা দ্বারা জ্ঞানের তৃপ্তি অসম্ভব।

এইরূপ যাহার কারণ অজ, তাহার কার্য্যও অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, উৎপত্তিশূন্য স্বীকার করিতে হইবে। যাহা উৎপত্তিশূন্য তাহাই অনাদি, যাহা অনাদি, তাহাই অনন্ত। সুতরাং যাহার 'কারণ, অজ বা অনাদি অনন্ত, তাহার 'কার্য্য ও' অনাদি অনন্ত। কিন্তু অনাদি অনন্ত বা উৎপত্তি-লয়-শূন্য বস্তুই নিত্যবস্তু,—সৎপদার্থ, পূর্ণ পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন অতএব যাহার "কারণ" সৎপদার্থ পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, তাহার কার্য্যও তদ্রূপ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। ইহাকেই সাংখ্য মতের কারণও সৎ, আর কার্য্যও সৎ বলা হয়। কিন্তু

যাহা সৎ পদার্থ, তাহা চিরদিনই সৎ ও স্বতঃপ্রমাণ; তাহা কখন সৎ কখন অসৎ কদাচ হইবে না। কার্য্য যদ্যপি সৎ হইয়া নিত্য বস্তু,—উৎপত্তি-লয়-শূন্য বা অনাদি অনন্ত হয়, তাহার আর নূতন উৎপত্তির অর্থাৎ কার্য্যাভাবে নূতন আবির্ভাবের প্রয়োজন কি? তাহা নিত্যবস্তু বিধায়ে তাহার উৎপত্তির উপপত্তি সম্ভবেনা। এরূপ অবস্থায় নিত্যবস্তু কার্য্যকে, "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব" অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, কারণের গুণ কার্য্য, কার্য্যের গুণ কারণে ইত্যাদি অপেক্ষাবুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা অনাদি হইয়া তাহার নিত্যতা ও সত্যতা কি প্রকারে বজায় রাখিবে; পক্ষান্তরে কার্য্য সৎ হইয়া পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বরের স্বরূপ হইলে তাহার আবার "কারণ রূপ" সৎপদার্থ পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিলে "কার্য্যরূপ" ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বা কার্য্য রূপ পরব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ কি প্রকারে হইবে? এরূপ অবস্থায় "কার্য্য রূপ" ঈশ্বরের অতিরিক্ত "কারণ রূপ" ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় ঈশ্বর বস্তুটী কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ শক্তিসম্পন্ন হইবে না; পরন্তু তাহা আশ্রয়ী বস্তু হইয়া বিনাশশীল হইয়া পড়িবে। যেহেতু যাহা স্বতঃসম্ভুত নহে, যাহাতে আশ্রয় বা অপেক্ষা বুদ্ধিজনিত সংশয় থাকে তাহা অপ্রমাণবৎ, এবং উৎপন্নার্থক বস্তু হইয়া "উৎপন্নস্য স্থিত্য ভাবাৎ" হইবে; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সার বেদে কথিত আছে। অর্থাৎ বেদপুরুষ স্বয়ং বলিয়াছেন যে,—আশ্রয়ী বস্তুর সত্তা না থাকায় তাহা অনিত্য ও প্রমাণের অযোগ্য। অতএব কার্য্যকে সৎরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাতে কারণ সম্বন্ধ স্থাপিত করতঃ বিনাশী মিশ্র পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিলে, বিনাশশীল সৎ বা চতুষ্কোণ গোলক শব্দের ন্যায় স্ববিরোধী হইয়া, প্রকারান্তরে "বিনাশশীল ঈশ্বর" ইত্যাদির দ্বারা ভগবদ্ নিন্দার বিষয়ীভূত হয়। ইহা সাধুজনানুমোদিত নহে; সুতরাং কারণ সৎ, কার্য্যও সৎ ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানের তৃপ্তি অসম্ভব। কার্য সৎ,—কারণের রূপান্তর মাত্র, সমুদয় জগৎ কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, অতএব "কারণ ও কার্য্য" অভেদ ইত্যাদি দ্বারাও সংশয়ের নিবৃত্তি কদাচ সম্ভব নহে।

আবার অনেকে কার্য্য ও কারণের একত্ব প্রতিপাদন মানসে বলিয়া থাকেন যে, বীজের কারণ বৃক্ষ, বৃক্ষের কারণ বীজ। বীজই ক্রমবিকশিত হইয়া বৃক্ষ, পরিণামে বৃক্ষই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বীজ। সমুদয় বৃক্ষটী বীজে বর্ত্তমান ছিল, ক্রমশঃ বিকাশ দ্বারা বৃক্ষ; আর বীজ বৃক্ষেই বর্ত্তমান আছে, ক্রমশঃ সঙ্কোচ দ্বারা বীজ। অতএব বৃক্ষের কারণ "বীজ" ক্রমবিকাশ দ্বারা "বৃক্ষ রূপ" কার্য্য হওয়ায়, "কারণ ও কার্য্য রূপে" বীজ ও বৃক্ষ অভেদ। তদ্রূপ জগতের কারণ-চৈতন্য ক্রমবিকশিত হইয়া জগৎ, আর ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া চৈতন্য হন। সেই চৈতন্যই জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত-কারণ; আর জগৎ সেই কারণের কার্য্য। সুতরাং ক্রমবিকাশবাদে "কারণ ও কার্য্য" অভিন্ন। উত্তম যুক্তি,—কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—অগ্রে বৃক্ষের উৎপত্তি, কি বীজের উৎপত্তি? অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে বীজ কিম্বা বীজ হইতে বৃক্ষ, ইহাদের মধ্যে

কোনটী অগ্রে ও কোনটী পরে মীমাংসা হওয়া উচিৎ। অগ্রে বীজের উৎপত্তি বলা চলে না; যেহেতু বৃক্ষ ব্যতীত বীজের উৎপত্তি অসম্ভব। তদ্রূপ অগ্রে বৃক্ষের উৎপত্তিও বলা চলে না; যেহেতু বীজ ব্যতীত বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং কারণ (বীজ) হইতে কার্য্য (বৃক্ষ) কিম্বা কার্য্য (বৃক্ষ) হইতে কারণ (বীজ) নিশ্চয় না হওয়ায় উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। আবার উৎপত্তির নিশ্চয়তা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে উৎপত্তি কদাচ কার্য্যকারী হইতে পারে না; অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উৎপত্তি অসিদ্ধ হইলে কার্য্য হইতে কারণ ও কারণ হইতে কার্য্য ইত্যাদি বাক্য নগণ্য হয়। অতএব "কার্য্য কারণ সম্বন্ধে পৌর্ব্বাপর্য্য-ক্রম-জনিত আশঙ্কা অবশ্য স্বীকার্য্য! অন্যথায় গো-শৃঙ্গের মত উভয়ের যুগবৎ উৎপত্তি স্বীকার করিলে, "কার্য্য কারণ" সম্বন্ধ লোপ পায়; অর্থাৎ কে কার্য্য, কে কারণ নির্ণয় না হওয়ায় "কার্য্য-কারণ" উপাধির বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম চৈতন্য-দেব, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারবিহীন, অনাদি, ও অনন্ত; তিনি ক্রমবিকাশে জগৎ, ক্রম-সঙ্কোচে চৈতন্য ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার সঙ্কোচ, বিকাশ, পরিণাম, ক্রম ইত্যাদিতে তিনি একটী সীমাবদ্ধ স্থিতিস্থাপক বস্তু হইয়া পড়েন, অতএব বীজ ও বৃক্ষের তুলনায় "কার্য্য কারণ" সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইলে, জ্ঞানের তৃপ্তি বা সংশয়ের নিবৃত্তি কদাচ সম্ভব নহে।

প্রকারান্তরে যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির পৃথকত্ব প্রদর্শনমানসে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়কে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, পুষ্প ও তদীয় সৌরভ, জল ও তদীয় শীতলতা, মনুষ্য, গো, অশ্ব, স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত ইত্যাদির বিভিন্নতা প্রদর্শনে নানাবিধ উদাহরণ উপস্থিত করেন; দ্রব্য-সমূহ দ্রব্যান্তর জন্মায়, গুণান্তর জন্মাইতে পারে না; গুণ সমূহ গুণান্তর জন্মায়, দ্রব্যান্তর জন্মাইতে পারে না। "ওরে নিধিরাম তুই কোথায় গেলি রে," আমি কাল, আমি গৌরবর্ণ আমি কৃশ, আমি স্থূল, ইত্যাদি ভূরি ভূরি ব্যবহার প্রচলিত থাকায় নানাত্ব জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য, ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতঃ পারম্পর্য্যো-পদেশ দ্বারা পরিণামে পারমাণবিক নিত্যতায় পরমাণুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহাদের পরিভাষার প্রাজ্ঞতায় জ্ঞানের পবিত্রতা আসে নাই, এবম্বিধ জ্ঞান-পরিবেদনায় পারিশ্রমিকও পোষায় নাই। যেহেতু ইহা দ্বারা হরিভূষণ নামক এক ব্যক্তি এক হইলেও সম্বন্ধের অনুপাতানুসারে কাহার পিতা, কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, কাহার ভ্রাতা, কাহার জামাতা; এইরূপ বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বদান্য, পণ্ডিত, তপস্বী, ও রাজাধিরাজ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দে বহু হরিভূষণ জ্ঞান করিতে হইবে; রেখা একটী বস্তু হইলেও নানা স্থানের সন্নিবেশ বশতঃ এক, দুই, তিন, আট, দশ, বার, শত, সহস্র, ইত্যাদি বহুবিধ শব্দে বহু জ্ঞান করিতে হইবে; কাল কম্বল, লাল ঘোড়া, শ্বেত শঙ্খ, নীল অপরাজিতা, পীত বস্ত্র, ইত্যাদি স্থলে কাল, লাল, শ্বেত, নীল, পীত ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তত্তৎ দ্রব্য,

কম্বল, ঘোঁড়া, শঙ্খ, অপরাজিতা, ও বস্ত্র প্রতীতি হইলেও, ইহাদিগকে পৃথকভাবে পৃথক দ্রব্য বুঝিতে হইবে; দর্পণ পরিপূর্ণ গৃহে আমি প্রবেশ করিলে প্রতি দর্পণেই আমি প্রতিফলিত হইয়া অনেক আমি মনে করিতে হইবে; বুদ্বুদ, তরঙ্গ, ফেণা, জল হইতে উত্থিত হয়, উহা জলাতিরিক্ত পৃথক বস্তু নহে, সুতরাং অভিন্ন; ইত্যাকার জ্ঞান সহজে উপলব্ধি হইলেও ইহাদিগকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; সৈন্ধব লবণখণ্ডের সমস্তই লবণ, তদতিরিক্ত পৃথক বস্তু কিছুই নাই, তত্রাচ দুই দুই মনে করিতে হইবে; সর্ব্ব শাস্ত্রের সার বেদে "একধৈবানুদ্রষ্টব্যং" বলিয়া যাহা উপদেশ দিয়াছেন অর্থাৎ এক ভাবে সমস্ত বস্তুকে দেখিবে বা একভাবে উপাসনা করিবে; এই বাক্য খণ্ড করিতে হইবে।

কিন্তু উল্লিখিত মতে সমবায়কে অর্থাৎ সম্বন্ধকে যদ্যপি বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়, অর্থাৎ সমবায়বোধক শব্দ "জামাতা" ও তদ্বোধক জ্ঞান "হরিভূষণ" ইহারা বিভিন্ন বস্তু, ইহাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব আছে স্থির করিয়া সংযোগ ও সমবায়ের শব্দ ও জ্ঞানকে পৃথক বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে "জামাতা" শব্দ দ্বারা যাহাকে বুঝাইবে, তদ্বোধক জ্ঞান দ্বারা তাহাকে বুঝাইবে না, ইহারই নাম সমবায়ের বিভিন্নতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,—জামাতা শব্দ দ্বারা যে হরিভূষণকে বুঝাইয়া থাকে, তদ্বোধক জ্ঞান দ্বারা সেই হরিভূষণকেই জানা যায়। এখানে শব্দ ও জ্ঞান দ্বারা যখন এক হরিভূষণ ব্যতীত দুই হরিভূষণ বুঝাইতেছে না, তখন শব্দ আর জ্ঞান দ্বারা সমবায়ের বিভিন্ন ভাব বা পৃথক অস্তিত্ব কি প্রকারে প্রতিপাদিত হইবে?

'কাল কম্বল' ইহা দ্বারা কম্বল দ্রব্যকেই বুঝাইতেছে, কম্বলের রূপ কাল গুণ দ্বারা পৃথক কম্বল বুঝায় না। এখানে 'কাল কম্বল' শব্দ দ্বারা যে কম্বলকে বুঝাইতেছে, তদ্বোধক জ্ঞান দ্বারা সেই কম্বলই বুঝাইতেছে। অতএব কাল গুণ কম্বল দ্রব্যের আত্ম বা আপন হওয়ায় গুণের দ্রব্যাত্মকতা প্রমাণিত হইতেছে গুণের দ্রব্যাত্মকতা প্রমাণিত হইলে, দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্য, গুণ, সমবায় পরস্পর বিভিন্ন নহে. ইহারা অভিন্ন বা অভেদ। এইরূপ যুক্তি দ্বারা কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষের দ্রব্যরূপতা প্রতিপাদিত হইয়া, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য. বিশেষ ও সমবায় শব্দগুলি অভিন্নতার বিষয়ীভূত হয়। সুতরাং নানাত্ব জ্ঞান কদাচ প্রসিদ্ধ হইতে পারে না। নানাত্ব জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হইলে, অগ্নি ও দাহিকাশক্তি, পুষ্প ও তদীয় সৌরভের একত্ব প্রতিপাদনে বিরোধ উপস্থিত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির বিভিন্নতা প্রদর্শনের চেষ্টাও বিফল হয়।

আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কাল, আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন থাকায় নানাত্ব জ্ঞানকে জ্ঞানের তৃপ্তি সাধন বিষয়ে অনুকূল বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের উপদেশের উদাহরণে দ্বৈতভাবের আবির্ভাব হইলে "কি নাসীদ দ্বৈততঃ পুরাঃ" ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় অবশ্যম্ভাবী হয়। পরিণামে প্রশ্নের মীমাংসায় উপলব্ধি হইতে থাকে যে,—দ্বৈত বা দুই স্বয়ংসিদ্ধ নহে

এক না থাকিলে যেমন দুই গণনা চলে না, তদ্রূপ একের আবির্ভাব স্বীকার না করিলে দুইয়ের প্রকাশ হয় না। অতএব দ্বৈতভাবে একের অপেক্ষাবুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বিধায়ে উহা সিদ্ধপ্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু বেদে বলিয়াছেন যে, "দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি"। মতান্তরে শশ-শৃঙ্গের মত এক ও দুইয়ের একসময়ে আবির্ভাব স্বীকার করিলে, কে এক, কে দুই কিছুই নির্ণয় না হওয়ায়, উৎপত্তির বিরোধ উপস্থিত হইয়া উৎপত্তি বা আবির্ভাব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য দ্বৈতভাবেও পৌর্ব্বাপর্য-ক্রমজনিত আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তিকে দুই, দুই দেখিলে ঐরূপ আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞানের তৃপ্তি বা সংশয়ের নিবৃত্তি অসম্ভব হয়।

মতান্তরে "ও রে নিধিরাম্ কোথা গেলি রে" ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন থাকায় নানাত্ব জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া যাঁহারা নানা-স্থানে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, নানাত্ব ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে,— নিধিরামের মৃত্যু হইলে পর তাহার মৃত শরীর কোলে লইয়া যখন তাহার মাতা রোদন করে "ওরে নিধিরাম তুই কোথা গেলি রে ?" তখনকার বিলাপের বিষয়ীভূত নিধিরাম অর্থে নিধিরামের শরীর বা দেহ-খানাকে বুঝাইবে না, যেহেতু শরীরটা তখন মাতার কোলেই থাকে। সুতরাং নিধিরাম বলিতে শরীরের সহিত "বিজাতীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মাকেই বুঝায়"। আর নিধিরাম যখন বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর যাইবে, তখন তাহার মাতা যদ্যপি বলে যে, ঐ যে বাছা নিধিরাম যাইতেছে, তখনকার নিধিরাম বলিতে বিজাতীয়-সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মা নহে; নিধিরামের দেহখানাই অর্থাৎ শরীরটা বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ নিধিরাম যখন মরিবে তখন বিজাতীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মা হইবে, আর যখন গমনাগমন করিবে, তখন শরীর হইবে। এইরূপ নিধিরাম নিজে যদি বলে যে, আমি হাটে যাইতেছি, তখন অহং বা আমি প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত নিধিরাম আত্মা হইবে। আর নিধিরাম "গমন করি-তেছেন" স্থলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিধায়ে নিধি-রামের শরীরখানা আত্মা বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম আমি-প্রত্যয়যুক্ত যে অহংজ্ঞান তাহাই আত্মা যাহা মানস প্রত্যক্ষের বিষয়-বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ নিধিরামের আমি জ্ঞান কখন আত্মা হইবে আর কখন কখন শরীরখানাও আত্মা হইবে। এ যুক্তি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে; একটী গল্পের দ্বারা ইহার ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। যথা:—

কোন দেশের এক উদারপ্রকৃতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নাভাবে পরিজন প্রতি-পালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া, তাঁহার নিজের একটী গাভী বিক্রয় করিবার জন্য হাটে লইয়া যান। পথিমধ্যে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে থাকেন যে;—আমাদের অধিক বয়স হইলে প্রাচীন জ্ঞানে সাধারণে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে, অন্যাপেক্ষা প্রাচীনের কথার মূল্য বেশী হয়, অধিক পরমায়ু হইলেই লোকে ভাগ্যবান বলিয়া থাকে। অতএব আমি

যদ্যপি হাটে গিয়া গাভীটীর অধিক বয়স বলি, তবে প্রাচীন জ্ঞানে আমার কথায় ক্রেতাদের অধিক আস্থা হইবে, এবং সম্ভবতঃ মূল্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। মনে মনে ব্রাহ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া হাটে উপস্থিত হইয়া খরিদদারের প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, এ আমার পৈতৃক গাভী, অতি বয়োবৃদ্ধা, পরানিষ্টবিরতা। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, অল্পে সন্তুষ্টা, নিরীহা ও সুস্থিরা। খরিদদারেরা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া নীরবে ফিরিয়া যায়, ক্রেতার অভাবে গাভীটীও বিক্রয় হয় নাই। উপর্য্যুপরি কয়েক হাটে এইরূপ হওয়ায়, অন্য এক হাটে অনেক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে ব্রাহ্মণ! আপনি প্রায় প্রতি হাটে এই গাভীটী লইয়া যাওয়া আসা করেন, কারণ কি? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, এই গাভীটী আমি বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়া থাকি। ঐ লোক কহিল, গাভীটী বিক্রয় হয়না কেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন, কেহ নেয় না, আমার কথা শুনিয়া সকলেই চুপ করিয়া চলিয়া যায়। সে কহিল, আপনি কি বলিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—এ গাভী অতি বৃদ্ধা, পরানিষ্ট-বিরতা, এইরূপ কহিয়া থাকি। সে কহিল,—ও এমন গাভী! গাভীটীর দাঁত দেখি? এই বলিয়া সে গাভীটীর দাঁত দেখিয়া কহিল, ও মশায়! এমন নয়, এমন নয়, বুদ্ধি-বিচারেই প্রাচীনের আদর, কায়িক কর্ম্মে প্রাচীনেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বিধায়ে সর্ব্বত্রই অনাদৃত হন; অতএব পশুজাতি বৃদ্ধাবস্থায় অকর্ম্মণ্য। আপনার এই গাভীটী বৃদ্ধা নয়, আমি দাঁত দেখিয়া ইহার বয়স বুঝিয়াছি। ইহার পর যে খরিদদার আসিবে, তাহাকে আপনি এইরূপ বলিবেন যে,—এই গাভীটী প্রথম প্রসব হইয়াছে, যথেষ্ট দুগ্ধ দেয়। এইরূপ কহিয়া সে চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্বে এই গাভীটী বৃদ্ধা কহিয়া আবার ইহা তরুণী, এতাদৃশ বিরুদ্ধবাক্য কিরূপে কহিব? এই বিরোধোদ্ভাবন করিয়া নির্ণয় করিলেন যে, এই গাভীটীর শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা প্রাচীন বটেন; যেহেতু বেদাদি শাস্ত্রে আত্মাকে প্রাচীন, পুরাণ পুরুষ বা পুরাতন পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদ বলেন যে, এই পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন পুরুষ ভূতকালবাচী; পুরাতন বিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা বেদকেই বুঝাইয়া থাকে; যেহেতু বেদ, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শ্রুতিসমন্বিত। অতএব প্রাচীন বা পুরাতন পুরুষ বলিতে বেদ পুরুষ পূর্ণপরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা দেহের ধর্ম্ম; ইনি বালক, ইনি যুবা, ইনি বৃদ্ধ, ইনি স্থূল, ইনি কৃশ, ইনি কাল, ইনি গৌরবর্ণ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র; আত্মা বিষয়ের ঔপচারিক বা কাল্পনিক শব্দ নীল, লোহিত, স্ফটিক ইত্যাদি বৎ। কিন্তু এরূপ কহিলে গাভী ত কেহ লইবে না। অতএব গাভীটী আত্মাংশে বৃদ্ধা, শরীরাংশে তরুণী এইরূপ বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ অর্দ্ধজরাগ্রস্থা। ব্রাহ্মণ এতদ্ভূত তত্ত্ববিচারে এইরূপ স্থির করিলে পর, একজন অপরিচিত খরিদদার উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গাভীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ খরিদদারকে কহিলেন, ওহে বাপু! আমার এই গাভীটী অর্দ্ধ বৃদ্ধা,—অর্দ্ধযুবতী খরিদদার ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, ব্রাহ্মণ সেকেলে প্রাচীন লোক, ইহার বিষয়জ্ঞান বা ভালমন্দ জ্ঞান নাই। প্রকাশ্যে কহিল, ও ব্রাহ্মণ! আপনি ও কি বলিতেছেন? আমরা বেদবিদ্ সাধুদের নিকট শুনিয়াছি যে, "ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বং," "তৎ সত্যং

স আত্মা" ইত্যাদিনা। অর্থাৎ আত্মাই যে সর্ব্বময় ও সত্য পদার্থ, তাহার আবার অর্দ্ধ বৃদ্ধ অর্দ্ধ যুবতী কি? ব্রাহ্মণ ক্রেতার বাক্য শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন যে, ওহে বাপু! তোমাদের বিচার লইয়া আমার গাভী বেচাটা ছেড়ে দিতে হবে কি? তা আমি পারবনা, বাপু! তোমার ইচ্ছা হয় খরিদ কর, নতুবা বিনা বাক্যব্যয়ে এ স্থান ত্যাগ কর। আমি তোমাদের জ্ঞান লইয়া গাভী বেচা বন্ধ করতে আসিনে। কিছুদিন পরে অন্য হাটে জনৈক ক্রেতা আসিয়া ব্রাহ্মণের গাভীটী খরিদ করিল, ব্রাহ্মণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তদ্রূপ "ওরে নিধিরাম কোথা গেলি রে" বিচারের সারভাব গ্রহণ করতঃ—প্রাচীন বা পুরাতন শাস্ত্র বেদকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনায় জ্ঞান ও ভক্তিকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে হইলে, ব্রাহ্মণের গাভী বিক্রয়ের মত বলিতে হইবে যে,—নিধিরাম অর্দ্ধ মৃত, অর্দ্ধ জীবিত। খরিদদারের মত লোকে থাকিলে বলিবে যে,—ইহা অর্থাগুরঙ্ক কিনা বাগাড়ম্বর ভাবভঙ্গি। (ক্রমশঃ।)

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

শুভ সংবাদ—পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীপরমহংসদেব এক্ষণে "৪৮নং পেনখানা—কাশীধাম," এই ঠিকানায় অবস্থিত করিতেছেন, যাঁহারা আগামী কুম্ভমেলায় তাঁহার সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী মাসের ১০।১২ই মধ্যে ৺কাশীধামে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—আর্য্য-দর্পণের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া মাথাভাঙ্গাবাসী (কুচবিহার) প্রায় ৫০জন ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় ভদ্রমহোদয় কৃপাপূর্ব্বক এ বৎসরের "আর্য্য-দর্পণের" গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া "আর্য্য-দর্পণের" উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আমরা, এজন্য, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। দেশের, দশের ও ধর্ম্মের জন্য, তাঁহারা আরও মন প্রাণ ঢালিয়া দিউন, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

—:0:—

ও তৎসৎ

আৰ্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৭ম বর্ষ, } চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

তীর্থযাত্রীর দৈনন্দিন লিপি।

দেব-প্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগ অতি রমণীয় স্থান ও মহাতীর্থ উত্তরদিক হইতে ভাগীরথী এবং পশ্চিমদিক হইতে অলকানন্দা প্রবল প্রবাহে এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন; আর ইতিপূর্ব্বে রুদ্র-প্রয়াগে মন্দাকিনী অলকানন্দার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়াছেন। এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়াছে।

সঙ্গম স্থানে যাইবার জন্য অলকানন্দার উপর সুদৃঢ় সেতু আছে। এতদিন আমরা অলকানন্দার ধারে ধারে ইংরেজাধিকার দিয়াই আসিতেছিলাম। অদ্য সেতু পার হইয়া টিহরী মহারাজের অধিকারে সঙ্গম স্থানে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডাগণ নদীর এই পারেই আপন আপন আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে; যাত্রীগণ অতি সাবধানে স্নান করিতেছেন; কারণ দুই গঙ্গার একত্র সম্মিলনে স্রোত অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে; হঠাৎ, পদস্খলন হইলে স্রোতে কোথায় ভাসাইয়া নিবে, তাহার ঠিকানা নাই। স্নানান্তে যাত্রীগণ তর্পণ, পিণ্ডদান, অন্নদান, জলদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি এখানকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া-কর্ম্ম সমাধা করতঃ বহু সিড়ী বাহিয়া পাহাড়ের উচ্চ শিখরস্থিত শ্রীশ্রীভগবান রামচন্দ্রের মন্দিরে যাইতেছেন। মন্দিরটী অতি প্রাচীন; তন্মধ্যে রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের দিব্য মূর্ত্তি আছে।

অনেকে এখান হইতেই টিহরীর পথ ধরিয়া গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী ও কেদার দর্শন-পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে যাইয়া থাকেন। আর কেহ কেহ এই সমস্ত স্থান দর্শন না করিয়াই এখান হইতে বরাবর পূর্ব্ব পারস্থ সোজা রাস্তায় বদরীনারায়ণ পঁহুছিয়া থাকেন

বদরীনারায়ণের পাণ্ডাগণ এই স্থানেই বাস করেন, তাহারা এই স্থানেই যাত্রিগণের নাম ধাম আপন আপন খাতায় লিখিয়া লইয়া থাকেন।

সাধু মহাপুরুষগণের প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে বদরীনারায়ণের পাণ্ডাগণ হরিদ্বারেই বাস করিতেন। পরে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উপদেশে দেবপ্রয়াগে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের প্রদত্ত অর্থে তোমাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। বাস্তবিক এক্ষণে তাহা হইয়াছে। মহাপুরুষের ভবিষ্যবাণী সত্য হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে পাণ্ডা পল্লীতে যদিও স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তবুও তাহাতে কয়েক শত পাণ্ডার সুন্দর সুন্দর বাড়ী, মন্দির, বাজার ও প্রশস্ত রাজপথ বিদ্যমান আছে। অলকানন্দার পূর্ব্বপারিস্থিত দেবপ্রয়াগের অংশ সমধিক চিত্তাকর্ষক ও জাঁকজমকসম্পন্ন। এই অংশে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া লম্বালম্বি ভাবে প্রকাণ্ড বাজারে নানাবিধ দোকান সারি সারি শোভা পাইতেছে।

এখানে সকল প্রকারেরই খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; বাজারে মুসলমানদেরও দোকান আছে। গঙ্গার উত্তর তীরস্থ স্থানেই ... গড়োয়াল-অঞ্চলে যত- ... দেখা গেল, তন্মধ্যে শ্রীনগ- ... এই নগর। এখানেও বাবা কালী- কম্বলী-ওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা আছে।

২৫শে বৃহস্পতিবার—ভোরে দেবপ্রয়াগ হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১১টার সময় রামপুর চটীতে উপনীত হইলাম; তথায় মাধ্যাহ্নিক আহারাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে বিকালে ৪টার সময় রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যা ৭½টার সময় ভিল্ল-চটীতে পঁহুছিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাচীন ভিল্লকেদারচটী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; কেবল মাত্র ভিল্লেশ্বর মহাদেব ও তন্নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন আমগাছ বিদ্যমান আছে।

মহাদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটী নূতন নির্ম্মিত; ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটী অশ্বত্থ গাছ;—তাহার তলদেশ বেদিকাকারে প্রস্তর দ্বারা বাঁধান এবং বেদীর উপরে একটী নব নির্ম্মিত মনোহর বৃষ স্থাপিত আছে। মন্দিরের নীচেই বাঁধান ঘাট; তথায় দক্ষিন দিক হইতে খাণ্ডব-গঙ্গা এবং কিঞ্চিৎ উপর হইতে মার্কণ্ডেয়-গঙ্গা আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিলিতা হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে কালের কুটীল গতিতে স্থানটী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি উহার সৌন্দর্য্যের সম্যক হানি হয় নাই।

এই ভিল্লকেশ্বর মহাদেব সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়-কামনায় মহাবীর অর্জ্জুন এই মহাদেবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। আশুতোষ অল্পেই সন্তুষ্ট; সুতরাং অর্জ্জুনের তপঃক্লেশ ভক্তাধীন আশুতোষের আর সহ্য হইল না। তিনি অর্জ্জুনের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কিরাতবেশে দেখা দিলেন, এবং উভয়েরই লক্ষীকৃত ও শর প্রহারে নিপাতিত একটী প্রকাণ্ড বন্যবরাহ উপলক্ষ্য করিয়া ছলবিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; মৌখিক বাক্-বিতণ্ডা পরিণামে যুদ্ধে পরিণত হইল।

ভগবান পশুপতি অর্জ্জুনের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যে, সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র সহ শক্রজয় পাশুপাত নামক মহাস্ত্র প্রদান করেন। বর্ত্তমান ভিল্লকেশ্বর মহাদেবই তাহার নিদর্শন। এই ভিল্লকেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ কেদার-নাথ মহাদেব মূর্ত্তিরই অনুরূপ।

২৬শে শুক্রবার,—অদ্য প্রত্যুষে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ৭½টার সময় শ্রীনগরে পহুছিলাম। তথায় শ্রীকমলেশ্বর মহাদেব ও রাজরাজেশ্বরী, মহিষমর্দ্দিনী, কংসমর্দ্দিনী, গৌরী ও চামুণ্ডা মাতাকে দর্শনান্তে বেলা ৯টায় সময় বাবা কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আহারাদি সমাপনান্তে, তথা হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার সময় শুকতারা চটীতে উপস্থিত হইলাম এবং রাত্রি-যাপন করিলাম।

শ্রীনগর।

শ্রীনগর বহুকাল হইতে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য গুর্খাগণের হস্তগত হয়। প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল তাহাদের অধীন থাকে। পরাজিত গাড়োয়াল-রাজ সুদর্শনসাহ হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন; তাহাতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে গুর্খাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরাজ জয়লাভ করেন। ইংরেজকৃত এই উপকারের নিদর্শন স্বরূপ সুদর্শনসাহ নিজ রাজ্য তুল্যাংশে দুইভাগ করতঃ অলকা-নন্দার পূর্ব্বাংশ ইংরাজ রাজাকে অর্পণ করেন; তৎসূত্রেই শ্রীনগর ইংরেজাধিকারে আইসে। রাজা পূর্ব্ব হইতেই শ্রীনগর ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীনগর হইতে ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থিত টিহরী নামক স্থানটী নদী ও পর্ব্বতে সুরক্ষিত বিবেচনা করতঃ ঐ স্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীনগরের প্রাচীন রাজ-অট্টালিকা বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টক-পাষাণময় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

বৃটীশ গাড়োয়ালরাজ্যে শ্রীনগরই প্রধান সহর। এখানকার সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা শ্রীযুত কমিশনারসাহেব বাহাদুর এখান হইতে ৬ মাইল দূরস্থিত পর্ব্বতের উপর 'পাউড়ি' নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সহকারী রাজকর্ম্মচারী, তহসিলদার এবং বিচারকগণ এই স্থানে অবস্থিতি করেন। স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ ও মনোরম।

প্রথমতঃ গুর্খাদিগের অত্যাচারে শ্রীনগর শ্রীভ্রষ্ট হয়; প্রায় ১৭। ১৮ বৎসর হইল, ইংরেজাধিকারে আসিয়াও, পর্ব্বতপাতে আবদ্ধ গঙ্গার বিপুল জলরাশির আকস্মিক প্লাবনে, বাবা কমলেশ্বরের মন্দির ব্যতীত সম্পূর্ণ নগর বিধ্বস্ত হয়। এই আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাকের পর ইংরেজগবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অজস্র অর্থব্যয় ও নিয়ত যত্ন চেষ্টা দ্বারা বর্ত্তমান সুদৃশ্য ও মনোরম্য নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

নূতন শ্রীনগরের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবারই যোগ্য বটে; এরূপ রমনীয় ও প্রশস্ত পার্ব্বত্য নগর আর কোথায়ও দেখি নাই। অন্যত্র নিরন্তর পর্ব্বতের পর পর্ব্বত কেবল ভয় ও উদ্বেগেরই সঞ্চার করিয়াছে; আর এখানে সেই পর্ব্বত যেন দূরে থাকিয়া নগরের শোভা সম্পাদনার্থই নগরপ্রান্তবর্ত্তী প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান বলিয়া বোধ হইল। নগর

মধ্যস্থিত বৃহৎ বাজার নানাবিধ পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত দোকানপাটে সজ্জিত। বাজার মধ্যস্থ সুন্দর সুন্দর প্রশস্ত রাস্তাগুলি দেখিলেই, পর্ব্বতশূন্য সমতল দেশের রাজধানীর রাজপথের কথা মনে হয়। এমন বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আর কোন পার্ব্বত্য নগরে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানকার আফিস, আদালত, ডাকঘর, টেলিগ্রাম আফিস, ছাপাখানা ধর্ম্মশালা, দেবমন্দির, ফলফুলের উদ্যান সকলই কেমন সুসন্নিবিষ্ট ও সুকৌশলে স্তরে স্তরে সজ্জিত বলিয়া বোধ হইল। এখানে রাজরাজেশ্বরী, মহিষ মর্দ্দিনী গৌরী ও চামুণ্ডার ৩টী সিদ্ধপীঠ আছে। শিলাময় শ্রীযন্ত্রের অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে এই নগর "শ্রীনগর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

২৭শে শনিবার,—অদ্য ভোরে রওয়ানা হইয়া বেলা ৯টার সময় 'নরকোটা' চটীতে উপনীত হইলাম। বিকালে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিতে হইল।

২৮শে রবিবার,—ভোরে 'নরকোটা' হইতে রওয়ানা হইয়া প্রায় দুইমাইল দূরে "রুদ্র-প্রয়াগ" প্রাপ্ত হইলাম। এইস্থান মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থান। আমরা মহাদেব রুদ্রনাথ ও সঙ্গমস্থান দর্শন করতঃ রওয়ানা হইয়া—"ছতলী চটীতে" উপস্থিত হইলাম। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায় অদ্য এখানেই রাত্রিবাস করিতে মনস্থ করিলাম।

২৯শে সোমবার,—প্রাতে "ছতলী চটী" হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১০টার সময় "চন্দ্রাপুরী" চটী প্রাপ্ত হইলাম; তথায় আহারাদি পূর্ব্বক পুনঃ রওয়ানা হইয়া সায়ংকালে "শিবরাম চটীতে" উপস্থিত হইলাম। এই চটীতে রাত্রিযাপন করিলাম। "শিবরাম চটীতে" লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

"চন্দ্রাপুরী চটীর" নিকটেই অগস্ত্যমুনির আশ্রম অবস্থিত। একটী মন্দিরের মধ্যে অগস্ত্যমুনির মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে; আমরা এই মূর্ত্তি দর্শনান্তে মন্দিরের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে এক বৃহৎ হোম হইতেছে দেখিলাম। হোমকুণ্ডের চারিধারে ৪ জন ব্রাহ্মণ আসীন হইয়া চারি-বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দুগ্ধ, যব, ঘৃত দ্বারা আহুতি প্রদান করিতেছেন। যজ্ঞের সম্মুখে ভগবতীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম;—শুনিলাম ঐ হোমে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইবে এবং একমাস পরে পূর্ণাহুতি প্রদান করা হইবে।

৩০শে—মঙ্গলবার,—অতি প্রত্যূষে রওয়ান হইয়া প্রায় ১১॥টার সময় "গুপ্তকাশীতে" উপস্থিত হইলাম। এখানে মণিকর্ণিকায় স্নানাহ্নিক, তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় আজ এখানেই অবস্থিতি করিলাম।

গুপ্তকাশী।

অগস্ত্যমুনি হইতে গুপ্তকাশী ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটী বড়ই সুন্দর, মন্দিরের চতুর্দ্ধারের উপর ও নিম্নতলে যাত্রীদের থাকিবার যথেষ্ট ঘর আছে। ঐ প্রাঙ্গনের মধ্যে মন্দিরের সম্মুখে মণিকর্ণিকা নামে একটী কুণ্ড আছে; ঐকুণ্ডে নির্ঝরিণী হইতে দুইটী

ধারা পড়িতেছে। দুইটী ধারার মুখই পিতল দ্বারা বাঁধান; একটী হস্তীমুখী, অন্যটী গোমুখী। প্রথম ধারার নাম যমুনা, অপরটীর নাম গঙ্গা। যাত্রীগণ সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঐ কুণ্ডে স্নান করেন, ও ঐ দেশীয় নারিকেলের ভিতর স্বর্ণ, রৌপা পুরিয়া গুপ্তদান করেন, ঐরূপ গুপ্তদাতাদিগের মধ্যে পাঞ্জাবী ও মাড়োয়ারীই বেশী। ঐ দেশীয় স্ত্রীলোকগণ স্নানের সময় গান করিতে করিতে, হাত ধরাধরি করিয়া, নৃত্যাকারে জলে পুনঃ পুনঃ গা ডুবাইয়া থাকেন; কিন্তু কাহাকেও মাথা ডুব ইতে দেখি নাই।

মন্দির দুইটী; একটীতে বিশ্বনাথ, অন্যটীতে বৃষারূঢ় শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। বিশ্বনাথের লিঙ্গ মূর্ত্তি রৌপ্য নির্ম্মিত পিটেন দ্বারা শোভিত; তাহার একপার্শ্বে মহামায়ার মুখপদ্ম সুশোভিত রৌপ্য নির্ম্মিত চক্র; অপর পার্শ্বে রজত নির্ম্মিতা চতুর্ভুজা লক্ষ্মীমূর্ত্তি। দ্বিতীয় মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বরের একপার্শ্বে পিতলময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি, অপর পার্শ্বে পিতলময় নারায়ণ মূর্ত্তি। সকল মূর্ত্তিই সুগঠিত।

দেবালয়ের বাহিরেই নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে সুশোভিত দোকান; ভোজ্য বস্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। দোকানগুলির সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তা; রাস্তার অপর পার্শ্বে চারু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, রাস্তার উপর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। এথাকার পাণ্ডা শ্রীযুত বেণীপ্রসাদ তেওয়ারী বড়ই শান্তস্বভাব-বিশিষ্ট ও মিষ্টভাষী।

৩১শে বৈশাখ, বুধবার—অদ্য ভোরে ৬ টা সময় গুপ্তকাশী হইতে রওয়ানা হইয়া ৭ টার সময় বেতাচটীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে এক দোকানে বদরীনারায়ণের পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে আমাদের জিনিষ পত্র রাখিবার বন্দোবস্ত করিলাম; এইস্থান হইতে ৺কেদারনাথে যাইতে হয়। ৺কেদারনাথের রাস্তা বড়ই দুর্গম, সুতরাং সমস্ত জিনিষপত্র তথায় লইয়া যাওয়া বড়ই অসুবিধাজনক বিধায়ে নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষাদি কাণ্ডীওয়ালার কাছে দিয়া বাকী মালপত্রাদি দোকানে রাখিয়া গেলাম; ৺বদরীনারায়ণ যাইতে হইলে এই রাস্তার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

আমরা বেতাচটী হইতে রওয়ানা হইয়া মধ্যাহ্নে কাটাচটীতে উপনীত হইলাম এবং আহারান্তে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া সায়ংকালে রামপুর চটীতে উপস্থিত হইলাম।

১লা জ্যৈষ্ঠ—বৃহস্পতিবার—অদ্য ভোরে রামপুর চটী হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা ১০টার সময় ত্রিযুগীনারায়ণ পহুছিলাম; তথায় পূজার্চ্চনা, ও দেবদেবী দর্শনান্তে মধ্যাহ্নিক আহারাদি সমাপন করতঃ বেলা ১২টায় বহির্গত হইয়া সন্ধ্যাকালে গৌরিকুণ্ডে পহুছিলাম। এখানে—

ত্রিযুগী—নারায়ণ

সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এরূপ প্রবাদ আছে, যে হরপার্ব্বতীর শুভ পরিণয় এই স্থানে সম্পন্ন হইয়াছিল; ঐ বিবাহকালে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদবধি ঐ অগ্নি অদ্যাপি ঐ কুণ্ডে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে; যাত্রিগণ প্রত্যেকেই ঐ পবিত্র অগ্নিতে হোমার্থে কাষ্ঠ ও ঘৃত দিয়া থাকেন। কাষ্ঠ ও ঘৃত ঐ মন্দিরেই খরিদ করিতে

পাওয়া যায়। যুগাতীত কালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া এখনও অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, ইহা হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের পরিচায়ক বটে, সন্দেহ নাই। সকলেই ঐ ঐ পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতে বিভূতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমরাও কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করতঃ আপনাকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করিলাম।

প্রায় এক মাইল দূর হইতে নিম্ন পথে অবতরণ করিতে করিতে ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাস্তার দুই ধারে সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্র নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, আর কোথায় বা লোকালয় দৃষ্ট হইল; চারিদিকে বিষম উচ্চ পর্ব্বত, আবার তাহারই সমতল ভূমিতে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও সমৃদ্ধ লোকালয় বড়ই চিত্তাকর্ষক বোধ হইল। মন্দিরের কাছে রাস্তার দুই ধারে বিস্তর দোকান; দোকানের উপরে ও পার্শ্বে যাত্রিদিগের থাকিবার স্থান। মন্দিরের অপর পার্শ্বে একটু নির্জ্জন ও উচ্চ ভূমিখণ্ডে একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে; ধর্ম্মশালা হইতে অনতিদূরে মন্দিরের প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের মধ্যে তিনটী কুণ্ড আছে একটী ব্রহ্মকুণ্ড, দ্বিতীয়টী কাকুণ্ড ও অপরটী পানীয় জলের কুণ্ড। প্রথম দুইটী স্নানার্থে ও তৃতীয়টী সর্ব্ব সাধারণের পানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্দিরটী পাষাণনির্ম্মিত ও বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল; মন্দিরে রৌপ্য নির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ও দক্ষিনে লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং অপর কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ঐ মূল মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে অবস্থিত মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত হোমকুণ্ড বিদ্যমান আছে।

ত্রিযুগী-নারায়ণ হইতে গৌরীকুণ্ড যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক অভাবনীয় দৈব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘটনাটী এই :—

সোণ-প্রয়াগে বাসুকী-গঙ্গার পুল পার হওয়ার পর হইতেই রাস্তায় চড়াই অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আবার অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা খুব পিচ্ছিল হইয়াছে; কোনরূপে অতি সাবধানে পথ চলিতে চলিতে ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পর্ব্বতকোলে একস্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম; আমার সঙ্গীয় যাত্রীগণ কিছু দূর অগ্রে গিয়াছেন। আমি হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, আমার বুঝি আর যাওয়া হইল না; এমন সময় দেখিলাম আমার পিছন হইতে ৫ পাঁচ জন পাহাড়ীয়া লোক আসিয়া আমার সম্মুখে স্থির হইয়া দাড়াইলেন। তন্মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল; তাঁহার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, প্রশস্ত ও উন্নত ললাট আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুদ্বয়, আজানুলম্বিত বাহু যুগল ও বলিষ্ঠ দেহ দেখিলে স্বতঃই যেন প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়; শির আপনা হইতেই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চায়। তিনি আমাকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—"বাবা! ওরূপভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছ কেন? তোমার ভয় কি? মা জগদম্বা অলক্ষিতে তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, তিনি সঙ্গীয় লোকদিগকে বলিলেন,—দেখ উহার মুখে কেমন ব্রহ্মজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহারাও তাঁহার এই কথায় সায় দিলেন। তদনন্তর তিনি চণ্ডীস্তব ও শ্লোক এবং মহামায়ার

শতনাম পাঠ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আমি ঐরূপ নিস্পন্দভাবে কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম, আমার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে ছিল না; তাহারা কিছুদূর চলিয়া গেলে, আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম আমার ভিতর কি যেন একটা অব্যক্ত-আনন্দের লহর ছুটিয়াছে,—প্রাণ আহ্লাদে নাচিয়া উঠিতেছে, আমি যেন কি এক দৈবশক্তিতে শক্তিশালী হইয়াছি, মনে বড়ই সাহস ও উৎসাহ হইল; বলিতে কি, এই ঘটনার পরে আমার কি আমার সঙ্গীয় যাত্রীদিগের কাহারও শারীরিক অবসাদ ও কি পীড়াদি হয় নাই; সর্ব্বত্রই সানন্দে ও সোৎসাহে ভগবদ্দর্শন স্পর্শন করিয়াছি। সকলই লীলাময়ের লীলা! আমি ক্ষুদ্র জীব তাঁহার মহিমা কি বুঝিব?

ক্রমশঃ—

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ।

হৃদয় নির্ম্মল হ'লে, ফুটে এ মোহন রূপ,
সে কি রূপ, না মিলে তুলনা।
মনোময় রূপ ওই—বিরাজে মনের মাঝে,
এ যে গো চিন্ময় রূপ, নহে ও কল্পনা॥
রাধা-ভাব-কান্তিযুত, এ যে রূপ সুললিত,
ঝলকে ঝলকে সুধা বর্ষে।
চিত্তের মালিন্য ছুটে, অন্তর ফুটিয়া উঠে,
মায়ার অতীত ভাব-স্পর্শে॥
পরাণ আলোক করা, দিব্য আলোকেতে ভরা;
ওই রূপ কি লাবণ্যময়!
ভাবজ্যোতি ছড়াইয়ে, হিয়া দেয় জুড়াইয়ে,
নবযুগে নব ভাবোদয়!
শ্রীরাধা ভাবের দ্যুতি সম্বলিত রূপ ভাতি,
ভাবুকের চিন্তনীয় ধন।
সদানন্দ প্রেমঘন, এ রূপের এক কণ,
অনুভবে প্রীতি অতুলন॥
মনের মানুষ ও কে, আছিস্ আছিস্ ভাই,
আয় ছুটে আয় ওরে আয়!
মধুর ভাব-তরঙ্গ, হৃদয়ে করুক রঙ্গ,
ডুবে যাই প্রেমের বন্যায়॥
নব বৃন্দাবন মাঝে, রমণীয় নব সাজে,
এরূপ ফুটুক অন্তরেতে।
নিরুপম রূপখানি, মানস প্রতিমাখানি,
রাখি যেন অতি যতনেতে॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
সোণামুখী—গরীবভাণ্ডার।

—:0:—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। ইনি দৃশ্যতঃ মানবাকার হইলেও ভৌতিক মানব নহেন। তবে সন্দেহ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ইহাই প্রসিদ্ধ; সুতরাং এই মনুষ্যাকার প্রত্যক্ষ জীবকে স্বয়ং ভগবান কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈশ্বর নিরাকার, একথা সত্য; কিন্তু এখানে "নিরাকার" অর্থে "আকার" নাই, এরূপ নহে। প্রত্যুত: যাহার নিশ্চয় আকার আছে, তিনিই নিরাকার।" নিঃ,—নিশ্চয় নিষেধয়োঃ; নিঃ,—এই উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়াত্মক ও নিষেধাত্মক। ঈশ্বর নিরাকার বলিতে "নিঃ" উপসর্গ নিশ্চয়াত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহার যাহা অভাব, তিনি তাহা প্রদান করিতে পারেন না। মুনিজনাচিত শুভ্র-শেখর পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত বহুবিধ পদার্থ-পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,—শুদ্ধ সত্ত্বময় খরকিরণ-বিকীরণকারী তমোহারী দিবাকর,—পূণ্যাত্মা-গণের অত্মা সদৃশ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী এবং ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রশান্ত শশধর প্রভৃতি পরিপূর্ণ এই বিশ্ব ত শ্রীভগ-বানেরই রচনা। এই পৃথিবীতেই কীট, পতঙ্গ, সর্প, বিহঙ্গ, দ্বিপদ, বহুপদ, অহস্ত, সহস্ত প্রভৃতি নানা আকারের পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, শ্রীভগবানের আকৃতি না থাকিলে তাঁহার রচিত বিশ্বের এবং এই পৃথিবীস্থ জীবসমূহের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হওয়া অসম্ভব হইত।

তবে শ্রীভগবানের আকৃতি কিরূপ? কীটাকৃতি তিনি পতঙ্গের আকৃতি দিতে পারিতেন না; তিনি সর্পাকৃতি হইলে বিহ-ঙ্গাকৃতি কোথা হইতে আইসে?

জগতের যাবতীয় প্রাণী আপাততঃ দৃষ্টিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও উহাদের মূর্ত্তির একটা সামঞ্জস্য আছে; এবং মনুষ্যই যে সর্ব্বশেষে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সমস্ত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

পৃথিবী প্রথমতঃ জলময়ী ছিল; পরে চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বশতঃ জল হইতে স্থলের উৎপত্তি হইয়াছে; ইহা আমরা বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি। সুতরাং প্রথমে জলচর পরে উভচর, ও তৎপরে স্থলচর প্রাণিগণের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ক ক্রমবিকাশের মত নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। সৃষ্টিপ্রবাহ নিত্য। উহা শ্রীভগবান হইতে আসিতেছে এবং শেষে শ্রীভগবানেই লীন হইতেছে।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে,—কোন স্থানে কতকগুলি পদার্থ উপর্য্যুপরি রাখিলে বাহির করিবার সময় সর্ব্ব-প্রথমেই শেষেরক্ষিত পদার্থটী বাহির করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে প্রথম পদার্থটী বহির্গত হইয়া থাকে। মনুষ্য শেষ সৃষ্টি সুতরাং মনুষ্যাকারই প্রথম অর্থাৎ আদি। সুতরাং উপলব্ধি হইতে পারে যে শ্রীভগবান মনুষ্যাকার।

আর একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, যদি একটী আম্রবীজ মৃত্তিকায় রোপণ করা যায়, তবে প্রথমে তাঁহার অঙ্কুর, পরে তাহার কাণ্ড, পত্র, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতি ক্রমশঃ বহির্গত হয়; কিন্তু যে বীজটী মৃত্তিকায় রোপন করা হইয়াছিল, সেটী নষ্ট হয় নাই।

তবে মনুষ্যাকার হইলে তাঁহার আকৃতি স্ত্রীলোকের ন্যায় অথবা পুরুষের ন্যায়? স্ত্রীলোক এবং পুরুষ ইহার কোনটী শেষ সৃষ্টি, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, শ্রীভগবান স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; যেমন,— কালী, দুর্গা বা রাধা। কেহ বলেন শ্রীভগবান পুরুষাকৃতি-বিশিষ্ট; যেমন,—মহাদেব, অথবা শিব বা কৃষ্ণ। যত মতভেদই থাকুক না কেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবেই সর্ব্বমতের সমন্বয় দেখিতে পাই। শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সমস্ত স্ত্রীমূর্ত্তির চরম সৌন্দর্য্য-ময়ী শ্রীরাধা এবং সমস্ত পুরুষাকৃতির পরম মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয় অর্থাৎ স্ত্রীমূর্ত্তি ও পুরুষ মূর্ত্তি উভয়ে মিলিত হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্ত্তি হইয়াছেন; এইজন্যই গোস্বামীগণ গান করিতেছেন;—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা-
দেকাত্মনা বপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতং তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিং-সুবলিত-নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

খেলার পুতুল।

কেন এ ছলনা প্রভু! কি দোষ আমার?
খেলার পুতুল মাত্র আমি ও' তোমার।

যেভাবে গড়েছ তুমি, হয়েছি গঠিত,
চলেছি, যে পথে যেতে করেছ ইঙ্গিত।

তুমিই দিয়েছ আঁখি রূপে মুগ্ধ করি,
দিয়েছ হৃদয় শত কামনায় ভরি।

সংসার সঙ্গীতে সদা তৃষিত শ্রবণ,
আকুল দুরাশামুগ্ধ চির অন্ধ মন,

তুমিই বিরলে ব'সে ক'রেছ রচনা,
তোমার আদেশ তারা করিছে ঘোষণা।

কে আমি, কি আছে মোর, কহ আপনার?
হাসি কাঁদি, যাহা করি, ইচ্ছায় তোমার।

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।

—:0:—

যোগপ্রক্রিয়ায় রোগারোগ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাড়াগীমুদ্রা। পশ্চিমোত্তান বা উগ্রাসনে উপবেশনপূর্ব্বক উদরকে তড়াগাকৃতি করিয়া কুম্ভক অনুষ্ঠান করিলেই তাড়াগী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা জরা ও মৃত্যু দূর করে।

মাণ্ডুকীমুদ্রা। মুখ বিবর মুদ্রিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তালু বিবরে জিহ্বার মূলদেশকে পরিচালিত করিবে এবং রসনা দ্বারা ধীরে ধীরে সহস্রদলপদ্ম-বিনির্গত অমৃতধারা পান করিবে। ইহাকে মাণ্ডুকী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে দেহ বলিত ও পলিত সঞ্চার হয় না, কেশের পক্কতা জন্মে না এবং চিরকাল যৌবন স্থির থাকে।

অশ্বিনীমুদ্রা। মুহুর্মুহুঃ গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলেই অশ্বিনীমুদ্রা হয়। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অশ্বিনী মুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই মুদ্রার প্রসাদে অর্শাদি গুহ্যরোগ ধ্বংস হয়, ইহা বল ও পুষ্টিসাধন এবং অকাল মৃত্যু হরণ করে।

কাকীমুদ্রা। স্বীয়মুখ কাকচঞ্চুবৎ করতঃ শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পান করিয়া নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলেই কাকীমুদ্রা সাধিত হয়। এই মুদ্রার প্রসাদে কাকের ন্যায় নীরোগী হওয়া যায়। দুর্জ্জয় শূলবেদনা এবং বুকেপীঠে যে কোন বেদনা থাকিলে আরোগ্য হয়।

মাতঙ্গিনী মুদ্রা। কণ্ঠমগ্ন জলে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্রে নাসিকা দ্বারা জলপান করিয়া মুখ দিয়া নিষ্ক্রান্ত করিয়া ফেলিবে; পরে আবার মুখ দিয়া জল লইয়া নাকদ্বারা নিষ্ক্রান্ত করিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার আচরণ করিলেই মাতঙ্গিনী মুদ্রা হয়। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে জরা ও মরণ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভুজঙ্গিনীমুদ্রা। মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া গলদেশ দ্বারা বায়ু পান করিবে। ইহারই নাম ভুজঙ্গিনী মুদ্রা। এই মুদ্রা জরা ও মৃত্যুকে দূরীকৃত করিয়া দেয়। জঠর মধ্যে অজীর্ণ প্রভৃতি যে কোন পীড়া বিদ্যমান থাকে, এই ভুজঙ্গিনী মুদ্রার প্রভাবে আশু তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ঊর্দ্ধচালনীমুদ্রা। নিজ মূত্র পরিত্যাগ কালে বলপূর্ব্বক অপান বায়ু দ্বারা ঐ মূত্র আকর্ষণ করিয়া লইবে। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি রোগ দূরীভূত হয়। দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে সাধক ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন।

পাঠক! যোগশাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার মুদ্রার বিষয় বর্ণিত আছে। তাহার মধ্যে অনেকগুলি হাতে-কলমে না শিখাইয়া দিলে সকলে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইবে না; সুতরাং সকলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অনর্থক বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে। যে মুদ্রাগুলির বিষয় লিখিত হইল, সেগুলি সহজসাধ্য এবং সাধারণের করণীয়।

রোগারোগ্য স্বন্ধে এইগুলি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। এই মুদ্রাসমুহ সর্ব্বব্যাধি ধ্বংস করে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ মুদ্রা অভ্যাস করেন, তাঁহার জঠরানল প্রবর্দ্ধিত হয়, কাশ শ্বাস, প্লীহা, গুল্ম ও বিংশতি প্রকার শ্লেষ্ম-রোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; জরা ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে প্রাণায়ামের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

প্রাণবায়ুর বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিঃশ্বাস নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইলে আয়ুক্ষয় নিশ্চিত। মানবের নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় ব'ার অঙ্গুলি শ্বাসবায়ু বহির্গত হয়, কিন্তু ভোজন, গমন, রমণ, গান ও নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যবিশেষে স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। নাসারন্ধ্র হইতে ব'ার অঙ্গুলি মাপিয়া সেই-স্থলে একটু পিঞ্জাতুলা ধরিয়া দেখিবে, যদি তাহা ছাড়াইয়াও বায়ু যায়, তবে তুলা সরাইয়া দেখিবে কতদূর তাহার গতি হইল, স্বাভাবিক অবস্থায় ব'ার অঙ্গুলির অধিক গতি হইলেই বুঝিতে হইবে, জীবন ক্ষয়ের পথে গিয়াছে। মৈথুনে যে জীবনের হানি হয়, নিশ্বাস গতির দীর্ঘতাই তাহার প্রধান কারণ। আবার যাহাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে, স্থুল কথায় ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিয়াছে, তাহাদের নিঃশ্বাস অতি ঘন ঘন ও দীর্ঘপাত হয়, কাজেই তাহাদিগকে আরও শীঘ্র মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া থাকে।

যোগাঙ্গীভূত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা ঐ নিঃশ্বাসকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই জীবনী-শক্তি রক্ষার একমাত্র উপায়। আবার যিনি যোগপ্রভাবে নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক গতি দু'এক অঙ্গুলি করিয়া হ্রাস করিতে পারেন, সর্ব্বসিদ্ধি ও অমানুষী ক্ষমতা তাহার করতলগত। এইরূপে যোগের উচ্চাবস্থায় উপনীত হইলে একেবারে বায়ু নিরোধ করিয়া বহুদিন কাটাইয়া দিতে পারা যায়।* যাহাহউক সাধারণ লোক যে কার্য্যে প্রাণ-বায়ু অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, সেই-কার্য্য যত অল্প করিবে, ততই সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যিনি নিয়মিত রূপে প্রাণায়াম করেন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাসের অস্বাভাবিক গতিকে স্বভাবে রাখাই দীর্ঘজীবন লাভের হেতু। প্রাণ শব্দে বায়ু,—আর আয়াম শব্দে নিরোধ; প্রাণায়ামের সময় কুম্ভক করিলে প্রাণবায়ু নিরোধ হয়; শ্বাসপ্রবাহ হয় না, এইহেতু জীবন দীর্ঘ ও রোগশূন্য হয়।

কিন্তু প্রাণায়াম অভ্যাস সাধারণের পক্ষে নিরাপদ নহে। যেমন একদিকে উপযুক্ত-রূপে প্রাণায়াম অভ্যাসে সর্ব্বরোগ বিনাশ পায়, তেমন অন্যদিকে অনুপযুক্ত অনুষ্ঠানে শ্বাস, কাস, হিক্কা, শিরকর্ণাক্ষি বেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। যোগা-চারপালন, নিয়ম ও সংযম এবং অভিজ্ঞ

---

*প্রাচীন যোগিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান কালের ভূকৈলাসের সাধু ও পাঞ্জাবের হরিদাস সাধু ইহার দৃষ্টান্ত। পূজ্যপাদ ত্রৈলিঙ্গস্বামীমহারাজও জলমগ্ন হইয়া দুই চারি ঘণ্টা অক্লেশে কাটাইয়া দিতেন। (লেখক)।

গুরুর উপদেশ ব্যতীত কাহারই প্রাণায়াম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রাণায়াম আট প্রকার; তন্মধ্য হইতে আমরা সহজসাধ্য দুই একটী রোগনাশক প্রাণায়ামের সাধন কৌশল নিম্নে বিবৃত করিলাম।

উজ্জায়ী। নাসিকাযুগল দ্বারা বহিস্থ বায়ু এবং হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা অন্তঃস্থ বায়ু সমাকর্ষণপূর্ব্বক কুম্ভক যোগে বদনের মধ্যে ধারণ করিবে। পরে শীতল জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করতঃ কণ্ঠদেশ সংকোচনপূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক সংন্যস্ত করিয়া যথাশক্তি নির্ব্বিঘ্নে বায়ু ধারণ করিবে। ইহারই নাম উজ্জায়ী প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে কফরোগ, দুষ্টবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাশ, জ্বর ও প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে।

শীতলী। রসনা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করতঃ কুম্ভকযোগে শনৈঃ শনৈঃ উদর মধ্যে বায়ু পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর ক্ষণকাল সেই বায়ু ধারণ করতঃ নাসাযুগল দ্বারা রেচন করিবে। ইহারই নাম শীতলী কুম্ভক। ইহা সাধন করিলে অজীর্ণ, শ্লেষ্মরোগ ও পিত্তজাত রোগ সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শূলবেদনা প্রভৃতি বুকে পেটে কোন প্রকার আভ্যন্তরিক বেদনা থাকিলে আশু আরোগ্য হয়। এবং রক্ত পরিষ্কার হইয়া দেহ কান্তিবিশিষ্ট হয়।

ভস্ত্রিকা। কর্ম্মকারের ভস্ত্রিকা যন্ত্র (কামারের জাঁতা) দ্বারা যেমন বায়ু আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নাসিকাদ্বয় দ্বারা বায়ু সমাকর্ষণ করত ধীরে ধীরে জঠর মধ্যে পরিচালিত করিবে; অনন্তর কুম্ভকযোগে যথাসাধ্য প্রপূরিত বায়ুকে ধারণা করিয়া পুনর্ব্বার ভস্ত্রিকার ন্যায় ঐ বায়ু ত্যাগ করিবে। ইহার নাম ভস্ত্রিকা কুম্ভক। ইহার অনুষ্ঠানে কোন রোগ বা কষ্ট সঞ্জাত হয় না এবং অহরহ আনন্দ বিধান হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি জরা ও মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, রোগবিনাশ আর বেশী কথা কি! প্রাণায়ামের অনন্ত ফল, আমরা কেবল রোগারোগ্যের জন্য তিন প্রকার প্রাণায়ামের আলোচনা করিলাম। রোগ বিনাশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমরা নিম্নে রোগারোগ্যের কয়েকটী সহজসাধ্য ও পরীক্ষিত কৌশল লিখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

আশ্চর্য্য কৌশল। জ্বর আক্রমণ করিলে কিম্বা আক্রমণের উপক্রম বুঝিতে পারিলে তখন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত জ্বর আরোগ্য ও শরীর সুস্থ না হয়, তাবৎ ঐ নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিবে। ইহাতে জ্বর আর আক্রমণ করিবে না। দশ পনর দিন ভুগিবার মত জ্বর পাঁচ সাতদিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মাথা ধরিলে দুই হাতের কনুয়ের উপর কাপড়ের পাড় বা দড়ি দ্বারা জোরে বাধিয়া রাখিলে পাচ সাত মিনিটে মাথা ধরা আরোগ্য হইবে। প্রত্যহ মাথা ধরিলে সেই সময়

---

*এই কৌশলগুলি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত,—পুস্তকগত বিদ্যা নহে; বহু শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা বহুবার পরীক্ষিত। প্রঃ লেঃ—

যে নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া কনুয়ের উপর খুব জোরে বাধিবে; যন্ত্রনা আরোগ্য হইলেই বাধন খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ।

শিরঃপীড়াগ্রস্থরোগী ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসাপুট দিয়া শীতল জল পান করিবেন, ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে, মাথা ধরিবে না বা সর্দ্দি লাগিবে না । এই পীড়ায় চিকিৎসক রোগীর আরোগ্য আশা পরিত্যাগ করেন, রোগী ও বিষম কষ্ট পাইয়া থাকেন; কিন্তু এ প্রক্রিয়ার রোগী আশাতীত ফল পাইবেন । বলা বাহুল্য, নিঃশ্বাসের সাহায্যে জল পান করা কর্ত্তব্য। নাসাবিবরে জল ঢালিয়া দিলে বিশেষ ফল পাইবেন না ।

স্থিরভাবে বসিয়া একদৃষ্টে নাভিমণ্ডলে দৃষ্টিপূর্ব্বক নাভিকন্দ ধ্যান করিলে এক সপ্তাহে উদরাময় আরোগ্য হইয়া থাকে । শ্বাসরোধ-পূর্ব্বক নাভি আকর্ষণ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ একশতবার মেরুদণ্ডে লাগাইলে আমাদি উদরাময়-সঞ্জাত সকলপীড়া আরোগ্য হয় এবং জঠরাগ্নি ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয় ।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় হস্ত-পদ সঙ্কোচ করিয়া ছাড়িয়া দিবে,—আর এপার্শ্বে ও পার্শ্বে আড়া-মোড়া ফিরিয়া সর্ব্ব শরীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিবে । প্রত্যহ চারি পাঁচ মিনিট ঐরূপ করিলে প্লীহা, যকৃৎ আরোগ্য হইবে । চিরকাল অভ্যাস থাকিলে ঐ সকল রোগ কখন আক্রমন করিবে না ।

প্রত্যহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে' ততবার দুই পাটী দাঁত একত্র করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিবে । যতক্ষণ মল কিম্বা মূত্র নিঃসরণ হয়, ততক্ষণ দাঁতে দাঁতে চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য । ইহাতে শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হইবে । নিয়ত অভ্যাস রাখিলে দন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘকাল কার্য্যক্ষম থাকিবে ।

বুকে, পীঠে বা পার্শ্বে—যে কোন স্থানে ফিক্ বেদনা হইলে যেমন বেদনা বুঝিতে পারিবেন, অমনি কোন নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই নাসিকা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে দুই চারি মিনিটে নিশ্চয়ই বেদনা আরোগ্য হইবে !

প্রত্যহ আহারান্তে চিরুণী দ্বারা (রবরের চিরুণী না হয়) মাথা আঁচড়াইবেন । এরূপ ভাবে চিরুণী চালনা করিতে হইবে যেন চিরুণীর কাঁটা স্পর্শ হয় । এই প্রক্রিয়ায় বাতরোগ ও উর্দ্ধগ কোন পীড়া আক্রমন করিতে পারে না । শীঘ্র চুল পাকিবে না ।

প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই মুখের ভিতর যত জল ধরে, তত জল রাখিয়া, অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার ঝাপটা দিয়া ধুইয়া ফেলিবে । আহারান্তে আচমন সময় অন্ততঃ সাতবার চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিতে হইবে । যে কোন কারণে মুখ ধুইতে হইলে কপাল ও চক্ষুতে জল দেওয়াও কর্ত্তব্য । স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন কালে সর্ব্বাগ্রে দুইপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মর্দ্দন করিতে হয় । এই কয়েকটী নিয়ম চক্ষুরোগের বিশেষ উপকারী । ইহাতে দৃষ্টিশক্তি সতেজ ও চক্ষু স্নিগ্ধ থাকে ।

এবং চক্ষুর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিয়মগুলি প্রত্যহ পালন করা কর্ত্তব্য। পরিশ্রমজনক কার্য্যান্তে শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত অথবা তজ্জনিত ধাতু গরম হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলে, অচিরে—অতি অল্প সময়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হইয়া শরীর সুস্থ হইবে।

কানে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে এরূপভাবে চাদর বা তোয়ালে দ্বারা কর্ণ দুইটী আচ্ছাদন করিয়া প্রখর রৌদ্রে চলিলেও রৌদ্র-জনিত কোন দোষ শরীর স্পর্শ করিতে পারে না এবং রৌদ্রতাপে শরীর তাপিত বা ক্লিষ্ট হইবে না।

স্মরণশক্তি হ্রাস হইলে মস্তকের উপর দুই খণ্ড কাষ্ঠকীলক রাখিয়া ধীরে ধীরে অঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করিবেন।

ললাটোপরি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ জ্যোতি ধ্যান করিলে আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং কুষ্ঠাদি রোগ দূর হইতে পারে। সর্ব্বদা দৃষ্টিরগ্রে পীতবর্ণ উজ্জ্বল জ্যোতিধ্যান করিলে বিনা ঔষধে সর্ব্বরোগ আরোগ্য ও দেহ বলি-পলি বিহীন হয়। মাথা গরম হইয়া ঘুরিতে থাকিলে শ্বেতবর্ণ ধ্যান করিলে বিশেষ উপকার হয়। শরীর উষ্ণ হইলে শীতল বস্তুর এবং শীতল হইলে উষ্ণ বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্যের ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ একচিত্তে শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণাদির ধ্যান করিলে দেহস্থ সমস্ত বিকার বিনষ্ট হয়। এইজন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হিন্দুর নিত্য ধ্যেয়। ইহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিধাতু সাম্য হয় (এই ত্রিধাতুর বৈষম্যে দেহ পীড়িত হইয়া থাকে) ও শরীর সুস্থ হয়। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে শিরসি-শুক্লাব্জে শ্বেতবর্ণ গুরুদেব ও রক্তবর্ণ তৎশক্তির ধ্যানেও শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। তাই ধর্ম্ম-সাধন প্রণালীর প্রথম স্তরেই এই সকল নিত্যানুষ্ঠেয় বিধি-ব্যবস্থা ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

পাঠক! অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করিবেন না। অশ্রদ্ধাও অবিশ্বাসের জন্য ঘরে অমৃত থাকিতেও আমরা মুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ। আধিব্যাধিতে দেহ জীর্ণ শীর্ণ,—অসুখ-অশান্তিতে গৃহ পূর্ণ। তাই ঘরের ছেলেদের নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাদের এই আয়োজন। অনিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা যেমন মানবদেহে রোগোৎপত্তি হয়, তেমন ঔষধ ব্যবহার না করিয়াও আভ্যান্তরিক ক্রিয়া দ্বারা রোগারোগ্যের উপায় নির্দ্ধারিত আছে। আর্য্যশাস্ত্রে তাহা নানা প্রকারে আলোচিত হইয়াছে। আমরা অধ্যাত্ম-বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া যে সকল রোগশান্তির কৌশল তন্মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, সাধারণ পাঠকগণের জন্য তাহা প্রকাশ করিলাম। এইসকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন সন্দেহ নাই। আমরা আগামী বর্ষে সন্ন্যাসিগণের প্রদত্ত সামান্য সামান্য দ্রব্যে বৃহৎ বৃহৎ রোগ প্রতিকারের বিধি ও কৌশল প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাই বলবতী।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

যোগানন্দ লহরী।

কীর্ত্তনের সুর (৪)

গৌরাঙ্গসুন্দর রূপ মনোহর, ভুবনমোহন মূরতি রে।
(সে যে) ভাবে ঢল ঢল, প্রেমে টলমল, নদীয়া বিভোর করে॥
কিবা কষিত কাঞ্চন, অঙ্গের বরণ, চঞ্চল চিকুর দোলে,
আহা, কোটী ইন্দু জিনি, উজল মুখানি, ভাতিছে প্রেমপুলকে;
(সে যে কেমন শোভা) (মুনিজন মনলোভা)
(ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে)
কিবা, ললিত শ্রীঅঙ্গ, নব তরঙ্গ,—প্রেমধারা আঁখি ঝরে॥
কিবা, শ্রীভুজযুগলে চপলা চমকে, অলকা তিলক ভালে,
আহা চন্দন চর্চ্চিত, ভকত রঞ্জিত, গলে বনমালা দোলে;
(মালা সাজিল ভাল) (ও সে গৌর অঙ্গে বনমালা)
(সে যে ভুবনমোহন মালা)
নব নটবর বেশে, ভাবের আবেশে, জগজন মন হরে॥
যত, মধুকরগণে ভ্রমে কমল ভ্রমে, যুগল পদ সরোজে,
তাহে, সোণার নূপুর, আহা কি মধুর, রুনু ঝুনু রবে বাজে;
(নূপুর বাজিছে রে) (মোহন তানে আকুল করে)
(মন প্রাণ নিল হরে) (রুনু ঝুনু রুনু রবে)
গোরা, রাধাভাবে ভুলে, কাঁদে হরি বলে, নাচে দুটী বাহু তুলে।
গোরা হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, চলিছে নগর পথে,
সে যে, ভেসে নয়নজলে, বল হরিবল বলে, প্রেম বিলায় যারে তারে;
(এমন দয়াল কে আছে) (সে যে জীবের তরে কেঁদে ফিরে)
(যারে তারে কোলে করে) (প্রেম বিলায় রে যেচে যেচে)
গোরা, মুখে হরিনাম, বলে অবিরাম, (দেয়) গড়াগড়ি ধূলায় পড়ে॥
যত পাষণ্ড দলন, হল অগণন, বিচিত্র সে লীলা হেরে,
নগরে নগরে, নদের ঘরে ঘরে, হরি হরি রব উঠিল রে;
(হরে কৃষ্ণ হরে) (হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে)
(হরে রাম হরে) (হরে রাম রাম হরে হরে)

সব পাতকী তরাতে, প্রেম সুধা দিতে, এল গোরা দয়া করে ॥
আহা, অধমতারণ করুণানিধান, কে আর এমন আছে,
যোগেশের মন, হওরে মগন, অভয় পদ সরোজে;
(পদে শরণ লও হে) (সেই অভয় পদে একবার)
(শমন ভয় আর রবে না রে) (তরে যাবে হেসে খেলে)
সদা হরি হরি বলে, নাচ বাহু তুলে, মজ রে (গৌর) প্রেম পাথারে ॥

—:0:—

বৈদিক—প্রসঙ্গ।

(১০)

পরমাণুর পরিণাম কি ?

আবার যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তিকে 'সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম' অণুবৎ অনন্ত বায়ুহিল্লোলে অনন্তপথে লোকলোচনের অগোচরে" ভাসাইয়া, ইহাদের নানাত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পান, বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য পারমাণবিক নিত্যত্ব অটুট রাখা ইত্যাদি বলিয়া নানা স্থানে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করেন; তাঁহাদের উপদেশের সার ভাব এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে, যথা—

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুই নিত্য বস্তু ও মূল পদার্থ। সুতরাং পরমাণু চতুর্ব্বিধ; ইহা স্থূল নহে, মূল। (নূতন বিজ্ঞানের মতে 'হাইড্রোজান' ও 'অক্সিজান' নামক বাষ্পদ্বয়ের মিলনে জল জন্ম গ্রহণ করে, সুতরাং ইহাদিগকেও মূল পদার্থ বলা যায়।) ইহাদের অন্য নাম ভৌম পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু, ও বায়বীয় পরমাণু। সাবয়ব বস্তু বিভাগ করিতে করিতে, যখন বিভাগের শেষ সীমায় পঁহুছিবে, অর্থাৎ আর বিভাগ করা চলিবে না, তখন তাহাই পরমাণু উপাধি পাইবে। পরমাণু ব্যতীত পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরমাণুপুঞ্জই সৃষ্টির প্রারম্ভে স্পন্দিত হইয়া (অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত হইয়া) পরস্পর সংযুক্ত হয়। স্পন্দনের পর দ্ব্যণুকারম্ভক সংযোগ। সংযোগ ব্যতীত দ্ব্যণুক হয় না, আবার পরমাণু দ্বয়ের ক্রিয়া ব্যতীত সংযোগ হয় না। দ্ব্যণুকাভাবে ত্রসরেণু, তদভাবে স্থূল জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। যে সময়ে পৃথিবী ইত্যাদি ভূত চতুষ্টয় চরম বিভাগে বিভক্ত হইয়া পরমাণু হইয়া যায়, সেই সময়ের নাম প্রলয়। প্রলয়কালে চরম অবয়বী অনন্ত পরমাণুই থাকে, তাহার আর অবয়ব থাকে না এবং অংশ বা বিভাগ হয় না। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে

ক্রিয়া জন্মে ! অর্থাৎ দ্ব্যণুকোৎপাদক পরমাণু মিলন বা ত্র্যসরেণু উৎপাদক দ্ব্যণুকের মিলন এক এক প্রকার, তেজ ও বায়ুর সাহায্যে হইয়া থাকে। যেমন হাইড্রোজান ও অক্সিজান বাষ্পদ্বয়ে জলীয় পরমাণু, দ্ব্যণুকের অমিলিত সমষ্টি এবং তেজের সূক্ষ্মাংশ ও বায়ুর সমাবেশ থাকায়, একটীর তেজ ও বায়ুর সাহায্যে অপরটীর পরমাণু সম্মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকের মিলনে ত্রাসরেণু, ক্রমে তাহাই স্থূল বা দৃশ্য জল সৃষ্টি করে। তদ্রূপ বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মিয়া সেই ক্রিয়া বায়বীয় পরমাণুকে সংযুক্ত করতঃ বায়বীয় দ্ব্যণুকোৎপাদন করে। ক্রমে ত্রাসরেণু ও চতুরণুক দ্বারা বৃহৎ বায়ু বা বায়ু নামক মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এ বায়ুকে নানা ভাবে না দেখিয়া একভাবে দেখিলে, বায়ুর সংঘর্ষ, অভিঘাত বা সংযোগ কদাচ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু সংঘর্ষ, অভিঘাত বা সংযোগ দ্বিষ্ঠ বস্তু। অতএব বায়ুর সংঘর্ষ, অভিঘাত ও সংযোগাদি অনুভব হইলে একাধিক বায়ু স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় যে, বায়ু দ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা বায়ুর ঊর্দ্ধগমন অনুমানের বিষয়ীভূত হয়। যেমন দুই বিভিন্ন দিকের জল প্রবাহে, স্রোতদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষ বশতঃ জলের মধ্যস্থান উচ্চ হইয়া উঠে; তদ্রূপ বায়ুবেগে যখন তৃণ, পত্র, ঊর্দ্ধে উঠিত থাকে, তখন বায়ুর ঊর্দ্ধগমন দুই দিকের বায়ু সংঘর্ষে হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই সংঘর্ষযুক্ত বায়ুই চলিতকথায় ঘুর্ণি-বায়ু (পাড়াগ্রামের ভাষায় ভীমরুল) নামে পরিচিত হয়। সুতরাং বায়ুর সংঘর্ষ অনুমান দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায়, বায়ু কদাচ এক নহে; সর্ব্বদাই নানারূপ। বায়ুর যে অন্য বায়ুর সহিত সংঘর্ষ বা অভিঘাত তাহাই বায়ুর নানাত্ব সাধক। জলের পক্ষেও তদ্রূপ। এইরূপ সকল বস্তুর নানাত্ব সাধক সংযোগ বিয়োগ আছে। সুতরাং বৈষম্যাবস্থায় আত্মা, জ্ঞান ও ভক্তিকে এক বলিলে চলিবে কেন?

ভাল কথা। কিন্তু পরমাণুতে যদ্যপি স্পন্দনরূপ আগুক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে তাহাদের সংযোগ সিদ্ধি হইবে; দ্ব্যণুক ও ত্রাসরেণুর দ্বারা বিশ্ববিস্তারও ঘটিবে; দুই বিভিন্ন দিকের জলস্রোত সংঘর্ষে "উচ্চজল" নামক পৃথক জল থাকিবে; ঘুর্ণীবায়ু (পাড়াগ্রামের ভীমরুল) দ্বারা বায়ুর নানাত্ব প্রসিদ্ধ হইবে। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি পৃথক দাঁড়াইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে? আর পরমাণুতে আগুক্রিয়া না থাকিলে সংযোগ সিদ্ধি হইবে না, সংযোগাভাবে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকাভাবে ত্রাসরেণু, তদভাবে বিশ্বসৃষ্টিও ঘটিবে না। স্রোতের উচ্চ নিম্নে সর্ব্বত্রই জল; জলাতিরিক্ত নূতন বস্তু হইবে না। বায়ুর ঊর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বত্রই বায়ু; বায়ু ভিন্ন পৃথক বস্তু হইবে না। সুতরাং উচ্চ নিম্ন শব্দগুলি জলের; আর ঊর্দ্ধ অধঃ ঘুর্ণী শব্দগুলি বায়ুর ঔপচারিক বা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস মাত্র দাঁড়াইবে। পারমাণবিক নিত্যতায় জ্ঞানের তৃপ্তি ও সংশয়ের নিবৃত্তি অসম্ভব হইবে। পরমাণুগুলিও নিজের নিত্যত্ব হারাইয়া অনিত্য উপাধি লাভ করিবে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পরমাণুপুঞ্জ স্পন্দিত অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত "হইয়া পরস্পর সংযুক্ত

হয়। ক্রিয়ার অভাবে অর্থাৎ স্পন্দনের অভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সংযোগ হয় না। অতএব সংযোগের নিমিত্ত কারণ ক্রিয়া বা স্পন্দন। অথবা সেই সংযোগ পরমাণুর কর্ম্মমূলক। এইরূপ পরমাণুতে যে স্পন্দন কর্ম্ম হইবে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় পরমাণু যে সক্রিয় হইবে, তাহারও নিমিত্তকারণ মানিতে হইবে। নতুবা "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" কিনা বিনা কারণে কার্য্য হয় না; এই নিয়মানুবোধে পরমাণুতে আদ্যক্রিয়ার (স্পন্দনের) অভাব হইবে। অতএব নিমিত্তকারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এই কারণটী কি? অর্থাৎ পরমাণুতে যে স্পন্দন ক্রিয়া হয়, তাহা কোন কারণ বশতঃ হয় জানিতে হইবে। অন্যথায় পরমাণুতে ক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দন হইতে পারে কি না এই সন্দেহ দূর হইবার নহে।

"প্রযত্ন" এই কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু "আত্মসংযোগ প্রযত্নাভ্যাং হস্তে কর্ম্ম"—অর্থাৎ আত্মার সংযোগ ও প্রযত্নই শরীর বা অবয়বজনিত কর্ম্মের কারণ হইয়া থাকে। এখানে চেষ্টার সমবায়িকারণ শরীর বা অবয়ব; যত্নবিশিষ্ট বা প্রযত্নবান্—আত্মার সহিত শরীরের যে সংযোগ তাহাই অসমবায়ি কারণ; আর আত্মার প্রবৃত্তি বা যত্নই নিমিত্ত-কারণ। যেমন লিখিতে লিখিতে বাম হস্ত দ্বারা আমার দাড়িগুলি পাক দিবার বা টানিবার ইচ্ছা হইল, কাজেই হাতটা নাড়িবার প্রবৃত্তি আসিল, এই প্রবৃত্তির নামই যত্ন; তারপর হাতে চেষ্টা হইল, এই চেষ্টার '-পৈশিক শক্তিরূপে" কার্য্য করার নামই হাতনাড়া। আমার হাত নাড়িবার প্রবৃত্তি বা যত্ন না হইলে, এবং আত্মার সহিত হাতের সম্বন্ধ না থাকিলে হাতনাড়া হইত না,—হাতনাড়ার অভাবে আমার দাড়িতে পাক দিবার খেদও মিটিত না। তবেই দেখা গেল হাতনাড়ারূপ কর্ম্মের হাত সমবায়ি কারণ সত্বেও, যত্নবিশিষ্ট আত্মসংযোগ ও প্রযত্ন-কারণ দাঁড়াইতেছে। তদ্রূপ পরমাণুর স্পন্দন কর্ম্মের কারণ "প্রযত্ন" না হইবে কেন? এইরূপ আশঙ্কা বা প্রশ্ন উদিত হইলে, সহজেই মীমাংসা দ্বারা স্থির হইবে যে, মহর্ষিরা যোগশাস্ত্রে, প্রযত্নের যে কারণ প্রদর্শন বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শারীরিক বা আবয়বিক কর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ বিষয়ক, যথা "প্রযত্নাভ্যাং হস্তে কর্ম্ম"। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয় কালে চরম অবয়বী পরমাণুর যখন কোন অবয়ব বা অংশ বিভাগ থাকে নাই, তখন শরীর বা অবয়ব না থাকায় (নিরাকার স্থলে) প্রযত্ন কখন পরমাণুর স্পন্দন কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। সৃষ্টির পর "প্রযত্ন" কর্ম্মের কারণ হইতে পারে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অন্যথায় জানা যায় যে, "ন হি তস্যামবস্থায়ামাত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি শরীরাভাবাৎ। শরীর প্রতিষ্ঠেহি মনস্যাত্মনঃ সংযোগে সত্যাত্ম গুণঃ প্রযত্নে জায়তে" অর্থাৎ শরীর বা অবয়ব না থাকিলে আত্মগুণ থাকে না, আবার শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না হইলে, আত্মার প্রযত্ন গুণ আপনা হইতে উপস্থিত হয় না। শরীরোৎপত্তির পর প্রযত্নের গুণত্ব অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মা নিরবয়ব ও নির্গুণ বিধায়ে, তাহাতে কোন প্রযত্নই হইতে পারে না। তদ্রূপ পরমাণু ও সৃষ্টির

পূর্ব্বে নিরবয়ব বিধায়ে তাহাতে কোনরূপ প্রযত্নের সম্ভাবনা নাই বা পৃথিব্যাদি পরমাণুর আদ্যক্রিয়ার কারণ "প্রযত্ন" নহে।

"অভিঘাত" এই কর্ম্মে কারণ হইতে পারে না। যেহেতু "অভিঘাতান্মুষল সংযোগাদ্ধস্তে কর্ম্ম" অর্থাৎ অভিঘাত স্বরূপ যে উদুখলে মুষল-সংযোগ তাহা হস্ত বা শারীরিক কর্ম্মের প্রয়োজক।

যেমন ফুটবল খেলিবার সময় হাত দিয়া বল নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই বলের ক্রিয়া নিক্ষিপ্ত অবস্থায় তির্য্যগ-গমন, তাহার পর ভূমিতে পড়িয়া আবার তৎক্ষণাৎ উৎপতন হয়, ইহা ভূমিতে অভিঘাত জন্য; তদ্রূপ সজোরে উদুখলে মুষল পড়িলে, তৎক্ষণাৎ মুষলে উৎপতন ক্রিয়া হয়, অর্থাৎ ঠিকরাইয়া পড়ে, ইহা উদুখলের অভিঘাত জন্য। মুষল উৎপতিত হইলে, সেই উৎপতন বেগ যুক্ত মুষলের সহিত হাতের বা শরীরের যে সংযোগ, তাহাই হস্ত উৎপতনের কারণ এবং সেই উৎপতন, প্রযত্ন জন্য। কিন্তু ইহাও শারীরিক বা আবয়বিক কর্ম্মের বিষয়ীভূত; সুতরাং সৃষ্টির পরে, পূর্ব্বে নহে। অতএব "অভিঘাত" সৃষ্টির পূর্ব্বে চরম অবয়বী নিরবয়ব পরমাণুর আদ্যক্রিয়া অর্থাৎ স্পন্দনের কারণ নহে।

"নোদন" এই কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু "প্রযত্ন বিশেষান্নোদন বিশেষঃ"। অর্থাৎ প্রযত্নবিশেষ হইতেই নোদন হইয়া থাকে। নিক্ষেপনীয় বস্তুর অনুকূলে হস্ত বা দেহাদির চেষ্টাকেও অনেকে নোদন বলিয়া থাকেন। কিন্তু "বৈশেষিক" মতে কর্ম্ম কর্ম্মের জনক নহে। অতএব নিক্ষেপের অনুকূল কর্ম্মকে চেষ্টা বলা চলে না। তবে চেষ্টাযুক্ত অবয়বের সহিত নিক্ষেপনীয় বস্তুর সংযোগ বিশেষকে নোদন বলিলে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে না। আবার প্রযত্নই সংযোগ বিশেষের প্রবর্ত্তক। এইজন্য প্রযত্ন-বিশেষ হইতে নোদনবিশেষ সাধিত হয়। কিন্তু "প্রযত্ন" শারীরিক কর্ম্মের কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব নোদন ও আবয়বিক কর্ম্মের কারণীভূত হইয়া পড়িল। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে নহে, পরে। এই হেতু "নোদন" পারমাণবিক আদ্যক্রিয়ার কারণ নহে।

"অদৃষ্ট" এই কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু "মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণম-দৃষ্টকারণকম্"; অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণির দিকে লৌহের অভিগমন, মন্ত্রপূত তীরের তস্করের প্রতিগমন, সর্প-ওঝার মন্ত্রপূত কড়ির সর্পের অনুসন্ধানে গমন ও সর্পকে সর্পাহত ব্যক্তির নিকট আনয়ন ইত্যাদি কর্ম্মের লৌহ, তীর ও কড়ির, অয়স্কান্ত, তস্কর ও সর্পের সহিত দৃঢ় সংযোগ হেতু যে স্পন্দন তাহার কারণ অদৃষ্ট। মতান্তরে জল গ্রহণ দ্বারা বৃক্ষাদির যে জীবন ধারণ হয়, সেই বৃক্ষে জলের যে অভিগমন তাহাকে অদৃষ্টের কার্য্য বলা হয়। কিন্তু এই যে অদৃষ্টের কার্য্যত্ব বা কারণত্ব দেখান হইল, ইহাও আবয়বিক বস্তুর জন্য। সুতরাং সৃষ্টির পরে। সৃষ্টির পূর্ব্বে নিরবয়ব পরমাণুর জন্য নহে। অতএব অদৃষ্ট পরমাণুর আদ্যক্রিয়ার কারণ নহে।

আবার "অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীত-সংযোগাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থে মরণ-কালে প্রাণ ও মনের দেহ ত্যাগ, উপগমন, দেহান্তরের উৎপত্তি তাহাতে প্রাণ ও মনের

প্রবেশ, গর্ভস্থ শরীরের স্পন্দন ও জীবের সুখ দুঃখের ইতর বিশেষে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদি. কর্ম্মের কারণ অদৃষ্ট বা ঐ সকল কর্ম্ম অদৃষ্টমূলক ব্যাখ্যা করতঃ অদৃষ্টকে কর্ম্মফলের তুলনায় আনিলে, (লৌকিক ব্যবহারে যাহা বরাত নামে পরিচিত) অর্থাৎ অদৃষ্টকে কর্ম্মফলের নিয়ন্তা বলা হইলে, কর্ম্ম আদিতে কি অদৃষ্ট আদিতে "বীজাঙ্কুরের ন্যায়" নির্ণয় করা অসম্ভব হয়; যেমন আদিতে বীজ না হইলে বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না হইলেও বীজ হইতে পারে না; তদ্রূপ জীব শুভাশুভ কর্ম্ম করিলে তাহার ফলে অদৃষ্ট নিয়ন্তা হইবে, কিন্তু আদিতে কর্ম্ম না থাকিলে, জীবই বা কে, কর্ম্মই বা কোথায়? এবং ইহার ফল ত দূরের কথা। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ম্মফল-নিয়ন্তা উপাধিটা লাভ করা "অদৃষ্টের পক্ষে" সম্ভবাতীত। অন্য-পক্ষে যেমন পুত্র না থাকিলে পিতা উপাধি লাভ হয় না, অর্থাৎ পিতা হইতে হইলে পুত্রকে অপেক্ষা করে; তদ্রূপ "কর্ম্মরূপ" পুত্র (জন্যবস্তু) না থাকিলে, "অদৃষ্টরূপ" পিতা (জনক) উপাধি অসম্ভব; অর্থাৎ উভয়, উভয়কে অপেক্ষা করে, কেহই স্বয়ং-সিদ্ধ উপাধি পায় না। কাজেই কে অগ্রে, কে পশ্চাত নির্ণয় হয় না।

অতএব কর্ম্ম অগ্রে, কি অদৃষ্ট অগ্রে, নির্ণয় না হওয়ায়, উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ-বশতঃ অর্থাৎ অনিশ্চয়ত্ব হেতু, উৎপত্তি অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং কর্ম্মফলের তুলনায় "অপসর্পণ মন্ত্রে" অদৃষ্ট নিরবয়ব পরমাণুর আদ্যক্রিয়ার কারণ হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বেদবাক্যে "অস্মাইদমগ্র-আসীত" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা জানা যায় যে; অদৃষ্টকে আদ্যক্রিয়ার কারণ বলিলে, অদৃষ্ট আত্ম-সমবায়ি বা পরমাণু-সমবায়ি যেরূপ হউক না কেন, অদৃষ্ট কখন অণুতে আদ্য-ক্রিয়া জন্মাইতে পারে না। যেহেতু অদৃষ্ট অচেতন। যাহাতে চৈতন্যের সংযোগ বা বা অবস্থিতি নাই, তাদৃশ অচেতন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয় না, বা কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইতে পারে না। চৈতন্যের প্রবৃত্তি না হইলে, সেই অবস্থা অচেতন বা জড় নামে অভিহিত হয়; প্রবৃত্তি গুণ দেখা যায় না। "গাভীর স্তন্যদুগ্ধের ক্ষরণ ও বৃদ্ধি" "মরা মানুষ নড়ে না কাজেই অচেতন-সংযুক্ত চৈতন্যের প্রবৃত্তি শক্তি নাই;" আর জীবন্ত মানুষ নড়া চড়া করে, সুতরাং চেতন এবং চৈতন্য-প্রবৃত্তি যুক্ত"; এই চেতন মানুষ সংযুক্ত অচেতন বস্তু রেলগাড়ী বা রথাদি গতি-বিধি দ্বারা প্রবৃত্তি যুক্ত হয়, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের প্রবৃত্তি শক্তি নাই, "মরা মানুষ নড়ে না বলিয়া" আর অচেতনই প্রবৃত্তি-যুক্ত হইয়া থাকে, "নড়া মানুষ রেল গাড়ীর চালক বলিয়া" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা যাঁহারা অচেতনের প্রবৃত্তি দেখাইতে প্রয়াস পান, তাঁহারা বোতল মধ্যস্থ ছিপি আঁটা দুগ্ধের বৃদ্ধি ও ক্ষরণ দেখেন না, পরিচালক 'মানুষ' ব্যতীত রেল ও রথের গমনাগমন প্রত্যক্ষ করেন না ইহা সত্য। এরূপ স্থলে স্থূলদৃষ্টিতে অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা গেলেও, সেই প্রবৃত্তি চেতন হইতে হয় বা তাহাতে চেতনার অধিষ্ঠান আছে; ইহা সহজেই অনু-মান দ্বারা সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ চেতন বৎসের

ইচ্ছায় দুগ্ধ ক্ষরিত ও চেতন মানবের ইচ্ছায় বাষ্পীয় শকট পরিচালিত, সহজেই উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়। তদ্রূপ যিনি পূর্ণ চৈতন্যময়, শ্রুতি বাক্যে যিনি সোহক্ষরঃ, পরমঃ স্বরাট্, যিনি সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভূত্বাৎ, যাঁহার প্রজ্ঞায় জগৎ প্রকাশিত, সেই পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্য দেবের মহিমায় জল অচেতন হইলেও বৃষ্টি ধারায় ভূতলে পড়িবে; নদী সাগারাভি-মুখে বহমানা হইবে; বায়ু লতাপাতা লইয়া উর্দ্ধে উঠিবে; অয়স্কান্ত মণি 'অচেতন' নিজে প্রবৃত্তি রহিত হইলেও, লৌহের প্রবর্ত্তক হইবে; কণা মাত্র শুক্র হইতে বিরাট জীব দেহ হইবে; গর্ত্তস্থ জীব নড়িবে; মৃত মানুষ নিস্পন্দ হইবে; শীতকালে শীত, বর্ষাকালে বর্ষা, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম হইবে; জাম গাছে জাম, আম গাছে আম, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ফলিবে; সৃষ্টিধারায় প্রত্যহ নিয়ত জীবাদি জন্তু জন্মিবে, পরিণামে মরণের কোলে যাইবে; রজ্জু দেখিয়া সর্প, মুড় গাছ দেখিয়া ভূত, শুক্তি দেখিয়া রৌপ্য ভ্রম হইবে; বেদবাক্যের উপর বিশ্বাস ভক্তিতে জ্ঞান, অন্যথায় অজ্ঞান আসিবে; বুদ্ধি-পরিচালনায় এরোপ্লেন, মনোপ্লেন, ও জেপোলিন শূন্যদেশে উড়িবে এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য সাধুগণের উপেক্ষায় আসিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি আছে, ইয়ত্বাই বা কে করিবে? নিয়ামক নির্ণয় ত দূরের কথা। এইটী মানিলেই যথেষ্ট হয়। তাহা হইলে সেই পরমকারণ নিত্যবস্তু চৈতন্যদেবই পরমাণুর কারণ হয়। তাহারই অন্য নাম "পূর্ণপরব্রহ্ম"। পরমাণু-গুলি সেই পরমকারণ বস্তু অপেক্ষা স্থুল হইয়া বিনশ্বর হইয়া পড়ে, নিজের সৃষ্টির পূর্ব্বে নিত্যত্ব রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। অন্যথায় "অদৃষ্টের" চেতনত্ব সম্ভবে না, সুতরাং অচেতন অবস্থায় পরমাণুর জনকত্বও খাটে না।

অতএব প্রযত্ন, অভিঘাত, নোদন, অদৃষ্ট ও অপসর্পণ মন্ত্র, সৃষ্টির পূর্ব্বে চরম অবয়বী পরমাণুর (যাহার অবয়ব বা অংশ বিভাগ নাই) আদ্য ক্রিয়ার অর্থাৎ স্পন্দনের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না। অন্যপক্ষে সৃষ্টি-কালীন পরমাণুতে যে স্পন্দন ক্রিয়া হইবে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় পরমাণু সক্রিয় হইবে, ক্রমে বিশ্ববিস্তার করিবে, তাহারও কোন নিমিত্ত-কারণ থাকে না। অথবা প্রলয়ে নিষ্ক্রিয় সৃষ্টিতে সক্রিয় ইহারও নিয়ামক কেহ নহে। সুতরাং নিমিত্ত বা কারণ না থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া হইবে না, ক্রিয়া ব্যতীত সংযোগও হইতে পারে না। সংযোগাভাবে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুকাভাবে ত্র্যসরেণু, তদাভাবে জগতের অনুৎপত্তি।

অন্য আপত্তি এই যে, পরমাণু যে অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা সর্ব্বাত্মিক কি আংশিক? সর্ব্বাংশে সংযোগ হইলে ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থুল সূক্ষ্ম, কিছুই হইতে পারে না; যে পরমাণুই সেই পরমাণুই থাকে। আংশিক হইলে অংশ মানিতে, হয়, তদ্দ্বারা চরম অবয়বী পরমাণু অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে; যেহেতু পরমাণুর অংশ বিভাগ নাই। পরমাণুর বাস্তবিক অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ আছে বলিলে, কল্পনীয় বস্তু মিথ্যা হয়; বস্তুপদ বাচ্য হয় না। ইহা দ্বারা পরমাণুসংযোগও মিথ্যা হইয়া পড়িবে। আবার বস্তুই জন্য পদার্থের অসমবায়ি কারণ; অবস্তু কাহারও অসমবায়ি-কারণ হইতে

পারে না। সুতরাং অসমবায়ি কারণের অভাবে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি অসম্ভব হইবে, বিশ্ব-বিস্তারও দুরাশায় দাঁড়াইবে। অন্যপক্ষে সৃষ্টিকালে "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" বশতঃ অর্থাৎ নিমিত্ত কারণের অভাবে যেমন পরমাণু সংযোজক ক্রিয়া অসম্ভব, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে অংশবিভাগশূন্য 'অখণ্ড' পরমাণুর বিশ্লেষণ ক্রিয়াও সম্ভবযোগ্য নহে। যেহেতু সে সময়ে নিয়ামক বা কারণক কেহ থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্ট টিকে না; কেননা ইহারা ভোগের প্রবর্ত্তক, মহাপ্রলয়ের নহে। অতএব কারণাভাবে পরমাণুতে আদ্যক্রিয়ার অভাব। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগ, সংযোগাভাবে বিয়োগ; সংযোগ বিয়োগের অভাবে সৃষ্টি-প্রলয়ের অভাব, এইরূপ প্রসক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়।

পরমাণু-ধর্ম্ম আলোচনায় আর একটী বিষয় জানা যায় যে, "রূপরস গন্ধ স্পর্শবতী পৃথিবী" অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ যাহাতে আছে, তাঁহাই পৃথিবী। পৃথিবীর এই চারিটী লক্ষণ প্রদর্শিত আছে। মতান্তরে ইহার আর একটী লক্ষণ এই যে, ইহা 'অনেক রূপবত্ত্ব' বা 'অনেক রূপবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যত্ব ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব' অর্থাৎ যাহাতে অনেক প্রকার রূপ থাকে তাহাই পৃথিবী। বহুরূপ, বহুরস, পাকজ স্পর্শ এবং গন্ধ এই চারিটী লক্ষণ পৃথিবীর, ইহাই ভাবার্থ; যথা অনেক রসবত্ত্ব, পাকজস্পর্শবত্ত্ব, গন্ধবদ্‌বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতিমত্ত্ব ইত্যাদি।

"রূপ রস স্পর্শবত্য আপো দ্রব্যাঃ স্নিগ্ধা" অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই পাঁচটী জলের গুণ (মতান্তরে কেহ কেহ তিনটাই মূল গুণ বলেন)। অর্থাৎ (১) যে জাতীয় দ্রব্যে শুক্লরূপ ব্যতীত অপর রূপ নাই, পরন্তু রূপ আছে, তাহা জল। ইহার অন্য নাম "শুক্লরূপমাত্রবত্ত্ব"। (২) যে জাতীয় দ্রব্যে মধুর রস ব্যতীত অপর রস নাই, পরন্তু রস আছে, তাহা জল।" যথা মধুরেতর রসবদবৃত্তি জাতিমত্ত্ব।" (৩) যে জাতীয় দ্রব্যে শীতল স্পর্শ আছে তাহা জল।" যথা শীতস্পর্শ-বদবৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব"। (৪) যে জাতীয় দ্রব্য স্বভাবতঃ পাতলা, অগ্নির তাপে জমাট হয় না, অন্য কারণে জমাট হইলেও সময় মত নিজেই গলিয়া যায়, তাহা জল। যথা "সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব বদবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্তি-জাতিমত্ত্ব"। (৫) যে জাতীয় বস্তুতে স্নেহ আছে, অর্থাৎ সংযুক্ত বস্তুতে লাগিয়া থাকে বা আশ্লেষকতা যাহাতে আছে, তাহাই জল। যথা "স্নেহবদ্ বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব"। এই যে এতগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে কোন পার্থিব বস্তুতে এই সকল গুণ থাকিলে তাহা জলেরই গুণ হইবে। পৃথিবীর গুণ হইবে না। পৃথিবীতে বহুরূপ, বহুরস ইত্যাদি বহুবচন আছে, জলে তাহা নাই; জলের গুণ এক-বচনযুক্ত। অতএব জল পৃথিবীতে অপেক্ষা সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র।

"তেজো রূপ স্পর্শবৎ" অর্থাৎ তেজে রূপ ও স্পর্শ 'দুইটী' গুণ আছে। ইহার প্রথমটীর লক্ষণ, যে জাতীয় দ্রব্য পর প্রকাশে সমর্থ, দ্বিতীয়টী যে জাতীয় দ্রব্যে উষ্ণ, স্পর্শ আছে; তাহাই তেজ পদ বাচ্য ইহাতে দুইটী গুণ থাকায়, ইহাও জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র।

"স্পর্শবান বায়ুঃ" অর্থাৎ যাহাতে স্পর্শ

আছে তাহাই বায়ু। ইহার লক্ষণ এই যে, যাহা রূপবান বস্তুতে নাই, কিন্তু স্পর্শবৎ বস্তুতে আছে তাহাই বায়ু। ইহাতে কেবল মাত্র একটী গুণ থাকায় ইহাও তেজ অপেক্ষা সুক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র।

"ত আকাশে ন বিদ্যন্তে"—অর্থাৎ আকাশে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ নাই বা মতান্তরে অনুভূত হয় না। ইহা দ্রব্যাশ্রিত নহে, সুতরাং নিত্যবস্তু। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু অপেক্ষা মহৎ বা স্থূল, বিশাল, বিপুল; যেহেতু আকাশ নিরবয়ব। পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয় তদ্রূপ নহে, যেহেতু সাবয়ব। অতএব নিরবয়ব বিধায়ে আকাশের কোন লক্ষণই নাই। এইজন্যই 'ত' অর্থাৎ তাহারা কিনা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ "আকাশে ন বিদ্যন্তে"। অতএব আকাশ নীরূপ, নীরস, নীর্গন্ধ ও নীস্পৃশ্য পদার্থ; সহজেই বুঝা যাইতেছে। কোন কোন দার্শনিক ধর্ম্মপ্রচারকদের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, বায়ুর যে স্পর্শ প্রত্যক্ষ, তাহা সুক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র নহে, বৃহৎ বা স্থুল। ইহাকে "মহৎ" বলা যায়। অথচ এই মহত্ত্বের ন্যূনতা ও আধিক্য আছে, সুতরাং আকাশের ন্যায় পরম মহৎ নহে; যেহেতু ইহার অবয়ব আছে। বায়বীয় অবয়বের যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ (চরম অবয়ব) তাহার আর অবয়ব নাই; সেই নিরবয়বই বায়ু পরমাণু বলিয়া জানিবে; তাহাই নিত্য বস্তু। ইহার ভাবার্থ দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যথা, বায়ু ক্ষুদ্র উপাধি পাইলেও বৃহৎও মহৎ, মহৎ কম বেশী হইবে, অথচ পরম নিত্য-বস্তু। আর ইহার সুক্ষ্ম ভাগটা নিত্য, স্থূল ভাগটা অনিত্য। অর্থাৎ নিত্যং পরিমণ্ডলম্," "অনিত্যোহনিত্যম্"। (ক্রমশঃ)।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

পরপারের যাত্রী।

এস কে আস্‌বে ত্বরায়
হ'য়ে পরপারের সাথী;
ভাব তরঙ্গে বিষয় ভুলে—
তবে লক্ষ্য কর গতি।

যে ভাবেতে বিভোর হ'য়ে
ভুলেছিলে এই সংসারে,
হিসাব নিকাশ করে এখন
দেখ বিচার করে।

বিচার শেষে শুন্য দেখে
হ'য়ে থাকিবে অবাক্,
ভবের বাজার ভেঙ্গে যাবে
বিশ্বখানই ফাঁক।

অসীমে সেই ফাঁক মিশালে
অসীম হবে সেটা,
আমি ভুল্‌লে পাগল হ'য়ে
ধর্‌তে চাইবে ঐটা।

এ পথের পথিক হইয়ে এস
যদি কোন সুধীজন।
আপন বিলায়ে, ধুলি-কণাতে
আপনায় কর মিলন।

দেখ্‌বে তখন অসীমের সাথে
অসীম হ'য়ে আছ,

ভাব তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই
পর পারে গেছ ॥

শ্রীপ্রমথনাথ বক্সী।

—:0:—

ব্রহ্মতত্ত্ব।

এই দৃশ্যমান অসীম, অনন্ত জগতের তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ; কিন্তু তা'র জ্ঞান ভাণ্ডারে, তা'র মহাভাবময় মানসক্ষেত্রে, এমন এক অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত রয়েছে, যা'র স্ফুর্ত্তিতে অসীমের অসীমত্ব, অনন্তের অনন্তত্ব এসে ধরা দিচ্ছে; এবং অনুভব কো'রে তা'তে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে, দেবত্ব লাভ কর্ত্তে সমর্থ হচ্ছে। অন্য সকল জীব থেকে, মানুষের ইহাই হ'ল বিশেষ শক্তি। এই শক্তিটীর নামই জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষকে অণু হ'তে অণীয়ান, মহৎ হ'তে মহীয়ানে পরিণত করে। জ্ঞান হইতে চেতনের অনন্ত বিস্তৃতি।

জ্ঞান বিস্তৃত হ'তে প্রবৃত্ত হ'লেই তা' ইচ্ছারূপে প্রকাশ হয়। ইচ্ছা উৎপন্ন হ'লেই তা'তে সৎ, অসৎ, দুটো মূর্ত্তি এসে বিভূতি নিয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ একবার ভাবে "করব কি না করব"। এর নামই হ'ল বিচারণা, সূক্ষ্ম-ভাবে কর্ম্মের প্রাথমিক ভিত্তি। বিচারণা যখন "কর্‌ব ও না করব" উভয়কে নিয়ে, কর্ম্মও সেরূপ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, প্রকাশ, লয়, গ্রহণ ও ত্যাগ ইত্যাদিকে নিয়েই প্রকাশিত। এই সৎ, অসৎ দুই স্বভাবাপন্ন কর্ম্মের, সৎ প্রবৃত্তি হ'তে ক্রমে ভক্তি ও অসৎ হ'তে ক্রমে নূতন নূতন বিষয় রচনা করে। সৎ প্রবৃত্তি হ'তে ভক্তি, কারণ কর্ত্তব্য ব'লে মনকে একটা সত্ত্বার অধীন করে, নিজের উপর কোন অভিমান না রেখে, কাজ ক'রে যায়। আর অসৎ প্রবৃত্তি হ'তে বন্ধনাত্মক কর্ম্ম জন্মে! তা'তে অভিমান টুকু বেশ ভালরূপে প্রস্ফুটিত থাকে। সেই জন্য সেটা যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তার চাইতে তার আত্মসুখের জন্য যে বেশী দরকারী, এ ভাবটী বেশ সুন্দর রূপে ফুটে উঠে! আর প্রবৃত্তির যেখানে শেষ, ইচ্ছার যেখানে লয়, জ্ঞান যেখানে অন্তর্ম্মুখী, ভক্তির যেখানে পূর্ণতা, সেখানেই আনন্দ।

আমাদের দেহে ৯৮° ডিগ্রী তাপ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। সমস্ত রৌদ্রের কেন্দ্র যেমন সূর্য্য, ঘরভরা আলোকের কেন্দ্র যেমন প্রদীপ, সেইরূপ দৈহিক তাপ সমষ্টির কেন্দ্র এক হিরণ্যগর্ভ;—প্রকারান্তরে আত্মা। তাপ থাক্‌লেই জ্যোতিঃ থাকৃতে বাধ্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যদিও সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু কৌশল অবলম্বন কর্‌লে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। দৈহিক জ্যোতির শক্তিতেই চক্ষের দর্শন শক্তি। জ্যোতিঃ চক্ষের সাহায্যে বাহ্য জগতের জ্যোতির

সঙ্গে মিশে, কোন পদার্থের স্বরূপ স্থির করে শেষে গ্রহণ করে। আবার তাপ ও তাড়িত একই জিনিষ। এই যে দেহ-ভরা তাপ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ মহাকেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে এবং বিকীর্ণ হ'তে তাহাতে যে গতির উৎপত্তি হচ্চে তাহা সূক্ষ্মভাবে অথচ মহাশক্তিশালী দৈহিক তাড়িত শক্তি। এ শক্তিতেই দেহের কোন স্থানে কিছু স্পর্শ হওয়া মাত্র, তা'র খবর তাড়িৎ-কোষ মস্তিকে এসে পৌছে। দেহের সকল স্থান জুড়েই তাড়িৎ চলাচল কচ্ছে বলেই, দেহখানার সকল স্থান সর্ব্বদা সচেতন; এবং রক্তের বহমান গতি ও তাপ বর্ত্তমান থাকে।

বাহ্যজগতে কোন জিনিষ ইন্দ্রিয়গোচর হ'লে যেমন তার একটা ছবি এসে বোধ জন্মায়, মনোমধ্যেও সেরূপ কোন বিষয় চিন্তা কল্লে, তা'রও একটা ছবি এসে মন-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তুলে, তা'র জ্ঞান জন্মায়। কোন বিষয়ই জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন মানসরাজ্যে নিজ মূর্ত্তি অঙ্কিত কর্ত্তে সক্ষম হয় না। সকল বিষয়েরই এক প্রান্তে জ্ঞান, অপর প্রান্তে তা'র নিজ স্বরূপ। মাঝখানে মন গ্রহণ ও প্রেরণ কচ্ছে। আবার ত্যাগ এসে কখন কখনও বিষয়ের শেষ যবনিকাপাত কচ্ছে। এসব কাজের প্রধান বাহনই হলেন তাড়িৎ-শক্তি। বিষয়ের আঘাত ইহাতে প'ড়লেই একটা কম্পন জন্মে; সে কম্পন বিষয় হ'তে গড়া'তে গড়া'তে জ্ঞানে এসে থেমে যায়। যেটাকে নিয়ে জ্ঞান অভিনয় কর্ত্তে ইচ্ছা করে, তা'র স্মৃতি একেবারে থেমে যেতে পারে না। তা' জ্ঞানের ভেতর থেকে ইচ্ছা রূপে বের হ'য়ে ইন্দ্রিয়পথে বিষয়কে গ্রেপ্তার কর্ত্তে ছুটে। এ সময় ইন্দ্রিয়ের রাজা মন 'ধরবে কি না ধরবে' একবার চিন্তা করে দেখে। তখন বিশেষ বিবেচনা শক্তি অর্থাৎ বিবেকের বশবর্ত্তী হ'য়ে যে কর্ম্ম করে, তা' অভিমান বর্জ্জিত হ'লে, অন্য একটা সত্বার কার্য্য মনে করে নিজ শক্তি টুকু তার মিশাইয়ে দিয়ে কর্ম্ম করে, তাই এসকল কর্ম্মের পরিপক্কাবস্থায় ভক্তি।

বিষয় থেকে জ্ঞানে পহুছিতে তার বাহন টীকে তাড়িত-শক্তি বলি কেন? তাড়িত-শক্তি মূলতঃ একটা ভীষণ গতি শক্তি; দেহ মধ্যে এর কেন্দ্র হচ্ছে আত্মা। আত্মার গুণ চেতনকে বিস্তার করাই ইহার কার্য্য। চেতনের বিস্তার কার্য্যের গতি যখনই কেন্দ্র হ'তে একটা স্পন্দনরূপে বের হয়ে পড়ে, তখন সেই প্রবাহ অন্তর্মুখীও [illegible] এবং পরিশেষে পরমাণু, আকাশ প্রভৃতির [illegible] ঠোকাঠোকির ফলে জ্যোতির্ম্ময় ও উত্তাপ [illegible] একটা স্থূল শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তিটী দেহের ভিতর অবিরাম চলছে বলেই, রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়; ৯৮° ডিগ্রি তাপ বর্ত্তমান থাকে, ও অন্তঃকরণ (Heart) ধুক্‌ধুক্ করে গতির সমতা রক্ষা করে। এইজন্য অন্তঃকরণকে (Heart) আয়ুর সমতা ও বিস্তারের যন্ত্ররূপে বলা যায়; সুতরাং দেহ মধ্যে যে সকল কাজ হ'চ্ছে, তা' মনের সাহায্যেই বলি, কিম্বা ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের সাহায্যেই বলি, সকলই এই মহাশক্তির আশ্রয়ে সম্পন্ন হ'য়ে থাকে।

দেহ গতির যেমন একটা কেন্দ্র আছে, অনন্তবিশ্বের অনন্তগতিরও সেইরূপ একটা আছে; জীবের তা' আত্মা; বিশ্বের তাহাই ব্রহ্ম। দেহকেন্দ্র থেকে গতির বিকাশ হ'তে

যেমন চেতনের বিস্তার ফলে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা হ'তে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থেকে কর্ম্ম ও ভক্তি এবং কর্ম্মভক্তি হতে আনন্দ; সেইরূপ বিশ্বেও কেন্দ্র হ'তে গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির সক্রিয়তা স্বভাবের চেতনা, ফলে অনন্ত বিস্তারের স্বভাব, তা' থেকে বিশ্বের শক্তি, শক্তির বিকাশ হ'তে গতি এবং গতি জমে গেলেই কাঠিন্য (Heardness) এখানেই হ'ল পরমাণুর সৃষ্টি।*

* আমরা হিন্দুদর্শন ও উপনিষদ প্রভৃতির দার্শনিক কূটতত্ত্বের উদ্ধার কর্ত্তে সক্ষম হ'লে, জগৎ রচনা উপাদান স্বরূপ পরমাণুর পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সূক্ষ্ম বিষয় প্রত্যক্ষ কর্ত্তে সক্ষম হই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম শক্তি যা' ভূমরূপে আছে, খণ্ডরূপে মানুষ অথবা জীবেও সীমাবদ্ধাবস্থায় তাহাই আছে। মানুষ ভিন্ন অন্য কোন জীব নিজস্ব সসীম শক্তিটীকে অসীম কর্ত্তে সক্ষম হয় না। মানুষ তা'র ইচ্ছাশক্তিকে যদি বিষয়াবদ্ধ না রেখে অসীমের দিকে পরিচালনা করে, করে তা' হ'লে সে'টা কিছুদিন পরে-অসীমের সঙ্গে সঙ্গে অসীম হয়ে যায়। এই হ'ল মানুষের বিশেষ শক্তি।

আমরা এখন স্পষ্টরূপে কেন্দ্র থেকে বিষয় পর্য্যন্ত যে একটা সমষ্টি গতি দেখ্‌তে পেলেম্, তাহাই ইচ্ছা। ইচ্ছার কার্য্য হচ্ছে জ্ঞানকে বিষয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে সচেতন রাখা। তাই ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বদা সচেতন দেখ্‌তে পাই। নিদ্রিতাবস্থায় সকল ইন্দ্রিয় যখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, তখনও ইচ্ছা জ্ঞানান্তর্গত সংস্কারের বীজকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই হ'ল স্বপ্ন। এক আনন্দের সময় ভিন্ন, ইচ্ছা নিস্তব্ধ থাকৃতে চায় না। ইচ্ছা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানকেন্দ্র ভেদ ক'রে চেতনায় এসে বিশ্রাম লাভ না করে, ততক্ষণ আনন্দ উৎপন্ন হ'তে পারে না। প্রকৃত আনন্দও যা, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বচিন্তা প্রভৃতির অন্তর্ম্মুখী পথে বিশ্রামও তাহাই।

জ্ঞান জ্যোতির্ম্ময়, যেমন সূর্য্য; ইচ্ছা তা'র বাহন, কর্ম্মভক্তি যেন আলোক ও তাপ; আনন্দ সে অন্ধকার। কর্ম্ম ধ্বংস হলেই আনন্দ সুতরাং এক্ষেত্রে ইচ্ছাও অব্যক্ত, জ্ঞান ও অব্যক্ত; কাজেই জ্যোতিঃশূন্য। যতক্ষণ জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির সঙ্গে মিশে থাকে,

---

* এতদিন জগতের প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই পরমাণুকে জগতের বস্তু রচনার মূল উপাদান মনে করিতেন, কিন্তু এখন ইলেকট্রন আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটা পরমাণু অসংখ্য ইলেকট্রনের (বিদ্যুৎকণা) সমষ্টি মাত্র। এই ইলেকট্রনের সমষ্টিই বস্তু এবং ইলেক্‌ট্রন মহাবেগে ধাবমান। সুতরাং যাহা আমরা শূন্য মনে করি, তাহা শূন্য নহে; তাহাও অসংখ্য ইলেক্‌ট্রনপূর্ণ বিন্দু সমষ্টি। এই বিন্দুগুলির ব্যাস অধ্যাপক রেণলড্‌সের মতে এক ইঞ্চির ২০................ ভাগের একভাগ। রেণলড্‌স্ অঙ্ক করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহাই জগতের ক্ষুদ্রতম বস্তু এবং ইহার নিজস্ব গতিবেগই জগতের গতিশক্তির নিদান। রেণলড্‌স্ আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমরা যে আকাশকে শূন্য মনে করি তাহা শূন্য নহে; নিরেট পদার্থ এবং আমাদের পৃথিবীতে প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাপ দিতেছে; এবং ইহার বস্তুসংহতি সীসার চেয়েও ঘন ও জল অপেক্ষা দশ হাজার গুণ ঘন। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্ ম্যাকেঞ্জি, প্রসিদ্ধ রসায়নিক সারটম্‌সন্ প্রভৃতি নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা এই একই সত্যে উপনীত হইয়াছেন। (current opinion and Litetary Digest.)

ততক্ষণ আলোকও স্থির নয়, অন্ধকারও স্থির নয়; সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বর্ত্তমান থাকে না; এবং আলোক ও অন্ধকার মহাসমরে প্রবৃত্ত। জ্যোতিঃ বিষয় অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশক, তাও অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ কোরে। অন্ধকার পৃথক পৃথক সমস্ত স্বরূপকে একবর্ণে আচ্ছন্ন কো'রে, এক অদ্বৈত স্বরূপে নিয়ে আসে সুতরাং জ্যোতিকে এর সঙ্গে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, আত্মবলে নিজস্ব দ্বৈতস্বরূপ প্রকাশকারিণী শক্তির বিকাশ কর্ত্তে হয়; কিন্তু তাহার ক্ষণ ক্ষণিক, কালের চক্রে আবার আলোক নিভে যায়, বিষয় ধ্বংস হয়; সুতরাং অন্ধকারর অদ্বৈত শক্তিতে মিশে যায়। অন্ধকারের স্বরূপ ভূমা, সে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান এবং আলোককে আশ্রয় দিয়ে আছে, তাই আনন্দ ও ভূমা এবং সর্ব্ব কর্ম্মের শেষ বীজ সেই বহন কচ্ছে। অন্ধকারের ভূমা অদ্বৈত স্বরূপকে ভেঙ্গে চুরে আলোক যেমন জগতের নানা প্রকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করায়, নিরানন্দও সেইরূপ আনন্দকে ভেঙ্গে চিরে নানা প্রকার বিষয়াকাঙ্ক্ষা যোজনা কো'রে দিয়ে আপন প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্যই অমার্জ্জিত জ্ঞানে সর্ব্বদা বিষয়-বুদ্বুদ ফুটে উঠে, মানসসাগরে উত্তাল তরঙ্গ তুলে দেয়।

একটা কথা হ'তে পারে, ব্রহ্ম কিম্বা আত্মা জ্যোতির্ম্ময় ও সচ্চিদানন্দ; সুতরাং তিনি অন্ধকার না হ'য়ে জ্যোতির্ম্ময় হলেন কেন? এর উত্তর অতি সহজ। আমরা যখন ব্রহ্ম কিম্বা আত্মার অনুসন্ধান করি, তখন তাঁহাকে বিষয়ের ভিতর দিয়ে খুঁজ্‌তে খুঁজতে অবশেষে একটা কেন্দ্র স্বরূপে পাই। কজেই বিষয় প্রকাশের দরুণ যে জ্যোতিঃর প্রকাশ তা' কেন্দ্রের উপর অধ্যাসিত অবস্থায় থাকে; কারণ বিষয়কে বাদ দিয়ে তাঁর সন্ধান সম্ভবে না; সুতরাং কেন্দ্রটীকে জ্যোতিঃর সঙ্গে মিশে আছে দেখ্‌তে পাই। এই অধ্যাস কার্য্যটী ঠিক স্ফটিকের গ্রাসে লাল কালী রেখে দূর থেকে দেখ্‌লে যেমন অবিচ্ছিন্ন দেখা যায় এ ব্যাপারও ঠিক তেমি। ব্রহ্ম কিম্বা আত্মা অন্ধকারও নয়, জ্যোতির্ম্ময়ও নয়, সসীমও নয় অসীমও নয়; চেতন ও নয়, অচেতনও নয়; পরন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্র। এজন্য ইহার স্বরূপ কেহ মুখে বো'লে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। তাই বোধহয় কোন সাধক ভাবের ঘোরে গেয়েছিলেন,—

"নাহি জ্যোতিঃ, নাহি সূর্য্য, নাহি শশাঙ্ক-
শেখর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ, অহম্ স্রোতে নিরন্তর।

* * * * * *

সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
রহে মাত্র আমি এই ধারা অনুক্ষণ,
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহা লয়ে প্রবেশিল,
অবাঙ্মানসগোচরম্ বোঝে প্রাণ,
বোঝে যার।"

এর পর সাধক নীরব, আর জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি নেই, ভাবের স্ফূর্ত্তি নেই, তাঁর খণ্ড ভাব মহাভাবে পরিণত হ'ল। এখানে তাঁর ব্রহ্মলাভ, এখানেই তাঁর মহানন্দ!!!

কস্যচিৎ পাগলস্য*।

* আত্মা মুক্তাবস্থায়।

:0:

প্রেমিক।

নয়নে ফুটিছে প্রীতির রেখা।
বচন তাঁহার অমিয় মাখা॥
অধরে সদাই মধুর হাস।
জানে না সেজন কঠোর ভাষ॥
দয়াই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ।
নেহারি তাঁরে জুড়ায় জীবন॥
পরকে আপন ভাবয়ে মনে।
অনাথে লইছে বুকেতে টেনে॥
মান অপমান না আছে তাঁর।
ধায়ে না সে কভু স্বার্থের ধার॥
ছোট বড় সে করে না বিচার।
সকলের সনে একই ব্যভার॥
আমার 'আমিত্ব' গিয়েছে ভুলে।
জগৎ জেনেছে আপন ব'লে॥
পরের দুঃখ করিতে মোচন।
করেছে ত সে আত্ম-বিসর্জ্জন॥
অপরের চোখে দেখিলে জল!
তাঁর নয়ন করে ছলছল॥
আমার বলিতে কিছু না আছে।
অনন্ত সত্বায় ডুবিয়াছে সে॥

দীন—স্বরূপানন্দ

—:০:—

মৃত্যু।

মুখস্টাই কিম্ভুত কিমাকার! মুখস্ উন্মোচিত হইলে যখন অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি প্রকাশ পায়, তখন আর তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে না। মৃত্যু সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আবহমানকাল মরণের একটা ভয় আমাদিগের অন্তঃকরণে লাগিয়া আছে। তাই মৃত্যু কথাটী শুনিলেই আমরা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ি। কিন্তু যদি আমরা অকারণসঞ্জাত ভয়ের মুখস্টা পরিহারকরতঃ মৃত্যুর প্রকৃত মূর্ত্তিটা সন্দর্শন করিতে পারি, তবে আর আমাদিগকে মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠিতে হয় না। ব্যবহারিক জগতে জীবের যত প্রকার ভয় আছে, তন্মধ্যে মরণ-ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গম্ ধাতু কিপ প্রত্যয়ে জগৎ। এখানে সকলই ছায়া-চঞ্চল, গতিশীল। পরিবর্ত্তনই এখানকার রীতি ও ধর্ম্ম। মৃত্যুও পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে চূড়ান্ত পরিবর্ত্তনের নামই মৃত্যু। ভয়, অপমান প্রভৃতিতেও আমাদের মনের সুতরা দেহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। তন্নিবন্ধ ঐ ঐ সময়েও আমাদিগের একপ্রকার মৃত্যু হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রেও অনেক প্রকা মৃত্যুর কথা আছে। পাশ্চাত্য কবি সেক্ষপীয়রও বলিয়াছেন, ভীরু ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পূর্বে অনেকবার মরিয়া থাকে।

ইহজগতে পরিবর্ত্তনের স্রোত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ও অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। "সর্ব্বদাই, অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক

সঙ্কালনে ও সামান্য বিষয় চিন্তা করিতে হইলেও শারীরিক কোষসমূহের ধ্বংস হয় ও নূতন কোষ সমূহ প্রস্তুত হইয়া উক্ত ধ্বংস কোষ বা অংশ সকলের স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে। শরীরস্থ কোষসমূহ প্রত্যেক ৪০ দিবস মধ্যে ধ্বংস হইয়া নূতন কোষ সকল দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।"—(ডাক্তার ইউ, এম্, সামন্ত, এল্, এম্, এস্, বাইও-কেমিষ্ট মহাশয়ের "বাইওকেমিক মেটিরিয়া মেডিকা" নামক পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠা)। "আমাদের মস্তিকে ৩০০,০০০,০০০ স্নায়ু-কেন্দ্র আছে। প্রত্যেক কেন্দ্র এক একটী স্বতন্ত্র কার্য্যস্থল। প্রত্যেক কেন্দ্র ৬০ দিন মাত্র জীবিত থাকে। প্রত্যহ ৫,০০০,০০০ বা মিনিটে ৩,৫০০টী কেন্দ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। আবার ঐ সময়ের মধ্যে ঠিক ততগুলি নূতন কেন্দ্র উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং ৬০ দিন বা ২ মাসে এক জন মানুষের সমস্ত মস্তিষ্কটী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাহিরে আমরা তাহার কোনই প্রমাণ পাইতেছি না।"—("সম্মিলনী", ১৩২১ সাল, ২০শে শ্রাবণ, ১৯শ পৃষ্ঠা)। এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন নিয়ত‌ই হইতেছে; সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদিগের মৃত্যু ঘটিতেছে। অতএব মৃত্যু ব্যাপার যখন আমাদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক তখন আর উহাতে ভয় কি? আমি বাল্যে যেমনটী ছিলাম, যৌবনে তেমনটী ছিলাম না; আবার যৌবনে যেমনটী ছিলাম, বার্দ্ধক্যে আর তেমনটী নাই। ঘোর পরিবর্ত্তন! দৈহিক, মানসিক সকল দিকেরই বিপর্য্যয়! মৃত্যু জিনিসটী আর একটু বেশী রকমের পরিবর্ত্তন। তাই গীতা বলিয়াছেনঃ—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥"—২।১৩

অর্থ—দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থা ত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ একটী অবস্থা বিশেষ মাত্র। ধীর পুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না।

অতএব, দেখা যাইতেছে, আমাদিগের পাঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে যে জীবাত্মা আছেন, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য দেহ ধারণ করেন। সেই ব্যাপারটীর নামই 'মৃত্যু'।

কথাটী এখন একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সাধারণে জীবাত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। চার্ব্বাকগণ বলেন :—"শরীরই আত্মা।" (হিন্দু পত্রিকা, ১৩২০ সাল, ৩২৬ পৃষ্ঠা)। জড়বাদী বুচ্‌নার; জে, লুচ; মিঃ গ্রান্টঅ্যালেন, ল্যাউএল; মি হার্বার্ট স্পেন্সার (হিঃ পঃ, ১৩২০ সাল ৩২৯ পৃ); অধ্যাপক ডব্লিউ, কে, ক্লিফর্ড (হিঃ পঃ ১৩২০ সাল, ৩০৯ পৃ) ইঁহারা কেহই আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল্; জি, জে, রোমেন্স (হিঃ পঃ, ঐ, ৩৩১ পৃ) ইঁহারা উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ডাক্তার স্নিলার, ডেভিড্ হিউম্, কোম্ত (হিঃ পঃ, ঐ, ৩৩২) অধ্যাপক উইলিয়ম্ জেম্স্ (হিঃ পঃ, ঐ, ৩৩৭) অধ্যাপক হক্সলি (হিঃ পঃ, ঐ, ৩৩৮) ইঁহাদের মধ্যেও নানারূপ মতভেদ আছে। তাই গীতাও বলেন,—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈন মন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব ॥
সঞ্জিৎ ঐ ২।২৯।

অর্থ—কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি বা এই আত্ম-তত্ত্ব আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না।

জীবাত্মা আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা কল্পনা নহে। উহা খাঁটী সত্তা শাস্ত্রে দেখা যায়, সত্যবানের মৃত্যু হইলে যম তাঁহার অন্নময় দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীবাত্মাকে লইয়া চলিলেন। হয়ত জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীরা এই তথ্যটী স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। কিন্তু অধুনা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এমন সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাহাদের সাহায্যে জড়দেহ হইতে লিঙ্গ শরীরের প্রয়াণ ও সেই প্রয়াণের বেগ-পরিমাণ জানা যাইতেছে।—(রঙ্গপুরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন জ্যোতিভূর্ষণ "ভৌতিক আয়না" আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নিয়মাবলী পুস্তক দ্রষ্টব্য) অতএব জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক্ষণে আর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই বিজ্ঞান চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন।

স্থূল দেহ হইতে জীবাত্মার এই প্রয়াণই মৃত্যু। এই ব্যাপারটী বড়ই গুরুতর। জীবাত্মা এই অন্নময় দেহ ত্যাগ করিয়া এক তিলও বিদেহাবস্থায় থাকে না। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময়ে যেমন কেহ বস্ত্র ত্যাগ ও অন্য বস্ত্র পরিধান যুগপৎই করিয়া থাকেন, নগ্নাবস্থায় যেমন তিনি এক তিলও থাকেন না, জীবাত্মাও তদ্রূপ স্থূল দেহ ত্যাগ ও অন্য দেহ ধারণ যুগপৎই করিয়া থাকেন। গীতাও তাই বলিয়াছেন :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২।২২।

অর্থ—যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। এখানে "অন্য অভিনব দেহ" অর্থে অন্য একটী স্থূল দেহ বুঝিতে হইবে না। সেরূপ বুঝিলে স্বর্গ-নরক ভোগ, শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি তাবৎ পারলৌকিক কার্য্যই নিরর্থক হইয়া উঠে। এই "অভিনব দেহ" অর্থে "আতিবাহিক দেহ"। স্থূল দেহ হইতে জীবাত্মার প্রয়াণ গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে আর একটী সুন্দর উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। স্থলটী এই—

"যথা তৃণজলৌকেব দেহী কর্ম্মানুগোহবশঃ।"

অর্থাৎ—যেমন জলোকা (জোঁক) তৃণ হইতে তৃণান্তরে যাইতে হইলে, এক তৃণকে সামান্যভাবে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব তৃণকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, তদ্রূপ জীব দেহান্তর আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে।

আতিবাহিক দেহাবস্থায় জীবাত্মা খুব যাতনা পায়। তার পরে ভোগদেহ হয়। তখন স্বর্গ-নরক ভোগ হয়। তার পরে জীবাত্মাকে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়।

অগ্নিপুরাণের ৩৬৯ অধ্যায়ে এইরূপ আছে:—

"বাহ্যবায়ানলোচ্ছে তু দেহে, যথাতিবাহিকে।
তিষ্ঠন্ বসতি কর্ম্মজ্ঞ দত্ত পিণ্ডাশনং ততঃ॥
তং ত্যক্ত্বা প্রেতদেহস্থ প্রাপ্যান্যং প্রেতলোকস্থং
বসেৎ ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত আমশ্রাদ্ধার ভুঙ নরঃ॥

আতিবাহিক দেহাত্তু প্রেতপিণ্ডৈর্বিনা নরঃ।
ন হি মোক্ষমবাপ্নোতি পিণ্ডাংস্তত্র স সোহশ্নুতে॥
কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং সমুৎসৃজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥
ভোগদেহাবুভৌ প্রোক্তাবশুভাশুভসংজ্ঞিতৌ।
ভুক্ত্বা তু ভোগদেহেন কর্ম্মবদ্ধান্নিপাত্যতে।"

তাৎপর্য্য—আতিবাহিক দেহের পর 'দশ পিণ্ড' পাইয়া প্রেত দেহ লাভ করে। দশ পিণ্ডের দুইভাগে নবদেহ গঠন; একভাগে মৃতের তৃপ্তি এবং অপর ভাগে যম দূতের তৃপ্তি হয়। প্রেতদেহপ্রাপ্ত জীব যমালয়ে নীত হয়, ষোড়শ প্রেত শ্রাদ্ধ অর্থাৎ আদ্য-শ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত হইলে জীব 'ভোগদেহ' প্রাপ্ত হয়। সেই দেহেই যম দর্শন ঘটে, সেই ভোগ-দেহ দ্বারাই যমের নির্দ্দেশানুসারে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ স্বর্গ বা নরকভোগ জীবের ঘটিয়া থাকে। (বারান্তরে সমাপ্য।)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদ।

—:০:—

বর্ষশেষে নিবেদন।

(বিশেষ-দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গাব্দ ১৩২১ সনের সঙ্গে সঙ্গে "আর্য্য-দর্পণ" ৭ম বর্ষ অতিক্রম করতঃ আগামী বৈশাখ মাসে ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিবে। আমরা শিক্ষিত, সজ্জন ও স্বধর্ম্মানুরাগী গ্রাহকবর্গের সাগ্রহ অনুরোধ ও উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম হইতে যদিও একফর্ম্মা অর্থাৎ ৮পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছিলাম, তথাপি মূল্য পূর্ব্ববৎই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমরা জনসাধারণ হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি প্রাপ্ত হই নাই। আশা আছে জগদ্গুরু জগদীশ্বরের কৃপায় আগামী বর্ষে অধিকতর সংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় গ্রাহক "আর্য্য-দর্পণের" গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মসেবায় আমাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা প্রতিবর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া গ্রাহকবর্গ হইতে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা গ্রহণ করিয়া থাকি। সেজন্ম ফাল্গুণ ও চৈত্র মাসে জানাইয়া থাকি যে, কেহ পত্রিকা গ্রহণে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলে, আমাদিগকে চৈত্র মাস মধ্যে জানাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ প্যাকেট ফেরত আসিলে, কৌপীন-মাত্রৈক সম্বল ভিখারী পরিচালকবর্গকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়; গ্রাহকগণই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু যে সকল গ্রাহক অকারণে নির্ম্মম হইয়া একটু ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে নিজ সাহায্য প্রতিগ্রহণ করেন, আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও একপয়সার পোষ্টকার্ডে না জানাইয়া পত্রিকা ফেরত দেন, তাঁহারা পরপ্রত্যাশান্বিত পত্রিকার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপণ কার্য্যের সহায়ক সন্দেহ নাই। আমরা বৈশাখ মাসের পত্রিকা ভিঃ পিঃ ডাকে গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইব। যদি কোন গ্রাহক

বিশেষ কারণে পত্রিকা গ্রহণে অসমর্থ হন, চৈত্র মাস মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস "আর্য-দর্পণের" কর্ত্তব্যপরায়ণ গ্রাহকগণ মধ্যে কেহই এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরিশেষে পত্রিকার হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই, তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে, এই পত্রিকা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে;—ইহার লভ্যাংশ "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের" সেবা বিভাগে ও দরিদ্র অনাথ-নারায়ণ সেবায় ব্যয়িত হয়। আপনাদিগের অনুগ্রহের উপরেই "আর্য-দর্পণের" উন্নতি ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। এক একজনের একটি পত্রিকার জীবন ধারণের পক্ষে আমরা যথেষ্ট মনে করি; সুতরাং প্রত্যেকেই যথা-সাধ্য, আপন আপন বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার প্রচার এবং নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া গ্রাহকমাত্রেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। পত্রিকা পাঠে যেমন একদিকে সাধুভক্তের অমৃতময়ী লেখনীর মধুরাস্বাদে তৃপ্ত হইবেন, তেমন অন্যদিকে গ্রাহকগণ আপন আপন প্রদত্ত অর্থে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার পূণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন। আমাদিগের উভয়দিগকেই সেবা ব্রতের সার্থকতা হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ—

বিনীত

প্রকাশক—"আর্য্য-দর্পণ"

পোঃ কোকিলামুখ, (যোরহাট) আসাম।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীনিগমানন্দ-গম্ভীরা—অত্র সারস্বতমঠের ব্রহ্মচারী যুবক ও বালকগণের বেদ-বেদান্ত পাঠের সুবিধার্থ শ্রীশ্রীকাশীধামে বিগত ২৯শে মাঘ শ্রীশ্রীশিবরাত্রির দিন "শ্রীনিগমানন্দ-গম্ভীরা" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিবালা—স্থানীয় সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ বাবুর বাগানবাড়ীতে এই আশ্রমের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিশ্রাম-কালে উক্ত গম্ভীরাতেই অবস্থিত করিবেন। আশাকরি, এসংবাদে বাঙ্গালী ভক্তমাত্রেই আনন্দিত হইবেন; আর তাঁহাদিগকে দুর্গম আসামপ্রদেশে আসিতে হইবে না। উক্ত গম্ভীরার ঠিকানা,—৪৮নং পিলখানা, বেনারস সিটী।

কুম্ভমেলা—বর্ত্তমান মাসের-২৮।২৯।৩০শে চৈত্র—(১১।১২।১৩ এপ্রিল) হরি-দ্বার কুম্ভমেলার মহাস্নান;—যাহারা আমাদের সহযাত্রী হইতে ইচ্ছা করেন;—তাহারা "৪৮নং পিলখানা-বেনারস সিটী" এই ঠিকানায় পহুছিয়া সংবাদাদি জানিয়া লইবেন।